অলকনন্দা প্যাটেল

পৃথিবীর পথে হেঁটে

অলকনন্দা প্যাটেলের জন্ম ঢাকার গেণ্ডারিয়ায়। বাংলাদেশে কৈশোর ও শৈশবের যে স্মৃতি তা এখনো বয়ে বেড়ান। বরিশাল ও ঢাকা তাঁর স্মৃতিতে এই অশীতিপর বয়সেও অম্লান। প্রবাদপ্রতিম অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার দাশগুপ্ত তাঁর পিতা এবং স্বামী আই জি প্যাটেল ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকসের ডিরেক্টর ছিলেন।

অলকনন্দা প্যাটেল নিজেও অর্থনীতির চর্চা ও সাধনার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছেন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। বর্তমানে যুক্ত আছেন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, আহমেদাবাদের সঙ্গে। শাস্ত্রীয় সংগীত ও সাহিত্যে অনুরাগ তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুশীলন অলকনন্দাকে করে তুলেছে সংগীত বিশেষজ্ঞ। সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিরলস প্রয়াস তাঁকে বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব দান করেছে।

বিশ্বনাগরিক অলকনন্দার পদচারণ ভুবনময় হলেও বাংলাদেশে তাঁর যে শেকড় তা এই খ্যাতিমান ও রুচিমান মানুষটিকে আমাদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। *পৃথিবীর পথে হেঁটেতে* উঠে এসেছে ত্রিশ-চল্লিশের দশকে তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলের ছবি ও তৎকালীন বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহ। মননের ঔজ্জ্বল্যে এই অনন্য গ্রন্থটি শুধু স্মৃতিকথা নয়, তাঁর রচনার গুণে, জীবনদৃশ্যে ও শৈলীতে বাংলা সাহিত্যে এ এক অনন্য সংযোজন।

9 789849 256915

অলকনন্দা প্যাটেল

অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক;
জন্ম ৯ নভেম্বর ১৯৩৭, ঢাকা।
অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি
ইতিহাস ও সংগীতে সমান আগ্রহী। ঢাকার
ইডেন স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু সাতচল্লিশের পূর্বে।
শিক্ষা গ্রহণ করেছেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়,
যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ-বিদেশের
বিভিন্ন বিদ্যায়তনে।
অধ্যাপনা — স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ,
দিল্লি; ডার্টিংটন কলেজ অফ আর্টস, ইংল্যান্ড।
দীর্ঘ সময় যুক্ত ছিলেন ইতালির মিলানে এনরিকো
এনি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে; গবেষণা করেছেন
বহুত্বধর্মী সংস্কৃতির সমাজ ও তার টেকসই
উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে। অলকনন্দার লেখায়
ইতিহাস সন্ধানের প্রয়াস যেমন রয়েছে তেমনি
রয়েছে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও সমসাময়িক
বাস্তবতায় তার বিশ্লেষণ। অর্থনীতির ছাত্রী হলেও
ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক বেশি। তাঁর লেখায় ফুটে
ওঠে দেশভাগের বেদনাবিধুর স্মৃতি। একই সঙ্গে
আন্দোলিত হন তিনি পুরনো স্মৃতি রোমন্থনে।
পাঠকের সামনে ধরা দেয় সে সময়ের সমাজ,
রাজনীতি, অর্থনীতির নানা প্রবণতা।
দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় গবেষণাসহ
ইতিহাসনির্ভর লেখা বেরিয়েছে তাঁর। সম্পাদনা
করেছেন তিন খণ্ডে পিতা যশস্বী অর্থনীতিবিদ
অমিয়কুমার দাশগুপ্তের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংগ্রহ।
রবীন্দ্রসংগীতে গুরু শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার,
শাস্ত্রীয় সংগীত শিখেছেন রামপুর ঘরানার ওস্তাদ
নিসার হুসেন খাঁ ও ওস্তাদ হাফিজ আহমেদ খাঁর
গাণ্ডাবদ্ধ শিষ্যা হয়ে। সংগীত বিষয়ে 'ঘরানা'
রীতি, সংগীতজগতে নারীর অবস্থান নিয়ে
গবেষণা করেছেন।
শখ — ভ্রমণ, চিত্রকলা, দর্শন, ইতিহাস পাঠ,
বাংলা গান শোনা, বাগানে সবুজ পাতার মাঝে
পাখি দেখা।

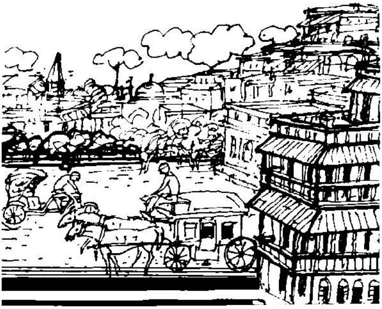

পৃথিবীর পথে হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলকনন্দা প্যাটেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলকনন্দা প্যাটেল

পৃথিবীর পথে হেঁটে

বেঙ্গল
পাবলিকেশন্‌স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর পথে হেঁটে
অলকনন্দা প্যাটেল

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭

প্রকাশক : আবুল খায়ের
বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, বাড়ি ৫৭/এ, মেগাডোরি (৫ম তলা)
সড়ক ১৫/এ (নতুন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ।
ফোন + ৮৮০ ২ ৫৫০২৯৩২৪

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : রফিকুন নবী

মুদ্রণ : এম কে প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৮৯/১ তেজগাঁও, ঢাকা

মূল্য : ৬৫০ টাকা

Prithibir Pathe Hente by Alaknanda Patel
Published by Abul Khair
Bengal Publications, House 57/A, Mega Dori (4th Floor)
Road 15/A (New), Dhanmondi, Dhaka 1209, Bangladesh.
Tel + 880 2 55029324

ISBN 978-984-92569-1-5

Price : BDT 650 USD 12

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

গৈলা, গেণ্ডারিয়ার
পূর্বপুরুষদের স্মরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে তারে মর মিছে— পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে না ক' আর;
রয়েছে অনেক কাক এ-উঠানে— তবু সেই ক্লান্ত দাঁড়কাক
নাই আর— অনেক বছর আগে আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক
দাঁড়কাক দেখা যেত দিন রাত— সে আমার ছেলেবেলাকার
কবেকার কথা সব; আসিবে না পৃথিবীতে সে-দিন আবার

কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, খেত, মাঠ, ঘাস,
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে সাদা হাত
সেই সব নোনা-গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, তাল-শাঁস,
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ— ধোঁয়া-ভরা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব?

জীবনানন্দ দাশ
রূপসী বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

অলকনন্দা প্যাটেলের বহু যত্নে, বহুদিন ধরে রচিত বইটি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আমার গুরুকন্যা তাঁর বালিকা বয়সে তখনকার ঢাকা শহরের অনেক স্মৃতি এই বইয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করেছেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ঢাকা থেকে মহানগরী কলকাতায় পৌঁছোতে প্রায় পুরো একটি দিন লেগে যেত। সুতরাং ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন শহর বলে মনে করা স্বাভাবিক ছিল। বিদেশি শাসিত পরিমণ্ডলে নগরটির টিকে থাকা দিনের পর দিন মন্থরগতিতে কাটে; তবে এরই মধ্যে একটু অন্যরকম উজ্জ্বলতা, যার প্রধান হেতু ঢাকা ও আসামকে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে ঘোষণার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত। হঠাৎ ব্রিটিশ প্রভুরা তা প্রত্যাহার করেন। হতাশ অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছুটা আশ্বস্ত করার লক্ষ্যে একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যথাশীঘ্র সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবে পরিণত করান। দেশ-বিদেশ থেকে গভীর মনীষাসম্পন্ন শিক্ষাবিদদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের অনেকের জন্যই সৌষ্ঠবমণ্ডিত বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই এতদিন শিক্ষা-সংস্কৃতি উপেক্ষিত ঢাকার আদল বদলে গেল। যে অধ্যাপকদের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে বসবাস উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো না, তাঁদের জন্য অচিরে অবিশ্রাম হু-হু করে হাওয়া বওয়া পুরানা পল্টন সেগুনবাগানের মতো অঞ্চলে একটি-দুটি করে বাড়ি তৈরি হলো, তরুণতম অধ্যাপকরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন ভেবে অবাক হতে হয়, কারা না দীর্ঘসময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রতী হয়ে জ্ঞান ও চর্চার মান কোন তুঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, জসীমউদ্‌দীন, সুশীল কুমার দে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ — কত নাম করব। এটা না বলা অমার্জনীয় অপরাধ হবে, অর্থনীতি চর্চায় ড. অমিয়কুমার দাশগুপ্তের পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য এবং সেইসঙ্গে ছাত্রবৎসলতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা বিলিতি ধাঁচে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা — ঢাকা হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল, কিছু ছাত্র আবাসিক, বাকিরা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে অধ্যয়নে ব্রতী হতেন। শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে শিক্ষার পরিমণ্ডল, জ্ঞানের অন্বেষণের পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা, প্রতিদিন কোনো তর্ক-বিতর্কসভা, সংগীত পরিবেশন অথবা সাহিত্যসভা, যা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা ঠিক আড়ষ্ট দিনযাপন করতেন না। যাঁরা জ্ঞানচর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন তাঁরা মাস্টার মশাইদের সন্তানসম।

উল্লেখ করতে আমার পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু না বলে উপায় নেই, প্রথম বেশ কয়েক বছর ধরেই কলকাতার শিক্ষামহলে একটু নাক সিটকানো ভাব ছিল; কিন্তু তাতে প্রকৃত বিদ্বজ্জনরা আদৌ নিরুদ্যম হতেন না।

অলকনন্দার শৈশব কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনন্দময় পরিবেশে। দেশ তখন বিদেশি শাসনে নানা বিধিবিধানে শৃঙ্খলিত — কিছুই যায়-আসে না, তাঁর বাল্যস্মৃতি মনোমুগ্ধকর। পুরানা পল্টনে ঝকঝকে নতুন বাড়িতে সংস্কৃতিমনা অধ্যাপকদের আবাস। তরুণ অধ্যাপকদের মাইনেপত্তর তেমন উঁচু হারে নির্দিষ্ট ছিল না, কিন্তু মধ্যবিত্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিজন সীমিত উপার্জনে প্রশান্ত দিনযাপন করতেন।

অলকনন্দার মস্ত সৌভাগ্য তাঁর পিতামাতা তাঁকে, সন্তানদের আদরে, আনন্দে শৈশব থেকে কৈশোরে অতিবাহন করিয়েছিলেন। তাঁর শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি তাই নিবিড় ভালোবাসায় সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে গভীর অধ্যবসায়ের পরে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর বালিকাবয়সের স্মৃতিচারণ করেছেন। স্মৃতি হয়তো মাঝেমধ্যে কুয়াশায় ঢাকা, পুরনো চিঠিপত্র, পুঁথিপত্র আবিষ্কার করে, একাগ্রচিত্তে চিন্তাভাবনা করে যতটা সম্ভব তিনি একটি বিশেষ সময়ের আবহাওয়াকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা ব্যবহার করে বলতে বাসনা জাগে, ঢাকা শহরে আবিষ্ট অলকনন্দার এই বইটি স্মরণবেদনার বরণে আঁকা এবং স্নিগ্ধতায় ভরপুর। ইতিহাস বদলায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে গোটা দেশে মস্ত অদলবদল, অনেক বিষাদ-অবসাদ। তা হলেও অলকনন্দার জীবন সম্বন্ধে মুগ্ধতাবোধ ক্ষান্ত হবার নয়। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ঢাকা এই স্মৃতিচারণ গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

অশোক মিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

*কালি ও কলমে*র পাতায় আমার লেখা 'ঢাকার স্মৃতি' পড়ে অশোক মিত্র মহাশয় প্রথম বলেন মনের আনাচে-কানাচে আরো খোঁজ নিয়ে বইয়ের আকারে ঢাকার জীবনশৈলী লিখতে। ওঁর মতে, সমাজের ইতিহাস গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি থেকে; নতুন প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ গবেষকের জন্য এ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আমার সমাজ ছিল পরিমিত — মধ্যবিত্ত, শিক্ষকদের পরিবার ও তাঁদের পারিপার্শ্বিকতা ঘিরে। *পৃথিবীর পথে হেঁটে* এর কিছু ছবি ধরে রাখবার প্রচেষ্টা। অশোক মিত্রের সঙ্গে তাঁর পড়ার ঘরে, দূরভাষে, চিঠিপত্রে আলোচনা, কথোপকথন, সর্বোপরি তাঁর লেখা ভূমিকা আমার বিরাট প্রাপ্তি; ওঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

এ বইয়ের নাম ভাইজান মো. শামসুর রহমানের দেওয়া। ওঁর স্নেহ ও বন্ধুত্ব না পেলে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সাহিত্য এত আপন হতো না, ঢাকা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য আমার হাতে আসত না, ঢাকার স্মৃতি লেখা শুরু হতো না। অনিতা সেন, মিষ্টিদি, আমার প্রথম দিদি-বন্ধু, ঢাকার জীবনের বহু ছবি সামনে তুলে ধরেছেন, পুরনো দিনের আনন্দের স্মৃতি পুনর্জীবিত করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত ২০১৬-তে দুজনকেই হারিয়েছি। ভাইজান বলতেন, 'ও বিবি, বেলা বয়ে যায় যে।' তাড়া দিতেন মিষ্টিদি, 'কবে শেষ করবে লেখা? আমি যে বসে আছি।' বেলা হয়ে গেল, পূর্ণাঙ্গ বই ওঁরা দেখে গেলেন না। আমার জীবন ও কাজে এঁদের অবদান ব্যক্ত করা সম্ভব নয়; ভালোবাসা ও ব্যথা নিয়ে দুই প্রিয়জনকে স্মরণ করি।

রফিকুন নবীর প্রচ্ছদ বইকে সমৃদ্ধ করেছে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ওঁকে। বাংলা লেখা শুরু করেছিলাম *চতুরঙ্গে*র পাতায়, প্রাক্তন সম্পাদক আবদুর রাউফের সৌজন্যে। এরপর মুনতাসীর মামুন *ঢাকার স্মৃতি*-১২-তে প্রকাশ করেন আমার 'যতোটুকু মনে পড়ে'। কয়েক বছর ধরে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ইতিহাস বিনা দ্বিধায় জানিয়েছেন হাশেম সুফি। গৈলার সমাজ ও সৌন্দর্য বিস্তৃতভাবে জানিয়েছেন বিশ্বপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাশগুপ্ত ও অংশুপতি দাশগুপ্ত। এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

লেখকের প্রেরণাসূত্র পাঠক। 'ঢাকার স্মৃতি' পড়ে বিভিন্ন পাঠক যোগাযোগ করেছেন; বিশেষ করে শাহজাহান গাজী, যিনি 'ঢাকার স্মৃতি'তে গৈলার কথা পড়ে গৈলা বকশীবাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী কেয়া সেনগুপ্তা ও প্রমিতা চক্রবর্তী গৈলা ও ঢাকার নানা তথ্য পাঠিয়েছে। বই লেখা শুরু হয়েছিল কন্যাসম শকুন্তলা নায়ারের শ্যামল-সবুজ বাগানঘেরা বাড়িতে — কেরালার ওট্টাপালম শহরে। এদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আবুল হাসনাতের সঙ্গে পরিচয় হওয়া সৌভাগ্যের, ওঁকে সম্পাদক হিসেবে পাওয়া আরো বড় সৌভাগ্যের। ওঁর কর্মক্ষমতা, ধৈর্য, সহযোগ, নিরুদ্বেগ-শান্ত বিচার ব্যবহার, নিঃশব্দে সম্পাদনা ও পরামর্শ লেখককে আশ্বাস দেয়। অস্পষ্ট হস্তলিপিতে স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছি ভারতবর্ষে, বরোদা শহরে, পুরো দায়িত্ব নিয়ে প্রচুর অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার মন্থরগতির লেখা উনি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে, ঢাকা শহরে। ওঁর উৎসাহ, সাহায্য না থাকলে এই আন্তর্জাতিক প্রয়াস সম্ভব হতো না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে হাসনাতভাইয়ের জন্য আছে এক বয়োজ্যেষ্ঠার স্নেহ-শুভেচ্ছা।

কন্যা রেহানার প্রোৎসাহন, গভীর ভালোবাসা না পেলে আমার কোনো কাজ সম্পূর্ণ হতো না। এছাড়া পেয়েছি তার বাড়ির শান্ত পরিবেশ, বইভরা পড়ার ঘর, আর মাঝে মাঝে আদেশ, 'লিখতে বসো'। ওর জন্য প্রতি মুহূর্তের স্নেহ।

২০০২-এর ঢাকা ও গৈলা অভিযান, বিশাল অভিজ্ঞতা, সম্ভব হয়েছিল ছোট ভাই পার্থ দাশগুপ্তর উৎসাহ ও সাহায্যে। তারপর থেকে এত বছর বহুজনের সান্নিধ্য ও সহায়তা পেয়েছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সুনীল গুপ্তকে, যিনি আমাকে বকশীবাড়ির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানান। কবীন্দ্রবাড়ির মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা তাঁর পিতামহীর সংঘর্ষময় জীবনের লেখন — *চারটি খাতা* — পড়তে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। ফজলুল রহমান, সালমা রহমান — পুরো রহমান পরিবারের সৌজন্যে 'ঢাকা' বাড়ি হিসেবে ফিরে পেয়েছি। নানাভাবে সাহায্য করেছেন অজয় দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা চন্দ্র, সাজ্জাদ জহির, এনামুল হক, অরুণা গুপ্ত, বাসুদেব দাশগুপ্ত, লাডলি ফয়েজ, ভাঙ্গা ও গৈলা স্কুলের সুধীজন, আব্দুল মান্নান, প্রদীপ কর্মকার ও মিহির সেনগুপ্ত। বরোদাতে অজয় দেশাই, মোহনভাই প্যাটেল ও নরেন্দ্র ভাসোভা আলোকচিত্র ও কম্পিউটারের রহস্যভেদ করতে সাহায্য করেন। আমার হাতের লেখা আঁকাবাঁকা, অস্পষ্ট। প্রচুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধৈর্যের সঙ্গে তার অর্থোদ্ধার করে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেছেন মো. আওরঙ্গযেব — এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিস্মৃতি স্মৃতিকে ঘিরে থাকে। তথ্য নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে; দীর্ঘ সময় নিয়ে লেখা — তথ্য ও ভাষার পুনরাবৃত্তি থাকা সম্ভব। ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী, এ দায়িত্ব আমার। ব্যক্ত-অব্যক্ত অসন্তোষ বন্ধন নিয়ে সংসার, সমাজ। লিখেছি যেটুকু আমার জানা, পরিচিত বা লিখিত — কাউকে আঘাত করবার উদ্দেশ্য আমার নেই। তবু যদি আঘাত করে থাকি মার্জনা চাইছি। বিভিন্ন ঘরানাতে একই বন্দিশের বাণীতে কিঞ্চিৎ তফাত থাকে। আমি বন্দিশ রামপুর ঘরানার অঙ্গে লিখেছি।

পুরনো দিনের কথা শুনতে ভালোবাসি, মা-বাবার কাছে গৈলা, বরিশাল, ঢাকা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি, এ লেখাতে তা প্রচুর সাহায্য করেছে। ঢাকার জীবন এঁদের কাছে ফিরে আসেনি। আমি ঢাকা, গ্রাম, দেশ ফিরে পেয়েছি জানলে এঁরা তৃপ্তি পেতেন, এ আমার মস্ত সান্ত্বনা।

অলকনন্দা প্যাটেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

যতটুকু মনে পড়ে	১৫
পুরানা পল্টন — ৫নং বাড়ি	১৮
ঘরসংসার	৫৩
ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধ	৬৭
পড়াশোনা-খেলাধুলা-ছেলেবেলার নানা প্রশ্ন	৭১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৮৫
সংগীত-সাহিত্য-আড্ডা	১৭২
পরিমলকাকা — ঢাকার পরিমল রায়	১৯২
গেণ্ডারিয়া	২০৪
লক্ষ্মীবাজার-শরৎকুটির	২৫৯
বরিশাল	২৬৬
গৈলা	৩০৬
যুদ্ধ-অধিকরণ-ওয়ারী	৩৪৫
ফেরা-ছেড়ে যাওয়া	৩৮১
উপসংহার	৩৯৩
পরিশিষ্ট	৩৯৯
আলোকচিত্র	৪০৫
সূত্র	৪৩৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতটুকু মনে পড়ে
ঢাকা, ১৯৪১-১৯৪৬

যে সময়কার ঢাকার কথা আমার মনে পড়ে, তা বহুকাল আগের কথা। স্মৃতি তাই কিছুটা বিক্ষিপ্ত, আবছা, আবার অনেকটাই সজীব। স্মৃতি বিনিময় করি এমন এক বন্ধু লিখেছিলেন, 'দুটি জিনিস মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পদ, কেউ তা কেড়ে নিতে পারে না। যতদিন মানুষ জীবিত থাকে। অনুভূতি ও স্মৃতি।' সত্যি তো তাই, জীবনের অনুভূতি দিয়ে যেভাবে স্মৃতিকে দেখি তা আমার একান্তই নিজস্ব সম্পদ, নিজস্ব দায়িত্ব। লেখা শুরু হয়েছিল 'যতটুকু মনে পড়ে' তার ওপর নির্ভর করে, শুধুই আমার ভাবনা থেকে। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মায়ের চিঠির ঝাঁপি ও ডায়েরির পাতা। ১৯৩৩-এর পর থেকে অন্তত ষাট বছরের ইতিহাস। লেখার ভিত হয়ে গেল দীর্ঘ, এ লেখন শুধু আমার মন বা চোখ দিয়ে দেখা কাহিনি রইল না। ভাবি, ডাকহরকরার ঝুলি নিয়ে পাতায় পাতায় চিঠি বিলি করলাম, কেন? ঢাকা শহর বহুমাত্রিক; তবু মনে হয় আমার ঢাকা শহরের আত্মা ছিল সম্পর্কের, বন্ধুত্বের, বন্ধনের; চিঠি তার পরিচয়।

আমার জন্ম ঢাকায়, গেণ্ডারিয়ার সতীশ সরকার রোডের 'উমা কুটিরে'র দক্ষিণের ঘরে। দিনটি ছিল ২৩ কার্তিক, ১৩৪৪, ইংরেজি ৯ নভেম্বর, ১৯৩৭। হাসান আজিজুল হকের কথা মানলে বলতে হয় জন্মস্থান, কাল, সবই শোনা কথা।[১] সত্যি তো, প্রত্যক্ষদর্শী হলেও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না; তবে মা-দিদিমার কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণও তো দেখি না। এই স্থান-কালই মেনে নিয়েছি।

গেণ্ডারিয়ায় জন্ম, আর এই গেণ্ডারিয়ার বাড়ি থেকেই ১৯৪৬-এর ২ অক্টোবর পুলিশের পাহারায়, পুলিশের গাড়িতে ঢাকা ছেড়েছিলাম। তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে চিরকালের জন্য — সে কথা নিজেকে বুঝতে দিইনি। পুরো নয় বছর নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু শেষের চার-পাঁচ বছরের স্মৃতি আছে। আমরা বড় হয়েছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে, আনন্দ-আতঙ্ক দুই-ই পাশাপাশি ছিল, আমরা ছোটরা কিন্তু আনন্দ নিয়েই থেকেছি, মন থেকে আতঙ্ক মুছে ফেলতে সময় লাগেনি।

স্মৃতিকথা দ্রুতগতিতে আত্মকথা ও পারিবারিক কাহিনিতে পরিণত হয়, আমার ঢাকা স্মৃতিতে এর ব্যতিক্রম হবে না। তবে মধ্যবিত্ত হিন্দু[২] পরিবারের দৈনন্দিন জীবন সব বাড়িতে প্রায় একই নিয়মে চলত। পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কিছুটা তফাত থাকত ঠিকই, তা সেটা এমন কিছু বেশি ছিল না। আশা রাখি আমাদের নিজস্ব কথা থেকে ঢাকা শহরের একটি সমাজের কিছুটা ছবি পাওয়া যাবে।[৩]

আমার বাবা, অমিয় কুমার দাশগুপ্ত, গৈলা বকশীবাড়ির পার্বতীকুমার দাশগুপ্ত ও ষষ্ঠিমণি দাশগুপ্তের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। ওঁর ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে, গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন। স্কুল পাশের পর দুবছর বরিশাল শহরে ব্রজমোহন কলেজে পড়ে ঢাকা যান উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। ১৯২৬ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির স্নাতক, ১৯২৬ থেকে ১৯৪৬ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

পরিবারে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ কয়েক পুরুষের। পার্বতীকুমারের কাকা রজনীকান্ত ১৮৯৩ সালে গ্রামের 'গৈলা সেকেন্ডারি স্কুল' শুরু করেন এবং আমার ঠাকুর্দা মশায় শুরু করেন ১৮৮৯-তে 'ভাঙ্গা পাইলট স্কুল'। ভাঙ্গাতে, কারণ ওঁর কর্মস্থল এই শহর। দুই স্কুলই আজো সুন্দর পরিবেশে শিক্ষাদান করছে।

পরিবারের পূর্বপুরুষরা অনেকেই কবিরাজ ছিলেন বা সংস্কৃতের পণ্ডিত; ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্ত, কাব্য, ভাষা এঁদের পাঠ্য এবং দৈনন্দিন চর্চার অংশ ছিল। বাবার যুক্তির দিকে পক্ষপাতিত্ব হয়তো পারিবারিক ধারা থেকে এসেছিল।

শহর ঢাকার মেয়ে, আমার মা, শান্তি দাশগুপ্তা, ইডেন স্কুল ও কলেজ পড়া, ঢাকা ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের স্নাতক। ওঁর বাবা উপেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ও মা হেমেন্দুবালা, দুজনেই শিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষাতে বিশ্বাস করতেন। পরিবারের অনেকেই শিক্ষয়িত্রী হয়েছেন।[৪]

সুন্দরী, সুগায়িকা, পরে সুগৃহিণী, আমার মায়ের মন ছিল নরম, আবেগপূর্ণ। বাবার চুলচেরা বিচারকে হেসে বলতেন, 'কম্বলের লোম বাছা'। এঁদের বিয়ে হয়েছিল ২৯ শ্রাবণ, ১৩৪১ (১৪ আগস্ট, ১৯৩৪)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় ষাট বছর একে অন্যের প্রেরণা ও ভরসা হয়ে সুখে জীবন কাটিয়েছেন।

বাবা-মার প্রথম সংসার ছিল সেগুনবাগানে (আমরা সেগুনবাগিচা বলতাম না), কোনো একতলা বাড়ির এক অংশে। মামাবাড়ি থেকে এখানেই আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বড় হবার পর সে বাড়ির সামনে দিয়ে বাবা-মা নিয়ে গিয়েছিলেন, সত্যি চারদিক সেগুনগাছে ভরা ছিল। এ বাড়িতে তখন কেউ থাকতেন বলে মনে হয়নি; সামনের বিশাল উঠোন আগাছাভরা, বাড়ির বাইরের রং চটা — কোথাও হলুদ, কোথাও শ্যাওলা সবুজ, কোথাও বা সাদা। পরিবেশ নির্জন।

১৯৩৭-এর হিসাবের খাতা ও চিঠিপত্র থেকে আন্দাজ করছি, এ বাড়ি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডা. আয়ারের, যিনি আয়ার সাহেব বলে পরিচিত ছিলেন।[৫] আমরা ছাড়াও এ বাড়িতে থাকতেন যামিনী দাস বলে এক ভদ্রলোক। অর্থাৎ তিনটি আলাদা সংসার এক বাড়িতে।

অধ্যাপকদের পারিতোষিক কম ছিল, তদুপরি মধ্যবিত্ত পরিবারে পারিবারিক দায়িত্ব থাকত, টানাটানি না থাকলেও খুব একটা স্বস্তির সঙ্গে খরচ করার মতো টাকা থাকত না। বাবা-মার প্রথম সংসার খুব পোশাকি ছিল না।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র

১. হাসান আজিজুল হক, ২০০৮, *কালি ও কলম*, পঞ্চম বার্ষিকী সংখ্যা, ঢাকা।

২. দুর্ভাগ্যবশত হিন্দু-মুসলমান পাড়া আলাদা থাকত বলে মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারগুলো সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব নয়।

৩. আমার অভিজ্ঞতা বেশিরভাগ ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের সমাজের।

৪. মায়ের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কিছু জানা নেই, বোধহয় কেউ লিখে যাননি বলে। বাবার পূর্বপুরুষদের কথা লিখিত রূপে আছে।

৫. ভাড়া বাড়ি। পৈতৃক সম্পত্তি না পেলে অল্পসংখ্যক অধ্যাপক নিজের বাড়ি বানাতে পারতেন। সে মনোভাবও কোনো কারণে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে, অন্তত অধ্যাপক মহলে ছিল না। আয়ার সাহেবের দেশ ছিল দক্ষিণ ভারতে, ঢাকাতে শুধু কর্মজীবন। দেশবিভাগের পর উনি বেশ কিছুদিন ঢাকাতে থেকে গিয়েছিলেন, পরে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভারতের দক্ষিণে। মাদ্রাজে উনি বাড়ি করেছিলেন, নাম ছিল 'ঢাকা হাউস'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরানা পল্টন — ৫নং বাড়ি

কোনো এক সময় আমরা চলে আসি পুরানা পল্টনে, ৫নং বাড়িতে — কবে জানি না। পুরানা পল্টনকে আমরা নতুন ঢাকার অংশ বললেও এর ইতিহাস নতুন নয়। পাঁচশো বছর আগে পাঠানি সুলতান আমল থেকে এ অঞ্চল ছিল ক্যান্টনমেন্ট বা সৈন্যদের আখড়া। এ ব্যবস্থা চলেছিল ইংরেজ রাজত্বেও, প্রথম মহাযুদ্ধ অবধি। তারপর আখড়া চলে গেল তেজগাঁও; ধীরে ধীরে শুরু হলো সাধারণের বসবাস, যেন আমাদেরই জন্য গড়া নতুন বাড়িঘর, নতুন বসতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই পুরানা পল্টনে থাকতেন — পরিমল রায়, অজিত সেন, মন্মথ ঘোষ, সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সবাই আমাদের প্রতিবেশী এবং বাবার বন্ধু হিসেবে আমাদের কাকা বা মেসো। এঁদের স্ত্রীরা ছিলেন মায়ের বন্ধু, আর এঁদের মেয়েরা আমার খেলার সাথী। ফুটবল খেলি না বলে সমবয়সী ছেলেরা আমাদের হেয় মনে করত, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারি না।

শান্ত, খোলামেলা পাড়া, পুরানা পল্টন — ঢুকলেই বড় দীঘি, তার বাঁধানো ঘাটের এক কোণে উঁচু মন্দির। সন্ধ্যাবেলা পুজোআর্চা করতে আসেন কেউ, আবার কেউ আসেন ঘাটের বাঁধানো সিঁড়িতে খোলা আকাশের নিচে বসে খবর আদান-প্রদান করতে। পাড়ার সামনে সবার প্রিয় পল্টনের মাঠ। খেলাধুলা, স্বাস্থ্যচর্চা, বৃদ্ধদের গল্পগুজব, অল্পবয়সীদের আলোচনা, রাজনীতি, বক্তৃতা সবই চলত এখানে। এই মাঠ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু এক চিঠিতে পরিমল রায়কে লিখেছেন, 'কী মজা দ্যাখো, তোমার ন্যুইয়র্কে গিয়ে পুরানা পল্টন মনে পড়ে, আমার মনে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁইবাসা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, এমনি নানা জায়গায় যেখানেই অনেক মস্ত মস্ত ফাঁকা মাঠ আছে — মনে হয় পুরানা পল্টনের মতো, কিন্তু ঠিক সে রকম না; পল্টনের মাঠের মতো সুন্দর পৃথিবীর অন্য কোনো মাঠ আমাদের চোখে লাগবে না। তার কারণ এ নয় যে ঐ প্রান্তর রূপগৌরবে শ্রেষ্ঠ — ভাবতে গেলে জায়গাটা অতি সাধারণ ভিন্ন কিছুই নয় — কিন্তু ওখানে আমরা যুবক ছিলাম, উন্মীলিয়মান সদ্য যুবক আমাদের কাছে সেটাই ওর মহিমা, সে মহিমার তুলনা নেই। আমার লেখার মধ্যে পুরানা পল্টনের কথা এতবার এসে গেছে... তবু এখনো এক-এক সময় আবার নতুন করে লিখতে ইচ্ছে করে; মনে হয় অনেক কথাই বলা হয়নি, সেখানকার দিন, রাত্রি, বিকেল, সন্ধ্যা, স্তব্ধ মধ্যরাত্রির আশ্চর্য নীল সিনেমার মতো জোছনা, তার ঠিক সুরটি স্পর্শটি আবার নতুন করে ধরতে ইচ্ছে করে।'[১]

আমার ঢাকা শহর ছিল অত্যন্ত সীমিত, পুরানা পল্টন ছিল আমার জগৎ। আর জানতাম গেণ্ডারিয়া, ওয়ারী, লক্ষ্মীবাজার, তবে কোনোটাই ঠিক পাড়া হিসেবে নয়। নবাবপুর বাজারের এলাকা, ঘোড়াগাড়ি থেকে দেখেছি আলোয় ঝলমল বাটার দোকান, ছোট্ট 'টি সেন্টার', আমার এক মামার চায়ের ব্যবসা ছিল, তাঁর দোকান এবং তাঁর সমসাময়িক অনেকেরই আড্ডার স্থল। কোথাও এক জায়গায় ছিল সাধনা ঔষধালয়ের বিশাল সাইনবোর্ড, আজো মনে হয় আছে। নাম শুনেছি অনেক; শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার, শুনে মনে হয়েছে ঐতিহ্যভরা বহুদূরের পথ। আরমানিটোলা বা ফরাশগঞ্জ নামে রোমাঞ্চ জাগত। ধানমণ্ডি তো প্রায় বাঘ-ভালুকের দুনিয়া — সেখানে কেউ থাকে বা যায় সেটা বিশ্বাস হতো না। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ছিল নীলক্ষেত: যেন আকাশছোঁয়া অনেক খোলা মাঠ, দিগন্তরেখা যেখানে নেমে এসেছে। এই সুদূরের হাতছানি খুব আকর্ষক হলেও আমরা আমাদের পুরানা পল্টনের ছোট এলাকা নিয়েই খুশি ছিলাম।

আমার প্রথম স্মৃতি পুরানা পল্টনের ৫নং বাড়িকে ঘিরে। নিরিবিলি পাড়া, অনেকটা জমি নিয়ে বেশিরভাগ একতলা বাড়ি। কুন্দ, দোলনচাঁপা, মাধবীলতা, জুঁই-কাঞ্চন ছাড়াও অনেক বাড়িতে ছিল মৌসুমি ফুলের বাগান। আমার বাবার বাগানের শখ এতবেশি ছিল যে, চন্দ্রমল্লিকার diameter ঢাকাতেও মাপতেন, শেষ জীবনেও মাপ নিয়ে ১২´´ বা ১৪´´ হলো তা জানিয়ে উৎফুল্ল হয়ে আমাদের কাছে চিঠি দিতেন। বাগানের শখ মেটাতে অনেকেই বাইরে থেকে বীজ আনিয়ে বিদেশি ফুল ফোটাতেন। বিদেশি কেন যে বলি, প্রতিবছরই তো ঢাকার মাটিতে শেকড় গেড়ে ফুটে উঠত। শীতকালে ৫নং-এ বেড়ার সঙ্গে বাঁশ আঁকড়ে চড়ে যেত 'সুইট পি' ফুলের লতা — ছোট ছোট ফুল মিটমিট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তাকিয়ে থাকত। ন্যাস্টারসিয়াম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া ছড়িয়ে দিত পাঁচমিশালি গালিচা। এছাড়া থাকত পুজোর ফুল — গাঁদা, টগর, লাল গোলাপ, জবা, বিশেষ করে পঞ্চমুখী, আর সুগন্ধি রজনীগন্ধা, বেলফুল, কুন্দ, কাঞ্চন। আমার প্রিয় ছিল মাধবীলতার গুচ্ছ, ঝুমকোলতা আর সবুজ ঘাসের ওপর ছড়ানো শিউলি ফুল। পুজোর জন্য শিউলির মালা গাঁথা, বোঁটা শুকিয়ে বাসন্তী রঙে পুতুলের শাড়ি রাঙানো, কাজ কিছু কম ছিল না। আর শিউলি ফুল মানেই তো শরতের নরম সোনালি রোদ, দুর্গাপূজার ঢাকের ধ্বনি, উৎসবের ডাক, আনন্দ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নানা এলাকার বেশিরভাগ বাড়িতে সুন্দর বাগান ছিল। নীলক্ষেতের বাগান ছিল বিখ্যাত। বিশেষ করে প্রোঃ সত্যেন বোসের বাগান, সেখানে উনি পায়চারি করতেন। আমার বাবার মতো, মালি কাজ করলেও গৃহস্বামী নিজেই বাগানের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেন। গাছের তলা অপরিষ্কার থাকলে সৌন্দর্য বজায় থাকে না — বাবাকে দেখেছি আটাশি বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে গোলাপের ঝরে পড়া শুকনো পাপড়ি কুড়িয়ে সযত্নে জমা করে রাখছেন। ঢাকাতে পরিমল কাকার দিদি ছিলেন, ছোড়দি। গল্প শুনতাম যে, ছোড়দি-পিসিমা তাঁর বাগান এত পরিচ্ছন্ন রাখেন যে গাছকে সজোরে ঝেড়ে শুকনো পাতা ঝরিয়ে সেটা কুড়িয়ে নেন। পাড়াতে এই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা হতো। আজ আমি নিজের অজান্তেই এভাবে গাছ ঝাঁকিয়ে শুকনো পাতা কুড়োই।

বাবা আমাকে আর দাদাকে (প্রয়াত সমীর দাশগুপ্ত, আমার জেঠতুতো দাদা, যিনি আমাদের বাড়িতে থেকে বড় হয়েছেন) আলাদা আলাদা গোলাকার জায়গা দিয়েছিলেন বাগান করার জন্য। মাটি খোঁড়া, বীচি লাগানো, জল দেওয়া, সবই আমাদের করতে হতো। বাবাদের সান্ধ্য আড্ডায় আমার অবাধ গতি থাকায়, নানা কথার মধ্যে শুনেছিলাম সুদূর বিলেতে একশ বছরেরও আগে রিকার্ডো নামে কোনো এক অর্থনীতিবিদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অত্যধিক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মাটি নীরস, ক্লান্ত হয়ে যাবে, উপযুক্ত যত্ন না নিলে ফসল কম হয়ে যাবে (অন্তত আমি এ-ই বুঝেছিলাম)। পাঁচ বছরের আমি, যত্নের খাতিরে অত্যধিক জল ঢেলে মাটি, ফুলের চারা, সব কিছুকেই এত পরিশ্রান্ত করে দিলাম যে, 'আমার বাগানে এত ফুল', একথা জাহির করার সুযোগই পেলাম না। জলে ভারাক্রান্ত আমার শখের বাগান শুকিয়ে গেল।

বাবার শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্যে সমীর দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'পুষ্পোদ্যান রচনায় তাঁর বরাবরই গভীর আগ্রহ ছিল। পুরানা পল্টন পাড়ায় তাঁর ৫নং বাড়ির প্রশস্ত উদ্যানে প্রাণভরে ফুল ফুটিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারাণসীতে তাঁর বাড়ির উদ্যানে ফুল ফোটানোর খেলা চলত। তবে শেষজীবনে শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়িতে এসে এক দশককালের বেশি সময় আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে ফুলের বাগান রচনা করেছিলেন। নিজের হাতে বেশি কিছু করতে পারতেন না, সারাদিন বাগানে ঘুরে ঘুরে কাটাতেন। আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন তাঁর অনুপম হস্তাক্ষরে, (কখনো) লিখতেন দুটো গোলাপ গাছ মরে গেছে, আমি যেন একটা জন এফ কেনেডি এবং একটা মাদাম কুরির চারা নিয়ে যাই। কিংবা চাইতেন ব্ল্যাক প্রিন্স অথবা তাজমহল অথবা প্যারাডাইস। কাকার অর্থনীতি চর্চার প্যাশন এবং ফুল ফোটানোর আগ্রহের মধ্যে কোনটা বেশি জোরালো ছিল বুঝে উঠতে পারিনি।'[২]

নীলক্ষেতের বাগান যখন চোখে ভাসে মনে হয় শুধু বাবা কেন, অধ্যাপক মহলের অনেকের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। কোনটা বেশি প্রিয়, নিজের বিষয়ে অনুসন্ধান, না ফুল ফোটাবার আকাঙ্ক্ষা? গাছপালা, ফুলপাতার মাঝে শান্তি আসে; বিখ্যাত গায়ক, পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুরকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম উনি আদৌ রেয়াজ করেন কিনা এত দশকের গানের পর; যদি করেন তো কখন করেন? উত্তরে বলেছিলেন, 'তানপুরা নিয়ে রেয়াজ করিনি বহু বছর হয়ে গেল। এখন রোজ ভোরে বাগানে ঘুরি, পুজোর ফুল তুলি; নিরালায়, নিভৃতে রাগের প্রাণ খুঁজে বেড়াই গুনগুন করে — সেই হলো আমার রেয়াজ।'

৫নং বাড়ি ছিল ছড়ানো বাংলো, দুদিকে বাগান, কিছু বড় গাছ, সামনে গাছের বেড়া, আর ভেতর বাড়িতে বিরাট উঠান।[৩] বাড়ির ভেতরে বাবার বড় পড়ার ঘর, তাতে বড় টেবিল, কাঁচ দেওয়া বইয়ের আলমারি, শোয়ার খাটে পরিপাটি বিছানা, গোটা দুই চেয়ার, একটি আরামকেদারা ও বাবার সেতার। এক সময় বাজাতেন, আমরা যদিও শুনিনি। অন্য ঘরে জোড়াখাট, এডওয়ার্ডিয়ান আমলের ধাঁচে মায়ের dressing table, আলমারি। বসার ঘরটি লম্বা, প্রচুর জায়গা, তাতে একটি সোফাসেট, কিছু চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। সোফার পেছনে সোনালি কাগজে লাল-কালো হরফে লেখা G. C. Basak। যেমনি চকচকে কাগজে নাম লেখা, তেমনি চকচকে পালিশ। মায়ের ১৯৩৭-এর হিসাবের খাতায় দেখেছি, 'গোকুল বসাক — ১০ টাকা আলমারির জন্য'। এটা আগাম, তিন খেপে ৩৫ টাকা দিয়ে পুরো সোফাসেট ও আলমারি বানিয়েছিলেন। এই তিনটি ঘর ছাড়া পেছনে লম্বা ঘর, প্রায় পুরো বাংলোর মাপে, সেটাতে খাবার টেবিল, তখনকার দিনের 'What not' যাতে যা খুশি ইচ্ছে রাখা যেত আর মাটিতে বসে খাবার কিছু পিঁড়ি। রান্না-ভাঁড়ার ছিল লাগোয়া, সেইসঙ্গে জল রাখার ঘর ইত্যাদি। তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে প্রশস্ত বারান্দা, খোলা ও ঢাকা; সংকীর্ণ ব্যাপার নয়।

আলো-হাওয়া থাকার জন্য জানালা-দরজা বেশিমাত্রায় থাকত। ৫নং-এ বাইরে যাওয়ার দরজা ছিল ছয়টি। আজকের দিনে বাঞ্ছনীয় নয়। তখনকার দিনে জানালা ছিল ভিন্ন ধরনের। একটি দেখালেও থাকত দুটি জানালা — ওপর-নিচ লাগোয়া; নিচেরটি ঘরের মেঝে অবধি নেমে আসত। ওপরেরটি খোলা হতো আলো-হাওয়ার জন্য, শিক ছিল বলে চিন্তার কিছু ছিল না। বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে নিচেরটি খোলা হতো। জানালায় খড়খড়ি থাকত আর আমাদের খেলা ছিল তাকে ওপর-নিচ করা। জানালা বা আলমারির দরজা বন্ধ করা হতো কাঠের ব্যাং দিয়ে, সত্যি ব্যাঙের মতো দেখতে ছিল এগুলো, আর দরজা বন্ধ করার জন্য ছিল কাঠের লম্বা চ্যাপ্টা লাঠির মতো কিছু (মনে হয় 'দাশা' বা 'দাড়ি' বলা হতো)। ছিটকিনি মনে পড়ে না, থাকলেও শুধু রাতে বন্ধ করার সময় ব্যবহার হতো।

ঢাকা বৃষ্টি-জলের শহর, বাড়ি কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঁচু বানালে সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি আসার আশঙ্কা কম হয়; খটখটে বাড়ি, ওপর থেকে যাতে জল চুঁয়ে না পড়ে তার খেয়াল রাখতে হয়, আলো-হাওয়া আসে সেদিকেও নজর দিতে হয়; তাছাড়া বাগান, উঠোন, চারদিকে খোলা জমি; বাড়ি ভাড়া এ পাড়ায় বেশি হতো। কিন্তু এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকত, তাই পাড়া-প্রতিবেশী সবাই মাইনের একটা বড় অংশ বাড়ি ভাড়াতে খরচ করতেন। মায়ের হিসাবের খাতা থেকে দেখেছি, ১৯৪০-এ ৫নং-এর ভাড়া : ৪২ টাকা, যখন কেটেকুটে বাবার মাইনে ছিল ১২৫ টাকার আশেপাশে।

আমাদের সব বাড়িতে আসবাবপত্র ভালো হতো; গোছানো, পরিচ্ছন্ন থাকত; কিন্তু সাজানোর জন্য শখের জিনিস বিশেষ রাখা হতো না, বড়জোর হাতের কাজ বা লেসে তৈরি টেবিলের কভার। এর ব্যতিক্রম ছিল দুটি বাড়িতে। সেগুনবাগানে জে. কে. চৌধুরীমশায়ের বাড়ির বসার ঘরের ছাদের নিচে, জানালার ওপর ভাগে পুরো দেয়ালের মাপে ওঁর ভ্রাতৃবধূ এঁকেছিলেন লম্বা ফ্রেস্কো। শুকনো ফুল, পাতা, গাছের ছাল দিয়ে রং উনিই বানাতেন। মনে পড়ে, বলেছিলেন ডিমের ব্যবহারও হয়। পরে বুঝেছি যাকে Bengal School of Art বলা হয়, যেমন নন্দলাল বসু ফ্রেস্কো এঁকেছেন বরোদাতে, সেই ধাঁচের। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম — একা একা তুলি দিয়ে এত উঁচুতে কী করে করলেন এই সূক্ষ্ম কাজ! সে বাড়ি সম্ভবত আজ নেই — থাকলেও, ফ্রেস্কোর ওপর না জানি কত চুনকাম হয়েছে। প্রফেসর চৌধুরীর কন্যা অমিতা বাবার ছাত্রী ছিলেন, অর্থনীতি বিভাগের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একজন, পরে কলকাতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতির নামি শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন। অমিতাদির সঙ্গে যোগাযোগ কখনো বন্ধ হয়নি। বছর দশেক আগে যখন তাঁর নব্বই ছুঁই ছুঁই, বলছিলেন, 'দ্যাখ — এত এত বছর কলকাতায় থেকে ঢাকার জন্য কষ্ট হয় তা বলতে পারি না। তবে জানিস, বাড়িটার কথা খুব মনে হয় — অমন সুন্দর বাড়িতে আর তো কখনো থাকিনি। ওটা ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে, এখনো হয়।'

অন্য সাজানো বাড়ি ছিল অজিত সেন মেসোদের। বসবার ঘরে সোফার সামনে, হরিণের শিংয়ের পায়ার ওপর ছিল ঝকঝকে গোলাকার নকশা করা পেতলের টেবিল, তার ওপর রাখা পেতলের গণ্ডার, হাতি ইত্যাদি। এক কোণে রাখা থাকত পেতলের লম্বা ডাঁটের ওপর কারুকার্য করা বিরাট ফুলদানি। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ঝকঝকানি কমত না। এগুলো এত ভালো লাগত যে, আমার বিয়ের সময় সোনা-গহনার বদলে এই বাহারের জিনিস চেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম। আজো সবকিছু যত্ন করে সাজানো আছে, কিন্তু সেই ঝলক কিছুতেই আনতে পারি না।

মধ্যবিত্ত পরিবারের ভূষণ ছিল বই — আলমারি ভরা বই। শুধু অধ্যাপক মহলে নয়, প্রায় বাড়িতেই থাকত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য — গদ্য এবং পদ্য, ভ্রমণকাহিনি বা ভক্তিমূলক বই। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ছোটদের জন্য আনা হতো গল্পের বা শিক্ষামূলক বই, যাতে ছোটরা একটি বৃহত্তর পৃথিবীর ছোঁয়া পায়। এছাড়া আসত নানারকম মাসিক পত্রিকা, যেমন *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *বসুমতী*। ১৯৩০-এর দশকে দেখেছি *প্রবাসী* শুরু হতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে, তারপর বিশ্বের নানা সংস্কৃতির ওপর প্রবন্ধ, নানা গল্প ও ধারাবাহিক উপন্যাস। পড়ুয়াদের ব্যস্ত রাখবার রসদ কম ছিল না। গৃহিণীরা সংসারের শত কাজের মাঝেও সময় করে দুপুরে একটু বই পড়ে নিতেন; দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ অঙ্গ ছিল বই পড়া।

শিক্ষকদের বাড়িতে নিজেদের বিষয়ের বই থাকত নিজস্ব গ্রন্থাগারে। বাবার পড়ার ঘরের আলমারিতে কালো বাঁধাইতে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা অর্থনীতির ওপর পুরনো, নতুন কত বই ছিল, বেশিরভাগ দ্বিতীয় বা তৃতীয় খেপে কেনা। বিভিন্ন নাম লেখা তাতে, যখন যিনি মালিক ছিলেন তাঁর। উপহারের বই হলে তাতে নানাবিধ উৎসর্গ থাকত, হাতে নিলে রোমাঞ্চ জাগত — কি জানি যাদের নাম লেখা তাঁরা কেমন পড়াশোনা করেছেন, আবার কী পরিবেশে বই বিক্রি করতে হয়েছে। তাঁরা কি বাবার মতোই এদের এত ভালোবাসতেন, এত যত্ন নিয়ে রাখতেন? যখনকার কথা বলছি তখন অনেক বইয়ের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের। এগুলোর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে বহু বছর, ব্যবহারে জরাজীর্ণ বই, আজ আমার গ্রন্থাগারের ভূষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন ঢাকা ছাড়ি, বইপত্র আমাদের মতো নিরাপদে শহর ছেড়েছিল, ভবঘুরে জীবনেও তারা সযত্নে ছিল। সবার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অজিত সেন মেসোরা ১৯৫০-এর দাঙ্গায় সবকিছু রেখে, বাড়ি বন্ধ করে কলকাতা চলে এসেছিলেন। শহর শান্ত হলে উনি ফিরে গিয়ে দেখলেন বাড়িতে অন্য বাসিন্দা, সেন পরিবারের রুচিসম্মত সাজানো বাড়ি অন্য রূপে সাজানো, কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। *মহাভারতের* এক খণ্ড পেয়ে নিয়ে এলেন — আর কিছু না। একজন অধ্যাপকের পক্ষে একটি বই হারানো দুঃখের, এ তো তাঁর বহু বছরের সঞ্চয়। এ রকম বহু 'হারিয়ে যাবার' কাহিনি আছে এপার-ওপারের মানুষের জীবনে।

৫নং বাড়ির ভেতরের উঠোনের আকর্ষণ ছিল প্রচুর। কুয়ো থেকে জল তোলা, কয়লা ভাঙা, গুল দেওয়া, কাঠ কাটা, গেরস্থালির কত কাজ সেখানে হতো। উঠোনের দরজায় দাঁড়িয়ে দুই কাঁধে বাঁশে ঝোলানো হাঁড়িতে দুধ, ঘি, গুড় বিক্রি করতে নানাজনের আনাগোনা, কাবুলিওয়ালার হাঁক, মুশকিল আসানের গান — সেই টানা সুর 'মুশকিল আসান'; দেখতে, শুনতে নানা অভিজ্ঞতা, অনুভূতি আনন্দ। এই দরজায় নিয়মিত আসতেন এক মহিলা; পায়ে চটি, সাদা শাড়ি সাধারণ করে পরা, চোখে চশমা, মার্জিত কথা। এর নাম ছিল graduate ভিখিরি, চশমার জন্য। মুশকিল আসানের আলখাল্লার থেকে চশমার ভীতি বেশি ছিল আমার। এই উঠোনেই পুরনো ধুতি গায়ে জড়িয়ে বাবা বসতেন আর নাপিত তার দক্ষ হাতে কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে দিত। পেছনের বারান্দায় চলত ঝামা দিয়ে পা পরিষ্কার করে আলতা পরা, চুল বাঁধা — আমার বিনুনি, মায়ের খোঁপা; লুডু খেলা, ছবির বই দেখা, জলছবি লাগানো — যেন মেয়েদের, ছোটদের আলাদা মহল।

লুডু খেলার সঙ্গে মনে পড়ে 'গোলকধাম', যতীনদা, বাড়ির এক সদস্য, তাঁর দেশ নোয়াখালীর কাছাকাছি কোনো গ্রাম বা সদরঘাট থেকে এনেছিলেন। দিনের কাজের শেষে সাঁঝবেলায় বা দুপুরে সময় নিয়ে খেলা — আলো-হাওয়া উপচেপড়া পেছনের বারান্দায়। আর কোথাও, কখনো এ খেলা দেখিনি। একটি মস্তবড় চকচকে কাগজে, যেমন মানচিত্রের কাগজ হয়, বড় বড় খোপের মাঝে নানা ভগবানের বা পৌরাণিক কাহিনি আঁকা। সবার উঁচুতে কাগজের পুরো প্রস্থ ছড়িয়ে গোলকধাম বা স্বর্গ। শুরুতে, একেবারে নিচে নরক। কড়ি দিয়ে খেলা — কড়ি চিত না উলটো তার ওপর নম্বর, প্রতি খোপেও নম্বর, ওপর-নিচ করার নানা সিঁড়ি; অনেকটা snakes and ladders-এর মতো। প্রচুর সিঁড়ি ভেঙে, ওঠানামার পর যদি ভাগ্যে থাকে তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলকধাম পৌঁছোনো। বুক দুরু দুরু করা খেলা, যদি নরকে নেমে যাই?

এই উঠোনের বারান্দাতেই বসতেন ফলওয়ালারা নানা ফল নিয়ে, আমের ঝুড়ি বেশি করে মনে পড়ে, ফজলি, ল্যাংড়া আরো কত কী। দর ছিল ১০০ করে। তাদের জিজ্ঞেস করা হতো, '১০০-তে কত?' উত্তর আসত ১০০-তে ১১০ বা ১২০। ডিমওয়ালার হিসাব ছিল ২০-তে, ২০-তে কত? আমি বড় বিপদে পড়ে যেতাম কারণ আমাকে যেভাবে অঙ্ক শেখানো হয়েছিল তাতে ১০০, ১০০ই; ১২০ বা ১১০ হতে পারে না। 'ফাউ' কথাটা অনেক পরে বুঝেছি — ততদিনে হিসাব থেকে ফাউ উঠে গিয়েছে। আঁট করে খোঁপা বাঁধা, ডুরে শাড়ি পরা বৌমারা বা লাল-সবুজ পাড়ের মোটা মিলের শাড়ি পরিহিতা শাশুড়ি মায়েরা, কখনো থান পরা বিধবা মহিলারা আসতেন মুড়ি, চিড়ে, খই, মোয়া নিয়ে। জল খেয়ে, মায়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে চলে যেতেন। মোয়া গুনতে খুকি, খোকার জন্য কখনো দুটি বেশি দিতেন, কিন্তু ফাউ ছিল না।

নন্দ স্যাকরা আসতেন ভেতরবাড়িতে, তাঁর ডিজাইনের বই নিয়ে। বইটিতে জাদু থাকত — কত গহনা, কত নকশা; কান, কানবালা, দুল, ঝুমকো, কানপাশা; গলার মপচেন, চিক, সাতনরি, সীতাহার, সাধারণ হারের কী বাহার; বিছে, ডবল বিছে, মটর মালা; হাতের বালা, কঙ্কণ, মানতাসা, বাউটি, ওপর হাতের তাবিজ বা আর্মলেট, দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। এক বহু পুরনো *বসুমতীর* পাতায় বিজ্ঞাপন ছাড়া এসব ডিজাইন উঠে গেছে, অন্তত আমার নজরে আসে না। বাইরে থেকে অতিথি এলে বা পারিবারিক বিয়ে থাকলে ওঁকে ডাকা হতো, মায়ের পক্ষে নতুন গহনা গড়ানো সম্ভব ছিল না। একটি মাত্র হার ছিল, মাঝে মাঝে নন্দ স্যাকরাকে দিয়ে ডিজাইন বদলে নিতেন। মনে হতো নতুন কিছু।

কাপড়চোপড় কেনাকাটা মানেই ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়। লেপ-তোশকের কাপড়, মার্কিন, লং ক্লথ, শালু থেকে বেনারসি শাড়ি অবধি, সব কিছুতেই এই দোকানের নাম দেখতে পাই পুরনো কাগজপত্রে। মার্কিন, লং ক্লথ কিন্তু হেলাফেলার ছিল না, এ দুটি ছাড়া সংসার করা ভার। শুধু ওয়াড় কেন, মার্কিন দিয়ে তৈরি হতো ছেলেদের নিমা, ছোট মেয়েদের হালকা জামা, যাতে একটু কুঁচি করা কাপড় এদিক-ওদিক লাগালেই হয়ে যেত বাহারের ফ্রক। বড়দের সেমিজ, হালকা পর্দার প্রয়োজন হলে পর্দা, প্রায় হলুদের গুঁড়োর মতো। লং ক্লথ একটু শৌখিন, শুধু পাজামা নয়, অল্পবয়সীদের শার্ট, পাঞ্জাবিও বানানো হতো এ দিয়ে। বাবা-কাকাদের পাঞ্জাবির জন্য আসত আদ্দি। সবকিছু পাওয়া যেত এক ছাদের নিচে ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে। বছরের পর বছর কেটেছে, মায়েদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দের দোকান বদলায়নি। কলকাতার গড়িয়াহাটে সারি সারি কত বাহারের দোকান, মায়েরা যেতেন শুধু ঢাকেশ্বরীতে। পুরনো পরিচয়ের আবহাওয়া নতুনে নেই।

৫নং বাড়ির সংসার খুব ছোট ছিল না। বাবা-মা, দাদা, ভাই (জন্ম ১৯৪২, নভেম্বর ১৭), আমি ছাড়াও ছিলেন যতীনদা, অল্পবয়সী অনাথ ছেলে। ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে সামনের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল কাজের খোঁজে। সেই যে মা ওকে বাড়ি নিয়ে এলেন ওরকম একলা দেখে, যতীনদা আমাদের পরিবারের অঙ্গ হয়ে গেলেন। তার বিয়ে হবার পর, আমরা কাশী ছাড়ার পরই, মা-বাবা তাকে আলাদা সংসার করতে দিলেন। আমার ভাই-অন্তপ্রাণ ছিল যতীনদার; ১৯৯৮-তে তার দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত আমার ভাই তার দেখাশোনা করেছে, যদিও যতীনদা কাশীতে, ভাই বিলেতে। সেকালে যতীনদার মতো অনেক বাড়িতেই কোনো দাদা বা দিদি সংসারের নানা দায়িত্ব নিয়ে স্নেহ-যত্নে পরিবারের সদস্য-সদস্যা হয়ে থাকতেন।

আমরা ছজন ছাড়া, আমার সেজজেঠিমা, দাদা সমীরের মা, দুই মেয়েকে নিয়ে বছরের অনেকটা সময় আমাদের সঙ্গে ঢাকাতে কাটাতেন, ১৯৩৪-এ বাবা-মার সংসার শুরু হবার পর থেকেই। জেঠামশায় আসামের এক চা বাগানে ডাক্তার ছিলেন, জেঠিমা, আমাদের সেজমা, নির্জন চা বাগানে থাকতে অপছন্দ করতেন, তাই এ ব্যবস্থা। ঢাকা না হলে উনি চলে যেতেন বরিশালে বড় জেঠামশায়ের কাছে, মাঝেমধ্যে আসামে, নির্বাসনে। সম্ভব হলে সেজজেঠা ছুটি নিয়ে চলে আসতেন আমাদের কাছে; পিঠাপিঠি ভাই — বাবা আর উনি ভাই ছাড়াও নিকট বন্ধু ছিলেন।

মধ্যবিত্ত পরিবারে নিজের সংসার না করে ভাশুর-দেওরের কাছে লম্বা সময় থাকা তখনকার দিনে একেবারেই স্বাভাবিক ছিল না। আপত্তি থাকলেও সেটা কেউ ব্যক্ত করেননি কারণ সেজমা ছিলেন গৈলা বকশীবাড়ির পাশে গুপ্তবাড়ির মেয়ে, বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছোট বোন; সংসারে তাঁর অধিকার বা স্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনি কাজ করতে ভালোবাসতেন না, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিন কাটাতেন; সংসারের কোনো দায়িত্ব এঁর ওপর দেওয়া যেত না। মা-জেঠিরা এটা মেনে নিতেন কারণ সেজমার স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল প্রচুর। মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, উনি থাকলে বাড়ি ভরে যেত। আমার মায়ের যেমন বিয়ের পর সাজগোজ, গয়নাগাঁটির দিকে মন একেবারেই ছিল না, বা মন দেওয়ার সময় ও সামর্থ্য ছিল না, সেজমা ছিলেন একেবারে উলটো। তিনি গয়না পরতে খুব ভালোবাসতেন। আসামের জনশূন্য বাড়িতেই হোক বা ঢাকাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু লোকজনের মাঝে হোক, মনে পড়ে স্নান করে ছোটখাটো গোলগাল মানুষটি লাল পাড় সাদা মিলের শাড়ি সাধারণ করে পরে চুড়ি, কঙ্কণ, ওপর হাতের আর্মলেট, গলায় চিক ও একাধিক চেন, কানে ঝুমকো পরে ৫নং বাড়ির ভেতরবাড়িতে হাঁটাচলা করছেন। হাসি-ঠাট্টা সইতে হতো, আবার এই সহজ-সরলতার জন্যই হয়তো সবাই ওঁকে ভালোবাসতেন।

৫নং বাড়ির সংসার ছোট ছিল না বলা সঠিক নয়, 'বড় ছিল' বলা উচিত। ২৮/৩/৩৮-এ ধীরেন দাশগুপ্ত, পরিবারের জ্যেষ্ঠ জামাতা, বাবাকে লিখছেন, 'অতুলের (আমার বড় জেঠামশায়) কাছে জানতে পারলাম ওর ছেলেমেয়েদের শরীর বরিশালে সুস্থ থাকে না বলে তারা তোমাদের কাছে। এখন কেমন আছে?' এটা যদিও সেগুনবাগানের দুটি ঘরের সংসারের কথা, ৫নং-এ আসার পর খুব একটা বদল হয়নি। তবে স্কুল ইত্যাদি শুরু হবার পর স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা ছুটির সময় হতো। মাকে কলেজ জীবনে দিদিমা ঘরের কাজ, রান্না করতে শেখাননি কারণ 'বিয়ের পর তো সংসার, রান্নাবাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, এখন পড়াশোনা করে, বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করুক।' হয়েও ছিল তাই, বিয়ের পর থেকে বড় পরিবার, রান্নাবাড়ি, আতিথেয়তা নিয়ে মায়ের জীবন কেটেছে। আশেপাশের মাসি-কাকিদের দু-একজন যাঁরা চাকরি করতেন, তাঁদেরও সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। এতে মায়ের বা অন্যদের কোনো আপত্তি ছিল না কারণ তাঁরা কেউ অন্দরমহলে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেননি। কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোচনা না হলে সব আড্ডাতেই বাবা-মেসো-কাকাদের সঙ্গে মা-মাসি-কাকিদের সমান স্থান ছিল। এঁদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, সিঁড়িতে বসে বা খোলা বারান্দায় কত সময় নিজেরা গল্পগুজব করতেন। 'সারাদিন হেঁসেল ঠেলছি' এই অনুশোচনা শুনিনি। আশ্চর্য, এত কাজের মাঝেও মায়েদের বই পড়া, পাড়ায় অল্প বেড়ানো, দুপুরে একটু গড়িয়ে নেওয়া বা সেলাই করা — সবকিছুর সময় থাকত।

* * *

ছোটবেলার প্রধান স্মৃতি হচ্ছে আমার ভাইয়ের জন্ম। ভাইবোন কেউ আসছে আমাকে বোঝানো হলেও, এর তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। সেজমারা বাড়িতে — হৈচৈ সবসময়। হঠাৎ একদিন এক ঘোড়াগাড়ি এলো — দুই ইংরেজ বা বিদেশি মহিলা নামলেন, নীল-সাদা গোড়ালি অবধি নিচু বিদেশি বেশ, গলার মালায় ক্রস। মাকে পরীক্ষা করতে এসেছেন — এঁরা ডাক্তার। ভয় ঢুকে গেল, মা নিশ্চয়ই অসুস্থ। এই ভয়ের জন্যই বোধহয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ি থেকে নেমে দুই শ্বেতাঙ্গী মহিলা গেট দিয়ে ঢুকছেন, এ ছবি আমার চোখের সামনে থেকে কখনো মুছে যায়নি।

একদিন শুনলাম আমার ভাই হয়েছে। আনন্দ, ঈর্ষা কিছু মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা যত্ন নিলেও আমার দৈনন্দিন জগৎ পালটে গেল, আমি মায়ের কাছ থেকে দূরে। পরে শুনেছি ভাইকে দেখতে যখন সবাই ঘরে ঢুকছেন, আমি ছিলাম সবার পেছনে, মুখে খুশির লেশও ছিল না। একেই হয়তো হিংসা বলে। ছেলে হয়েছে — সবাই সেই আনন্দে ব্যস্ত, আমার দিকে তাকাবার কারো সময় নেই। হঠাৎ একাধিপত্য চলে গেল, আমি বাইরের কেউ হয়ে গেলাম।

আমার সহায় হলেন দিদিমা। তিনি কাছে টেনে নিলেন, হয়তো বললেন, 'আমাগো মাইয়াই লক্ষ্মী'। ষষ্ঠীর দিন বাড়ি ভরা, সবাই আসছেন সদ্যোজাত শিশুর জন্য উপহার নিয়ে, আমি উপেক্ষিত। ঠোঁট ফোলাতে ওস্তাদ, এদিক-ওদিকে ঘুরতে লাগলাম। দিদিমা সব উপহার আমাকে দিয়ে বললেন, 'আসলে এগুলো তোমার জন্য, ভাই ছোট বলে ওকে দেওয়া হয়েছে।' ঠোঁট ফোলানো আমিকে বুঝ দিতে সময় লাগত না। একটি ছোট মেয়ের মনের উচাটন বুঝেছিলেন দিদিমা; আর বুঝেছিলেন মৃণাল মাসিমা, মায়ের মাসতুতো বোন। শুধু ভাইয়ের জন্য নয়, কমলা রঙের সিল্কের জামার কাপড় আমার জন্য আলাদা করে এনেছিলেন। সেকালে একটি কন্যাসন্তানের মনে ঈর্ষা নয়, ব্যথা হতে পারে, তা নিয়ে আত্মীয়-পরিজন বড় একটা চিন্তা করতেন না।

ছোটবেলার প্রখর স্মৃতিতে আছে বিবন দাই, ভাইকে জুড়েই তার উপস্থিতি। সে নাকি আমার শিশুকালে অনেকদিন আমার যত্ন করেছে — তা তো আমার মনে নেই, আমি তাকে দেখেছি পাঁচ বছর বয়সে, ভাইয়ের জন্মের পর। এক সোনালি রোদভরা সকালে বিবন বাইরে সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে, মা নিচের জানালা খুলে তার সঙ্গে কথা বলছেন, ফ্রেমে রাখা ছবির মতো এ দৃশ্য পরিষ্কার আমার সামনে। পরদিন থেকে সে ভাইয়ের যত্ন-আত্তিতে সাহায্য করতে শুরু করল। পাতলা, ফর্সা, ছোটখাটো, কোঁকড়া চুল, খয়েরি দাঁতে (কী সেবন করত জানি না) তাকে আরো সুন্দর দেখাত। বিবনের ভাষা ছিল কিঞ্চিৎ অপরিচিত, সকালকে সে বলত 'বেয়ান' বা 'বিয়ান', জলকে 'পানি', আমি এই তফাতের কারণ বুঝে উঠতে পারতাম না। সদ্যোজাত শিশুর যত্ন নিতে অভিজ্ঞ বিবন আর মায়ের মধ্যে আমাকে ও ভাইকে জড়িয়ে একটা বন্ধন ছিল। বিবন ছিলেন স্বল্পভাষী, উঁচু স্বরে কথা বলতে কখনো শুনিনি; ছাপা শাড়ি হাল ফ্যাশনে পরা, কোমরে আঁচল গোঁজা, বিবনকে এত যুগ পরও ছেলেবেলার অন্তরঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন মনে হয়। ভাইয়ের জন্মের কমাস পরই দুর্ভিক্ষ শুরু হলো, বিবন ভাইয়ের নাম দিল 'আকালবাবু'। বড় আদরের সঙ্গে ডাকত, 'আকালবাবু ও আকালবাবু'। ১৯৪২-৪৩ সালে সে আমাকে ভিনদেশে বানানো চিনেমাটির ছোট্ট পেয়ালা রেকাবি দিয়েছিল পুতুলখেলার সামগ্রী হিসেবে, আজো তা আমার কাছে রাখা আছে। দেশবিভাগের সময় ভবঘুরের মতো নানা ট্রেনে চড়ে, নানা শহরে থেমে, কখনো স্টেশনে, কখনো কারো বাড়িতে সময় কাটিয়ে, দিল্লি, বর্ধমান, কটক কত জায়গায় বাস করেছি; শুধু আসবাবপত্র কেন, ঢাকার সংসারের বেশিরভাগ জিনিসই ছেড়ে আসা হয়েছে বা হারিয়ে গেছে, কিন্তু মায়ের পুঁটুলিতে সাবধানে কাপড়ে জড়ানো বিবনের দেওয়া সেই উপহার আজো অটুট অবস্থায় রয়ে গেছে।

প্রিয় বন্ধু ছিল কৃষ্ণা, পরিমলকাকার ভাইঝি। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কথায় পটু, তার পাশে নিজেকে বোকা মনে হতো। আমার থেকে চার মাসের বড়, আমার ওপর বড়র মতোই প্রতাপ ছিল তার — আমার কিন্তু খারাপ লাগত না। খুব ভাব ছিল আমাদের। পড়াশোনায় তখন ওর মন ছিল না, একবার খেলাচ্ছলে কোনো গুরুজন ওকে পড়াতে গেলে খানিক খেলার পর হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওমা, তোমরা আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছ — এ খেলা খেলব না।' হয়ে গেল পড়া! গল্প শুনেছি, এক বিকেলে কৃষ্ণা যথারীতি ৫নং-এ এসেছে; আমি মাটিতে বসে পা ছড়িয়ে কাঁদছি — এ কাজ আমি প্রায়শ করতাম। কৃষ্ণা বলে উঠল, 'ওমা, তুই কাঁদছিস? কেন? জেঠিমার (আমার মা) কথা শুনিসনি বুঝি? তাই বকুনি খেয়েছিস? জানিস না, বড়দের কথা শুনতে হয়?' এ নিয়ে কৃষ্ণার মা, জেঠিমা খুব হাসাহাসি করতেন, কারণ ও যে সবসময় সুবোধ বালিকা হয়ে কথা মেনে চলত তা নয়। তবে ওর একটা স্বাভাবিক তেজ ছিল, যাকে হয়তো ইংরেজিতে personality বলা হয়; ওর উপদেশ মেনে চলতে আমার অসুবিধে হতো না।

কৃষ্ণা পরে কলেজ পাশ করে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষক সুনীলদাকে বিয়ে করে সুখে সংসার করেছে। ওর বিয়েতে কনে সাজানো থেকে শয্যাতুলুনির টাকা অবধি সবকিছুতেই মহানন্দে অংশগ্রহণ করেছি। আর আমার বিয়েতে কৃষ্ণা ছিল প্রধান শ্যালিকা।

খুব কাছের ছিলেন, আজো আছেন, আমার মিষ্টিদি, অজিত সেন মেসোর মেয়ে। আমার থেকে কয়েক বছরের বড়, আমাকে তাঁর ছোট বোনের মতোই স্নেহ করেন। শুনেছি আমার জন্মের কিছুদিন পর যখন গেণ্ডারিয়া থেকে সেগুনবাগানের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, এই মেসোমশায় তাঁর গাড়িতে আমাদের সবাইকে নিয়ে যান। ছোট মিষ্টিদিও সঙ্গে ছিলেন। শান্ত, ধীরস্থির, মিষ্টিদি আমাদের ঝগড়া, রেষারেষি, বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুতুলখেলার ঝগড়া মেটাতে পটু ছিলেন। আজো তাঁর মাঝে একটা সৌম্য ভাব আছে। এঁর বিয়েতে (১৯৫৪ কি '৫৫) প্রথমবার শয্যাতুলুনির টাকা পেয়ে কী আনন্দ হয়েছিল! তখন বিয়েতে শাড়ি, গহনা খাটে বা কোথাও সাজাতে হতো, যাতে সবাই যৌতুক দেখতে পারেন। বেগুনি রঙের বেনারসিতে সোনালি জড়ির শঙ্খ আজো আমার চোখের সামনে। ওঁর স্বামী শঙ্করদাও শান্ত ছিলেন। সুনীলদা, শঙ্করদা দুজনের সঙ্গেই আমার সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যদিও দেখা-সাক্ষাৎ কম হতো। আজ অনেক সুখস্মৃতি নিয়ে আমরা তিন বান্ধবীই একা।

আরেক বন্ধু ছিল টুটু — এ-ও কৃষ্ণা, বাবার বন্ধু অরুণ দত্ত মেসোর মেয়ে। উনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক — বাবারা একই সময় লন্ডনে ছিলেন। এঁরা পুরানা পল্টনে থাকতেন না, প্রায়ই বিকেলে বেড়াতে আসতেন। টুটু ছিল অন্যরকমের বন্ধু, পুতুলখেলার সাথী নয়, বই পড়ার সাথী। আমরা বই নিয়ে আলোচনা করতাম, সেটা হয়তো 'টুনটুনির বই'র মধ্যে সীমিত থেকেছে, তা 'টুনটুনির বই'র আনন্দ তো চিরকালের।

ওঁদের সম্বন্ধে দুটো কথা মনে পড়ে। গরমের ছুটিতে একবার ওঁরা পুরো পরিবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের আমরা — কলকাতায় আস্তানা নেই, দার্জিলিং যাবার প্রশ্ন আসে না। তখন ওখানে রকমারি পাথরের গহনা পাওয়া যেত। মাসিমারা ফিরে এসে আমাকে ইটের রঙের কোনো পাথরের এক জোড়া কানের গহনা দিয়েছিলেন — শৌখিন জিনিস পেয়ে আমার যে কী আনন্দ! কার হবে না? উপহার দেবার চল তখন ছিল না, বড়জোর জন্মদিনে একটি বই, মাসিমা অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমাকে, তাই দিয়েছিলেন। এই কানের গহনা বহুকাল আমার সঙ্গী ছিল, হঠাৎ পাথরটা আলগা হয়ে গেল, দার্জিলিংয়ের ছোঁয়া কোথায় মিলিয়ে গেল। সেই বিখ্যাত শহর দেখতে বহু বছর লেগেছে, আমার ১৯৮২ আর ভাইয়ের ২০১০। ততদিনে শহরের আভিজাত্য, জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে। পাথরের গহনা কোথাও নেই, তার বদলে পাওয়া যায় মেকি হাতির দাঁত ও প্লাস্টিকের গহনা। ইংরেজ আমলের ভার বইছে কাঠের সিঁড়ি ও কার্নিশওয়ালা একটি হোটেল, আর সেখানে প্রতি বিকেল পাঁচটায় পরিপাটি করে সাজানো চায়ের সরঞ্জাম। ভিড় ও আবর্জনায় কাঞ্চনজঙ্ঘা টাইগার হিল দেখবার আনন্দ স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। সাহস করে নিচে জঞ্জালের স্তূপ ডিঙিয়ে শহরের বাসিন্দাদের ঘিঞ্জি বাজারে পাওয়া যায় অপূর্ব সোনার গহনা। সে তো সোনা। টুটুর দেওয়া পাথরের কানপাশাই আমার দার্জিলিংয়ের প্রিয় স্মৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুটুর মা, মাসিমাকে খুব ফ্যাশনদুরস্ত মনে হতো — উনি সাধারণ করে শাড়ি না পরে, কুঁচি দিয়ে আমার কলকাতার মাসিদের মতো শাড়ি পরতেন। পাতলা, লম্বা, যতদূর জানি, কলকাতায় বড় হয়েছিলেন, হালফ্যাশনে ছিমছাম হয়ে সেজে আসতেন। ওঁর একটা কথা ভোলার নয়। বেশ কয়েকটি বোন, সাজগোজ করতে সময় নিতেন, এঁদের বাবা তাতে মাঝে মাঝে একটু বিরক্ত হতেন। একদিন রুষ্ট মনে বললেন, 'তোদের তৈরি হতে এত সময় লাগে কেন? দেখিস না, ভুতার মা, সবসময় তৈরি, কই, তার তো সময় লাগে না।' ভুতার মা বাড়ির কাজের মহিলা। ব্যস, হয়ে গেল, 'ভুতার মা' যুক্ত শব্দ হয়ে আমাদের শব্দকোষে জায়গা নিল। চট করে কোনোদিন সাজগোজ করে বেরোলেই বাবা বলতেন, 'ও আজ বুঝি ভুতার মা?'

দেশবিভাগে টুটুরা ঢাকা ছাড়েনি। মা-বাবাদের যোগাযোগ থাকলেও আমরা নতুন জীবন, নতুন বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত, পুরনোদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা ভাবিনি। বহু বছর পর টুটুর সঙ্গে দেখা হলো কলকাতায়। ঘর-সংসার, পড়াশোনা ছাড়াও ছোটবেলার নানা গল্প হতো। টুটু কামরুন্নিসাতে পড়ত — একদিন বলল, 'এ-ই জানো, হঠাৎ একদিন ইডেন আর কামরুন্নিসা একত্র হয়ে গেল। তুমি তো ইডেনের মেয়ে, বাব্বা, তোমার ইডেনের মেয়েদের কী ডাঁট, কী নাক উঁচু, আমাদের গ্রাহ্যই করে না। কথা বলত না আমাদের সঙ্গে, সারাক্ষণ 'আমরা ইডেনের' — কী রাগ যে হতো। স্কুল কিন্তু আমাদের — ওরাই বাইরের, সেসব তোয়াক্কা করত না।' ততদিনে ষাট বছরের ওপর কেটে গিয়েছে, আমরা দুজনেই সত্তরের কোঠায়, পুরনো অবহেলা টুটু ভোলেনি — ভুলে যাবার কথাও নয়।

আমাদের জীবন ছিল সাদামাটা, নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। খেলনা, সাজগোজ, বইপত্র কিছুরই প্রাচুর্য ছিল না। প্রাচুর্য না থাকলেও জীবনযাত্রা সুঠাম, পরিচ্ছন্নভাবে চালানো হতো। সাজের মধ্যে প্রজাপতি আকারের ক্লিপ পেলেই খুশি। প্লাস্টিক আসেনি, গ্যাটাপার্চারের হলে তাকে অত্যন্ত শৌখিন মনে হতো। কিছুটা কারণ নিশ্চয়ই অর্থের অসংকুলান; শুধু তাই নয়, হেলাফেলার প্রাচুর্যকে অনেকেই সুনজরে দেখতেন না। যেন সংস্কৃতি, ঐতিহ্যহীন হঠাৎ-বড়লোক। পাড়ায় এরকম দুএকজন যাঁরা ছিলেন, পরিমলকাকা তাঁদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতেন।

মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে মাস্টারমশাইদের পরিবারের ছোট মেয়েদের পোশাক-আশাক ছিল সাধারণ; সুতির ফ্রক, বেশি শখ হলে এক-আধটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাটিনের। জন্মদিন বা পুজোয় কখনো একটি ছোট শাড়ি। ছেলেরা পরতেন প্যান্ট, শার্ট বা ধুতি-শার্ট, বড়রা ধুতি-পাঞ্জাবি। কোনো কোনো বাড়িতে নিমার ব্যবহার ছিল। পুরান ঢাকায় যেমন আমার মামাবাড়িতে লুঙ্গির চল ছিল, পুরানা পল্টনে এটা মনে পড়ে না। বাবারা ধুতি পরতেন শান্তিপুরি বা ফরাশডাঙ্গার — অবাক লাগত, ফরাশডাঙ্গার ধুতি নীল হয়ে আসত, এক ধোপে সাদা হয়ে যেত। ধুতি কুঁচিয়ে রাখা একটা কলা, বাবা-কাকারা এটা নিজেরা করতেন। কোঁচানো ধুতি বা কোঁচানো শাড়ি রাখার জন্য আলনা ছাড়া চলত না। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মধ্যে সামান্য আলনার উচ্চ স্থান ছিল। সবচেয়ে শৌখিন ছিল পাঞ্জাবি — সাদা ফুটফুটে আদ্দি, তা আবার গিলে করা। গিলে করার পদ্ধতিটা আজো আমার কাছে রহস্য রয়ে গিয়েছে। আমাদের 'সাত্তারের' বা ঢাকার দর্জিদের মতো মিহি সেলাই, বিশেষত পাঞ্জাবির সেলাই আর কোথাও দেখিনি। মেটিয়াবুরুজেও নয়। পরিমলকাকার চেহারা মনে পড়ে, কোঁচানো ধুতির ওপর গিলে করা সাদা পাঞ্জাবি আর শীতে হালকা ছাই নয়তো খয়েরি রঙের একটু গরম পাঞ্জাবি পরে হেঁটে আমাদের বাড়ি আসছেন।

তৈরি জামা সদরঘাট থেকে আনলে কারো মনঃপূত হতো না, সব বাড়িতেই 'সাত্তারের' আনাগোনা ছিল। পাঞ্জাবি ছাড়াও আমাদের সাত্তার কত সুন্দর ফ্রক, ব্লাউজ তৈরি করে দিত। ওই যে বলেছি এমন মিহি সেলাই আর কোথাও দেখিনি। একবার ফ্যাশন হলো 'স্মকিং' করা হাঙ্গেরিয়ান নামের ব্লাউজের। সাদা মিহি কাপড়ে সাত্তারের হাতের তৈরি মেরুন ও কালো রঙের স্মকিং এনে দিয়েছিল বাইরের জগতের এক ঝলক। সেকাল হিসেবে মজুরি ছিল বেশি — দুই টাকা।

বয়স তিরিশের কাছাকাছি গেলেই বা দুই এক ছেলেমেয়ের মা হলেই মায়ের দলকে রঙিন শাড়ি ছেড়ে সাদা শাড়ি পরতে হতো। এঁরা শখ মেটাতেন পাড়ের রঙে ও নকশায়। সাধারণ করে শাড়ি পরতেন, বাড়িতে মিলের আর বাইরে গেলে ধনেখালি বা শান্তিপুরি। আজ ধনেখালির কদর নেই আর শঙ্খ-পাখি ডিজাইনের ডবল কি সিঙ্গল জরিপাড়ের শান্তিপুরি পাওয়াই যায় না, সংগ্রহালয়ে দেখতে হয়। শান্তিপুরি শাড়ির ঐতিহ্য পুরনো, এর বিশেষত্ব ছিল পাড়ের কারুকার্যে, সৌন্দর্যে; হাঁস, লতাপাতা, শঙ্খ বা আঁশপাড়ে আবদ্ধ থাকত না; প্রয়োজনে সামাজিক বিষয়ে মন্তব্য থাকত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আর গোঁড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুরা হিন্দুধর্ম রক্ষা করতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন চালাচ্ছেন, শান্তিপুরের তন্তুবায়রা শাড়ির পাড়ে রচনা করলেন এই কবিতা

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর
চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট
বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন
প্রচার হবে এ আইন
দেশে দেশে জেলায় জেলায়
বেরোবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের
লেগে যাবে ধুম।[৪]

সমর্থন না পরিহাস?

শিক্ষক মহলে ঢাকাই শাড়ি ছিল শৌখিন, চল ছিল কম। মায়ের কাছ থেকে শুনেছি একবার জোড়া-কলসি পাড়ের একটি ঢাকাই শাড়ি বড় পছন্দ হয়েছিল, খুব শখ হয়েছিল কিনবার, ১৮ টাকা দামের এই শাড়ি মায়ের পক্ষে কেনা সম্ভব হয়নি। বহু বছর পর আমাকে এ কথা বলেছিলেন। মায়ের শাড়ি-গহনার প্রতি নজর খুব একটা ছিল না, তাই একটা শখ মেটাতে পারেননি বলে আমার খুব দুঃখ হয়েছে। তবে প্রায় সব বাড়িতেই তখন এই অবস্থা। মহিলারা বিয়েতে পাওয়া কিছু ভালো শাড়ি, যেমন বেনারসি, যত্ন করে রেখে দিতেন, বিয়ে-থাতে পরে যাবার জন্য। বিশেষ শাড়ি ছিল 'করিয়াল'; পুজো, দুর্গাপূজার প্রতিমা বরণের জন্য রাখা থাকত। কোরা রঙের বেনারসের সিল্ক, খুব মসৃণ নয়, তাতে লাল পাড়ের কোলে জরির সূক্ষ্ম দাঁত, আর আঁচলে জরির কারুকার্য। বিয়ের যৌতুকে এ শাড়ি দেওয়া হতো; তা সম্ভব না হলে লাল পাড় সুতির শাড়ি, পুজোর জন্য আলাদা করে।

সাধারণত লাল হলেও মায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু মীরামাসির[৫] করিয়াল শাড়ির পাড়ের রং ছিল গাঢ় বেগুনি। দুই বন্ধু যার যার পুজো দেবার শাড়ি পরে যখন একসঙ্গে দশমীর দিন প্রতিমা বরণ করতে যেতেন, বড় ভালো দেখাত। চাবি ঝোলানো আঁচলের খুঁটি ঘোমটার ওপর দিয়ে গলায় জড়ানো, কপালে সিঁদুরের টিপ, নিজেরাই একেকটি প্রতিমা। নতুন ফ্যাশনে, আধুনিক জীবনযাত্রায় করিয়াল শাড়ির প্রয়োজন নেই, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের গলিতে বাহারের শাড়ির দোকানেও পাওয়া যায় না; এ-ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রহালয়ের ফর্দে চলে গিয়েছে।

আমরা ছেলেমেয়েরা ভাবতাম মায়েদের দক্ষতা ছিল রান্নাঘরে, আতিথেয়তা করতে, পরিবারের দেখাশোনা করতে আর অপরিসীম ভালোবাসা দিতে। এর বাইরে যে তাঁদের কোনো ভাবনা থাকতে পারে বা শখ-আহ্লাদ থাকতে পারে তা কখনো মনে আসেনি — অন্যায়মতোই মনে আসেনি। হঠাৎ জানতে পারলাম মা সুগন্ধি পাউডার ভালোবাসেন। যুদ্ধের বাজারে কোথা থেকে বাবা Yardley Lavender Powder নিয়ে এলেন। মায়ের বাহারের dressing table-এ lavender রঙের ছবি আঁকা চ্যাপ্টা কৌটো, যার ফুটো ফুটো মুখ একদিকে প্যাঁচ দিলে খোলে, অন্যদিকের প্যাঁচে জাদুর মতো বন্ধ হয়ে যায়; শুধু ঘরে নয়, আমাদের জীবনেও সুগন্ধ ভরে দিল। মা-মাসিদের প্রসাধনের শখ অল্পবিস্তর ছিল না তা নয়, তবে সামগ্রী ও সামর্থ্যের অভাব ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, পুরানা পল্টনে কারো সাজগোজের প্রতি নজর দেবার ইচ্ছে বা সময়ও বিশেষ ছিল না। চুলের তেল সম্বন্ধে কিন্তু সবাই সচেতন ছিলেন। তৈলচিক্কণ, ঘন, কালো লম্বা কেশের জন্য কোন তেল ভালো এ নিয়ে মহিলা মহল বিভক্ত ছিলেন, প্রায় ইস্ট বেঙ্গল-মোহনবাগান ফুটবল টিমের ভক্তদের মতো। জবাকুসুম না ক্যান্থারাইতিন? নিজস্ব পছন্দ কেউ ছাড়বেন না। ড্রেসিং টেবিলে থাকত ট্যালকম পাউডার, 'হিমালয়' জাতীয় নামের বরফের মতো সাদা স্নো, মুখে-গলায় বুলিয়ে নেবার জন্য পাউডারের বাক্স আর সিঁদুর কৌটো। মিহি পাউডার আসত গোলাকার বাক্সতে, তাতে দু'তিন রঙের গোলাকৃতি এবড়োখেবড়ো ছাপ, আধুনিক শিল্পীর ক্যানভাসের মতো — ভেতরে থাকত নরম, প্রায় কায়াহীন সুতোর গুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাফ।

'তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক' — এ আশীর্বাণী আমাদের চৌহদ্দির ভেতর ঢোকেনি তখনো — আলতা, সিঁদুর, পানের খিলির রাঙা দিয়ে সাজতেন শাশুড়ি-বৌমারা। পান শুভ। রামপুর ঘরানার কর্ণধার ইনায়েত খাঁ সাহেবের বন্দিশ আছে হামীর রাগে, আড়াচৌতাল তালে — 'প্যারি লাডলিসি সুন্দর' দুলহানের বর্ণনা; পানের লাল রঙে সৌন্দর্য

হসত হসত ফুল ঝরত ঝরত
মুখসোঁ বিড়ি পানন লাল লাল
দিখত ইনায়েত —
কপোল লোচন বনি দুলারি প্যারি।

(ব্রজভাষায় পানের 'বিড়া'কে 'বিড়ি' বলা হয়, জানালেন ওস্তাদ রাশিদ খাঁ)

মা-মাসি-কাকিমারা পাড়ার বাইরে বিশেষ যেতেন না, অভিভাবক ছাড়া কখনই নয়। বাইরে যেতে হলে ঘোড়াগাড়ি আনা হতো। অবস্থাপন্নরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতেন ফিটনে করে। বিকেলে গা-ধুয়ে, পাটভাঙা শাড়ি পরে পাড়ার মধ্যে বেড়াতে গেলেও সন্ধ্যের মধ্যে সবাইকে বাড়ি ফিরতে হতো। সংসারের কাজ শুধু নয়, ছেলেমেয়েদের এটা ছিল পড়ার সময়। তাছাড়া গৃহলক্ষ্মী কথাটা মনে রাখা হতো — ধূপধুনোর সঙ্গে সঙ্গে গৃহলক্ষ্মী শাঁখ বাজিয়ে দেবী লক্ষ্মীর আবাহন করতেন।

বিশেষ দিন বা পুজো ছাড়া মন্দিরে যাবার চল খুব ছিল না। একে তো যানবাহনের অসুবিধে, তাছাড়া পুজোকে পারিবারিক, নিজস্ব ব্যাপার বলে বিশ্বাস ছিল, বাড়ির চার দেয়ালের ভেতরেই করা হতো। মাঝেমধ্যে গিয়েছি সিদ্ধেশ্বরী মন্দির বা রমনা কালীবাড়ি, তা কোনো নির্দিষ্ট দিনে নয়।

আমরা ঘটা করে বাড়িতে সরস্বতী পুজো করতাম। এই দিন বই-খাতা খোলা মানা — পুজো, প্রসাদ, শাড়ি পরা — সম্ভব হলে বাসন্তী রঙের শাড়ি — সারাদিন নির্ভেজাল আনন্দ। একটি মুশকিল ছিল: সরস্বতী পুজোর আগে কুল বা বরই খাওয়া মানা, বাড়ির কুলগাছ ফলে ভরে যেত, নিচে কুল ছড়িয়ে থাকত, অতিকষ্টে লোভ সংবরণ করতাম। বিদ্যার দেবী, নিয়ম অমান্য করা যায় না। পুজোর ব্যাপারে পরিমলকাকার মা বলতেন, 'মূর্তির প্রয়োজন কী, বই-খাতা, পেনসিল, দোয়াত-কলম পুজো করো।' ঢাকার জীবন থেকে শুরু করে আজো প্রতি বসন্তপঞ্চমীতে তাই করছি। এখন তো আর পাঠ্যপুস্তক নেই, পছন্দের বই, পরিবারের কারো লেখা বই, তানপুরা, তবলা ফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রণাম করি। আগে মা মন্ত্র বলতেন, 'টং টং সরস্বতী, নির্মলবরণী'। শেষ লাইন ছিল 'যাবৎ জীবন তাবৎ থাক' — মাঝে কোথাও ছিল 'রত্নে বিভূষিত গজমতি হার', পুরোটা পরিবারের কারো মনে নেই। পুজোতে ফাঁক রয়ে যায়, সন্দেহ নেই — তবে অন্য একটি মন্ত্র আছে, মিঞা তানসেনের লেখা ধ্রুপদ অঙ্গে সরস্বতী বন্দনা

সরস্বতী মাতা হো বরদাঈ
ব্রহ্মা বিষ্ণুকী তো হৈ দুহাই
বীচ সভা কে রহো সহাঈ
দেহ তোহে অব রাম দোহাঈ।[৬]

মায়ের বলা মন্ত্রর কথা সম্বন্ধে অনেককাল ভেবেছি, টং টং তো হতে পারে না, ত্বং ত্বং-কে বোধহয় এভাবে বলা হয়। আমার ধারণা একেবারেই ভুল। লক্ষ্মীপুজোয় ঘণ্টা বাজাতে নেই, আওয়াজ শুনে চঞ্চলা মা-লক্ষ্মী গৃহস্থের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেন। সরস্বতী পুজোয় তার উলটো — সশব্দে, সজোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দেবীকে আবাহন করতে হয় — তাই প্রথমে 'টং টং'।

প্রায় বাড়িতে লক্ষ্মীর আসন ছিল, আর কোনো পুজো হোক না হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মীব্রত রাখা হতো প্রতি বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যেবেলা মা-বৌরা কেউ দেবীর মূর্তির সামনে বসে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তেন। প্রসাদ হতো বাতাসা, খয়েরি বা সাদা। মা-মাসিদের গলায় শুনতে পাই :

পূর্ণিমার তিথি যদি হয় গুরুবারে,
যেই নারী সেই দিন উপবাস করে...

তাঁর কামনা পূর্ণ হয়। মায়েরা সেদিন উপোস করতেন, সন্ধ্যেবেলা পাঁচালির কাহিনি শুনতে আমরা বসে যেতাম। বাতাসার সঙ্গে প্রসাদে থাকত ফল। কোজাগরি পূর্ণিমার দিন পুজো হতো জাঁকজমক করে — শরৎপূর্ণিমা, দেবীপক্ষের শেষ দিন, সে-রাতে চাঁদ যেন আরো সুন্দর। সারা বাড়িতে সে সন্ধ্যেয় মা-লক্ষ্মীর 'পা' আঁকা, জানালা-দরজা সব খোলা, যেদিক দিয়ে খুশি তিনি ভেতরে আসতে পারবেন। পা হবে অন্দরমুখী, ওঁকে আহ্বান করা। সেদিন বাড়ির সব বাতি জ্বালা, বাইরে প্রদীপ। বাইরে-ভেতরে আলপনা। চালের বাটা দিয়ে আলপনা, উজ্জ্বল সাদা রং পুজোর ভাব এনে দেয়। চালের বাটা বেশি ঘন হবে না, আবার জল বেশিও পড়বে না, যে নরম কাপড়ের সাহায্যে আলপনা দেওয়া হচ্ছে, তা যেন মাটি না ছোঁয়, মাঝের আঙুল দিয়ে আঁকতে হবে। দক্ষতার প্রয়োজন — বাঙালি মেয়ের এমনিতেই এসে যায়, শিখবার প্রয়োজন হয় না।

এদিন ভোগের আয়োজন বিরাট — লুচি, আলুর দম, পাঁচ রকম ফল, হালুয়া, রকমারি ছাঁচে করা সন্দেশ, পায়েস, আর মোয়া-চিড়ে, খই, মুড়ি — আরো যদি কিছু পাওয়া যায়, নারকেলের নাড়ু, আর গেণ্ডারিয়ার প্রথায় মুগের জালা।[৭]

বিশেষ উপোস ছিল শিবরাত্রির। নির্জলা কিনা জানা নেই, তবে সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যের পর মা জলভরা ঘট, ফুল, বেলপাতা নিয়ে শিবমন্দিরে যেতেন পুজো দিতে। তারপর খাওয়া — ভাত নয় রুটি। মা আরো কিছু মানতেন; শিবরাত্রির আগের রাতে আর পরের দিন দুপুরে রুটি খেতেন। একে বলা হতো শিবরাত্রির উপোসে 'চুনি-পান্না' করা।

ঘটা করে পুজো করা হতো বলছি, তবে আমাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে পুরোহিত ডাকা হতো না। সে হাতেখড়ি বা অন্নপ্রাশন। উৎসব মানে নতুন জামা-কাপড়, ফুল, চন্দন, বেলপাতা, তুলসীপাতা, আলপনা, ভাইফোঁটাতে কাজল, পায়েস আর ভোজ; নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, লুচি হলে তো কথাই নেই। মিলের শাড়ির পাড় থেকে সুতোর গুচ্ছ টেনে আমরা চটের আসনে কারুকার্য করা আসন বানাতাম। যার জন্য অনুষ্ঠান, অর্থাৎ জন্মদিন, ভাইফোঁটা, হাতেখড়ি বা কারো কোলে বসে অন্নপ্রাশন, আসন হতো সেদিন তার সিংহাসন। ভাইফোঁটা বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মনে পড়ে। বরিশালে দেয়ালির পর প্রতিপদে ফোঁটা দেওয়া হয়, ভাইয়ের দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা একটু আলাদাভাবে :

প্রতিপদে দিয়া ফোঁটা,
দ্বিতীয়ায় দিয়া নিতা,
যমুনা দেয় রে যমরে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইরে ফোঁটা,
আমার ভাই হোক —
লোহার কাঠি নিম তিতা।

মামাবাড়িতেও প্রতিপদে ফোঁটা দেওয়া হতো — প্রার্থনার ভাষা ছিল ভিন্ন।

দ্বিতীয়াতে নিতিয়া, প্রতিপদে ফোঁটা,
আইজ অবধি ভাইগণ আমার
যমদুয়ারের কাঁটা।
যমের বইন যমুনা আমি
যমদুয়ারে যাইও না তুমি,
যমদুয়ারে দিয়া কাঁটা
বইন দেয় ভাইরে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইরে ফোঁটা
আমার ভাই হউক লোহার কাঠি
নিম তিতা।

AMARBOI.COM

দুর্গাপূজা ছিল বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব — নতুন জামা-কাপড় পরে, ঢাকের ধ্বনি, পুজোর মন্ত্রপাঠ, চণ্ডীপাঠ শুনতে শুনতে সবাই একত্র হয়ে পুজো দেখার মতো আনন্দ বছরে কমই আসে। সকালে উপোস করে ভক্তিভরে অঞ্জলি দেবার মতো আনন্দও যেন অন্য কখনো হয় না। এ দিনগুলোকে গেণ্ডারিয়ার ভাষায় বলা হতো 'বছ্ছরকার', এসব দিনে সব শুভ-সুষ্ঠুভাবে করতে হয়, ছোটদের কান্না-ঝগড়া বন্ধ। সপ্তমীর দিন বোধহয় কাছেপিঠে কোথাও যেতাম পুজো দেখতে — প্রতি বছর অষ্টমীর দিন কয়েক পরিবার মিলে যাওয়া হতো রামকৃষ্ণ মিশনে, অষ্টমীতে কুমারী পুজো, আরো ঝলমলে পুজো। সারাদিন ওখানেই কেটে যেত। নবমীর দিন যাওয়া হতো ঢাকেশ্বরী মন্দিরে; যতদূর মনে পড়ে একটি বড় চত্বরে বিরাট প্রতিমা, ডাকের সাজের সাজে তেজস্বিনী মা-দুর্গা, কোথাও যেন কোমলতা ছোঁয়া। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক — সবার আলাদা ভঙ্গি, আলাদা রূপ। নবমীর দিন পুজো শেষে বাড়ি এসে মন খারাপ হতো, দশমীতে তো মায়েরা বরণ করবেন, মা-দুর্গা ও তাঁর পরিবারকে বলবেন, 'আসছে বছর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা, আবার এসো।' পুজোর কদিন মা-দুর্গা কৈলাস পর্বত ছেড়ে বাপের বাড়ি আসেন, দশমীতে ফিরে যান স্বামীর ঘরে, আসবেন আবার পরের বছর, এই ছিল বিশ্বাস। নবমীর রাতে মা গাইতেন, 'নবমী নিশি, তুমি ফুরায়ো না' — নিশি ফুরালেই তো বরণ ও বিদায়, শূন্যতা। গান শুনে চোখে জল আসত, এ ছিল সব মায়ের আর্তনাদ, পুজো শেষে মেয়ে যে চলে যাবে স্বামীর ঘরে!

দুর্গাপূজার আগে শরৎকালে শুরু হয় আগমনী গান। দেবীর আগমনের আনন্দের সঙ্গে ছিল প্রতি মায়ের হৃদয়ে আশা-নিরাশার দোলা। ছোট বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন অন্য ঘরে; দুর্গাপূজায় তাদের আসতে দেওয়া হবে কি? কত মাকে যে নিরাশ হতে হতো। 'আগমনীতে দুঃখিনী মায়ের অন্তরের কান্নাই শোনা যায়। পূর্ববঙ্গের শরৎ; ভরা নদী, ভরা খাল-বিল।' জলপথে ছোট ছোট নৌকোয় আসা-যাওয়া। 'সকল সময়েই মায়ের মন কাঁদিয়া মরে দূর প্রবাসিনী কন্যার জন্য। প্রতি কন্যাই যেন গৌরী, সব মাতাই যেন মেনকা। কত নৌকা আসে, কত নৌকা যায় — মায়ের মন ভাবিয়া মরে, এরই কোনো নায়ে যেনবা আমার গৌরী আজ আসিতেছে। হতাশ মায়ের নয়নে শুধু জল ঝরে। বাউল গোলাম মৌলা সেই ব্যথার গান গাহিয়াছেন :

গোলাম মৌলা মোছে নয়ন
কে-বা দিবে ভাও।
কোন নায়ে বা গৌরী আমার
যায় তো কতই নাও'।[৮]

* * *

বিয়ের পর স্বামীর কর্মস্থলেই মেয়েদের নতুন বন্ধুত্ব, সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মিষ্টিদির মা, জুনোমাসি, ছিলেন মায়ের নিকট বন্ধু। দু-মেয়ে নিয়ে মাসি-মেসো প্রায়ই আসতেন — আড্ডা জমত ভালো, সহজে ভাঙত না। শান্ত মুখশ্রী, জুনোমাসি রকমারি পাড়ের শান্তিপুরি শাড়ি পরা, ৫নং-এর বাগানে বা অন্দরে গল্প করছেন, ছবিটি মনোরম। বিয়ের পর অল্প বয়সে নতুন সংসার মা ও মাসি কাছাকাছি বাড়িতে করেছিলেন — সুবিধে-অসুবিধে ভাগ-বাট করে বহু বছর একসঙ্গে কাটিয়েছেন — সম্পর্কে কোনোদিন ছেদ আসেনি। দেশবিভাগ সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে না, যে যেখানে থাকুন, একে অন্যের খবর রেখেছেন, সম্ভব হলে দেখা করেছেন।

১৯৮২-তে মা-বাবা শান্তিনিকেতনে অবসর জীবন কাটাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন। শান্তিনিকেতনে মার নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হতো। হঠাৎ দেখি হিসাবের খাতায় কাকে কাকে চিঠি লিখেছেন তার রোজনামচা আছে। তাতে 'জুনো'কে প্রায়ই চিঠি লেখা হচ্ছে। দশ বছর পর ১৯৯২-তে আমার বাবার মৃত্যুর পর জুনোমাসি মাকে লিখছেন, 'এ যে কি হারানো কেবল যার যায় সেই জানে। এই দুঃখের কোনো সান্ত্বনা নেই। আমি একা হয়েছি আজ কতদিন হলো। তবু আমাদের কম বয়সের সুখস্মৃতি তো ভোলার নয়।'

মায়ের প্রিয় বান্ধবী ছিলেন মীরামাসি, ইংরেজির অধ্যাপক মন্মথ ঘোষের স্ত্রী, পুরানা পল্টনে প্রতিবেশী। মা-মাসিদের মধ্যে এক উনিই চাকরি করতেন — স্কুলে পড়াতেন। কাজ সেরে প্রায় বিকেলেই উনি মায়ের কাছে আসতেন, সন্ধ্যে হলে ফিরতেন। ওঁদের বাড়িটা ছিল একটু দূরে, পাড়ার সীমানায়, কোণে। মা জিজ্ঞাসা করতেন, 'মীরা, তোমার ভয়ডর নাই?' মীরামাসির সত্যি ভয়ডর ছিল না, উনি বকুনি দিলে লেঠেলও পালিয়ে যাবে মনে হতো। ওঁর কর্মক্ষমতা ও ধৈর্য ছিল অসাধারণ। যৌথ সংসারের বড় বলে দায়িত্ব ছিল প্রচুর; স্কুলে সারাদিন খাটুনি, বাড়িতে নিজের দুটি ছেলে-মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওরের সংসার ও স্বামী নিয়ে বিরাট সংসার। স্বল্প আয়ে সবকিছু সামলানো, বড়দের মনমেজাজ ঠিক রেখে চলা, আবার কাঁকড়ার ঝোল রান্না করা — এই ছবি আমার চোখে ভাসে। ওঁর কঠিন অবয়বের পেছনে লুকিয়ে ছিল একটি স্নেহপ্রবণ মানুষ। দিল্লিতে ওঁদের ক্যারলবাগের বাড়িতে গেলেই বলতেন, 'এই, একটু মাছ খা — টাটকা পাবদা, এই রাঁধলাম। বা পায়েস আছে, নে না একটু, তুই তো মিষ্টি ভালোবাসিস, না বলিস না, এতদূর থেকে আসিস।' ঢাকার স্পর্শ, স্নেহভরা কথা। মন্মথকাকা ও মীরামাসির জন্য আমার মনে একটা বিশেষ জায়গা ছিল, তাই মধ্যবয়সী হয়েও ছুটে যেতাম ওঁদের কাছে, সেই পুরনো স্পর্শ পেতে।

যেদিন স্কুল থেকে অবসর নেন, ক্লাস শেষে বিদায় অনুষ্ঠানের পর ছুটে এসেছিলেন মায়ের কাছে — সামনে হঠাৎ শূন্যতা, এক মাকেই বলতে পারতেন। ততদিনে দায়িত্বের ভার লাঘব হয়েছে, 'কাজ নেই' জীবন ওরকম কর্মঠ মানুষের পক্ষে মোকাবেলা করা মুশকিল। সৌভাগ্যবশত দেশবিভাগের পরও ঘোষ ও দাশগুপ্ত পরিবার একসঙ্গে থেকেছে বহু বছর। জুনোমাসির মতো অল্পবয়সে মা, মীরামাসি পুরানা পল্টনে কাছাকাছি নতুন সংসার শুরু করেছিলেন। মাসির জীবন মসৃণ ছিল না, তবে রোজকার জীবনযুদ্ধ ওঁকে পরাজিত করতে পারেনি।

বিয়ের পর মাকে হাত ধরে সংসার করতে শিখিয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মেজবৌদি', বাবার বন্ধু অধ্যাপক অক্ষয় ঘোষালের স্ত্রী। ওঁর নাম কেউ জানতেন বলে জানি না, কেন মেজবৌদি ডাকা হতো তাও জানি না, মা-বাবা দু'জনেই এভাবে সম্বোধন করতেন ওঁকে। ১৯২৬ থেকে শুরু করে বহু বছর অক্ষয় জেঠা, বীরেন জেঠা (গাঙ্গুলী, অর্থনীতির অধ্যাপক) আর বাবা বকশীবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। অক্ষয় জেঠা তখন বিবাহিত, তবে পরিবার কলকাতায় থাকত। মেজবৌদি মাঝে মাঝে এসে সংসার সামলে নিতেন। ছোটখাটো, রোগা — প্রায় কাঠির মতো শরীর বলা যায় — মহিলা, ওঁর ঘন কালো চুল ছিল গোড়ালি অবধি লম্বা। গোলাকার খোঁপা এতই বিশাল ছিল যে, মনে হতো খোঁপার ওজন ওঁর থেকে বেশি। মা বলতেন, 'বেচারি, কোনোদিন বালিশ ব্যবহার করতে পারল না।' খোঁপার ওজন নিয়ে, কাঠি কাঠি শরীরে উনি ছিলেন অসম্ভব কর্মঠ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, কথা বলার ভঙ্গি ছিল ভিন্ন, আমার খুব ভালো লাগত। বাড়িতে এলেই ওঁর কলহাস্যে বাড়ি ভরে যেত।

উনি মায়ের বন্ধু ছিলেন না, মা ওঁকে দিদির মতো শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। আমার মনে পড়ে মেজবৌদি গল্পের মাঝে বলছেন, 'ও শান্তি, বড়িটা আরেকটু ভেজে নাও' বা 'মাছে আরেকটু নুন-হলুদ দাও', 'আচারটা আরো দু-দিন রোদে দিও।' হিসাব রেখে আয়ের মধ্যে কীভাবে সংসার চালাতে হয় তাও মেজবৌদি শিখিয়েছিলেন মাকে। দেশবিভাগে যোগাযোগ বন্ধ হয়নি, দেখাশোনা প্রায়শ হতো। ততদিনে মেজবৌদির শিক্ষায় মা গৃহকর্মে নিপুণ, তবে অক্ষয় জেঠার শত চেষ্টাতেও বাবার বিষয়-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হলো না; নিজের একটি বাসস্থান হওয়া উচিত তা উপলব্ধি করতে অনেক বছর কেটে গেল। সহকর্মী-বন্ধু বীরেন গাঙ্গুলী কোনোদিনই এ মর্ম বুঝলেন না, বাড়িভাড়া দিতে তাঁর সম্বল উজাড় হলো। ধুতি অল্প উঁচু করে পরা, একটু মোটা কাপড়ের সাদা পাঞ্জাবি, কালো সুতোয় গাঁথা সোনার বোতাম, ছোটখাটো দেখতে অক্ষয় জেঠা, বেতের চেয়ারে বসা, পাশে তাঁর কালো পোর্টম্যান্টো, যেটা ছাড়া উনি কোথাও যেতেন না, ঈষৎ পা দুলিয়ে বাবাকে বলছেন, 'অমিয়, তুমি বোঝ না, একটি নিজস্ব বাড়ির কত প্রয়োজন' — এ ছবিটি আমার সামনে স্পষ্ট। মা-বাবার প্রতি ওঁদের অকপট বন্ধুত্ব-ভালোবাসা সেই ছোট বয়সে আমাকেও স্পর্শ করত। মেজবৌদি বা মীরামাসির মতো মহিলাদের কাছে পাওয়া সৌভাগ্য।

মাসি, জেঠি, কাকি — পাড়ার সবাইকে আমার পছন্দ হতো তা নয়। একজনকে কখনো ভুলব না। পুরানা পল্টনে কাছাকাছি গৈলার সম্পর্কে এক জেঠিমা থাকতেন। মেদবহুল শরীর নিয়ে দুপুরে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে আসতেন। আমার বছরচারেক বয়স হবে, বারান্দায় বসে ক, খ, গ, ঘ লিখতে চেষ্টা করছি; হঠাৎ তিনি এসে তাঁর অনবদ্য ভাষায় বললেন, 'অ শান্তি, তোমার মাইয়া বাউয়া নাকি?' বলেই এমন অপকর্ম থেকে রক্ষা করার জন্য, তাঁর বলিষ্ঠ হাতে আমার গালে একটি চড় মারলেন, 'থাপ্পড় মাইরা তরে ঠিক করুম' হুমকি দিয়ে। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো, আমি 'ঠিক' হয়ে গেলাম, ডান হাতে লিখি।

বলা বাহুল্য, মহিলার ওপর আমার দারুণ আক্রোশ, প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষায় রইলাম। কদিন পর এসে বললেন, 'অ মাইয়া, তর সেফটিপিনটা আমারে দে, কান চুলকাইতাছে।' আমি চোখ গোল গোল করে বললাম, 'দেব না'। তিনি ভয় দেখিয়ে বললেন, 'না দিবি তো তরে মাইয়া আমি কিছু দিমু না।' চট করে জবাব দিলাম, 'ইস, কবে যেন কিছু দিয়েছ যে ভয় দেখাচ্ছ।' তিনি আমার অবাধ্যতার জন্য মাকে ভালো-মন্দ কিছু বললেন। মা 'ছোট জা', যতই দূরসম্পর্ক হোক, চুপ করে রইলেন।

পাড়াতে ৩নং বাড়িতে থাকতেন মায়ের বন্ধু জ্যোৎস্নাদি। লম্বা, দোহারা চেহারা, কর্মঠ, গুণী মানুষ, মাকে নানা কিছু শেখাতেন। মায়ের থেকে বয়সে বড় ছিলেন, অভিজ্ঞতাও ছিল বেশি। মাকে নানা পরামর্শ দিতেন। সুচিন্তিত হলেও ফল যে ভালো হতো তা নয়। একবার মাকে বোঝালেন, বিবির (অর্থাৎ আমি) চুল অত্যন্ত পাতলা, সাতবার ন্যাড়া করলে চুল ঘন কালো হবে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল আমার ন্যাড়া মাথা চেহারা! একটু চুল হলেই মুণ্ডন ব্যবস্থা। এ রকম চলতে লাগল বহুদিন। বাবার এক বন্ধুর স্ত্রী ছিলেন মায়ের শুধাদি, ইনিও মায়ের থেকে অনেকটা বড় এবং ভারতবর্ষের নানা শহরে থেকে অভিজ্ঞ। বাবা লাহোর যাবেন কাজে। শুধামাসিমা বহুদিন লাহোরে থেকেছেন, বাবাকে বললেন, 'লাহোর থেকে উল আনবেন আর আনবেন ফুৎনা (চুলের জন্য ট্যাসল)।' বাবা রং-বেরঙের ফুৎনা আনলেন — লাভ কি, আমার চুল তো আবার শজারুর কাঁটা। সময়ে চুল লম্বা হলো, তবে সাত মুণ্ডনেও কেশ ঘন হলো না। জ্যোৎস্নামাসির প্রতি অভিমান বা রাগ ছিল বৈকি, কিন্তু ও বাড়ির নিমকি-মিষ্টির স্বাদ সব হারিয়ে দিত।

পাড়ায় বিভিন্ন রকমের মানুষ থাকেন, সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না; দেখি বা তাঁদের কথা শুনি। বেশিরভাগ হাসি-ঠাট্টার। একটি সুন্দর ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের অপরিচিত কোনো মেয়ের বিয়ে — পুরানা পল্টনেই একটু দূরে থাকেন ওঁরা। হঠাৎ এক ভরদুপুরে ঢোলকের বাজনা, গান — বেরিয়ে দেখি, মেয়েকে কনের সাজে সাজিয়ে, মহিলারা রং-বেরঙের শাড়ি-গহনা পরে ঢোলক আর গীতের সঙ্গে পুরো পাড়া ঘুরে যাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাকার এঁরা জানি না; কে জানে, হয়তো এভাবে অনেকের আশীর্বাদ নিতেন। জরিভরা ঝলমলে পোশাক, মেয়েরা ঢোলক বাজাচ্ছেন, আগে কখনো দেখিনি, নতুন অভিজ্ঞতা, ভিন্ন রকমের আনন্দ।

ছোটরা পাড়ার গুজব জড়ো করতে ওস্তাদ — কত গল্প যে শুনেছি। সব তো লেখা যায় না, তবে নানা মজার কথা ছাপিয়ে একটি মনে গেঁথে আছে, সেটা লিপিবদ্ধ করি। এক বিধবা দিদিমা ছিলেন, কাছেই থাকতেন, তাঁর জামাতার অভিজাত বংশ নিয়ে দারুণ গর্ব, দম্ভ বলা উচিত। অবস্থাপন্ন পরিবার, পোশাক-আশাক, কথাবার্তায় আভিজাত্যের ছাপ দেখা যায়। পাড়ার সবার বন্ধু-মানুষ। দিদিমা, জামাতার গর্বে নিজেকে আলাদা রাখেন। এক বিকেলে গিয়েছেন পরিমলকাকার বাড়ি — টেবিলে লুচি-বেগুন ভাজার ভোজ চালু। দিদিমা বলে উঠলেন, 'তোমাদের বেশ সুবিধে, সবাই পুরো লুচি খেয়ে নিচ্ছে। আমার জামাইবাবাজি তো ফুলকো লুচির 'টুসকো'টুকু ছাড়া কিছু খান না।' আর কি, 'ফুলকো লুচির টুসকো' হয়ে গেল আমাদের বুলি। মনে হতো 'টুসকো' তো কুড়কুড়ে হয়, গলা খসখস করে না?

এই দিদিমা আমার মাকে একটু করুণা করতেন। ওঁর মেয়ে আরামে থাকেন, মা বেচারি তো সারাদিন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। যুদ্ধে বাড়ি অধিগ্রহণে ওঁরা, আমরা, সবাই পুরানা পল্টন ছেড়ে যাচ্ছি। আমরা গেলাম ওয়ারী, বাবা-মায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু আশুজেঠা ও অমিতা মাসিদের বাড়ির একদিকে। ওঁদের নতুন বাড়ি জানা নেই। দিদিমা অমিতা মাসিকে বললেন, 'শান্তিদের বেশ, এক ঠেলাগাড়িতে সব জিনিসপত্র এলো আর এক ঘোড়াগাড়িতে ওরা সবাই এসে গেল। নিশ্চিন্তি। আমাদের যে কত ব্যবস্থা, কোনোটা যাবে হাতে করে, কোনো জিনিস গাড়িতে কোলে নিয়ে, কিছু মুটের মাথায়, কিছু ঠেলাগাড়ি আর রিকশায়। অন্তত চারদিন লাগবে। শান্তির কত সুবিধে।' অমিতা মাসির কাছে এ গল্প শুনেছি, তবে তাতে এই দিদিমার প্রতি কখনো রাগ হয়নি। 'টুসকো'র মতো কথা শিখতে পেরেছি, আর কী চাই। যাঁদের নিয়ে দিদিমা বড়াই করে কথা বলতেন তাঁরা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতেন না এসব কথা, অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তখন হেসে উড়িয়ে দিলেও আমার মনে নিশ্চয়ই দাগ কেটেছিল, তাই আজো মনে আছে সম্বলহীন শান্তিদের পুরানা পল্টন থেকে ওয়ারীর অভিযান।

কৃষ্ণাদের 'পরম ভবন', মিষ্টিদিদের 'পল্টন ভিলা' বা মীরামাসিদের বাড়ি ছিল ক'রাস্তা পেরিয়ে। গুজরাটিতে কথা আছে, 'পহলা সাগ্গো পাড়সি', অর্থাৎ 'প্রথম আত্মীয় প্রতিবেশী'। ৫নং পুরানা পল্টনের প্রতিবেশীরা আত্মীয়ের মতোই ছিলেন। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ডানদিকে যেখানে একটু বাঁক নিয়েছে, সেখানে ছিল জ্যোৎস্নামাসিদের ৩নং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি। মেসোকে বেশি দেখিনি, প্রায়ই ট্যুরে থাকতেন, ওঁদের মেয়ে অঞ্জুদি অনেক বড়, বোধহয় কলেজে পড়তেন — মাঝেমধ্যে আসতেন বাগান দেখতে। ছোট ভাই তিলক, আমার ভাইয়ের সমান — ওদের তখনো খেলা করার বয়স হয়নি। ভাই যতীনদার ঘাড়ে আর তিলক তার 'যতীনদার' ঘাড়ে একসঙ্গে বেড়াতে যেত। জ্যোৎস্নামাসি আসতেন দিনে অন্তত একবার। খুব লম্বা, আধঘোমটা দেওয়া, দশ হাত শাড়ি পরতে অসুবিধে হতো। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মার সঙ্গে গল্প করতেন। ব্যস্ত মানুষ, কখনো বেশিক্ষণ থাকতে পারতেন না।

আমি ওঁদের বাড়িতে প্রায়ই ঢুকে যেতাম, সেই নিমকি-মিষ্টির লোভে। কিঞ্চিৎ গোলাকার বাড়ি, মেঝে থেকে শুরু হয়ে হালকা নীল রঙের লম্বা কাঠের জানালা, অর্ধচন্দ্র আকারে বাড়িতে যাওয়ার সিঁড়ি, বারান্দা, বড় বড় ঘর। সামনে খোলা জমি। অন্যান্য বাড়ি থেকে ধাঁচ আলাদা, আমার এ বাড়ি খুব সুন্দর মনে হতো। একবার এখানে একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যথারীতি না বলে-কয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়েছি — বাড়িভরা অতিথি, একটু এলোমেলো ব্যাপার। কোনো এক ঘরে ছোটরা খেলা-গল্প করছে — বিনাদ্বিধায় ঢুকে পড়লাম। একটি ছেলে, বছর ১২-১৩ হবে, ভাবলেশহীন মুখে লম্বা দড়ি নিয়ে স্কিপিং রোপের মতো লাফ দিচ্ছে। হঠাৎ দেখি ঘর খালি, সবাই অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। ছেলেটি লাফ দিয়ে চলেছে, তার মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বাবা কি বিলাত্‌ফেরত (ত, ফ যুক্তাক্ষর করে)?' বারতিনেক জিজ্ঞাসা করার পর প্রশ্ন বুঝতে পেরে বললাম, 'হ্যাঁ'। ছেলেটি কিছু না বলে আগের মতো ভাবলেশহীন মুখে চলে গেল। প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝে আমি কী রকম ভয় পেয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে গেলাম। হয়তো সরল মনে সে প্রশ্ন করেছিল, আচমকা 'যুক্তাক্ষর' শুনে ভয় পেয়েছিলাম। প্রশ্ন বা ভয় পাওয়া, কোনোটারই কারণ বুঝে উঠতে পারিনি।

৪নং-এ থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ের অধ্যাপক সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। শান্তিপ্রিয় মানুষ, নিজের মনে থাকতেন। ওঁর একটি রেডিও ছিল, বাবা যেতেন ও বাড়িতে দিলিপ রায়ের গান শুনতে। ১৯৪৩-এ তিনি বিয়ে করে নিয়ে এলেন ছোটখাটো সুন্দরী কাকিমাকে। দু-বাড়ির মাঝে কাঁটাতারের বেড়া — কাকিমা তাঁর দিকে, মা এদিকে, কত সকাল-বিকেল দাঁড়িয়ে গল্প করতেন, কাকিমা ঘরসংসার, রান্নাবাড়ি নিয়ে প্রশ্ন করতেন। সেই শীতকালে মনে পড়ে কাকিমার ছবি, গল্প করছেন আর উল বুনে চলেছেন।

কাকিমা বিয়ের পর কলকাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন ভাশুরপো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেধোকে। মেধোদা সেন্ট গ্রেগরিতে, দাদার থেকে দু-ক্লাস উঁচুতে। গাঢ় বন্ধুত্ব হলো। স্কুলের পর বাড়ি ফিরে একটু পরই কাঁটাতারের বেড়া লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে টুক করে এসে যেতেন মেধোদা ৫নং-এ। কোনোদিন গেট দিয়ে আসতেন না। লম্বা চেহারা, হাতে সবসময় বই। বারান্দা থেকে ডাকতেন, 'কাকিমা', অর্থাৎ মা, অমনি মা শুরু করতেন, 'কে, মেধো, আয় আয় — কী খাবি বল?' ৪নং-এ তার নিজের কাকিমা যতই যত্ন করুন না কেন, মেধোদা এই কাকিমার আদর-যত্ন সানন্দে গ্রহণ করতেন। তারপর দাদাতে, মেধোদাতে ছুট মাঠে — ফুটবল খেলতে। মা মেধোদাকে বাড়ির ছেলের মতোই দেখতেন। একবার কোনো অতিথি বাড়িতে দুটি ছেলেকে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ওইটি তো সমীর, অন্যটি কে?' মা অবাক, এ আবার জিজ্ঞাসা করবার কথা নাকি, সজোরে বললেন, 'ও তো মেধো, পাশের বাড়িতে থাকে — এ বাড়ির ছেলের মতো।' অর্থাৎ আমাদের দুবাড়িতে ভেদাভেদ নেই। মেধোর জন্য বই — ২ টাকা ৪ আনা — লেখা আছে এপ্রিল, ১৯৪৪-এর হিসেবে। আপন করে নেবার অসীম ক্ষমতা বোধহয় বাংলা মায়ের জন্মগত।

রাস্তার উলটোদিকের কোণে থাকতেন পূর্ণদাজেঠা। এঁর পুরো নাম জানি না। উনি 'বোটানির' অধ্যাপক ছিলেন। অকৃতদার, মধ্যবয়সী, মাথায় চুল বিরল না হলেও সংখ্যায় কম, একটু উঁচু সাদা পাজামা আর গেরুয়া জাতীয় রঙের পাঞ্জাবি পরে হঠাৎ করে চলে আসতেন। 'আসুন, আসুন, পূর্ণদা' বলে মা ওঁকে বসিয়ে গল্প করতেন। কোথা থেকে চা-জলখাবার উদয় হতো জানি না। মা ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, 'পূর্ণদার মতো মানুষ কম দেখা যায়', প্রায়ই বলেছেন আমাদের। গাছপালা ছিল পূর্ণদাজেঠার জীবন। কাউকে কাছে পেলেই গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। অনেকে ঠাট্টা-মস্করা করতেন: দুঃখের কথা, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে যদি তখন থেকে আমরা শিখতাম, আজ পৃথিবীর অবস্থা হয়তো এত অসহায় হতো না।

৫নং-এর উলটোদিকে ছিল বোস বাড়ি। যৌথ পরিবার — দুই বোন মনিদি আর মিনুদিকে মনে পড়ে, দিনের মধ্যে কতবার এবাড়ি-ওবাড়ি যাওয়া-আসা হতো। পুরানা পল্টনে আমরা কত আনন্দে এক পরিবারের মতো কাটিয়েছি, হৃদ্যতা, নৈকট্য কত পোক্ত ছিল, তা মিনুদির চিঠি থেকে বোঝা যায়। ১৯৯২-র জানুয়ারির ১৪ তারিখে আমার বাবা মারা যাওয়ার পর ১৭ তারিখে মাকে মিনুদি লিখছেন :

'অমিয়দার মৃত্যু সংবাদ পড়ে ভাবছিলাম আপনজনেরা একে একে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। কত ছুটে ছুটে তোমাদের বাড়িতে গেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত দুষ্টুমি করেছি। তারপর পাকিস্তান হওয়ার পর কে কোথায় হারিয়ে গেলাম। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, মার কাশীতে আসার খবর পেয়ে অমিয়দা নিজে এসে আমাকে আর মাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এরকম কত স্মৃতি মনে ভেসে আসছে। সর্বদা আমার ঢাকার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে ও তোমাদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। কত আদর, কত ভালোবাসা তোমাদের কাছে পেয়েছি।'

আমাকে লেখা পরিমলকাকার এক ছড়ার কিছু পঙ্ক্তি থেকে এই আপনজন সম্পর্কের আন্দাজ পাওয়া যায়।

ছিল পাশাপাশি বাড়ি,
অথবা মাঠের পাড়ি,
ব্যবধান নহেক অধিক,
কাদের বাড়ির ও যে
অপরে কেমনে বোঝে
আমরাই বুঝি নাই ঠিক।[৯]

বাইরের কেনাকাটার কাজ বাবা-কাকারাই করতেন। বিশেষ প্রয়োজন হলে হয়তো ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে যাওয়া হতো — এর বেশি নয়। মায়েরা পর্দানশিন ছিলেন না, তবে একা একা বা মহিলারা দলবেঁধে কোথাও যাবেন, সে প্রথাও ছিল না। প্রধান কারণ যানবাহনের অসুবিধে, কেউ গিয়ে ঘোড়াগাড়ি ঠিক করে নিয়ে আসবেন, তবেই তো বাইরে যাওয়া। বাবা-কাকাদের পক্ষে নবাবপুর জাতীয় জায়গায় যাওয়ার সুবিধে বেশি ছিল, তাই এ ব্যবস্থা। আমাদের জুতো কেনা এতে একটু কষ্টসাধ্য হতো — বারদু-তিন বদলেও আনতে হতো কোনো কোনো সময়। সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজে পায়ের পাতার মাপ এঁকে দিতাম, তা মিলিয়ে বাটার দোকান থেকে বাবা জুতো নিয়ে আসতেন। কি সুন্দর চামড়ার বুট, ওপরে প্রজাপতি ক্লিপ বা ট্যাসলের মতো চামড়া দিয়ে তৈরি সাজ। কাগজে পা দেওয়া অন্যায়, দেবী সরস্বতীর প্রতীকের ওপর পা রাখা; উপায় ছিল না, ছাপ আঁকা হয়ে গেলে কাগজকে প্রণাম করে নিতাম। প্রশ্ন হতে পারে আমাদের নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ কি ছিল না? সত্যি তো — ওসব কথা ভাবতে শিখিনি ছোটবেলায়, বাবার পছন্দের জুতো আর মায়ের পছন্দের ফ্রক ছিল আমাদের পরিধান। ভালো-মন্দের কথা নয় — সে সময় এটাই ছিল স্বাভাবিক। এতে আমাদের ভাবনা-চিন্তা, সৌন্দর্যবোধ, নিজস্ব রুচি বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেতে বাধা পেয়েছে বলে মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুতোর মাপের কথায় মনে হলো ফুলস্ক্যাপ কাগজ ছাড়া চলত না। শুধুই কি মাপ, মাসের হিসাবের খাতা, ধোপার হিসাবের খাতা, ছোটদের লেখা শেখা, স্কুলের হোমওয়ার্ক লেখা, শিক্ষকদের গবেষণার ফল, এই কাগজজুড়েই সব খাতা বানানো হতো। হিসাবের খাতা বানাবার একটা বিশেষ ধরন ছিল। খাতা হবে সরু ও লম্বা সাড়ে ৪"x১৪"। সেভাবে কাগজ ভাঁজ করে মাঝে পোক্ত সেলাই করে দিলে হতো মনের মতো খাতা। এই পদ্ধতি বা আকারের ব্যতিক্রম আমাদের বাড়িতে কখনো হয়নি, দীর্ঘ ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৫ অবধি নিশ্চয়ই নয়। আমার কাছে মায়ের প্রায় সব হিসাবের খাতা সুরক্ষিত আছে।

আমার মা লেখিকা ছিলেন না; লেখিকা হবার কোনো ইচ্ছে ছিল, তাও মনে হয় না। কিন্তু উনি লিখতে ভালোবাসতেন। নানা ডায়েরিতে টুকরো টুকরো দিনপঞ্জি আছে, যেমন কোথায় বেড়াতে গেলেন, কে দেখা করতে এসেছিলেন, কারা চা খেতে এলেন, কে টেলিফোন করলেন ইত্যাদি — নিজের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, অনুভূতির কথা। অনেকটাই আছে তাঁর ভ্রমণ সম্বন্ধে, সে কাশী শহরের সরু গলিই হোক বা তাজমহল, বুডাপেস্ট হোক। পরে কোনোদিন পড়তে ভালো লাগবে বা পরের প্রজন্ম জানতে পারবে আমার মা-বাবার জীবন সম্বন্ধে, অন্তত কিছুটা — হয়তো এটাও ছিল লেখার কারণ। এই অভ্যেস তাঁর শেষ জীবন অবধি ছিল। আশি-পঁচাশি বছর বয়সেও লিখছেন, 'বিবি টেলিফোনে জানিয়েছে যে সে কাল সন্ধ্যের প্লেনে বরোদা ফিরবে, কিংবা ভাইয়ের কাছে বিলেতে গেলে, নাদিনের (মায়ের পুরনো বন্ধু) বাড়ি গেলাম চা খেতে।'

এসব লেখা মাঝেমধ্যে হলেও, একটা খাতা তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহারের ছিল, নিত্যসঙ্গীর মতো — তাঁর হিসাবের খাতা। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের, প্রায় ছয় দশক, অন্তত পঞ্চাশ বছরের হিসাবের খাতা তিনি রেখে গিয়েছেন। মনে পড়ে শেষবেলায়, সন্ধ্যেবাতি দেবার আগে, পেছনের বারান্দায় মোড়াতে বসে মা দৈনিক হিসাব লিখছেন। খুঁটিনাটি, বড়-ছোট সব খরচই তাতে আছে, যেমন ১৯৩৭-এর ১৩ জুলাই 'রজনীকে ঝিনুক বাটির জন্য ৬ টাকা ৪ আনা।' রজনী কে জানি না, হয়তো কোনো সামাজিক দায়িত্ব। খুচরো পাওনা, বড় পাওনা বিশেষ করে লেখা : তারিখ ১২ আগস্ট —

১. ঘিওয়ালার পাওনা। ১ টাকা ৫ আনা

২. দুধওয়ালির জুলাইর পাওনা ১ টাকা ৪ আনা।

৩. ৩১ জুলাই পর্দার কাপড়, টেবিল ক্লথ ইত্যাদির জন্য ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় হইতে ৮ টাকা ১৫ পয়সার কাপড় আনা হয় — দাম বাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের পাওনাসমেত মোট বাকি — ১৭/১০।

স্বল্প আয়ে শুধু ঢাকার সংসার নয়, বরিশালে বড় ভাইয়ের সংসারে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে, হিসাব মেলানো সহজ ছিল না, সহজ নয় বলেই এ কাজে অবহেলা করা যেত না।

আমরা যখন একটু বড় হয়েছি, সংসারে টানাটানি কম হয়েছে, ভাই মাকে বলত, 'হিসেব লেখা তো একটা অভ্যেস তোমার, গোঁজামিল দিয়ে গরমিল মেলাও।' মা রুষ্ট হতেন না, মালির মাইনে বা দুধের দাম ক্রমশ বেড়ে চলেছে, হিসাব লেখার প্রয়োজন শেষ হতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর লেগেছে।

১৯৩৭-এর হিসাবের খাতায় দু-একটি জিনিস লক্ষণীয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে আয়ের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পূরণ করা সহজ নয়। হিসাবের খাতায় আছে, 'সুন্দর দিদির তহবিল', অর্থাৎ আমার পিসিমার নামে তহবিল। এতে কোনো মাসে রাখা হতো পাঁচ টাকা, আবার কোনো মাসে কিছু নেই। এই তহবিল থেকে মাঝে মাঝে ধার নেওয়া হতো, আবার সেটা শোধ দেওয়া হতো। পিসিমা অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাঁকে টাকা পাঠাবার প্রয়োজন ছিল না। মনে হয় এভাবে টাকা বাঁচিয়ে পুজোতে দিদি-জামাইবাবুকে ভালো শাড়ি-ধুতি দিতে পারতেন। পুজোতে নিজেদের জন্য কিছু কেনা হিসাবের খাতায় নেই, আমাদেরও মনে পড়ে না। এটা অভ্যেসের মতো হয়ে গিয়েছিল, পরে যখন কেনা সম্ভব ছিল, তখনো নিজেদের ওপর খরচ বিশেষ করতেন না। জিজ্ঞেস করলে মা বলতেন, 'ওই তো হইল: অমুকে দিল, তুই দিলি, আছে তো নতুন শাড়ি, আবার কি?' ১৯৮২তে প্রথম দেখছি নিজেদের জন্য কিছু: 'পুজোর তহবিল থেকে প্রোঃ রাখলেন ১০০ টাকা — তা থেকে সাতটি গোলাপের চারা কেনা হলো (৫১ টাকা ৪০ পয়সা), বাকিটা দিয়ে লং ক্লথ।' বাবার শৌখিনতা চিরকাল রয়ে গেল গোলাপ চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়িতে।

১৯৩৭-এর অন্য উল্লেখযোগ্য হিসাব আমার সেজজেঠিমাকে ঘিরে। তাঁর ছেলে সমীরের জামা, জুতো, বই, চুল ছাঁটা, সব খরচ লেখা; সেজমার নিজের ব্যবহারের শাড়ি বা জামা-কাপড়, মায়ের সংসার খরচের হিসাবে উল্লেখ করা। আবার আছে, 'সেজদির কাছ থেকে ধার ৫ টাকা।' কমাস পর, 'সেজদির ধার শোধ ৫ টাকা।' সেজমা ঠিক অসহায় ছিলেন না। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে দেওর-জায়ের কাছে একনাগাড়ে দীর্ঘদিন থাকতেন, কিন্তু ধার, ধারই — শোধ দিতে হয়। শান্তির ধার শোধ ২ টাকা — এও আছে।

১৯৩৭-এ সত্যিকারের ধার থাকত ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে — নতুন সংসার, নানাবিধ জিনিস, লেপ, তোশক, ওয়াড়ের কাপড়, মশারি, কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুর প্রয়োজন। প্রতি মাসেই ধার থাকত।

এ বছর ১ মার্চ মা লিখছেন, 'ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের পূর্ব-বাকি ২২ টাকার মধ্যে ১০ টাকা ১লা মার্চ দেওয়া হইল, বাকি ১২ টাকা এবং উক্ত তারিখে নেটের মশারির কাপড়ের দাম সম্পূর্ণ বাকি রইল। মশারির বাকি ১১ টাকা ৮ আনা ১৫ পয়সা।' দুমাস পর ধার শোধ হয়ে যায়। সবই প্রয়োজনীয় জিনিস। ঢাকেশ্বরী থেকে আনা 'অপ্রয়োজনীয়' জিনিস মায়ের 'করিয়াল শাড়ি — ১৯ টাকা, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭'। বিয়েতে পাওয়া করিয়াল শাড়ি বড় জাকে দিতে হয়েছিল শুনেছি, দুর্গাপূজা সামনে, তাই এটা বাবা কিনে দিয়েছিলেন। ননদ-পুটুলি ও নমস্কারি শাড়ি দেওয়া হলেও বড় জায়েরা, ননদরা দু-একখানি শাড়ি নিয়ে নিতেন। ১৯৭১-এ এই প্রথা দেখেছি গুজরাটে — সেখানে ননদ-পুটুলি নেই, তবে নববধূর ট্রাঙ্ক থেকে একটি শাড়ি ননদ নিতে পারেন। শুধু একটি। লটারির মতো করে ঠিক হতো কোন ননদের অধিকার এটা। যতই শাঁখ বাজুক, উলুধ্বনি হোক, নববধূর আগমন খুব মসৃণ হতো না আমাদের সমাজে।

আরেক হিসেব ছিল সাপ্তাহিক — ধোপার কাপড়, কী এলো, কী যাবে তা লেখা। ওই মোড়ায় বসেই লেখা। আমাদের ধোপার নাম ছিল খগেন; আমার ধারণা ছিল খগেন মানেই ধোপা। একবার খগেনের আসতে কদিন দেরি হয়েছে, আমি পাড়া বেড়িয়ে এসে মাকে বললাম, 'দেখো, ওদের বাড়ির খগেন তো আজ এসেছে, আমাদের বাড়ির খগেন কেন এলো না?' ধোপার খরচ অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে লেখা, 'ধোপা ১১ টাকা।' খগেনের ঘাড়ে করে আনা বস্তাটা কখনো হালকা হতো না, ১১ টাকা নিশ্চয়ই ন্যায্য ছিল। কাপড় নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপারে খগেন নিয়মিত ছিল না, প্রায়ই বচসা হতো। খগেনের একই জবাব, 'কী করুম, ঠাইরেন।'

প্রতি মাসে হিসাব শুরু হয় ভিন্নভাবে — শুধু আমদানি ও খরচ নয়। প্রতি মাসে মাইনের পুরো চেক দেওয়া হতো বাবার সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার মামা সুবোধ সেনগুপ্তকে, জমা হতো টি-সেন্টারের খাতায়। তারপর ২ টাকা ৪ টাকা করে যখন যেমন প্রয়োজন ওঁর কাছ থেকে নেওয়া। মাসের শেষে কোনো সময় কয়েকটি টাকা জমা থাকত, আবার কোনো মাসে একটু বাকি। এ ব্যবস্থা কেন, বুঝতে সময় লেগেছে। ব্যাংকের ঝামেলা থেকে রেহাই পেতেন বাবা, বাড়তি টাকার প্রয়োজন হলে চিন্তা থাকত না। আর সুবোধমামা ব্যবসা করতেন, কাঁচা টাকার প্রয়োজন হতো, বাবার মাইনের যতটুকুই হাতে থাকত, কাজে লাগত। এমন বিশ্বাস, সুদহারা অলিখিত দেনা-পাওনার উদাহরণ আর দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসকাবারে হিসাব মেলানো প্রায় বাড়িতেই ছিল পীড়াদায়ক। তা সত্ত্বেও দুই ব্যাপারে কার্পণ্য ছিল না — আতিথেয়তা ও খাওয়া-দাওয়ায়। ঢাকার অপর নাম 'আতিথেয়তা, খাতিরদারি' — আজো এর পরিবর্তন হয়নি। ভরা বাড়ি, ভরা টেবিল মা ভালোবাসতেন লিখেছি; বাবা ছিলেন বন্ধুবৎসল মানুষ। যেমন একাগ্রভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ করতেন, বাগান করতেন, তেমনি উদ্যম নিয়ে আড্ডা দিতে পারতেন। বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডা নিয়মিত চলত — বকশীবাজার, পুরানা পল্টন, ওয়ারী, দিল্লি বা শান্তিনিকেতন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বা অর্থনীতিবিদরা বাবার বন্ধু ছিলেন, বলা বাহুল্য, তবে বাবার বন্ধুত্ব এঁদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; শুধুই সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাও নয়। বাবার বন্ধুমহল ছিল যেন খোলা আকাশ — বিভিন্ন জগৎ থেকে তাঁরা আসতেন। জ্যোতির্ময় রায়, নামি লেখক ও চলচ্চিত্র পরিচালক; সুধীশ ঘটক — ফটোগ্রাফিতে মার্গ প্রদর্শক, শচীন চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ হলেও তিরিশ-চল্লিশের দশকে বহুকাল বোম্বাইতে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কবিবন্ধুদ্বয় বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত, কলকাতায় থিয়েটারের মঞ্চে অভিনেতা, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, সুধীর সেন, যিনি এক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেক্রেটারি ছিলেন; এঁদের সঙ্গে দেখা হতো কলকাতায় কারো বাড়িতে বা হ্যারিসন রোডের কোনো মেসবাড়িতে, যেখানে শচীনকাকা থাকতেন। মাঝেমধ্যে এঁদের কেউ ঢাকা এলে, জড়ো হতেন বাবার বাসস্থানে।

সবাইকে আমার মনে নেই, তবে কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। রামকৃষ্ণ বাবুকে ভুলতে পারি না কারণ ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম থিয়েটার দেখা জুড়ে আছে। জ্যোতির্ময় রায়ের হাসি, ব্যক্তিত্ব ভুলবার নয়। প্রথম যখন দেখি ঠিক তার আগে বাবা ওঁর লেখা *পদ্মনাভ* পড়ছিলেন; বইয়ের নাম ও লেখকের উজ্জ্বল চেহারা দুটিই ভালো লেগেছিল। সদাশিবকাকা (সেনগুপ্ত) লন্ডনের বন্ধু, কলকাতায় Indian Statistical Institute-এ শুরু থেকে কাজ করতেন — যখন কলকাতায় কোনো পাড়ায় দুটি ঘরে প্রশান্ত মহালনবীশ ইনস্টিটিউট আরম্ভ করেন তখন থেকে। বাড়ি ছিল ঢাকায়। প্রায়ই আসতেন। এ রকম নম্র, স্নেহপ্রবণ, রসিক, সৎমানুষ কম দেখেছি। স্যুট পরিহিত ছাড়া কখনো দেখিনি, কিন্তু ছিলেন খাঁটি বাঙালি, বাঙালও বলা যেতে পারে। রুগ্‌ণ মানুষ, এলেই মা বলতেন, 'বেচারা, চিরটাকাল দুধ-ভাত খাইয়া রইল আলসারের লইগ্গা। একটু খাওয়াইয়াও সুখ পাইলাম না।' মা-মাসিরা কেউ অন্দরমহলে থাকতেন না তো, তাই বাবার সব বন্ধুর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়েরও হৃদ্যতা ছিল। চমক দিয়ে বজ্র আওয়াজে হঠাৎ উপস্থিত হতেন লম্বা-বলিষ্ঠ চেহারার 'ভিম-ভ্যাট', যেন একটি নাট্য মুহূর্ত। ওঁকে এই নামেই সবাই ডাকতেন, আসল নাম বোধহয় ছিল বিমল ভট্টাচার্য্য — এ নাম ওঁকে মানাতো না। কোনো সময় আসতেন একটি বিশাল অ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে, ভয়ে পালিয়ে যেতাম। কুকুর কিন্তু শান্ত ছিল। টুঁ-শব্দটি করত না। ভিম-ভ্যাট এলে মনে হতো বাড়ির সব কোনা থেকে হাসি-হট্টগোল-আনন্দ ভেসে আসছে। উনি বীরেন জেঠারও খুব বন্ধু ছিলেন। শেষ জীবনে বোধহয় কোনো ব্যর্থতা বা বিশ্বাসঘাতকতা ওঁকে আঘাত করেছিল। শেষ বয়সে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছি, কুকুর অনেক ভালো — বিশ্বাসে ঘা দেয় না।' ভীমরতি না সত্যের উপলব্ধি জানি না।

এক কাকাকে বিশেষভাবে মনে পড়ে, অলন্দা কাকা, ছেলেবেলায় পুরো নাম উচ্চারণ করতে না পেরে বলেছিলাম 'অলন্দা' — সেই থেকে আমি অলন্দা, উনি অলন্দা কাকা। আমার ভাই, আমার স্বামী — সবাই ওঁকে এ নামেই ডাকতেন। গাল ভরা হাসি নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'বৌদি' বলে ঢুকতেন অরুণ মুখার্জি, আমার অলন্দা কাকা ও ওঁর স্ত্রী, গীতাকাকিমা। প্রথমে I.C.S., পরে ব্যারিস্টার ও ভারতবর্ষে সুপ্রিমকোর্টের জজ, শুরুতে দর্শনের ছাত্র, ওঁর মেধা ছিল তীক্ষ্ণ। একদিকে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত, অন্যদিকে নবদ্বীপের নব্য-ন্যায়, দুবিষয়েই ওঁর পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। ওঁর জ্ঞান ও অনুশীলনশক্তি পরবর্তী জীবনে আমাকে অবাক করে দিয়েছে। প্রতিভাবান মানুষটি জমিয়ে আড্ডা দিতেন, আমাকে পরে বন্ধুর মতোই দেখতেন। শুনেছি, ওঁদের বিয়েতে যখন আমি খুবই ছোট, বায়না ধরেছিলাম কাকার কাছে থাকব। পুরো বিয়ের অনুষ্ঠান ওঁর কোলে বসেছিলাম। শান্ত হয়ে বসলেও একে শান্ত বলা যায় না।

হঠাৎ করে ৫নং-এ এসে যেতেন প্রো. সত্যেন বোস, কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলতেন, 'কোথায়? তোরা কে কোথায় আছিস?' ঘোমটা টেনে মা অমনি এসে পড়তেন বসার ঘরে। অসুস্থ হওয়া অবধি ঠিক এভাবেই আসতেন কাশী বা দিল্লির বাড়িতে।

বন্ধুদের সঙ্গে বাবার কীরকম আত্মিক বন্ধন ছিল তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কলকাতায় ইংরেজির অধ্যাপক, কালিপদ ব্যানার্জি ছিলেন সুবোধমামা ও বাবার নিকট বন্ধু। বাবার কাছে ওঁর মাস্টারমশায় লাওনেল রবিন্সের লেখা, *The Nature and Significance of Economic Science* বইটির দুটি কপি ছিল। একবার আমি একটি কপি নিয়ে চলে আসছি, বাবা বললেন, 'এ বইটা তুই নিস না, অন্য কপিটা নে।' অবাক হয়ে 'কেন'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করার আগেই বললেন, 'যেটা তোর কাছে, তাতে কালিপদ ব্যানার্জির হাতে আমার নামটা লেখা আছে। কালিপদ তো নেই, বইতে অন্তত ওর হাতের লেখাটা তো দেখতে পাব।'

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রীতে ভরা থাকত আমাদের বাড়ি। খাবার টেবিলে শুধু আমরা পাঁচজন এটা কমই হতো। আমার ভাই লিখেছে, 'আমরা বড় হয়েছি আমাদের মা-বাবাকে ভাগ করে কারণ বাড়িতে সবসময় আরো দাদা-দিদি, কাকা-কাকি অনেকেই থাকতেন; আর মনে পড়ে বাবার প্রাণখোলা হাসি। আড্ডা, আলোচনা, শোরগোল, অট্টহাসিতে ভরা থাকত আমাদের বাড়ি।'[১০] অবারিত দ্বার বাড়িতে বড় হয়েছি আমরা। 'অবারিত দ্বার' এ বাড়িতে কেন স্বাভাবিক পরিবেশ ছিল তা আমার মা-বাবা সম্বন্ধে নবনীতা দেবসেনের লেখাতে স্পষ্ট হয়ে আসে।

'অবিকল মায়ের স্নেহের স্বাদ পেয়েছিলাম [মাসিমার] কাছে, [এক] প্রবল স্নেহের আশ্রয়। শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যখনই গেছি, আদর-যত্নে ভরে দিয়েছেন। মাসিমা স্বভাবত অতিথিবৎসল, রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। মেসোমশাই শান্তিনিকেতনে গল্প করতে সময় পেতেন। নানা বিষয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর অর্থনীতির বাইরে। স্মৃতিচারণ শুনতে মুগ্ধ লাগত সব সময়েই। জানা মানুষদের অজানা সময়ের কাহিনি। ...[আর] তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের কাহিনি, বেনারসের গল্প, পাটনার গল্প, ওয়াশিংটনের কাহিনি, দিল্লির গল্প, কত কী!...

ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে যারপরনাই গর্ব ছিল তাঁর (মেসোমশাইর)। মাসিমার ওসব ছিল না — ছেলেমেয়েরা কে কতটা মেধাবী, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে কে কী খেল, কতটা খেল, কে মোটা হচ্ছে, কে রোগা হলো, কার শরীর কেমন আছে, কার মন কেমন আছে — ব্যস, এদিকটাতেই নজর ছিল বেশি মাসিমার। কে কী কাজকর্ম করে বিশ্বভুবনে কতখানি গভীর দাগ কাটতে পারল, তা নিয়ে অতটা চিন্তিত ছিলেন না মাসিমা। মেসোমশাই তা ছিলেন। আমরা বড় ভাগ্যবান, এমন একটা সময়ে জন্মেছি যখন চতুর্দিকেই পেয়েছি মহীরুহের ছায়া, মহৎ প্রাণের আশীর্বাদ। 'পিতৃমাতৃতুল্য' কথাটা তখন অর্থবহ ছিল।'[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. ১২ অক্টোবর, ১৯৫১। দুর্ভাগ্যবশত পরিমল রায়ের মৃত্যুর দু-দিন পর এ চিঠি New York পৌঁছেছিল। অর্থনীতিবিদ ও সাহিত্যিক পরিমল রায়ের নামের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পরিচয় হয় স্কুলজীবনে, *মৌচাকে*র ধাঁধার উত্তরে। পরে কলেজে একসঙ্গে পড়তে গিয়ে মুখোমুখি আলাপ ও বন্ধুত্ব। এঁরা দুজন ও অজিত দত্ত ছাত্রজীবন থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, আজীবন রয়ে গেলেন। ভৌগোলিক দূরত্ব কোনো বাধা দেয়নি। পরিমল রায় ছিলেন প্রতিবেশী, বাবার প্রিয় ছাত্র, প্রিয় সহকর্মী, আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ছোটদের প্রিয় পরিমলকাকা।

২. শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, পৃ. ২৭-২৮। শান্তিনিকেতনের বাড়ি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। এটি এখন বাবার নামে একটি রিসার্চ সেন্টার। বাগান, বিশেষ করে গোলাপ বাগান, পুনর্জীবিত করা হয়েছে।

৩. এ পাড়ার বেশিরভাগ বাড়ি অনেকটা জমির ওপর ছিল।

৪. *পশ্চিম বঙ্গ* : বিদ্যাসাগর সংখ্যা, বর্ষ ২৯, ১৪০১।

৫. মায়ের জীবনে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না।

৬. সেন, ক্ষিতিমোহন, পৃ. ৬১। রাগ বা তাল উল্লেখ নেই।

৭. ভেজানো কাঁচা মুগডাল, মিহিকাটা শসা আর কুরোনো নারকেল।

৮. সেন, ক্ষিতিমোহন, পৃ. ১১২।

৯. লেখিকার সংগ্রহ।

১০. শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, পৃ. ৮৮

১১. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরসংসার

রান্না খাওয়া-দাওয়া থাকত গৃহিণীর সুনজরে। পাচক থাকলেও রান্না মায়েরা নিজের হাতেই করতেন। কী বাজার হবে, কী রান্না হবে সবই তাঁদের তদারকে হতো। ঠাণ্ডা মেশিন ছিল না, তাজা বাজার হতো দুবেলা। মা বলতেন, 'যতই টানাটানি হোক, এবেলার মাছ কখনো ওবেলা খাইনি।'

চারবেলার খাবার ব্যবস্থা করতে হতো, প্রাতরাশ, দুপুর-রাতের পুরো রান্না, আর বিকেলের জলখাবার। বিকেলে ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে এলে, চাকরিজীবীরা দিনশেষে বাড়ি ফিরলে, বিকেল-সন্ধ্যায় আসা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য চা-মিষ্টি-নোনতা, সবকিছুর সরঞ্জাম; খুব সোজা কাজ ছিল না, অন্তত সময়সাপেক্ষ ছিল। প্রায় বাড়িতেই সাহায্য করার জন্য এক-আধজন থাকলেও গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব ছিল প্রচুর। পুরনো শহরের বাড়িতে রান্নাবাড়ি উঠোনে থাকত, বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নতুন পাড়ায় রান্নাঘর বাড়ির লাগোয়া বলে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো না বা রোদের তাপ লাগত না। অনেক বাড়িতে আমিষ, নিরামিষ ঘর আলাদা থাকত, অন্তত উনুন, বাসন পৃথক রাখা হতো।

এবাড়ি-ওবাড়ি নেমন্তন্নর পাট ছিল না, বোধহয় নেমন্তন্ন এলাহি ব্যাপার তাই। মাঝে মাঝে সপরিবারে কেউ এলে, পাড়া-প্রতিবেশী বা দূর থেকে, যা রান্না হতো বাচ্চারা ভাগাভাগি করে খেয়ে নিতাম। এতে বড়রা একটু বেশিক্ষণ গল্প করতে পারতেন। মিষ্টিদি বলেন, 'ডিমের ডালনার ডিম ভেঙে আধখানা ডিম কত তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছি আমরা বন্ধুরা মিলে।'

রান্না হতো কয়লায়, বড় বসানো উনুনে বা তোলা উনুনে। উনুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজানো-ধরানো সোজা কাজ ছিল না, এক এক দিন উনুনের অবাধ্যতা কাঁদিয়ে ছাড়ত। কাঠের ব্যবহার কম ছিল, জল গরম ইত্যাদি বাড়তি কাজ ছাড়া। গুল, ঘুঁটের প্রয়োজন হতো — যেমন নাপিত আসত ছেলেদের চুল ছাঁটতে, নাপিতিনি মেয়েদের আলতা পরাতে — এক মহিলার বাঁধা কাজ ছিল এসে গুল দেওয়া। নরম আঁচের প্রয়োজন হলে ব্যবহার হতো কাঠকয়লা। মুড়ি, চিড়ে, খই সদ্যভেজে নিয়ে আসত মেয়েরা। নাড়ু, মোয়া, পিঠে, আমসত্ত্ব, আচার সব বাড়িতেই বানানো হতো। রোদ দেখে আমসত্ত্ব দেওয়া — এক রোদে ওঠাতে হবে, আচার ক'দিন ধরে রোজ রোদে দিতে হবে, গৃহকর্ত্রীর কাজের শেষ নেই।

নকশা করা থালাতে আমসত্ত্ব দিলে আমসত্ত্ব হয় আলপনার মতো; এ রকম পাতলা থালা আলাদা রাখা থাকত, আমের মৌসুমে তার দেখা পেতাম। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম সৌন্দর্য ও স্বাদের কথা ভেবে। এ ছাড়া ছিল বড়ি দেওয়া — পটু হাতের প্রয়োজন। মসুর ডাল, কলাইর ডাল — বিভিন্ন ডালের বড়ি; কোনোটা সুক্তো বা ঘণ্টতে, কোনোটা মাছের ঝোলে, কোনোটা শুধুই ভাজা, একেবারে নিয়মে বাঁধা। মা-কাকিমারা আঁচলে চাবি বেঁধে সাধারণ করে সুতির শাড়ি পরে রোদে বসে অল্প তেল মাখা থালাতে ছোট, মাঝারি, বড়মাপের বড়ি দিতেন — যেন পটের ছবি।

বড়ির কথায় মনে পড়ে 'আস্যি' থাকা বা না থাকার কথা। 'আস্যি নেই', অর্থাৎ এটা বানানো পরিবারে বারণ। নিয়ম ভাঙলে ঘরে 'অলক্ষ্মী' ঢুকবে, এই বিশ্বাস। মা বলতেন আমাদের বাড়িতে কলাইর ডালের বড়ি আর কাসুন্দি দেবার আস্যি নেই। এগুলো তাই আসত বাইরে থেকে। পারস্পরিকভাবে এই মানা আমাদের বাড়িতে, অর্থাৎ বাবার পরিবারে, চলে এসেছে।

বাইরে থেকে খাবার আনাবার প্রশ্ন উঠত না; ছানা, মিষ্টি, বিভিন্ন জলখাবার বাড়িতেই বানানো হতো। ফিটকিরি বা ছানার জল দিয়ে ছানা কাটা হতো — মুড়ি-চিড়ে দিয়ে ছানা মেখে জলখাবার হতো। মা একটু চিনি দিয়ে ছানা মেখে, কড়াইতে সেঁকে সন্দেশ বানাতেন — অনেকটা কাঁচাগোল্লার মতো। এ মিষ্টি না থাকলে শেষ বয়সে বাবার দুপুরের খাওয়া সম্পূর্ণ হতো না। অতিথিদেরও জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি, 'মাসিমা, আজ সন্দেশ নেই?' ছানার ডালনা হতো মাঝে মাঝে। ছানা কেটে জল ঝরিয়ে, টুকরো করে, একটু লাল করে সাঁতলে, আলু দিয়ে তৈরি ডালনা, তবেই না ছানার ডালনার স্বাদ। ছানার সব গুণ হয়তো নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু স্বাদকে তো অবহেলা করা যায় না। উত্তর ভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছানা না ভেজেই রান্না করা হয়, অসম্পূর্ণতার ছাপ থেকে যায়, গাঢ় সবুজ পালংশাকের সঙ্গে ধবধপে সাদা ছানা যেন গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকে। ছানা বা ক্ষীর দিয়ে তৈরি হতো রকমারি মিষ্টি — মাছ, শঙ্খ, ফুল, 'সুখে থাকো', 'আবার খাবো', নানা সাজে হালকা বা কড়া পাকের সন্দেশ। 'পিঠে' সংক্রান্তির পিঠের ফর্দ দেবার চেষ্টা না করাই ভালো, পুরান ঢাকার গলিতে আজো দেখতে পাই বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন পিঠে। আমার পছন্দের ছিল পুলি পিঠে, আর ক্ষীরের পুরের পাটিসাপটা। পাটিসাপটা মসৃণ হলে পরীক্ষায় উতরালো না, 'ক্ষতে'র দাগ না হলে পাটিসাপটা কি? পায়েস হতো উৎসবের দিনে, জন্মদিন, ভাইফোঁটা, পুজোআর্চা। নতুন গুড় এলেই উৎসবের দিন বেড়ে যেত। দু'জাতীয় পায়েস খুব মনে পড়ে, কমলালেবুর পায়েস আর চুষির পায়েস। প্রথমটি সোজা, শুধু দুধ ঠাণ্ডা করে কমলা দিতে হয়, কিন্তু 'চুষি' বানানো কঠিন — সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ। ময়দা মেখে দিতেন মা, কীভাবে জানি না, এক চিমটে, খুবই ক্ষুদ্র এক চিমটে ময়দা মাখা নিয়ে হাতের তালুতে ওরকমই ক্ষুদ্র 'চুষি' বানানো। এগুলো থালাতে রাখাতেও কেরামতি ছিল, যাতে এঁটে না যায় — হাতে ও থালাতে একটু তেল মাখাতে হতো। চুষি এতই ছোট — সূক্ষ্ম বলা যায়। চুষি শুকিয়ে গেলে, দুধে ঢেলে পায়েস হতো। মনে হয় এটা ছিল বাড়িতে তৈরি 'সেমাই'। উৎসবের দিনে পায়েসের কথা বলেছি — শীতের দিন, বাগানে ফুল, তাজা শাকসবজি, উৎসব তো রোজই। একটি মিষ্টি বাইরে থেকে আসতো — 'প্রাণহরা'। ঢাকার খ্যাতনামা ময়রা মরণচাঁদ ঘোষের দোকানের বিশেষ 'সন্দেশ'। নাম শুনে কবি মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন, 'মানলাম সন্দেশটি খুব সুস্বাদু। কিন্তু নাম 'প্রাণহরা' কেন? সে তো বিষ। বলতে পারো 'মনোহরা'।[১]

রান্নার মধ্যে মাছের প্রাধান্য স্বাভাবিক কারণেই বেশি ছিল — ছোট, বড় দুই-ই। কই, মাগুর, চিতল, ইলিশ, রুই, কালবাউশ, পাবদা, মৌরলা, কাজলি, পুঁটি, নানা মাপের চিংড়ি, কাকে ছেড়ে কাকে রাখি। পূর্ববঙ্গের জলের স্বাদ আলাদা, তাই মাছের স্বাদ আলাদা। ঝোল, শর্ষে, দইমাছ, মালাইকারি ইত্যাদি ছাড়াও ছিল শোল-মুলো, টাকি মাছের পুর আর কেচকি মাছের ভাজা। সবই সুস্বাদু। রহস্যময় রয়ে গেল পুরান ঢাকার, অর্থাৎ গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে প্রচলিত শুঁটকি মাছ। মা খুব ভালোবাসতেন; শুকনো করে বানিয়ে একটু বেশি পরিমাণে ভাতের সঙ্গে শুকনো করে মেখে খাওয়া নাকি অত্যন্ত সুস্বাদু। আমরা কাছে ঘেঁষতাম না, এত তীব্র তার উপস্থিতির প্রচার — আমাদের কাছে এই সুস্বাদু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাটি রহস্যই রয়ে গেল। মুরগির চল ছিল কম (অনেক বাড়িতে মুরগি আনা বারণ ছিল), আলু দিয়ে খাসির মাংস রান্না হতো, নেমন্তন্ন থাকলে তো নিশ্চয়ই। টমেটোর ব্যবহার খুব কম মনে পড়ে, হয়তোবা চাটনিতে। খাদ্যরসিক শৌখিন বাড়িতে, বিশেষ করে যাঁরা বংশানুক্রমে ঢাকার, যেমন আমার মামাবাড়ি, রান্না হতো কচ্ছপ বা হাঁস। হাঁসের ডিমের ব্যবহার হতো ডালনায়, বাকি সব কিছুতে মুরগির ডিম। একটু গোঁড়া বাড়িতে মুরগির ডিম ঢুকত না।

রকমারি ডাল, তার রকমারি রান্না। মুগ, মসুর ছাড়া ছিল খেসারি, কলাই, ছোলার ডাল — তার থেকে একটু তফাতের মটর ডাল। বিভিন্ন ফোড়ন, বিভিন্ন স্বাদ। কলাইর ডালে একটু মৌরি বাটা, মসুর ডালে পেঁয়াজ যায়, শুধু রাঁধুনি ফোড়নেও সুস্বাদু হয়। এছাড়া ছিল মুড়ো দিয়ে, মুলো দিয়ে, ডাঁটা দিয়ে, পাঁচমেশালি তরকারি দিয়ে ডাল; করমচা, কাঁচা আম, কামরাঙা বা আমড়া দিয়ে টকের ডাল, উচ্ছে দিয়ে তিতার ডাল। বহুকাল পরে মনে এলো চালতার ডাল; চালতার এক একটি পরত ধীরে ধীরে যেন মমতা দিয়ে ছাড়ানো। এখনো কি হয়? জানি না — আমি তো আর দেখিনি।

বেগুন ছিল 'হলুদের গুঁড়ো'র মতো — পোড়া, ভাজা, শর্ষে বাটা, পাঁচমেশালি তরকারিতে, আবার মাছের ঝোলে নানা প্রণালিতে। বিভিন্ন আকারে কাটা, তাতে একই বেগুনের স্বাদ আলাদা হয়ে যায়। বিশেষ রান্না ছিল সাদা তরকারি — হলুদ ছাড়া নানা সবজি মিশিয়ে পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না। এতে কুমড়োর ডাঁটা, মুলো দিলে বেশি উপাদেয় হতো। সুক্তোই ছিল কত রকমের; শুধু লাউর সুক্তো, পাঁচমেশালি সুক্তো — কোথাও কোথাও আবার সুক্তোতে ভাড়ালি বা থোড় না থাকলে তাকে সুক্তো মনে করা হতো না। এখন মনে হয় স্বাস্থ্যের পক্ষে কী ভালো তা ভেবেচিন্তে রান্না হতো। এলাচ, দারচিনি, তেজপাতার গুণ সম্বন্ধে আজকাল পড়ি, স্বল্প পরিমাণে এর ব্যবহার তো আমাদের রান্নায় বহুকাল থেকে। স্বল্প, কারণ এরা কিঞ্চিৎ উষ্ণ মেজাজের, বলা হয় 'গরম মসলা'। পাঁচফোড়নে রাঁধুনি থাকত, আজকাল কিন্তু বাজারের পাঁচফোড়নে মৌরি থাকে, স্বাদ কত বদলে যায় তাতে। রোজকার খাবারে প্রায় সময় টক কিছু রাঁধা হতো, বিশেষ করে গরমে কাঁচা আম ব্যবহার করে। বেশি ছোট আম হলে জলে শুধু নুন, মিষ্টি দিয়ে সেদ্ধ করা, নরম বীচি থাকলে শর্ষে ফোড়ন দিয়ে অম্বল — গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখে। এছাড়া করমচা, কামরাঙা, আমড়ার চাটনি ছিল — এমনসব ফল, ডালেও যায়, টকেও ব্যবহার হয়। অতিথি এলে তৈরি হতো টমেটোর চাটনি, খেজুর, কিশমিশ দিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতকালের একটি রান্না মনে পড়ে — সরপড়া পাবদা মাছ। পাবদা মাছের ঝোল ছড়ানো বাসনে বেশিক্ষণ রেখে দিলে ঠাণ্ডায় তার ওপরে সর পড়ে যায়। ঝোল গাঢ় হয়। গরম ভাতের সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘন ঝোল আর পাবদা মাছ অতি উপাদেয়। এসব রান্না এখনো নিশ্চয়ই আছে, আমার স্মৃতিতে স্বাদে লোভনীয়, দৃশ্যে শোভনীয়। তাই বিশেষ করে লেখা।

কোনো শাকাহারি অতিথি এলে মা বানাতেন 'ধোঁকার' ডালনা। 'ধোঁকা' কারণ মাংসের টুকরোর মতো দেখতে, কিন্তু ডাল দিয়ে তৈরি, ধোঁকাই বটে।[২] সম্ভবত ছোলার ডাল ভিজিয়ে, শুকনো করে বেটে, তাকে একটু কড়াইতে সেঁকে, তারপর ভাপে সেদ্ধ করা। চৌকোনো কেটে এই ডালনাতে মাংসের মতোই পেঁয়াজ এবং অন্য মসলা পড়ত, এবং পাঁঠার মাংস রাঁধার মতোই সময়সাপেক্ষ ছিল। এছাড়া মা বানাতেন ঘুগনি। একজাতীয় শুকনো শিমের বীচি ভিজিয়ে, ভাজা নারকেলের টুকরো আর জাদুকরী মসলা মিশিয়ে অপূর্ব স্বাদের কিছু বানাতেন — লুচির সঙ্গে খাওয়া হতো। এসব ছিল গেণ্ডারিয়ার আমদানি।

চপ, কাটলেট, পোলাও মধ্যবিত্ত পরিবারে ক্বচিৎ, কদাচিৎ হতো। বাইরে থেকে কেউ এলে মা 'চপ' বানাতেন। সেদ্ধ আলুতে কিমার পুর দিয়ে গোলাকার চপ, ডিমের গোলায় ডুবিয়ে, পাউরুটির গুঁড়োতে এপিঠ-ওপিঠ করে ভাজা। পাউরুটির গুঁড়ো বাড়িতেই বানাতে হতো। দারুণ ছিল তার স্বাদ, ভাবতাম, ইস কে কবে আসবেন, একটু 'চপ' খাব। হয়তো তেমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। কিন্তু ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের মায়ের হাতের স্বাদ সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে কাছের।

পোলাও, মাংস ঘন ঘন তৈরি হতো না বলে কোনো দুঃখ ছিল না। আমরা সেদ্ধ চালের ভাত খেতাম, তাতেই ছিল স্বাদ আর ভাত তো কত রকমের হয়, জাউভাত, পান্তাভাত, সেদ্ধভাত, যাকে আমার এক গুজরাটি বন্ধু বলেন shadow rice, সঙ্গে পোস্ত বড়া বা রাঁধুনি সম্ভারের পাতলা মসুর ডাল; সর্বোপরি ডাল-চাল মিশিয়ে গরম গরম খিচুড়ি, সঙ্গে কুড়কুড়ে আলুভাজা, বেগুনভাজা, সুগন্ধি গাওয়া ঘি। গভীর বর্ষা, শীতের কনকনে ঠাণ্ডা, খিচুড়ি হলো সেরা খাবার; আঙুল ডোবানো মুস্কিল এত গরম, ধীরে ধীরে রইয়ে-সইয়ে খাওয়া। খিচুড়ি চিরন্তন; পান্তাভাত, জাউভাত, তার আনুষঙ্গিক সবকিছুই এখন স্মৃতি। মা-বাবার সঙ্গে একটি জীবনধারা চলে গিয়েছে, আমি অন্তত তাকে ধরে রাখতে পারিনি।

লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হলো — সবকিছুই কি ভালো লাগত? বাড়িতে এমন কিছু কি রান্না হতো না, যা অপছন্দ করতাম? ছিল, তবে ছোটবেলা থেকে নিমপাতা ভাজা খেয়ে তারও একটা স্বাদ এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল। কচু নানা রকমের, কোনোটাই ভালোবাসতাম না, বাড়িতে নিয়ম অনুযায়ী যা রান্না হতো, সব খেতে হতো। হয়তো তাই, অপছন্দের জিনিস, এক শুঁটকি মাছ ছাড়া, কিছু মনে পড়ে না। আদর-যত্নের মাঝে বড় হয়েছি, জীবন ছিল ভালো লাগার, ভালোবাসার।

নিরামিষ ঘর আলাদা করে না থাকলেও পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া সুস্বাদু নানা প্রকারের নিরামিষ ব্যঞ্জন রোজকার পরিবেশনের অঙ্গ ছিল। হিন্দু বিধবার শখ-আহ্লাদ করার উপায় ছিল না। নিরাভরণ সাদা ধুতিতে তাঁরা জপ, আহ্নিক, পুজো নিয়ে দিন কাটাতেন। এক রান্নাঘরে তাঁদের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল নিজের সৃজনশক্তি, নিপুণতা প্রকাশ করবার। তাই হয়তো আমাদের নিরামিষ রান্নাতে এত বৈচিত্র্য। ভাজা, সুক্তো, সেদ্ধ, পোড়া, ঘণ্ট, চচ্চড়ি, ডালনা, ছেঁচকি — আরো কত কী থাকত দুবেলার রান্নায়। গরমে লাউ ঠাণ্ডা, চৈত্রমাসে নিমপাতা রোগ থেকে বাঁচায়, এই সবও চিন্তা করা হতো। কিছুই ফেলা হতো না — আলু, পটোল, লাউর খোসা ভাজা, কাঁঠালের বীচি পোড়া, সুক্তোয় বা মুগডালে একটু কচি শিউলি পাতা — প্রত্যেকটির আলাদা স্বাদ, আলাদা উপকার। মৌসুমি ফুলের মতো মৌসুমি তরকারি। বিভিন্ন ঋতুতে পেতাম বিভিন্ন তরকারি; উচ্ছে, কাঁকুড়, কপি, থোড়, মোচা, কাঁঠাল, কুমড়ো, ছাদ অবধি বেয়ে যাওয়া লতার ডগায় চালকুমড়ো — লিখে শেষ করা যায় না। রকমারি শাক — পুঁইশাক, লালশাক, হেলেঞ্চা, ডাঁটাশাক, পালংশাক, আবার লাউশাক, কুমড়োশাক; নানা রকমের ডাঁটা — সজনে ডাঁটা, লাউ-কুমড়োর ডাঁটা, একেক ডাঁটা রান্নার আলাদা আলাদা পদ্ধতি। মরিচ ঝোলে একটু কালিজিরা, কাঁচা লঙ্কা, সজনে ডাঁটা বা ফুলে শর্ষে বাটা — সবকিছুতেই বৈচিত্র্য। মনে পড়ে বকফুল ভাজা। বকের মতো ধবধবে সাদা বকফুল — ঢাকার পর কখনো দেখিনি। জানি না এখনো পাওয়া যায় কিনা। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ বহু জিনিস বাজারে আসে না — চাহিদা নেই। গুজরাটে ছিল বর্ষাডোরির ফুল — সুস্বাদু ফুল, গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের বর্ষার তরকারি। নতুন প্রজন্মের কেউ এর নামও জানে না, পাওয়া যায় না। কুমড়ো ফুল ভাজা ছিল আমার প্রিয়। একটি ফুলের ভেতর আরেকটি ফুল ভরে তাকে ত্রিকোণ করে, বেসন বা চালের গুঁড়ো মাখিয়ে ভাজা। কল্পনাশক্তি অবাক করে দেয়। এই ভাজার প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমাদের বংশানুক্রমে, কিছুদিন আগে Boston-এর কাছে কোনো Farmers' Market থেকে বাজার করে এনে আমার কন্যা অতি উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'মা, মা, কুমড়ো ফুল এনেছি, ভাজা খাব!' প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার নিরামিষ ঘরের দুটি রান্না সচরাচর দেখি না, মনে হয় ঢাকার নিজস্ব। 'চালের বেনুন' — নানা রকমের সবজি দিয়ে মুড়িঘন্টের নিরামিষ রূপ, আর 'শিমের বীচির ডালনা'। ঘুগনি থেকে ভিন্ন জাতের শুকনো শিমের বীচি ভিজিয়ে খোসা ছাড়িয়ে বেগুন দিয়ে ডালনা। বেশ ঘি, মসলা, তেল দেওয়া এই ডালনাতে মৌরি বাটা দিতে হয়, তাই এর স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। পেঁয়াজ, রসুন ছাড়া নিরামিষ ঘরের রান্না অনন্য। আমিষ, নিরামিষ দু-ঘরেই রান্নার মাধ্যম ছিল শর্ষের তেল; লুচি, নিমকি ইত্যাদির জন্য শুদ্ধ ঘি। কোলেস্টেরলের ভয় তখনো ঢোকেনি, সাদা তেলের নাম কেউ শোনেনি। হঠাৎ এক সময়, বোধহয় যুদ্ধের সময়, বাজারে এলো 'দালদা' বা 'ডালডা', হলুদ রঙের টিনে শ্যাওলা সবুজ অক্ষরে লেখা 'ডালডা'। ঘিয়ের মতো ব্যবহার করা যায় তবে অনেক সস্তা। মা ভীতু মানুষ, হলুদ মাখা মিলের শাড়ি পরে জীবন কাটাবেন কিন্তু সস্তা বলে নতুন জিনিস তাঁর রান্নাঘরে ঢোকাবেন না। 'দালদা' আমাদের বাড়িতে ঢুকল না। এখন ট্রান্স ফ্যাট নিয়ে পড়ে মনে হয় মাঝে মাঝে ভীতি থাকা লাভজনক।

কুটনো কাটা, মশলা বাটা, সবই নিপুণভাবে করা হতো। কোন তরকারি ডুমো ডুমো, কোনটা কুচি বা বড় আকারে, কোন রান্নার জন্য কী মসলা বাটা হবে তা ঠিক ছিল, নিয়মভঙ্গ করা যেত না। শিলনোড়াতে মসলা বাটা, কোরানোর বঁটিতে নারকেল কোরানো, বঁটিতে কুটনো কাটা, সবকিছুতেই দক্ষতার প্রয়োজন। উত্তর ভারতে প্রথম দেখলাম গুঁড়ো মসলা, শুকনো নারকেল, ছুরির ব্যবহার, যেন রান্নাঘরের সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছে — আজো রপ্ত হয়নি। দিনে কী রান্না হবে ঠিক হতেই বিরাট কাজ ছিল মসলা বাটা। শর্ষে কি পোস্ত? নাকি দুই-ই, ধনে-জিরে বা শুধু ধনে, হলুদ বেশি করে, আদাও তো নিশ্চয়ই, পেঁয়াজের কী প্রয়োজন? মাছে সবসময় পেঁয়াজ দেওয়া হতো না। পেঁয়াজকলি থাকলে কখনো বাটা পেঁয়াজ নয়। মিহি করে মসলা বেটে কাঠের বা পাথরের থালায় আলাদা করে রাখা হতো। নানা প্রস্তুতির পর রান্না শুরু। রোজকার রান্নাও এলাহি ব্যাপার — সুন্দর, গুছিয়ে। মনোযোগ দিয়ে, সুচারুরূপে গড়া।

পরিবেশন করার একটা নিয়ম ছিল; যেমন-তেমন করে দেওয়া যেত না, যেমন খুশি খাওয়াও যেত না। নুন, লঙ্কা, লেবু পাতে থাকত, ভাত বাড়ার পর এক এক করে দেওয়া হতো নিমপাতা বা উচ্ছে ভাজা জাতীয় তেতো কিছু। এরপর সেদ্ধ, যেমন আলু বা কুমড়ো, ডাল, শাক, শুকনো তরকারি, ডালনা বা ঝোলসমেত তরকারি, ছোট মাছ, বড় মাছ — শর্ষে বাটা বা পোস্ত বাটা থাকলে তার নির্দিষ্ট স্থান, এরপর ডিম ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাংস। রোজ তো সব থাকত না, তবে নিয়ম ছিল এই। এ-ও একটি 'কলা', যেন তুলি দিয়ে একের পর এক রং পড়ছে ক্যানভাসে। মা-মাসিরা পরিবেশন করে খেতে বসতেন। আমরা বড় হয়ে বারবার মাকে বলতাম, 'মা, তুমি বসে পড়ো না আমাদের সঙ্গে'; মায়ের কথা কানে বাজে, 'দাঁড়া, একটু দিয়ে নিই।' এটা সব মায়ের মনের কথা, 'সবুর কর, আগে একটু তোদের যত্ন করে নিই।'

অসুখবিসুখ না হলে আপেল আনা হতো না। সেই কবেকার, কোথাকার আপেল, স্বাদও পেতাম না। জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম্বুরা, গরমে শরবতের জন্য বেল, চাটনির জন্য কদবেল, সারাবছর কিছু না কিছুর অপেক্ষায় থাকতাম। পেয়ারা ডাঁসা না পাকা, কোনটা নেব, সেও তো সমস্যা। কালো জামে বেশি স্বাদ আনার জন্য একটা খেলা ছিল, খুব আঁট করে বন্ধ করা বাসনে কালো জামে নুন ছিটিয়ে খুব ঝাঁকাতাম। ছাল উঠে যাওয়ার ফলে নুন কালো জামের ভেতরে ঢুকে যেত আর একটি অপূর্ব রং ও স্বাদ এনে দিত। সবুজ জামরুল ছিল আমার প্রিয় — এর স্বচ্ছ সবুজ রঙের আলাদা আকর্ষণ ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সব ফল ভালো, কিন্তু বসে থাকতাম আমের মৌসুমের জন্য। ফজলি, ল্যাংড়া, হিমসাগর — আরো কত কি। আম কাটা ছিল বাবার কাজ, তিনি আমের রসিক ছিলেন, ভাস্করের মতো নিপুণভাবে ছুরির আঘাতে কেটে আমকে অন্য রূপে রূপসী বানাতেন। আমাদের ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হতো।

আম বা আমসত্ত্ব নয়, আমের রস ছিল অনেকের পছন্দ। রসে মুড়ি মেখে বা দুধ মিশিয়ে খাবার চল ছিল অনেক বাড়িতে। মন্মথকাকা আমের রস ছানায় মিশিয়ে উপভোগ করতেন। এর জন্য ওঁকে অনেক ঠাট্টা শুনতে হয়েছে। ছানা আমের সংযোগ যদি অবাক করে, গুজরাটে আম খাবার রীতি আরো অবাক করার। আমের রসই বেশি পছন্দ, খাওয়া হয় প্রচুর ঘি মাখানো রুটি দিয়ে। আমার শাশুড়ি মা আক্ষেপ করতেন আমি এর বেশি এগোই না, ওঁর সময় রসের বাটির সঙ্গে একটি ছোট বাটিতে ঘি থাকত, থালায় একটু শুকনো আদার গুঁড়ো। শুনেছি সবকিছুর মিশ্রণে স্বাদ অপূর্ব — আমি অতদূর যাইনি। তবে বলতে হবে, রুটি দিয়ে আমরস খেতে বেশ ভালো লাগে।

আমাদের সব বাড়িতে রুপার ব্যবহার ছিল না বলতে হয় — রোজকার সংসারে একেবারেই নয়। পুজোর আসনে সম্ভব হলে রুপার মূর্তি বা প্রসাদের থালা রাখতেন কেউ, তবে মূর্তি পঞ্চধাতুর হলে বেশি শুভ মনে করা হতো, আর পাথর বিশেষ করে শ্বেতপাথর বেশি পবিত্র। বিয়েতে জামাইকে নকশা করা রুপার পানের কৌটা দেওয়া হতো, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েকে রুপার সিঁদুরদানি। আমার মায়ের সিঁদুরদানিটি একটি ময়ূর, যার পেখম খুললে সিঁদুর কৌটা বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সিঁদুর পরার কাঠি ও তা রাখার খাপ। সদ্যোজাত শিশুকে নিকটাত্মীয়রা দিতেন রুপার ঝিনুক, ঝুমঝুমি বা কাজল লতা, অন্নপ্রাশনে অবস্থাপন্ন মামাবাড়ি হলে আসত রুপার থালা, বাটি, গ্লাস। এর বেশি কিছু দেখিনি।

ঐতিহ্য ছিল কাঁসার বাসনে। নানা রকমের, নানা মাপের থালা, ফুল কাটা, নকশি কাটা, গোল ছাপ দিয়ে ডিজাইন করা, আবার একেবারেই সাদামাটা। বিয়ের থালার ওজন ও মাপ দেখে মনে হয় শুভ দিন ছাড়া এগুলো ব্যবহার করার কথা কেউ ভাবেননি। বাবার থালাটির দৈর্ঘ্য দেখছি ২৪" আর মায়েরটি একটু ছোট, ১৮"। ওজন এত যে তোলা ভার। এছাড়া যৌথ সংসারে জনাকুড়ির জন্য রান্না করা যায় সে মাপের হাঁড়ি, কড়াই, মানানসই খুন্তি, হাতা এবং জলের জাগ। বিয়ের যৌতুকের গ্লাসে ঢাকনা থাকত, আর নানা মাপের বাটি — জামাইকে বিয়ের রাতে প্রথমবার খাওয়াবার সরঞ্জাম। সব এখন ঘর সাজানোর জিনিস।

রোজকার ব্যবহারের বাসন একটু হালকা, ওজনে, সৌন্দর্যে নয়। খাবার পরিবেশন করার নানাবিধ বাটি, রেকাবি, জামবাটি, উঁচু কার্নিশ দেওয়া গোল থালা; ডাল, ডালনা, শুকনো তরকারি, মাছের ঝোল — সব কিছুর জন্য উপযুক্ত আকারের বাসন। রান্নাঘরের তাকে বা খাবার টেবিলে এর শোভা ছিল আলাদা। আমার নিজের প্রিয় জিনিস ঠিক বাসন নয়, তবে দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী। একটি হচ্ছে মায়ের পেতলের পানের বাটা, বাইরে ডায়মন্ড কাটা ডিজাইন, ভেতরে চুন, সুপারি, খয়ের রাখার ছোট ছোট খুপরি, ঘরের মতো। এর একটি নিচতলা আছে, তাতে থাকে পান। দ্বিতীয়, যা আজো ব্যবহার করি, তা হচ্ছে ফুলের সাজি; গোল, ডায়মন্ড কেটে নকশা ও হাতল। হাতলে দুদিকে দুটি ছোট বাটি, সিঁদুর, চন্দনের জন্য। শিউলি হোক বা জবা, পদ্ম কি সাধারণ গাঁদা — সবার সৌন্দর্য বেড়ে যায় এই সাজিতে।

ভিন্ন জাতের বাসন আসত তীর্থযাত্রা থেকে। বাড়ির বয়স্করা বিশেষ করে বিধবারা, একবার অন্তত তীর্থযাত্রায় যাওয়ার সংকল্প করতেন, সম্ভব হলে যেতেন — কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন। কাশীর বাসন প্রসিদ্ধ, সেখান থেকে আনতেন নিকটাত্মীয়দের জন্য তামা বা পেতলের ঘটি, শিব-পার্বতী বা অন্য দেবদেবীর ছবি খোদাই করা, ছোট, মাঝারি থালা। ঘটি নানাবিধ; গঙ্গা, যমুনা, অর্থাৎ পেতলের মাঝে কিছুটা তামা, শুধু তামার বা শুধু পেতলের। ঘটি বা কলসে থাকত অপূর্ব কারুকার্য, *রামায়ণ-মহাভারত* থেকে কোনো দৃশ্য বা শিব-পার্বতীর কোনো কাহিনি। হাতে ঠুকঠুক করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে এত সুষ্ঠুভাবে করা হতো জানি না। সবই পারস্পরিক কলা, কত পুরনো কে জানে। বাসন ছিল গৃহিণীর গর্ব।

মাসিমা (মায়ের মেজদিদি) ছড়া বলতেন

'সত্যযুগে ছিলেন হরি
ত্রেতাযুগে রাম
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ
আর কলিতে গৌরাঙ্গ।'

এর সঙ্গে মাসিমার মন্তব্য

'সত্যযুগে মানুষ সোনার থালায় খাইত,
সোনার থালা ফ্যালাইয়া দিত।
ত্রেতাযুগে মানুষ রুপার থালায় খাইত
রুপার থালা ফ্যালাইয়া দিত।
দ্বাপরে তামার থালায় খায়
সেই থালা ফ্যালাইয়া দেয়।

আর কলিতে মানুষ মাটির থালায় খায়, আবার মাটির থালা তুইলা রাখে! আজকাল দ্যাখস না চিনামাটির বাসনে খায় আর সেগুলা যত্ন কইরা তুইলা রাখে।'

AMARBOI.COM

আমাদের চিনামাটির থালার ব্যবহার ছিল না, তবে সে রকম কোনো অতিথি এলে সাদা চারটি চিনেমাটির প্লেট বের হতো এবং সত্যিই তা সযত্নে তুলে রাখা হতো।

বৈধব্যের পর আতিশয্য শোভা পায় না — তাঁদের বাসন বেশিরভাগ হতো পাথরের; কালো বা সাদা সাধারণ পাথরের থালা, বাটি, গ্লাস। থালার দৈর্ঘ্য ছোট — যেন কোনোমতে খেয়ে নেওয়া।

দিদিমার কালো পাথরের উঁচু কানার ছোট থালাটি আমি নানা জাতের হালকা রঙের কড়ি দিয়ে সাজিয়েছি। দিদিমা দেখলে খুশি হতেন। কাঁসা থাকত না তা নয়, তবে কম। আসল কথা, হিন্দু বিধবার নিরামিষ ঘরে আমিষ ঘরের শোভা-সৌন্দর্যের জায়গা নেই। নিরাভরণ বিধবার মতো নিরাভরণ ছিল নিরামিষ ঘর — এঁদের রান্নার সামগ্রী, উপকরণ — সবই ছিল সীমিত। সেই একবেলাই তো রান্না। এঁরা নিজেদের ভাগ্য বা হতভাগ্য মেনে নিয়েছিলেন, প্রতিবাদ আসতে বহু বছর লেগেছে।

শুনেছি ঢাকার যোগেশ দাস মহাশয়ের বাড়িতে পাথরের বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল হাঁড়ি, থালা ছিল; পরিবারের অনেক বিধবা একসঙ্গে দীর্ঘকালের জন্য তীর্থযাত্রায় যেতেন, সঙ্গে থাকত তাঁদের রান্না-খাওয়ার সামগ্রী, সবই ভারী পাথরের। অভিজাত ঘরে নিরামিষ ঘরের বাসনে আভিজাত্য থাকবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, তবে আমি ভাবি স্টেশনের কুলিদের কথা। এই ভারী ভারী পাথরভরা ট্রাঙ্ক না জানি কীভাবে তারা ট্রেনে উঠাত-নামাত।[৪]

'যতটুকু মনে পড়ে' লিখতে বসেছি, কাটছাঁট করার ইচ্ছে নেই, উপায় নেই; কষ্ট হলেও লিখতে হয়। আরেক রকমের বাসন দেখেছি কোনো কোনো দোকানে, বোধহয় গেণ্ডারিয়াতে। সঠিক জানি না, মনে হয় টিনের বাসন, তাতে সাদা, নীল কালাই, ওজনে হালকা। কিনারা থাকত গাঢ় নীলের। আমাদের কোনো বাড়িতে কালাইর বাসন থাকত না, কানাঘুষো শুনেছি, 'রাম রাম, কালাইর বাসন, আমাগো বাড়িতে ঢোকে না। মুসলমান বাড়িতে ওইগুলা ব্যবহার হয়।' ছোট ছিলাম, এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিনি, এটুকু বুঝতাম এর ভেতরে আরো কিছু আছে — বাসনের তো ধর্ম থাকে না। শুধুই মুসলমান বাড়িতে ব্যবহার হয়, এ কথা একেবারেই অসত্য। আমাদের ৩২ নম্বর পুরানা পল্টনের বাড়ির পেছনে এক কোণে একটি কুঁড়েঘরে এক দুস্থ বিধবা মহিলা থাকতেন, তাঁর বাসনও কালাইর ছিল। বাসন তো ঠিক ধর্ম অনুপাতে চলে না, অর্থ-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। গরিব হিন্দু, গরিব মুসলমান সস্তা জিনিস ছাড়া কিছুতে নজর ফেরাতে পারে না, তাদের জীবন নির্বাহের সামগ্রীর একই লক্ষ্য, সস্তা কোন জিনিসটা। 'জাত' পাগল, 'ধর্ম' পাগল, 'অর্থ' পাগল সমাজ এসব ভেবে দেখে না, একটা অতি অনাবশ্যক, অনিষ্টকর, মনগড়া বিধান দিয়ে, সমাজে পাঁচিল খাড়া করে।[৫] তাই বলেছি, লিখতে মনোকষ্ট হয়।

রোজকার সংসার, রান্নাবান্না নিয়ে এতটা লিখলাম, কোথায় সেই উপাদেয় খাদ্য তৈরি হতো সে সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার। গৃহিণী বা বাড়ির মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি বিরাট অংশ কাটত রান্না দালানে। বড় হোক, ছোট হোক বাড়ি তৈরির সময় এই দালানের আলো-হাওয়ার ওপর নজর দেওয়া হতো। লাগোয়া হলেও এদিকটা তৈরি হতো বাড়ির থেকে কোনা করে অর্থাৎ এল শেপ দিয়ে, উঠোন আর বাড়ির সীমার বেড়ার মাঝে। দুদিকই খোলা। দালানে তিন-চারটে ঘর, রান্নারটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড়। ভাঁড়ার ঘর আলাদা বা একই সঙ্গে, কাঠ ও কয়লা রাখার গুদামঘর আর একচিলতে একটি খুপরি — গুল, ঘুঁটে, কাঠ-কয়লার জন্য। বর্ষার প্রকোপ থেকে সবকিছুই রক্ষা করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো দালান জুড়ে লম্বা সরু বারান্দা, এ বারান্দা থেকে প্রত্যেকটি ঘরে আলাদা করে যাওয়ার দরজা, আবার ভেতরেও দরজা এক ঘর থেকে অন্যটিতে যাওয়ার।

সবকটি ঘরেই জানলা থাকত — খুপরিও অন্ধকূপ ছিল না; যতটা সম্ভব জানলা-দরজা মুখোমুখি রাখা হতো, যাতে হাওয়া চলাচল করে। ৫নং বাড়িতে বাইরের দিকে দুটি জানলা, আবার ভেতর দেয়ালেও দুটি; উনুনের আঁচের গরমে বাইরের হাওয়ার সোয়াস্তি পাওয়া যেত। আলোও যথেষ্ট আসত।

স্যাঁতসেঁতে ভাব, সাপখোপ, ব্যাঙ ইত্যাদি থেকে বাঁচতে বাস করার দালানের উচ্চতা থাকত বেশি। বেশ কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো বাড়ির সামনের বারান্দায়। আজকালকার বাড়িতে যেমন সোজা ঘরে ঢোকা হয়, তেমন ছিল না আমাদের সময়। বারান্দাহীন বাড়ি মনে পড়ে না, এটা পেরিয়ে বসবার ঘর ইত্যাদি।

রান্না দালানের উচ্চতা এতটা নয়, আসল বাড়ি থেকে কয়েক ধাপ নিচু, উঠোন থেকে এক সিঁড়ির বেশি উঁচু নয়। সিঁড়ি অল্প হলে কুয়ো থেকে তোলা বালতি বালতি জল, কলসভরা খাবার জল, কাঠ, কয়লার বস্তা, সবই তুলতে সুবিধে হয়। মনে হয় নগণ্য, কিন্তু এসব হচ্ছে 'পাকের ঘরের' অন্যতম ব্যবস্থা — নানা চিন্তা করে এই দালান বানানো হতো।

রান্নাঘরের ভেতরের আয়োজন সাধারণ হলেও ভেবেচিন্তে করা হতো; এক কোণে থাকত দুটি মাটিতে গাঁথা উনুন — ৫নং-এর দুটি ছিল নিচু, বসে রান্না করবার। ওপরে জানলা ছিল। উঁচু উনুন দেখেছি কখনো, সাহেবি বাড়িতে এই উনুনেই 'কেক' ইত্যাদি বানানোর ব্যবস্থা থাকত। বড় রান্না এতে হতো। এছাড়া থাকত তোলা উনুন — অন্তত দুটি, মা পিঁড়িতে বসে ছোট তোলা উনুনে রান্না করতে পছন্দ করতেন। যতীনদা উনুন ধরিয়ে দিতেন, মাকে দেখেছি অনেক সময় তালপাতার হাতপাখা দিয়ে আগুনকে কিঞ্চিৎ সতেজ করতে। এতেও সময় যেত। রোজকার ব্যবহারের বাসন, ভাতের হাঁড়ি, সসপ্যান, কড়াই ইত্যাদি রাখা থাকত বেশ উঁচুতে লম্বা প্রশস্ত তাক-এ। এছাড়া দেয়ালের ভেতরে বসানো জালি দেওয়া আলমারিতে চাল, ডাল, মসলা থাকত, হয়তোবা থালা, বাটি, গ্লাস। বাইরে বারান্দায়, রান্নাঘরের ভেতর কলসি কলসি জল, কোনোটাতে রান্নার, শাক-সবজি ধোবার জল, কোনোটাতে ফুটানো খাবার জল, গৃহিণীকে নানা হিসেব রাখতে হয়। এক কোণে ইঞ্চি-দুয়েক নিচু চৌকোনো জায়গা, যেখান থেকে নালা দিয়ে বাইরে জল চলে যায়।

রান্নাঘরে ছড়ানো বা সাজানো থাকত কিছু পিঁড়ি, নানা ধাঁচের, নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাপের ডালা, কুলো, বেলুন-চাকি, বঁটি, সর্বোপরি শিলনোড়া। রান্নার বাসনের নিয়ম কড়া, লোহার কড়াইতে রান্না, আলাদা অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে দুধ গরম। সসপ্যানে দুধ কেন গরম হতো না জানি না। ভাতের হাঁড়ি অন্য ধরনের, আধুনিক স্থাপত্যশিল্পে জায়গা পায়। ছোট গোলাকার ভিত্তি দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে গোলাকারের বৃত্ত বাড়ে যেন বেলুন ফুলে উঠছে, বৃত্ত ঠিক মাপের হলে ধীরে ধীরে গোলাকার ছোট হয়ে ভাতের ফেন গালার 'গলা'র মাপ হয়ে যায়। ওপরে ঢাকনি। তখন তো মেশিন ছিল না, পিটিয়ে এই আকার দেওয়া স্থাপত্যকলাই বটে।

মা-মাসিরা কত সহজে কাপড় দিয়ে দুদিক ধরে, ঢাকনি একটু খুলে ফেন বের করে দিতেন, মনে হতো এ আর এমন কী কাজ। আসলে কিন্তু মোটেই সহজ নয়। ভাত রান্নার কথায় মনে পড়ল, ছোটবেলায় মাকে সাহায্য করতে মাঝে মাঝে রান্নাঘরে যেতাম। একদিন বান্ধবী কৃষ্ণা রন্ধনরত তার ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলল, 'চিন্তা করো না, আমি ভাত রেঁধে দিচ্ছি।' একটু ভেবে বলল, 'ভাতটা হলো কিনা কী করে বুঝব? কী দিয়ে টিপি — সাঁড়াশি দিয়ে না চিমটা দিয়ে?' আমাদের রান্নার দৌড় এ পর্যন্ত, বাকি তো পুতুলখেলা!

রান্নাঘরে আসবাবপত্র বিশেষ থাকত না, তবে খাবার ঘরের 'হোয়াট নট'-এর মতো একটি 'মিটসেফ' রাখতেই হতো। নামটা বোধহয় ইংরেজি 'মিট সেফ' থেকে এসেছে, যেখানে মাংস ভালো থাকবে। তিনদিকে জালি দেওয়া ছোটখাটো এই আলমারি, মনে হয় প্রত্যেক রান্নাঘরে দেখেছি। মাংস রাখা হতো না, রোজ মাংস রান্নাও তো হতো না। কোনো সময় হলুদ-নুন মাখা মাছ রাখা হতো, বেশিরভাগ সময় থাকত বাটা মশলা, দুধ, রাঁধা তরকারি জাতীয় কিছু। তাও বেশিক্ষণের জন্য নয় — সবকিছু তো তাজা বানানো হতো। মিটসেফ ছিল পোকামাকড়, ধুলো থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা, বেড়ালেরও সময় লাগত ভেতর থেকে মাছ নিয়ে পালাতে। বেড়াল-ইঁদুরের উপদ্রব সর্বত্র, কোনো কোনো বাড়িতে তাই শিকে বাঁধা হতো। রান্নাঘরে কেউ না থাকলে বাইরে থেকে শেকল লাগাতে হতো, মাছের সুগন্ধ পেতে বেড়ালের সময় লাগে না। কালীঘাটের পটে দেখেছিলাম — বেড়াল মাছ দাঁতে চেপে পালাচ্ছে, চোখ খুশি ও দুষ্টুমিতে ভরা। এ দৃশ্য অজানা ছিল না আমাদের।

বিয়ের পর সংসার করতে গিয়ে দেখি, ঠাণ্ডা মেশিন আছে, নানাবিধ আলমারি আছে, মিটসেফের প্রয়োজন নেই। কেমন খালি খালি লাগল। শ্বশুরবাড়ির গ্রামের বাড়ি গিয়ে দেখি নাম অন্য হলেও মিটসেফ ঠিক বিরাজ করছে। ছাপ্পান্ন বছর হলো, জালি দেওয়া বেড়াল তাড়ানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলমারিটি বহাল তবিয়তে আজো গ্রামের বাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৬]

নামেই রান্নাঘর — এর মহিমা ছিল অনেক বেশি। যৌথ সংসারের মহিলারা, বাপের বাড়ি আসা বিবাহিত মেয়েরা, বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি না পাওয়া অভিমানরত বধূমাতারা, সবার একত্রে সুখে-দুঃখে, হাসি-ঠাট্টা করার জায়গা ছিল রান্নাঘর। ছোট বাচ্চারা খেলা করত এখানে, নয়তো বাইরের বারান্দায়। ছোটদের বায়না, কান্নাকাটি, ঝগড়া সবই রান্না দালানে। স্কুল-কলেজ যাওয়ার আগে ছেলেমেয়েরা গরম গরম মাছ-ভাত খেয়ে যাবে, তাও এখানে। সন্ধ্যেবেলা মায়ের কাছে পড়াশোনা করতে হবে, বসে যাও রান্নাঘরের পিঁড়িতে। গরম গরম লুচি খেতে ইচ্ছে হয়, যাও রান্নাঘরে, দু আঙুলের মাঝে লুচি দোলাতে দোলাতে পালিয়ে যাও; খাস্তা গজা, জিবে গজা, এলোঝেলো, কুচো নিমকি ভাজা হচ্ছে — রান্নাঘরে আবদার করলে পাওয়া যায়। এখানকার বকুনি অন্য ধাঁচের, 'দ্যাখো মাইয়ার কাজ।' অন্দরমহলের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, রান্নাঘরকে ঘরসংসারের মধ্যমণি বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

তথ্যসূত্র

১. বসু, পৃ. ১১।
২. গুজরাটি 'ঢোকলা' থেকে কথাটা আসতে পারে। একই প্রণালিতে বানানো হয়, তবে এ দিয়ে ডালনা বানানো হয় না। 'ধোঁকা' দেওয়া থেকে এসেছে, বোধহয় বেশি যুক্তিযুক্ত।
৩. গুজরাটিতে এই বীচিকে 'ভাল্' বলে। বাংলায় বোধহয় একাধিক সবজিকে আমরা 'শিম' বলি।
৪. কথোপকথন, মো. শামসুর রহমান। রূপনারায়ণ হাউসের জিনিসপত্রের নিলামের দিন উনি উপস্থিত ছিলেন।
৫. নিউইয়র্কে 'মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট'-এ লাল-সাদা, নীল-সাদা কালাইর কফি কাপ আধুনিক ডিজাইনের ছাপ নিয়ে চড়া দামে বিক্রি হয়।
৬. আমার রবীন্দ্রসংগীতের গুরু শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের আত্মকথা, পৃ. ২। ময়মনসিংহে বাহাম গ্রামের বাড়িতে 'মিটসেফ' না থাকায় মিষ্টির হাঁড়ি সরানো কত সহজ ছিল সে কথা তাঁদের দুষ্টুমির ফর্দে দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধ

কোনো মেকি সমস্যা সামনে এলে একটু হেসে বাবা বলতেন, 'বুঝলি, জীবনে বাঁচতে হলে এসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়।' জীবনে বাঁচতে হলে অসুখ-বিসুখের মতো সত্যিকারের সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়, ডাক্তার-বদ্যির প্রয়োজন হয়।

ম্যালেরিয়া, জল থেকে নানা রোগ আসত, যেমন আজো আসে। ধুলো-মাটি, বৃষ্টি-জলে ভিজে খেলা করে ছোটদের সর্দি-জ্বরে ভুগে ওঠা, স্বাভাবিকভাবে বড় হবার অঙ্গ। যানবাহনের অসুবিধা ছিল, এপাড়া-ওপাড়া যাওয়াতে সময় নিত, সব পাড়াতেই অন্তত একজন করে ডাক্তার থাকতেন। আমাদের কাছাকাছি যিনি ছিলেন, তাঁর ডাক্তারি ডিপ্লোমা থাকলেও মনোযোগ ব্যবসায়ে বেশি ছিল, কেউ তাঁকে চিকিৎসার জন্যে ডেকেছেন বলে মনে হয় না। শোনা যেত যে, যুদ্ধের বাজারে সৈন্যদের খাবার সরবরাহ করে তিনি প্রচুর টাকা করছিলেন। পরিমলকাকা মুচকি হেসে বলতেন, কারো প্রশ্নের জবাবে ডাক্তারমশাই বলেছিলেন, 'কুটিপতি হই নাই, স্যার।' মানুষটি সরল ও মিশুকে ছিলেন, এঁদের পরিবারের সঙ্গে ঢাকা ছাড়বার পরও বহুকাল আমাদের যোগাযোগ ছিল।

পাড়ার অন্য ডাক্তার ছিলেন এক বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথ। এঁকে সাদা গুলি দিতে কখনো দেখিনি, তবে প্রায় সব ব্যাধিতেই দিতেন, সম্ভবত তাঁর নিজের বানানো 'বহরের ননী'। এই ননীর দুর্গন্ধে যে কোনো অসুখের বীজাণু পালাবার পথ খুঁজবে। আমরাও পালাবার পথ খুঁজতাম, যখন উনি, বার্ধক্যের কারণে ভাঙা ভাঙা গলায় বলতেন, 'ভয়ের কিছু নেই, একটু বহরের ননী লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে।' আসল ভয় যে 'ননী'তে তা কী করে বোঝাই। অবাক লাগে যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরানা পল্টনের মতো অবস্থাপন্ন পাড়ায় কোনো ডাক্তার ছিলেন না। দূর থেকে তাঁদের আসতে হতো।

আমাদের ডাক্তারবাবু ছিলেন শৈলেন বাবু, ড. শৈলেন সেন ওয়ারী থেকে আসতেন। লম্বা, শান্ত চেহারা, যত্ন নিয়ে আমাদের পরীক্ষা করতেন। উনি স্থির হলে হবে কি, এ রোগীর স্বভাব শান্ত ছিল না; উনি যখন আমার কান ফুটো করতে এসেছিলেন, কানমলা দিচ্ছেন ভেবে কোথায় যেন কামড়ে দিয়েছিলাম। জানতাম কী করা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও। তাও তিনি ধৈর্য হারাননি। আমাদের পরিবারকে রোগমুক্ত রাখার জন্যে তাঁর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সরোজদেবী মায়ের বন্ধু ছিলেন। গেণ্ডারিয়ার প্রতিবেশী, একসঙ্গে বাসে করে যেতেন কলেজে। ওঁর একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য মনে পড়ে। আমাদের ওয়ারীর বাড়িতে ওঁরা, বন্ধু হিসেবে ডাক্তারবাবুও প্রায়ই আসতেন।

দেশবিভাগে সবাই এখানে-ওখানে ছিটকে পড়েছি; ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। চার দশক পেরিয়ে গেছে, বোম্বাইতে কোনো বাড়ির গানের জলসা থেকে বাড়ি ফিরব, আমার সেদিন গাড়ি নেই। গৃহস্বামী এক অল্পবয়স্ক দম্পতিকে বললেন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। মেয়েটির সুশ্রী, শান্ত চেহারা নজরে পড়ার মতো। গাড়ি চলতে শুরু করলে সে আমাকে বলল, 'আপনি আমাকে চেনেন না, আমি আপনাদের কথা অনেক শুনেছি। আমার বাবা ছিলেন আপনাদের ডাক্তারবাবু, ড. শৈলেন সেন।' একটা ফাটল জোড়া লেগে গেল। আশ্চর্য লাগে, ছোট ঢাকা শহর ছেড়ে আমরা বিরাট ভারতবর্ষে — এদিক-ওদিক বসবাস করেছি। তবু কত বন্ধু, কত পরিচিতর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দেখা হয়েছে, খবর পেয়েছি; এ যেন ঢাকার সম্প্রীতির নিদর্শন।

ম্যালেরিয়ার ধাত থাকলে হঠাৎ কোনো সন্ধ্যেবেলায় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত। বাড়ির বৃদ্ধারা জিজ্ঞেস করতেন, আজ একাদশী না অমাবস্যা? বিশ্বাস ছিল কোনো কোনো বিশেষ তিথিতে এই জ্বর আঁকড়ে ধরে। এবং আগে থেকে সেদিন উপোস করলে জ্বর আসে না। তা জানি না, তবে ওষুধ ছিল একটি, কুইনাইন। শুনেছি ভীষণ তেতো। বহু বছর পরে 'মংপু' গিয়ে দেখি কুইনাইন যে গাছ থেকে বানানো হয়, চতুর্দিকে তার চাষ, জঙ্গল। দৃশ্যটি মনোরম, কিন্তু দেখে শিহরণ আসে। ছোটখাটো সমস্যা লেগেই থাকে — পা মচকে গেলে হলুদ-নুনের পট্টি লাগাও, আঁচড়-আঘাতে কেটে গেলে চট করে লাগাও আয়োডিন বা কোনো পাতার রস, ধনুষ্টংকার যেন আঁকড়ে না ধরে। টোটকা বেশি ব্যবহার হতো, এখন আবার সে দিন ফিরে এসেছে মনে হয়। একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্ত রোগের নাম শুনতাম 'ইরিসিপ্লাস', কারো হয়েছে বলে জানি না, তবে গ্রিক নাটকের মতো নাম, ভুলে যাই কী করে।

ওষুধের কথায় প্রথমেই মনে পড়ে স্বর্ণসিন্দুর, ওতে নাকি সত্যি সোনা থাকত। কালো পাথরের খল-এ স্বল্পপরিমাণ স্বর্ণসিন্দুর অনেকক্ষণ ধরে পিষতে হতো, যাতে খলের সঙ্গে মিশে যায়। তারপর অনুপান। অনুপান নির্ভর করত অসুখের ওপর; দুধ, মধু বা সর খলে আবার পিষিয়ে মসৃণ হলেই তা ওষুধের রূপ নিত। সর্দি-কাশি নিত্যসঙ্গী, থ্রোটপেইন্ট কাঠিতে তুলো লাগিয়ে পেইন্ট গলায় লাগানো, এর কোনো সুখস্মৃতি থাকতে পারে না, গলা জ্বালা করত। সর্দির আরেক ওষুধ 'মিস্টল', নাক খুলে যাবে, স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নেওয়া যাবে। কেটে গেলে আয়োডিন, কী জ্বালা যে করত! শরীরের শক্তির জন্যে Waterbury's Compund, আর হজমের জন্যে 'একওয়া টাইকটিস', এটা তো ওষুধই মনে হতো না। কিছু ওষুধ আসত বোতলে, বোতল সাধারণ তবে মাপ ভারি মজার, তাসের ডায়মন্ডের মতো কাগজ কেটে লম্বা করে লাগিয়ে দেওয়া। এক একটি ডায়মন্ড, একে 'দাগ' বলা হতো, এক দাগে এক ডোজ। বড়ি, ক্যাপসুলের যুগে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এছাড়া ছিল আদা-তুলসী পাতার রস, শিউলি পাতার রস, জোয়ানের আরক, একওয়া টাইকটিসের ভিন্ন রূপ, মা-ঠাকুমার ঝুলির ওষুধ। সাধারণত আদা-তুলসী পাতা ছেঁচে জলে গরম করে দেওয়া হতো। অন্য প্রণালিতে লোহার খুন্তি আগুনে গরম করে আদা-তুলসীর রসে ছেঁকা দেওয়া হতো। এ ওষুধ আরো কড়া। পায়ে কাঁটা লাগা ছোটদের নিত্যকার ব্যাপার, ছুঁচ বা আলপিন আগুনে গরম করে তা দিয়ে কাঁটা বার করা হতো। ডাক্তার তো বারবার কাঁটা বার করতে আসবেন না, তাই নানা দেশি উপায়। এসব ছিল ঠিকই, তবে খটখটে বাড়িতে থেকে, তাজা মাছ-তরকারি খেয়ে আলো-হাওয়ায় হেঁটে বেরিয়ে, খেলা করে ভালোই তো থাকতাম।

অসুস্থতার পর পথ্যের ওপর কড়া নজর রাখা হতো। কিছু পথ্য, যেমন বার্লির জল, এতই বিস্বাদ ছিল যে দেখলেই অসুখটাকে পালিয়ে যাবার হুকুম দিতাম। তবে জ্বর কি চট করে কথা শোনে। পথ্য নির্ভর করত অসুখের ওপর, কখনো জলে ভেজানো নরম চিড়ে, তাতে একটু লেবুর পাতা ভেঙে দেওয়া, খেতে মন্দ লাগত না। কখনো দুধ-সাবু, বার্লির জলের মতোই বিস্বাদ। শরীর একটু সুস্থ হলে, ভাত খাবার অনুমতি পেলে দেওয়া হতো সুক্তো ভাত, যেমন হেলেঞ্চা শাকের, উচ্ছে, শিউলি পাতা বা অন্য কোনো তেতো দিয়ে। এ সুক্তোতে ভাড়ালি জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারি কিছু পড়বে না, কাঁচাকলা থাকলেই হলো। কালিজিরা চালের ভাত, হালকা ফুরফুরে চাল, হজম করতে সহজ। মাছ শুরু করলে হালকা মাছ কাজলি, মৌরলা বা মাগুর (শিঙ্গি চলবে না) দিয়ে পাতলা ঝোল। বাংলার বাইরে থেকে থেকে কালিজিরা চালের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন আমেরিকার বস্টন শহরে বাংলাদেশি দোকানে দেখি চালের বস্তার ওপরে লেখা, 'কালিজিরা চাল'। মনে হলো 'হারাধন' ফিরে পেয়েছি।

ভাত দেওয়া হতো রয়ে-সয়ে। পথ্য শুরু হতো আটার রুটি বা পাউরুটি দিয়ে দুধের সঙ্গে নরম করে, কখনো দই-চিড়ে দিয়ে। রুটি হালকা মনে করতেন বড়রা। বিয়ের পর গুজরাটি সংসারে গিয়ে দেখলাম একেবারে উলটো, সর্দি-জ্বর হলেই বলা হয় 'আজ আর রুটি নয়, ভাত দেব, হালকা খোরাক', হয়তো যেটা রোজ দিনের অভ্যেস, যেমন গুজরাটে রুটি, সেটা বাদ দেওয়াই উপকারী। অনেক প্রজন্মের অভিজ্ঞতা দিয়ে এ নিয়ম তৈরি হয়।

পথ্য তো ভেবেচিন্তে দেওয়া হলো, কিন্তু জ্বরের পর যে অরুচি হয় তার কী করা? মুখে স্বাদ নেই খাবে কী করে? শর্ষের তেলে নুন মিশিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে রুচি ধীরে ধীরে ফিরে আসে, এ ধারণা ছিল। আসত বোধহয়, কারণ এই ঝাঁঝওয়ালা তেলে বেশ স্বাদ ছিল।

ছোটবেলায় কত বায়না করেছি রোগীর খাবার খাব না, আজ সুক্তো, হালকা মাছের ঝোল, কালিজিরা চালের ভাত সবই দুষ্প্রাপ্য; মনে হয়, 'আহা কি ভালো লাগত স্নেহ-যত্ন নিয়ে তৈরি সেই রোগীর পথ্য।' আর এই যে ডাক্তারের আদেশে এখন রোজ সকালে বার্লির জল খেতে হয়, তাতেও কি একটু স্বাদ পাচ্ছি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াশোনা-খেলাধুলা-ছেলেবেলার নানা প্রশ্ন

একটু বড় না হলে, অন্তত সাত-আট বছরের না হলে, আমরা স্কুলে ভর্তি হতাম না। প্রথমত, শুধু পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর করে, সীমাবদ্ধ সিলেবাসের ওপর পড়াশোনা করা আর লম্বা সময় ছোটদের স্কুলে কাটানো, অনেক মা-বাবাই পছন্দ করতেন না। এর থেকে বাড়িতে বড়দের কাছে নানা বিষয়ে লেখাপড়া শেখানোতে ছিল এঁদের বিশ্বাস। আরো কারণ ছিল; তখন কাছাকাছি কিন্ডারগার্টেন জাতীয় স্কুল থাকত না — যেতে হতো ঘোড়াগাড়ি চেপে দূরের স্কুলে, যেমন কামরুন্নিসা বা ইডেন। সারাদিনের ধকল ছোটদের পক্ষে কষ্টকর — আমি বা কৃষ্ণা বাড়িতেই ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক ইত্যাদি শিখেছি। সন্ধ্যেবেলা বাবা-কাকারা পড়াতেন, দিনে মা-জেঠিরা। ছেলেরা মাঝে মাঝে একটু অল্প বয়সে স্কুলে যেত, সেটা খেলার মাঠের জন্য। আমার, কৃষ্ণার সেসব বালাই ছিল না, রিবন দেওয়া রং-বেরঙের ফ্রক-পরা পুতুল নিয়ে খেলতেই ভালোবাসতাম।

স্কুলে না গেলেও পড়াশোনা করার নির্দিষ্ট সময় ছিল, সকাল-সন্ধ্যায়। মনোযোগ দিয়ে বসতে হতো, সে বাবার পড়ার টেবিলের এক কোণেই হোক বা দাদার মতো টেবিল-চেয়ারে। মায়ের কাজের জায়গায় পিঁড়িতে বসেও বই পড়া হতো। সকালে বাবা বলে দিতেন কী কী কাজ করতে হবে, লেখা, যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি, আবার সন্ধ্যেবেলা সেগুলো দেখে দিতেন। মাও প্রশ্নোত্তর করে বা খাতা দেখে জেনে নিতেন কতটা উন্নতি হলো।

সবচেয়ে বেশি আনন্দের সঙ্গে শেখা হতো মৌখিকভাবে — কথাবার্তার মাধ্যমে, প্রায় খেলাচ্ছলে। বাবাদের ক্লাস একটু বেলা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু হতো, মধ্যাহ্নভোজন তাই সবাই মিলে একসঙ্গে করতাম। খাবার টেবিলে বসে পড়াশোনার কথা হতো, প্রশ্নোত্তর হতো, ছুটির দিন হলে তো কথাই নেই, লম্বা সময় পাওয়া যেত। শুধু দুপুরে কেন, বিকেলে জলখাবারের সময় টেবিল ঘিরে অনেকে থাকতেন, খেলা জমত ভালো। ইংরেজি, বাংলা ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস এই সময়ই ভালো করে শিখেছি। তখন ছিল General Knowledge-এর প্রতিপত্তি — কে কবে কী আবিষ্কার করেছেন, কোন পাহাড় কত উঁচু, কোথায় বৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, এসব পাঠ্যের মধ্যে ছিল। অনেক সময় বাংলায় যে কথা বলতাম তা ইংরেজিতে অনুবাদ করার হুকুম আসত। ইংরেজি, বাংলা বানানও এভাবে শিখেছি। পাঠ্যপুস্তক তখন ঢাকাতে খুব বেশি আসত না, বোধহয় যুদ্ধের জন্য। *বাংলা সহজ পাঠ*, ইংরেজিতে *New Method Reader*, পরে যাদব চক্রবর্তীর অঙ্কের বই ছাড়া তেমন কিছু মনে পড়ে না। যোগ-বিয়োগ বারান্দায় চক (Chalk) দিয়ে করতাম, বই না থাকায় মুখে মুখে শিখতাম। এটা যে সবসময় আনন্দদায়ক হতো তা নয় — প্রশ্নের জবাব ঠিক না দিতে পারলে ভর্ৎসনা শুনতে সময় লাগত না।

'সহজ পাঠের' জাদু বহু শিশুর মন ভুলিয়েছে; Michael West-এর *New Method Reader* ছিল আরেক অসাধারণ বই, 'সহজ পাঠের' মতোই, স্তরে স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় করে আসত। শুধু ইংরেজি ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদি নয়, গল্প, কবিতা ছাড়াও এতে থাকত নানা ঐতিহাসিক কাহিনি, পৃথিবীর নানা আশ্চর্যের কথা, আবিষ্কারের কথা, বিভিন্ন নদীতীরের বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতির বিবরণ; শিক্ষার গোড়াপত্তন এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে কৌতূহল নিয়ে পৃথিবী, জীবনকে দেখতে শিখি। ছোটদের এ ধাঁচের ইংরেজি বই আমার নজরে আর আসেনি। প্রত্যেকটি গল্প, কাহিনির নিচে থাকত সারাংশ, নয়তো এসব থেকে কী শিখতে পারি, তা দু-ছত্রে। একটি কবিতাতে শুরু ছিল, 'We are Pilgrims. master...'[১] (লম্বা কবিতার অংশ)। তাতে লেখা ছিল পরিব্রাজক বা ভ্রমণের নানা বৃত্তান্ত। নিচে লেখা, 'তোমরাও বড় হয়ে নতুন জায়গা, নতুন সংস্কৃতি দেখবার, জানবার চেষ্টা করবে। নতুন দেশ দেখবার সুযোগ কখনো ছেড়ো না।' এই উপদেশ আমাদের অনেকের জীবনে অমূল্য ছিল, যতদূর সম্ভব মেনে চলেছি, বেড়াবার সুযোগও প্রচুর এসেছে।

গল্পের বই মনে পড়ে 'অ্যারাবিয়ান নাইটসের' বাংলা, 'এশিয়ার ছেলেমেয়ে' ও 'গল্প হলেও সত্যি'। শেষেরটি এখনো আমার কাছে আছে, পড়তে ভালো লাগে। 'গল্প হলেও সত্যি'তে একটি গল্প চীন দেশের কোনো জায়গা সম্বন্ধে। সেখানে নাকি অতিথি বাড়িতে এলে তিনি যদি স্বাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতেন, তো বলা হতো 'এসো ভাই, বসো, চা আনছি।' আর এই অতিথির আগমন যদি অপছন্দের হতো তা হলে প্রশ্নাদি এইভাবে হতো, 'তোমরা কি ভেতরে আসবে না? তোমরা কি বসবে না?' 'না' শুনেই অতিথি 'না' বলে প্রস্থান করতেন। কতটা সত্যি জানি না, তবে এই মজার গল্প ভুলি কী করে? *ঠাকুরমার ঝুলি* ও *টুনটুনির বই* সবার প্রিয়। খেলা ছিল 'কে ভাই, টুনি ভাই, এসো ভাই, বসো ভাই, পাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই' কে কত তাড়াতাড়ি বলতে পারি। বেশি তাড়াতাড়ি বলতে গেলে হিজিবিজি হয়ে যেত, হাসি-উল্লাসে ঘর ভরে যেত, যে হিজিবিজি বলেছে সেও উচ্চ হাসিতে মেতে উঠত। এ খেলাতে ঈর্ষা ছিল না।

আরেকটি অবাক করা বই ছিল মিনু মাসানির *Our India*। বড়দের বই, ইংরেজি বুঝতে পারি না — বাবা বইয়ের নানা ছবি দেখাতেন, আমি তাতে আকৃষ্ট হতাম। তুলনামূলক অনেক কিছু দেখানো হতো ছবি আকারে। বিশ্বের নানা দেশে গড়পড়তা দুধ কতটা হয়। দুধের বালতি হাতে সারি করে মানুষ দাঁড়ানো, কোথাও বালতি প্রায় কানায় কানায় ভরা, কোথাও শুধুই একটু তলানি। সে যুগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার এমন বই আর ছিল বলে মনে হয় না।

আমার মনে মনে একটা নিজস্ব খেলা ছিল। টেবিলে বসে বড়রা যখন কথা বলতেন, আলোচনার সূত্রটা ধরে রাখতে চেষ্টা করতাম, অর্থাৎ এক বিষয় থেকে পরের বিষয়ে কীভাবে যাওয়া হয়েছে। যেমন হয়তো কেউ বললেন রেশনের চাল বড়ই খারাপ, সেই থেকে কালোবাজার, কালোবাজার করে কে বড়লোক হলেন বা জিনিসপত্রের দামের বিপর্যয়, যুদ্ধ, ইংরেজদের অসাধুতা, তার থেকে অনতিদূরে সেনাবাহিনীর প্রতি সন্দেহ, বা জাপানি বোমার ভয়। কোনো সময় এলো স্বাধীনতার কথা। একের পর এক চলতে থাকত, এর হিসেব রাখতাম আমি, খুব সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু টুকরো টুকরো কিছু শিখতে পেতাম।

খাবার টেবিলে ধাঁধা, শক্ত শব্দের অর্থ, এসবও চলত। বড়দের মধ্যেই হতো। একদিন কেউ প্রশ্ন করলেন, 'ঊঢ় মানে কেউ বলতে পারেন?' উত্তর সহজে এলো না, সবার মনে চিন্তা, কী হতে পারে এর অর্থ। আমি হঠাৎ বলে দিলাম 'ঊঢ় মানে যার বিয়ে হয়েছে'। উত্তর শুনে বড়রা অবাক। জ্ঞানটি ওই খেলার ফল। ক'দিন আগে সাহিত্যের আলোচনা ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল শরৎচন্দ্রে, সেই থেকে 'অনূঢ়া', তাই থেকে বার করলাম 'ঊঢ়'র অর্থ। আমাকে আর পায় কে, ভাব দেখালাম বাংলা ভাষায় আমার দারুণ দখল!

এই টেবিলে বসে গ্লোব দেখে পৃথিবীর নানা দেশ, শহর সম্বন্ধে শিখতাম। তখনো পড়তে শিখিনি, অক্ষর পরিচয় হয়নি, কিন্তু গ্লোবে কোথায় কোন শহর দেখিয়ে দিতে পারতাম — অন্তত কিছু শহর। দাদা অমর্ত্য সেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন, ছোটবেলায় আমাকে এড়িয়ে চলতে হতো কারণ 'টিম্বাকটু' চিনবার খেলায় আমি ওঁকে হারিয়ে দিতাম। হেরে যাওয়াটা হয়তো ইচ্ছাকৃত, তবে সত্তরের ঘরে ঢুকেও এই দাদাটির প্রশংসা শুনতে বড় ভালো লাগে।

আসলে গ্লোব ছিল আমার প্রিয় খেলনা — কেমন একটু নুয়ে গোল-গোল এদিক-ওদিক ঘোরে। কত বিচিত্র আকারের আঁকাবাঁকা রেখা ভিন্ন ভিন্ন দেশকে আলাদা করে রাখে। আর কত যে জল — জল আর জল। সাগর-সমুদ্রের নাম কি চমৎকার, যা খুশি তাই নয়, কোনো বিশেষ কারণে নাম দেওয়া হয়েছে — ভূমধ্য, অতলান্তিক, প্রশান্ত, অতল গভীর প্রশান্তি অনুভব করতে সাহায্য করে। হিমালয় দেখে একটি দুঃখের কাহিনি মনে আসত। ১৯২৪, দুই সাহসী পুরুষ মাউন্ট এভারেস্টের শিখরে পৌঁছবার জন্য রওনা হয়েছিলেন। অনেক অনেক উঁচুতে পৌঁছেছিলেন, শেষে তাঁদের দেখা গিয়েছিল যেন দুটি কালো বিন্দু নড়াচড়া করছে। তারপর শুধু সাদা বরফ, কোন তুষারধস বা ঝড়ে সমাধিস্থ হয়েছিলেন কে জানে। মনটা খারাপ হয়ে যেত। আবার উত্তর মেরু দেখে সেখানে পৌঁছানোর দুর্যোগ যাত্রা বর্ণনা মনে রোমাঞ্চ এনে দিত। এসব জানতে পারতাম সেই *New Method Reader* পড়ে। ও বই আমার হাতছাড়া হতো না, আর গ্লোব, যতটা সম্ভব, খাবার টেবিলের অনন্য সাজ করে রেখে দিতাম।

রং, আকার, নকশার প্রতি নজর বোধহয় ছোট থেকেই ছিল। পরিমলকাকা বলতেন একবার এক লুচির টুকরো দেখে বলেছিলাম, 'এই তো Crete'। এরপর উনি স্নেহের বশে পদ্য লিখেছিলেন, 'বিবি'কে উপহার হিসেবে।

মনে পড়ে ছোটবেলা
পড়াপড়া নিয়ে খেলা
লম্ফে লম্ফে লঙ্ঘিছে চত্বর
লিখিছে পড়িছে কত,
শৈশবের বিদ্যা যত
অনায়াসে শিখিছে সত্বর।
আমরা অবাক মানি
এ-বয়সে এতখানি?
দেখে-শুনে ভারি লাগে ভালো,
ক্রমে ক্রমে হলে বড়
বুদ্ধি হলো ঘোরতর
পল্টনের বাড়ি হলো আলো।[২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবার টেবিলে শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকত। গ্লোব দেখতে জানলে হবে কি, আর কিছুতে কাউকে হারাতে পারতাম না। General Knowledge-এ মন্মথ কাকার ছেলে বাবু প্রত্যেকবার প্রথম হতো, যে-কোনো সাহিত্য সংক্রান্ত প্রশ্নে দাদা সমীর সবার আগে।[৩]

দাদা সমীর পাঁচ বছর বয়স থেকে আমার মা-বাবার কাছে থেকে বড় হয়েছেন। ক্লাস ওয়ান থেকেই ঢাকাতে St. Gregory-তে পড়েন, গুরুগম্ভীর পড়াশোনা। দুরন্ত ছেলে, পড়াশোনায় মন নেই; বরং ঘড়ি জাতীয় আশ্চর্যজনক জিনিস খুলে, ভেতরকার যন্ত্রপাতি দেখবার ঔৎসুক্য বেশি। বাড়িতে প্রায় সব ঘড়ি অচল করে দিয়েছিলেন। ক্লাসে কী পড়ানো হয় মনে থাকে না, বাড়িতে কী পড়তে হবে তাও মনে থাকে না। শেষপর্যন্ত মা ক্লাস টিচারকে চিঠি পাঠালেন তিনি যেন হোমওয়ার্ক আলাদা করে লিখে দেন, যাতে মা দাদাকে পড়াতে পারেন। সবকিছু সহজ হয়ে গেল, দাদা বই ভালোবাসতেন, আর ভালোবাসতেন তাঁর ছোট কাকিমাকে।

আমার স্মৃতিতে দাদা একটু উঁচু ক্লাসে — ঘড়ি তখনো চুরমার করেন এবং টুকরোগুলো কোনো আলমারির নিচে লুকিয়ে রাখেন, তবে পড়াশোনায় মনোযোগ এসে গেছে। কলম ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না, নানা নম্বরের ১নং, ২নং পেনসিলের সাহায্যে সব কাজ করতে হতো। ধীরে ধীরে এলো জিওমেট্রির বাক্স, স্কেল, কম্পাস ইত্যাদি — অমূল্য সম্পদ, আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। স্ক্রু দিয়ে পেনসিল কম্পাসে লাগিয়ে, গোলাকৃতি, অর্ধগোলাকৃতি চিত্র আঁকতেন। ঈর্ষা হতো না এত লক্ষ্মী আমি ছিলাম না।

জ্যামিতির ছবি আঁকার মতো দাদার আরো দুটি কাজ ছিল, যাতে প্রচুর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল। ভূগোলে মানচিত্র আঁকা কঠিন কাজ। বিভিন্ন নম্বরের পেনসিল, ছুরির মতো তীক্ষ্ণ করে কাটা, তাকে উলটোদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহাড়, পাহাড়ের উচ্চতা, এবড়োখেবড়ো চল দেখানো, আবার বিভিন্ন প্রশস্তির রেখা দিয়ে নদী, শাখানদী দেখানো — অসীম ধৈর্যের কাজ। দাদার সেটা ছিল। দ্বিতীয় 'ছবি' ছিল 'পেনমেনশিপ'। হাতের লেখা ভালো করবার জন্য চারটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে বারবার একই মকশো করা। অত্যন্ত একঘেয়ে কাজ, দাদা কিন্তু মনের আনন্দে করে যেতেন, খাতার পাতা ভরে গেলে সত্যি ছবির মতো দেখাত। কলেজ জীবনে উনি ভালো ছবি আঁকতে শুরু করেন, St. Gregory-র শিক্ষা বোধহয় এর প্রথম পরিচ্ছেদ। আজো হয়তো স্কুলশিক্ষায় এসব আছে, তবে শান্তিনিকেতনে পাঠভবনে কম্পাস ছিল, বাকি দুটি ছিল না। আমার কাছে তাই এটা এক হারিয়ে যাওয়া শিক্ষা-পদ্ধতি।

দাদা স্কুলে যায়, তার হোমওয়ার্ক থাকে, পরীক্ষা থাকে, আমার শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে মুখে, খেলা-খেলা পড়া; দাদার প্রতি ঈর্ষা প্রচুর। ১৯৪৩-এ ৫নং পুরানা পল্টনে শুরু হলো Dasgupta Academy; ছাত্র আমি একা, শিক্ষক আমার বাবা। আমি ক্লাস III-তে। পাঠ্যপুস্তক বিশেষ ছিল না, শেখা অনেকটাই মুখে মুখে, লেখার কাজ বেশি। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে এলো বার্ষিক পরীক্ষা, ঠিক দাদার যেমন থাকত। ইংরেজি ও বাংলার প্রশ্নপত্র পেয়েছি, ইংরেজি খুব উঁচুদরের বলব না, Jack and Jill-এর আগে খুব একটা যায়নি। বাংলায় প্রশ্ন দেখে মনে হয় syllabus কঠিন ছিল, দাদার St. Gregory থেকে কিছু কম নয়। 'টাইটানিকের দৈর্ঘ্য কত ছিল', 'ভীষ্মের শরশয্যা বলিতে কী বোঝ' বা 'তোমার বাড়ি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখো', হেলাফেলার ব্যাপার নয়।[৪]

১০০-তে কত নম্বর পেয়েছিলাম জানি না, তবে 'ভাই-এর কাণ্ড' প্রবন্ধ লিখে ২০-তে ১৮ পেয়েছিলাম। লেখা পড়ে মনে হয় নামি শিক্ষক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত কন্যার ব্যাপারে মুক্তহস্তে নম্বর দিয়েছিলেন।[৫] Dasgupta Academy মোটেই খেলা-খেলা ছিল না, প্রবন্ধে নম্বর দেবার পর বাবার সই ও তারিখ আছে, ৩১/১২/১৯৪৩। মাঝে মাঝে কানে আসত বাবা ঢাকার বাইরে যাচ্ছেন অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'external examiner' বা 'বাইরের পরীক্ষক' হিসেবে, viva অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা নিতে। আবদার শুরু করলাম — দাশগুপ্ত অ্যাকাডেমিতেও এরকম হওয়া চাই। তা নয়তো অ্যাকাডেমি কী? বায়না চলতে লাগল। এ সময় কোনো কাজে ঢাকা এলেন ডা. পরিমল রায়, বাবার নিকট-বন্ধু। যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন কলকাতায় Director of Public Instructions (DPI)। আজো দেখতে পাই ৫নং-এর সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, আমাকে দেখে বললেন, 'আমি তোমার external examiner, তোমার পরীক্ষা নিতে এসেছি।' পরীক্ষা হলো বসার ঘরে, বাবা Head হিসেবে বসা, তবে মৌন কারণ তাঁর মেয়ের viva হচ্ছে; ডা. পরিমল রায় প্রশ্ন করছেন। প্রশ্নোত্তর মনে নেই, নম্বরও মনে নেই, তবে পাশ নিশ্চয়ই করেছিলাম। মাঝে মাঝে ভাবি — বইয়ের ভার, খাতার ভার, টিউশন ক্লাস, কিছুই নেই, বাবা-কাকারা কত নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়েছেন।

পুরানা পল্টনে দাদার তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন — পল্টন, পরে কবি সমরেন্দ্র সেন ও বাবু, যিনি পরে ভারতীয় নৌসেনায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আর মল্লু। সমীরদার বইপড়া, টিকিট সাজানো, খেলাধুলা, সবকিছুর সাথী ছিলেন এঁরা। মেধোদা ও এদের তিনজনের সাহায্য নিয়ে ৫নং বাড়িতে শুরু হলো 'শান্তি লাইব্রেরি'[৬]। নিয়ম ছিল গ্রাহক হতে হলে দু-একটি বই দান করতে হবে। এভাবে পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বাড়ির তহবিল থেকে কিছু বই নিয়ে বসবার ঘরের এক কোণে শুরু হলো এই পাঠাগার। প্রত্যেকটি বই খয়েরি কাগজে মোড়া, যেমন পাঠ্যপুস্তক বা স্কুলের খাতা মোড়া হতো। ওপরে লেখা থাকত 'শান্তি লাইব্রেরি' ও নম্বর। একটি লম্বা খাতায় দাদা লিখে রাখতেন বই নেওয়া ও ফেরত দেওয়ার তারিখ, কে নিল তার নাম। দাদার থেকে কিছু ছোট মল্লু, বাবু আর পল্টন ছিল অত্যধিক উৎসাহী; লাফিয়ে চলা, হুড়হুড় করে কথা বলা, 'সমীরদা, সমীরদা' করে দৌড়ঝাঁপ করে তার আদেশ পালন করাতে দক্ষ। শান্ত, ধীরস্থির মেধোদা, 'শান্তি লাইব্রেরি'কে সত্যিকার একটি লাইব্রেরির আকার দিতে ছিলেন দাদার প্রকৃত সহকর্মী। তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বই পড়ার ঔৎসুক্য ছিল; বন্ধুরা মিলে লাইব্রেরি ভালো চালালেন। একসময় ৫নং বাড়ি ছেড়ে ওয়ারী চলে যেতে হলো — মেধোদা, বাবুরা, কেউ কাছে নেই, পাড়াতে চেনাজানা সেরকম নেই, বইগুলো সাজানো রইল, কিন্তু শান্তি লাইব্রেরি স্তিমিত হয়ে গেল। পুরানা পল্টনে ফিরে আসার পর বন্ধুদের কাছে পেয়ে দাদা তাঁর প্রিয় পাঠাগারকে নতুন প্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, সফল হলেন না। হঠাৎ করে শহরের, পাড়ার আবহাওয়া বদলে গিয়েছিল, সবাই যেন অন্যমনস্ক।

খেলাধুলার সময় বিকেল। ছেলেরা স্কুলে ফুটবল খেলত, আবার বাড়ি ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলার মাঠে ছুট। যথারীতি তারকাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে চলে আসতেন মেধোদা, দাদাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতেন ক্রিকেট ইত্যাদি খেলতে। কাছেই ছিল বিশাল মাঠ — সেখানে অন্য বন্ধুরাও জড়ো হতেন। ক্রিকেটপাগল ছিলেন অনেকেই। দাদা (সমীর) মুস্তাক আলির ব্যাটিংয়ের স্টাইল নিয়ে নানা গল্প করতেন। মাঝে মাঝে সেই স্টাইলের 'কাট'ও (cut) দেখাতেন। খেলার মাঠে আমরা মেয়েরা যেতাম না, এসব দেখানো হতো ৫নং-এর দালানের পাশের সরু বাগানে, কুলগাছের তলায়। আমার সুপুরুষ দাদাকে এক নামি ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে দেখে আমি তার আরো অনুগত হয়ে যেতাম।

ছোট মেয়েদের স্কুলের সমস্যা নেই — আমাদের খেলার সময় ছিল আগে, তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ। খেলা মানেই পুতুলখেলা। পাড়াতে একা বের হতে অসুবিধে ছিল না; বেলা তিনটে নাগাদ বান্ধবী কৃষ্ণা আসত রোজ, খেলা জমত কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়িতে। পুতুল বাড়িতেই বানানো হতো, তাদের শাড়ি-জামা, পুঁতির মালার গহনা — সাজাতে-গোছাতে প্রচুর সময় যেত। পুতুলের বিয়ে ছিল এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাহি ব্যাপার। কনে সাজানো, বরের পোশাক, মুকুট — সবই তৈরি করতে হতো নিজেদের, মা-মাসি-দিদিদের সাহায্য নিয়ে। তত্ত্ব আসত ছেলের বাড়ি থেকে, মিষ্টির ভোজ হতো। পুতুলের বিয়েতে যেমন আনন্দ হতো, ঝগড়া, অশ্রুবর্ষণও কিছু কম ছিল না। কার ছেলে, কার মেয়ে — এই ঠিক করতে মনকষাকষি, আড়ি পর্যন্ত হয়েছে, তবে মিটমাট হতে সময় লাগেনি। একবার পাশের বাড়ির ঝর্ণাদির ছেলে পুতুলের সঙ্গে বিয়ে হলো আমাদের কারো মেয়ে পুতুলের। বিবাহবাসর ৫নং বাড়ি। তত্ত্ব এলো সাজিয়ে রাখার মতো। খুদে খুদে সন্দেশ, রসগোল্লা, আরো নানা মিষ্টি, শাড়ি-গহনা তো অবশ্যই — তাও খুদে। এলো কারুকার্য করা কাপড়ে ঢাকা ডালা-কুলোতে। ঝর্ণাদির মা, নীলিমা মাসিমার হাতের তৈরি, এমন আর কখনো দেখিনি।

যেমন বলেছি, আমার মায়ের শাড়ি-গহনার মায়া ছিল না। উনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। পুতুলের শাড়ি জমকালো হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে যে পুতুল কনে সাজবে। মায়ের বিয়েতে পাওয়া ক্রেপ বেনারসি, তার জরির পাড়, বুটি — কোথাও একটু ছিঁড়ে গিয়েছে, বিনা দ্বিধায় মা তাকে টুকরো করে পুতুলের শাড়ি করে দিতেন। কতবার এরকম হয়েছে। আমাদের প্রজন্ম অনেক সচ্ছল অবস্থায়, যখন পুরনো শাড়ির পাড়, আঁচল কেটে antique সংরক্ষণের নাম দিয়ে অন্য কিছু করি, মায়ের কথা মনে পড়ে।

ছোটবেলার বন্ধুদের মধ্যে শুধু মিষ্টিদি, কৃষ্ণা বা টুটুর কথা বেশি করে লিখেছি এজন্য যে ওরা খুব নিকটের ছিল — যোগাযোগ চিরকাল রয়ে গেছে। পাড়ায় আমরা কিন্তু যথেষ্ট দলে ভারি ছিলাম, খেলার সাথী, পাড়া-বেড়ানোর সাথী আরো অনেক ছিল। যেদিন অনেকে একত্র হতাম, বাগানের কোণে, কুলগাছের নিচে বসে বিকেলের জলখাবার খেতাম সবাই মিলে। মা-মাসিদের রান্নাঘরের ভাণ্ডার যে-কোনো আবদারের সময় ভরা থাকত। এই একসঙ্গে জলখাবার খাওয়া — হয়ে যেত আমাদের চড়ুইভাতি। এক্কাদোক্কা, হাই মারো কিত-কিত, কানামাছি, অনেক কিছু খেলা হতো, তবে আমি এসবে অপটু ছিলাম। মাঝে মাঝে গোল হয়ে বসে খেলতাম 'রুমাল চোর' বা 'musical chair', বড়রা গাইতেন, বন্ধ করতেন, আবার শুরু। আমরা চেষ্টা করতাম রুমাল চোর না হতে বা গান বন্ধ হতেই চেয়ার দখল করতে। পড়াশোনার বোঝা তথাকথিতভাবে না থাকায়, খেলাধুলা, পাড়ায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া, বই পড়া সবকিছুর জন্য সময় থাকত।

যতই স্বাধীনভাবে পাড়াতে ঘুরে বেড়াই না কেন, বাড়ি ফিরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো আলো থাকতে থাকতে, সন্ধ্যের অনেক আগে। হাত-পা ধুয়ে, কাপড়-জামা বদলে বই-খাতা নিয়ে বসতাম দাদার সঙ্গে। কখন সন্ধ্যে হতো, কখন খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম মায়ের ঘরের বিশাল জোড়াখাটে, টেরও পেতাম না।

স্মৃতি সবসময় মধুর বা মনোরম হয় না। পুতুলখেলার ব্যাপারে একটি গ্লানিকর ঘটনা, যাতে আমি নায়িকা না হলেও প্রায় সমস্তরের উপনায়িকা, বহুকাল আমাকে অনুতপ্ত, লজ্জিত রেখেছে। হয়তো আমাকে একটু শক্ত হতেও শিখিয়েছে। সাত দশকের ওপর কেটে গিয়েছে — রাখঢাক করে লিখবার প্রয়োজন নেই। মিষ্টিদিদের বাড়ি, পল্টন ভিলা, ছিল একটু দূরে। দু-রাস্তা পেরিয়ে। কয়েকজন একত্র না হলে ওখানে যাওয়া মানা ছিল, অর্থাৎ কৃষ্ণা আর আমি হুট করে চলে যেতে পারতাম না, দলবেঁধে যেতে হতো। ও বাড়িতে পুতুলখেলা খুব ভালো হতো। ওঁরা ছুটিতে কলকাতা যেতেন, অন্য ধরনের পুতুল এবং পুঁতির মালা নিয়ে আসতেন, চোখ টাটানো সম্পদ। আমাদের তো বাড়িতে শাড়ির টুকরো দিয়ে বানানো পুতুল, আর ঢাকার ফেরিওয়ালার পুঁতির মালা।

একদিন খেলার মাঝে বের হলো ছোট ছোট গোল গোল মুক্তোর মতো পুঁতির হার, মাঝে উজ্জ্বল সবুজ কাচের লকেট। মনে হয় চতুর্দিকে তার আলো ছিটকে পড়ছে। আমাদের সবার চোখ জ্বলজ্বল করা লকেটের দিকে। খেলা হলো — মিষ্টিদি বাক্সে সব গুছিয়ে রাখলেন। সেদিনের মতো খেলা শেষ।

নিষ্পাপ মনের কার্যকলাপ সবসময় নিষ্পাপ হয় না। ফেরার সময় এক বান্ধবী আমাকে বলল, 'দ্যাখো, সবুজ কাচের মালাটা আমি কেমন নিয়ে এসেছি।' গর্বের ভাব তার মুখে। তারপর বলল, 'আজ এটা তুমি রাখো, আমি পরে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব।' আমি বাধ্য এবং ভীতু, নিয়ে নিলাম। মায়ের কড়া চোখ চারিদিকে থাকে, ঠিক ধরে ফেললেন মালাটি আমার নয়। সব মালা মাটিতে ছড়িয়ে খেলা করছিলাম, কঠোর স্বরে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কার? তোমার তো নয়, কোথায় পেলে?' সত্যিটা বললে উনি বিশ্বাস করলেন, লজ্জায় চোখের জল ফেলতে শুরু করলেন। এই প্রথম মায়ের হাতে চড় খেলাম। বললেন, পরের দিন দুষ্কর্মের বোঝা মাথায় নিয়ে মালাটা মিষ্টিদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পরদিন সত্য-অসত্যের মাঝের রাস্তা নিয়ে মিষ্টিদিকে বললাম, 'এ মালাটা তো তোমার, ভুল করে কাল নিয়ে গিয়েছিলাম — রাগ ক'রো না।' সরল মনের মিষ্টিদি বিশ্বাস করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কথা, মনে কোনো দাগ পড়ল না। দোষটা যে করেছিল সে কিন্তু পার পেয়ে গেল, তাতে আমার কোনো রাগ হলো না। দোষ তো আমারও ছিল, দোষীর সাহায্যকারীও যে দোষী হয় সে জ্ঞান তখনো হয়নি। আর সত্যি কথা বলতে, সবুজ কাচটির ওপর আমার কি একেবারেই কোনো লোভ ছিল না?

* * *

ছোট বয়সে নানা প্রশ্ন মনে আসে, প্রশ্ন মাঝে মাঝে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণা, টুটু, আমার — সবার মধ্যেই এটা ছিল, তবে সমস্যা ছিল যার যার নিজস্ব। বড়দের জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পেতাম, নেহাতই মূর্খ ভাববেন হয়তো, আর বন্ধুদের মধ্যে কথা বললেও, প্রশ্ন এতই নিজের, আপনার, যে উত্তর অন্য কেউ দিতে পারত না।

দুটি সমস্যার কথা মনে পড়ে, যা বহুদিন আমাকে চিন্তার মধ্যে রেখেছে। আমরা ওয়ারীতে থাকতে দিদিমা মাঝে মাঝে আসতেন। প্রত্যেকবারই শুনি বলছেন, 'যাই, একটু সদিবুদ্দির সঙ্গে দেখা করে আসি।' যাঁকে আমি 'সদিবুদ্দি' ভাবতাম, তিনি ছিলেন দিদিমার সম্পর্কে বোন ও প্রিয় বন্ধু, কাছেই থাকতেন। আমি কেবলই ভাবি 'সদিবুদ্দি' তো মুসলমান নাম, সুরাবর্দ্দির সঙ্গে মেলে। তিনি কী করে দিদিমার বোন হন? তখনকার দিনে, আমাদের জগতে এটা তো অসম্ভব ছিল। এ ধাঁধা আমাকে বহু দিন জ্বালিয়েছে। অনেক পরে জানলাম এই বোনের নাম ছিল সৌদামিনী, দিদিমা এঁকে ডাকতেন সুদুরদিদি বলে এবং সেটা এত তাড়াতাড়ি বলতেন যে আমার কানে আসত, 'সদিবুদ্দি'। আসল নামটা জানতে পেরে নিজেকে বেশ নির্বোধ মনে হয়েছিল।

অন্য সমস্যা গুরুতর। ভাই খুব ছোট, এক বিকেলে আমরা গিয়েছি পল্টনের মাঠে বেড়াতে, ভাই যতীনদার কোলে। মাঠে বেঞ্চে বসা ইংরেজির অধ্যাপক অমলেন্দু কাকার (বোস) বাবা, তাঁর সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে। আমাকে দেখিয়ে বন্ধুদের বললেন, 'এটি অমিয় দাশগুপ্তর মেয়ে, আর বাচ্চাটি', আমার কানে এলো, 'ওর সৎভাই'। গভীর চিন্তায় পড়ে গেলাম। এই ছোট আদরের ভাই আমার সৎভাই কী করে হয়? দাদা-দিদিরা অনেকে (তাতে দাদা সমীর অগ্রণী) আমাকে বলতেন, আসলে আমি দাশগুপ্ত বাড়ির কেউ নই, বাবা আমাকে লন্ডনের বিরাট দোকান সেলফ্রিজ থেকে কিনে এনেছিলেন। রঙ্গ করার এরকম কথা তাদের মনে কেন এলো জানি না, তবে একথা প্রায়ই শুনতে হতো। আমি পাল্টা জবাব দিয়েছি, 'তাই যদি হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যদি বিলিতি হই, আমার গায়ের রং কালো কেন?' চট করে উত্তর আসত, 'ও — বিলেতেও মাঝে মাঝে মানুষ কালো হয়।' 'সৎভাই' শুনে সেলফ্রিজের কথা মনে দ্বিধা এনে দিলো। গভীর উচাটন, 'তা হলে কি বাবা-মা আমার নন? আমি কি সত্যি সেলফ্রিজের সামগ্রী?' এ প্রশ্ন তো বন্ধুদের বলা যায় না। কিছুদিন পরে নিজেই ঠিক করলাম, সব বাজে কথা, আজগুবি গল্প, আমার বাবা-মা আমারই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলে গেল।

সব মিটমাট হয়ে গেলেও, বহুকাল চিন্তা করেছি, ওই দাদু কী বলেছিলেন যে আমি 'সৎ' শুনেছি। এ ধাঁধার উত্তর হঠাৎ একদিন পেয়ে গেলাম অনেক অনেক বছর পর, হয়তো অর্ধশতাব্দী পর। উনি বলেছিলেন 'সহোদর ভাই', দাদুদের প্রজন্মে এ ভাষার প্রচলন ছিল। আমাদের চলতি ভাষায় 'সহোদর' শোনা যায় না, পাঁচ বছরের আমি জানব কী করে? সৎ-মায়ের কাহিনি — নানা রূপকথায় শুনেছি, সেটাই প্রথমে মনে এলো, বিশেষ করে 'লন্ডনে কেনা' বলা হতো বলে। সরল মনে হলেও, দায়িত্বজ্ঞানহীন খুনসুটি কত নির্দয় হতে পারে!

অন্যান্য সমস্যা বা চিন্তা ছিল না তা নয়। 'একটুকু ছোঁয়া লাগে', গানের 'কিছু পলাশের নেশা'র পর শুনতাম 'কিছু বাচা পায় মেশা'। 'আমি বনফুল গো' প্রায় সবার গলায়, আমিও গাইছি, 'আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে দুলিয়ানন্দে', অর্থহীন এই পঙ্‌ক্তিগুলোতে বড় বিব্রত হতাম। গায়ক-গায়িকার দোষ নয়, আমি অক্ষরের ভাগ-বাটোয়ারা করা জানতাম না, গোলমাল করে ফেলতাম। 'বাচা পায় মেশা'র অর্থ না করতে পেরে কী মুস্কিলে যে পড়তাম।

এর থেকে আরো মারাত্মক একটা সমস্যা বা গোলমাল ছিল কমল দাশগুপ্তর একটি গানে, 'যেথা গান থেমে যায়' — যেমন সুর, তেমন বাণী — অন্তত আমি যতটুকু বুঝি। কিন্তু 'মরা অতিথির তীরে' কেন? অতিথির মৃত্যু কি কেউ চায়? তখনো *ম্যাকবেথ* পড়া হয়নি। তাছাড়া 'অতিথির তীরে'র তো কোনো মানে হয় না। অজ্ঞতা প্রকাশ করার ইচ্ছে আদৌ ছিল না, তাই প্রশ্ন নিজের মনেই রয়ে গেল বহুদিন। তবে এ তো বসে বসে চিন্তা করার ব্যাপার নয়, কদিন পরে ভুলে গেলাম। ভুল ভাঙলো অনেক পরে, ফিরোজা বেগমের সুরেলা আওয়াজ ও শুদ্ধ উচ্চারণে, 'মনে হয় তার প্রেম জেগে রয় মরা অতীতের তীরে' শুনে। আজ যখন আমার অতীত ভবিষ্যতের থেকে অনেক লম্বা, কথাটির অর্থ নতুন রূপ নিয়েছে।

অক্ষরের গণ্ডগোলের বিষয়ে মনে পড়ে রানী কাকিমার কাছে শোনা এক মজার গল্প। এক মা গর্ব করে বলছেন, 'আমার ছেলে, এত কম বয়সে সুন্দর পড়তে শিখেছে।' শুনে প্রতিবেশী কোনো মহিলা বললেন, 'বাছা, সামনের ওই সাইনবোর্ডটি পড়ো তো'। ছেলেটি পড়ল হরেকঅরঅকম্ বা জিও-বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদেরঅকা রঅখানা, ড ড নং'। অর্থাৎ 'ক, ম, র, র খোলা — হসন্ত নেই। আসলে ছিল 'হরেক রকম বাজি ও বারুদের কারখানা, ৬৬ নং'। আমার গানের কথা বোঝা ও ছেলেটির পড়ার প্রতিযোগিতা হতে পারত।

সমস্যা এতেই শেষ হয়নি — আরো গুরুতর প্রশ্ন জমাট ছিল আমার মনে, যার সমাধান হয়নি, যার কালোছায়া আজো আমাদের সমাজকে দূষিত করে চলেছে। আমার বয়স সাত কি একটু বেশি, বর্ধমানে গিয়েছি মেজ জেঠার বাড়িতে, ওঁর বড় মেয়ে, আমাদের দিদিমণির বিয়েতে। আগেও গিয়েছি, আনন্দে কেটেছে। মেজ জেঠা বর্ধমানে রাজ কলেজে পড়িয়েছেন তাঁর পূর্ণ কর্মজীবন। বর্ধমানে এবং তার বাইরে ওঁর প্রচুর ছাত্র।

এ বাড়িতে আসতেন মেজ জেঠার প্রাক্তন ছাত্র 'আজম'। রোজই আসতেন, মেজ জেঠিমাকে 'মা' বলে ডাকতেন। অন্য দুই দাদার মতো এঁরও অন্দরমহলে যাওয়া-আসার বাধা নেই; ভাইবোনদের সঙ্গে আড্ডা মারা, আমাকে খেপানো, জেঠিমাকে সাহায্য করা, বাজারহাট করা, বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এঁর কোনো পার্থক্য ছিল না। বিয়েবাড়ি — প্রচুর কাজ। বাড়ির বড় ছেলে তখনো কলেজে পড়েন, আজমদাই বাড়ির বড় ছেলের মতো। তিনি দায়িত্ব নিয়ে ঘর, বাইরের সব কাজ সামলাচ্ছেন।

বিয়ের সন্ধ্যে — বাড়ির ছাদে বিয়ে, ফুল দিয়ে সাজানো মণ্ডপ, আলপনা, বিয়ের পিঁড়ি, ঘট, বেলপাতা — নানা সরঞ্জাম। চেনা-অচেনা সবাই উপস্থিত, হৈ-হুল্লোড়, কিন্তু আজমদা কাছাকাছি নেই। আজমদার ভক্ত, সারা বাড়ি খুঁজে দেখলাম — উনি ভেতরবাড়িতে কোথাও নেই। হঠাৎ কী খেয়াল হলো, দালানের বাইরে খুঁজতে গেলাম; দেখি সামনের উঠোনে, যেখানে বাইরের অভ্যাগতদের বসানো হয়েছে, সেখানে চুপ করে একটি চেয়ারে বসা। অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন না, নিজে একজন অতিথির মতো বসে আছেন, মুখে মৃদু হাসি। উনি কেন ভেতরে নেই, সেই ছিল আমার প্রশ্ন, আমার সমস্যা। আমার জেঠা-জেঠিমা ওঁকে ভেতরে যেতে মানা করেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি না। মনে হয় সমাজের বিধান জানতেন, তাই নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন আজমদা। শুভবিবাহের অনুষ্ঠানে বিধর্মীয় কারো ছায়া পড়ুক, আমাদের পরিবারের কারো আপত্তি না থাকলেও, আত্মীয়-পরিজন-সমাজ?

এ নিয়ে আজমদার মনে ক্ষোভ ছিল বলে মনে হয় না। উনি পরে ঢাকাতে আইনজীবী হয়ে কর্মজীবন কাটিয়েছেন। বারবার এসেছেন কলকাতা, বর্ধমান, গুরু-গুরুমা, গুরু পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। এঁদের সম্পর্কে ধর্ম যে কোনো বাধা দেয়নি তা মেজ জেঠার একটি চিঠিতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। মেজ জেঠিমার মৃত্যুর পর ১৯৭২-এ মেজ জেঠা আমার মাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখছেন, 'তোমার মেজদিকে (জেঠিমা) সবাই অত্যন্ত গোঁড়া মনে করত। তা কিন্তু একেবারেই নয়। আজমকে তো দেখেছ। ওকে কোনোদিন বাড়ির ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা করে দেখেননি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়ে ওকে খাওয়াতেন, তারপর অন্যদের থালাবাটির সঙ্গে আজমের বাসনও নিজে মেজে নিতেন।'

তখন বুঝিনি, এখন মনে হয় স্কুলে ছাড়া আমার তো কোনো মুসলমান খেলার সাথী ছিল না। আমরা আলাদা আলাদা এলাকায় থাকতাম, সামাজিক যোগ একেবারেই ছিল না। মুসলমান সহকর্মী, ছাত্ররা আসতেন, খাওয়া-দাওয়া করতেন, বাবা-কাকারাও হয়তো যেতেন, কিন্তু আমরা পরিবার হিসেবে কোনো মুসলমান বাড়িতে কখনো যাইনি। মা বলেছিলেন একবার বহু আগে কাজি আব্দুল ওদুদের বাড়ি গিয়েছিলেন, এছাড়া মেলামেশা, আসা-যাওয়া শুনিনি, দেখিনি। এ দেয়াল রাখার প্রয়োজন বুঝে উঠতে পারিনি।

আমার স্মৃতিতে ১৯৫০ সালে আমেরিকাতে ওয়াশিংটন যাবার পরই মুসলমান ও অন্য ধর্মীয় পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ওখানে অল্পদিনেই বাড়ির সভ্য হয়ে গেলেন পূর্ববঙ্গের ইসলামদা। তিনি বিয়ে করলেন পশ্চিম পাকিস্তানের রেহানা লতিফকে। বিয়ে হলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইস্পাহানি সাহেবের বাড়িতে — বাবা বরকর্তা। দেশ দুভাগ হয়ে গিয়েছে বলেই কি এই হৃদ্যতা সম্ভব হলো?

রেহানা বৌদি আমাদের এত প্রিয় ছিলেন যে, বছর পনেরো পর যখন আমার মেয়ের জন্ম হলো তার নাম রাখলাম 'রেহানা'। এর বহুকাল আগে ইসলাম ভাইরা পাকিস্তান ফিরে গিয়েছেন, দুই দেশের গরম হাওয়াতে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেহানা বৌদিকে ফিরে পেয়েছিলাম বহু বছর পরে, নিউইয়র্কে। ততদিনে ইসলামদা নেই। ভারতবর্ষের প্রীতি ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের সমাজ দেখি ১৯৬০-এর দশকের দিল্লিতে, যখন ওখানে বাস করতে এলাম। শিক্ষক মহল, সরকারি মহল, বাণিজ্য মহল — সবাই উন্নয়নের কাজে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ যাতে একটু উজ্জ্বল হয়, সে কাজে লিপ্ত। আপন আপন ধর্ম নিয়ে থাকেন সবাই, ধর্মের বাধা দেখিনি। আজ ২০১৫-তে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না।

উত্তর ভারতে শাস্ত্রীয় সংগীতের ঘরানা ওস্তাদ ও পণ্ডিতদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদ-ভাব দেখিনি, আজো নজরে আসে না। ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ যখন ছায়ানট রাগে গাইতেন 'সুগ্রীব রাম কৃপা' বা পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুর পেশ করতেন শিবমত ভৈরবে, 'প্রথম মান আল্লা' মনের গভীর থেকে আসত ভগবান, রাম বা আল্লার কৃপার প্রার্থনা; আমার মনে হতো নিজের নিজের ধর্ম হিসেবে তাঁরা এত ধার্মিক যে, সেই নিষ্ঠার থেকেই বের হতো এই প্রার্থনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গভীর সুর। শুনেছি করাচি বা লাহোরে শাস্ত্রীয় সংগীতকে 'হিন্দুস্থানি সংগীত' বলাতে কোনো শ্রোতা যখন আপত্তি জানান ওস্তাদ সালামত আলি খাঁ জবাব দিয়েছিলেন, 'দেশ টুকরো করা হয়েছে; শাস্ত্রীয় সংগীত, সুর, তাল, রাগ-রাগিণী, সংগীতের ইতিহাস তো ভাগাভাগি হয়নি।'[৭] মনে করিয়ে দেয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের হৃদয়বিদারক ছড়া :

কেউ ভাবল না ইতিহাস ফের
ভুল হয়ে গেল বিলকুল
এতকাল পরে ধর্মের নামে
ভাগ হয়ে গেল নজরুল।[৮]

ধর্ম সমন্বয়ের মনোভাব বা ধর্মনির্বিশেষে স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল এবং বহু মানুষের মধ্যে আজো আছে। বর্ধমানের বাড়ি তারই উদাহরণ। তবু আমার ছেলেবেলার প্রশ্নের উত্তর পাইনি, সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং তার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। ইংরেজ কবি James Elroy Flecker (১৮৮৪-১৯১৫)-এর দীর্ঘ কবিতা, 'The Golden Road to Samarkand' থেকে। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তাদের সহজ-সরলভাবে ইংরেজি শেখাবার বিভিন্ন পদ্ধতির পথপ্রদর্শক মাইকেল ওয়েস্ট ১৯২০-১৯৩২ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯২১-এ এই কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

৩। বড়াই করে অনূঢ় থেকে ঊঢ় বা Crete-এর কথা লিখলেও আমি অসাধারণ কিছু ছিলাম না। মাস্টারমশাইদের ছেলেমেয়ে আমরা, পড়াশোনা বই-খাতার মাঝে থেকেছি, বাবা-মা যত্ন করে পড়াতেন, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নানা কিছু শেখাতেন। ছোটরা অনেকেই তাঁদের পছন্দের বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন — দাদা, বাবু, অমলেন্দু কাকার ছেলে তীর্থঙ্কর — সবাই। অসাধারণের কথা ওঠে তো মনে পড়ে আমাদের থেকে বড়, প্রফেসর জুন্নারকরের মেয়ে সুশীদিকে, কলেজে ওঁর মেধা কিংবদন্তি হয়ে ছিল। আর দাদা অমর্ত্য সেন সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা না করাই ভালো।

৪। পরিশিষ্টে একটি প্রশ্নপত্র দেওয়া হলো।

৫। লেখাটি মায়ের বাক্সে সযত্নে রাখা আছে। কাঁচা হাতে লেখা উত্তরের পাতা খুঁজে পেয়েছি, নম্বর ইংরেজিতে ৯৮/১০০ আর বাংলায় ৭৫/১০০।

৬। দাদার ছোটমা, অর্থাৎ আমার মায়ের নামে।

৭। এ কথা আমাকে বলেছিলেন অর্থনীতিবিদ পি.এন. দার, দিল্লিতে। উনি ও ওঁর স্ত্রী শীলা ১৯৩০-এর দশক থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন।

৮। *আরেক রকম*, তৃতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ১৬-২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২, পৃ. ৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বাবা, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত ১৯২২-এ বরিশালের বিএম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় অর্থনীতি। বিশ্ববিদ্যালয় তখন নতুন, সবেমাত্র ১৯২১-এ শুরু হয়েছে। বিলেতের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ ঘেঁষা শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরেজি কায়দার বিশাল সুদৃশ্য দালানে কলেজ, ছাত্রদের আবাস, খোলা মাঠ, পুষ্পশোভিত গাছপালা, ছাত্রদের কাছে সবকিছু রোমাঞ্চকর, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে গ্রাম বা ছোট শহর থেকে যাঁরা আসতেন, তাঁদের কাছে। পূর্ববঙ্গে এই প্রথম ইউনিভার্সিটি, সবার পক্ষে কলকাতা গিয়ে পড়াশোনা করা সম্ভব হতো না, আর্থিক সংকট ছিল প্রধান বাধা, তাঁদের কাছে এই নতুন শিক্ষাকেন্দ্র এনে দিলো উচ্চশিক্ষার বিরাট সুযোগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ অনুশীলন করে চিন্তা করতে শেখানো। এ বিষয়ে প্রথম উপাচার্য, স্যার উইলিয়ম হারটগের লখনৌতে দেওয়া (১৯২৯) বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য 'আমার মনে হয় ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি বিষয়, সে বিষয় যা-ই হোক, নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে শেখা, চিন্তা করা ছাত্রদের শেখানো হয় না। তাই নিজের মতামত তৈরি করার মতো শিক্ষাও দেওয়া হয় না। ছাত্ররা বিচার করতে শেখে না, শিক্ষকের কথা মেনে চলে। মতভেদের সাহস বা যোগ্যতা কোনোটিই তাদের হয়ে ওঠে না। মনে পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চাকরিপ্রার্থী এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার বক্তৃতার পর কোনো ছাত্র যদি এসে বলে, দুঃখিত স্যার, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, আমার চিন্তা অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কী বলবে?' উত্তর ছিল, 'আমি মনে করি আমার থেকে আলাদা মত রাখবার অধিকার কোনো ছাত্রের নেই'। আমরা ওকে নিইনি।

তবে কেবল সুবিচার দিয়ে মতামতের যোগ্যতা জীবনের পাথেয় হয় না, কারণ দৃঢ়বিশ্বাস যুক্তিকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারে। চরিত্রে তাই সাম্যতার প্রয়োজন। এটা পাওয়া কঠিন; তার থেকেও কঠিন জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে সবকিছু ছেড়ে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা।'[১]

ঢাকায় ছাত্রদের এঁরা নিজের মতো চিন্তা করে লক্ষ্য সামনে রেখে চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঐতিহ্য চলে এসেছে, আজ তো প্রায় একশ বছর হতে চলল।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন কলকাতা না গিয়ে বাবা অচেনা-অজানা আনকোরা নতুন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কেন এলেন। প্রথম কারণ নিশ্চয়ই আর্থিক — মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, যৌথ সংসার চলে বড়দাদার উপার্জনে, উপায় না থাকলে কলকাতা পাঠাতেন জেঠামশায়, তবে দেনা হতো প্রচুর। শুধু তাই নয়, বড় ভাই চিন্তা করে দেখলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি নতুন, শিক্ষকবৃন্দ অতুলনীয়, শিক্ষার ধাঁচ আলাদা — ছাত্রসংখ্যা অল্প, গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে পড়াশোনা না করে স্বচ্ছ পরিবেশে তাঁর ছোট ভাই উচ্চশিক্ষা পাবেন। ঢাকা শহর সুন্দর; ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোনো ইতিহাস নেই এ কথা ঠিক, তবে ভবিষ্যৎ থাকবে না সে কথা কেউ বলতে পারে না। বাবা বলতেন, 'দাদার এই একটি সিদ্ধান্ত আমার জীবন বদলে দিলো। আমি যা শিখেছি, যা হতে পেরেছি তা দাদার যুক্তিযুক্ত এই বিচারের জন্য।'

বাবার পক্ষে ঢাকায় পড়তে আসা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল। গৈলা গ্রামের ছেলে, ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও বরিশাল শহর ছাড়া কোথাও যাননি। গ্রামগঞ্জ থেকে আসা অন্য ছাত্রদের মতো, নানা নদীর ঢেউ ভেঙে, বড় জাহাজে বুড়িগঙ্গার ঘাটে এসে নামা সোজা কথা ছিল না। রোমাঞ্চের সঙ্গে আশঙ্কা নিশ্চয়ই ছিল, তবে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এঁদের এত তীব্র ছিল যে, ভালো লাগবে ঠিক করেই পরিবারের বাঁধন ছেড়ে উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে আসতেন। বাবার মনোভাব না জানলেও সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিতে কিছুটা আভাস পাই। করিম সাহেব এসেছিলেন ১৯৪০-এ, আঠারো বছর পর, বয়স ছিল কম (ওঁর পনেরো, বাবার উনিশ); কিন্তু দুজনেই ছিলেন বরিশালের, অর্থের টানাটানি নিয়ে বড় হয়েছেন, দুজনেরই 'মুরব্বি' বড় ভাই, যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এঁদের কথায়, লেখায় সর্বদা ফুটে উঠেছে।

সরদার ফজলুল করিম লিখছেন, (১৯৪০ সাল) 'আমি (ঢাকা) এসেছিলাম বলাটা ঠিক নয়। বরিশালের একটি 'পোলা' এসেছিল ঢাকা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা কলেজে পড়তে। [কলকাতা না গিয়ে ঢাকা এসেছিল] এর একটি বোধগম্য কারণ হচ্ছে আর্থিক। কিন্তু আজ এত বছর পর সেই ছেলেটির ঢাকা আসার ছবিটির দিকে তাকাতে গিয়ে যে কথা মনে পড়ে, সেটা আর্থিক সে বিবেচনার ব্যাপার নয়। মনে ভেসে ওঠে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ছবি। খাল-বিল বরিশালের ছেলে হলেও এমন বড় 'জাহাজে' চড়ে আর সে নিজের জেলার বাইরে যায়নি।

ঝমঝম করে বিরাট জাহাজ। বরিশাল থেকে ছেড়ে বিরাট বিরাট নদীর বুকে ঢেউ তুলে, চাঁদপুর বন্দর এবং মুন্সীগঞ্জে নোঙর করে, নারায়ণগঞ্জের নদীতে ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ থেকে তারপর আবার মীরকাদিম হয়ে সন্ধ্যার পর যখন বুড়িগঙ্গায় ঢুকল, তখন কিশোরের চোখে পড়ল, দূরের রাস্তা দিয়ে আরো দ্রুতবেগে এক-চোখো কি একটা যেন দৌড়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। সঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র ... বলেছিল, 'ওই দেখ রেলগাড়ি যায়।'[২] ...

এরপর জাহাজ ভিড়েছিল শান্ত বুড়িগঙ্গার বাদামতলী ঘাটে। জাহাজ ভিড়ল কিন্তু 'ভোঁ' দিলো না। না, আশ্চর্য নয়, কাছেই 'আহসান মঞ্জিল', সন্ধ্যার পর 'ভোঁ' দিলে নবাবসাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত হবে, তাই 'ভোঁ' দেওয়া বারণ, এই ছিল চলতি কাহিনি।

১৯৪০ সালে সেই কিশোর পোলাটি এসেছিল 'বিদেশ' ঢাকায়... বরিশালের দিকে ফিরে তাকায়নি। তাকিয়েছিল অজানা ঢাকা দেখা যায় কি না, কখন দেখা যাবে, তার দিকে। সেদিন ছিল অজানার আকর্ষণ; 'লিউর অব দি আননোন'। কিন্তু আজ স্মৃতির বাহনে চড়ে সেই ৪০ সালে ফিরে গিয়ে অত সহজে বরিশাল ছেড়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'[৩]

বাবার ক্ষেত্রে সবই মিলে যায়, তবে রেলগাড়ির বিস্ময়, ঢাকার আকর্ষণ তাঁকে গৈলা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, না ১৯২২-এ, না শেষজীবনে। আকর্ষণ আকর্ষণই থেকে যায়, কলেজ জীবনের নতুন করে পৃথিবী দেখতে পাওয়ার দিনগুলো কখনো ভুলতে পারেননি, ভুলতে পারেননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কুড়ি বছর। গৈলা — সে তো নিজের দেশ, মাটি।

বাবা অর্থনীতি কেন পড়লেন জানি না, জিজ্ঞাসা করিনি। আইসিএস বা সরকারি চাকরির ইচ্ছা ছিল না, থাকলে অর্থনীতি পড়ার কারণ বুঝতাম। ছেলে-মেয়ের চেয়ে নাতনির কৌতূহল বেশি, সে-ও জানে না। বাবা ও অর্থনীতি এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে 'কেন' কথাটা মনে জাগেনি। অশোক মিত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি লিখেছেন :

> 'আমার নিজের যা মনে হয় তা-ই লিখছি, ওঁর কাছ থেকে শুনিনি। সময়টা ছিল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের; হয়তো ভেবেছিলেন অর্থনীতি দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা ও উন্নতির ক্ষেত্রে কাজ দেবে। আরো বড় কথা, অনুশীলন করা, তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্ন-উত্তর, পাল্টা প্রশ্ন করার ক্ষমতা ওঁর এত উচ্চমানের ছিল, আমার মনে হয় এক অর্থনীতির তত্ত্বে তার ব্যবহার সম্ভব ছিল। এটা জানি যে, উনি ভাবনা-চিন্তা করে বিষয় নির্ণয় করেছিলেন, কাকতালীয়ভাবে নয়।

আমার ক্ষেত্রে একেবারেই উলটো হয়েছিল। ভর্তি হতে গিয়েছি, Dr. S. N. Roy (ইংরেজি) অফিসে নেই, দেরিতে আসবেন; Dr. H. L. Dey অফিসে বসা, হয়ে গেলাম ভর্তি, শুরু হলো অর্থনীতি।' (২১ শে মে, ২০১৬)

সংগীত, নাটক, ছবি আঁকা, সাহিত্যচর্চা, রাজনীতি; সর্বোপরি আড্ডা — সবই ছিল ঢাকার শিক্ষার বা জীবনযাপনের অঙ্গ, রমনা ছিল বড় সুন্দর। ঢাকার আপ্যায়ন, বিখ্যাত শহর ও ইউনিভার্সিটিকে নিজের করে নিতে, বন্ধুমহল পেতে বাবার সময় লাগেনি। 'বাসন্তিকা', 'শতদল' তখন শুরু হয়েছে কি না জানি না, অন্যান্য হলের সঙ্গে রেষারেষি ছিল বলে মনে হয় না, তবে ঢাকা হলের ছাত্র বলে যথেষ্ট গর্ব ছিল।[৪] আড্ডাপ্রিয় মানুষ, বন্ধুগোষ্ঠী ঢাকা হল বা অর্থনীতির সহপাঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি।

সমসাময়িক বেশি কারো কথা জানি না। আসলে ছোটবেলা থেকে বাবার এত বন্ধু দেখেছি, কে ঢাকায় ছাত্রাবস্থার, শিক্ষক অবস্থার, কে কলকাতার মেসবাড়ি থেকে বা বিলেত থেকে — ঠিক রাখা মুশকিল। ঢাকার কথায় বিশেষ করে বলতেন হাফিজুর রহমানের কথা, অর্থনীতি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের সর্বোত্তম ছাত্র — এ কৃতিত্ব আলাদা, ইতিহাসের পাতা। এক বছরের সিনিয়র হলেও দুজনের বন্ধুত্ব ছিল; পাশ করে হাফিজুর রহমান সাহেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন, যোগাযোগ রইল না। ১৯৭৫-এ ছেলে আনিসুর রহমানের বাবাকে লেখা চিঠি, 'আপনার ও মাসিমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আব্বা ও আম্মারও খুব ভালো লেগেছে।' আশ্চর্য লাগে ভাবতে, ছাত্রজীবনে কত সময় একসঙ্গে অর্থনীতিচর্চা করেছেন, হয়তো চায়ের আড্ডা দিয়েছেন, কর্মজীবন, দেশবিভাগ পথ আলাদা করে দিলো, অর্ধশতাব্দী পর দেখা, যখন ছেলে নামকরা অর্থনীতিবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক। বারবার বলি তাই, জীবনের নানা অধ্যায় সময়ে গোলাকার হয়ে ফিরে আসে।

বাবার দুজন বন্ধুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। ঢাকা হলের সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রসিকতায় তুখোড়, নাটকের স্টেজ বাঁধতে পারদর্শী, আমার অতি স্নেহপ্রবণ মামা। রসিক ছিলেন নিশ্চয়ই, এখন মনে হয় উনি ধরা ও ধরার মানুষগুলোকে কৌতুকের সঙ্গে দেখতেন। গানের জলসার ব্যবস্থা, থিয়েটারের মঞ্চের বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে পরিচয়, সে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড্ডার নিত্যসঙ্গী — পরে টানাটানির সংসারের সহমর্মী ও বাবার 'ব্যাংক',[৫] আজীবনের বন্ধুত্ব।

স্বাধীনচেতা মানুষ, চাকরি করতে অনিচ্ছুক, ব্যবসা করবেন — খুললেন 'টি সেন্টার', বাবাদের সান্ধ্য আড্ডার সেন্টার। ওঁরা কী গল্প করতেন জানি না, কল্পনা করি সাহিত্য, সংগীত, রাজনীতি, যুদ্ধ, দেশের অবস্থা ছাড়াও ছিল পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক টানাপড়েন, ব্যবসার ওঠানামা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় কর্তার সঙ্গে সমস্যা — নৈরাশ্য, উৎসাহ কিছুই বাদ পড়েনি — দুজনের মধ্যে ছিল চরম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, মাথা উঁচু করে থেকেছেন চিরকাল, দেশবিভাগে কলকাতা এসে মাথা উঁচু করে থাকতে সুবোধমামার প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। ব্যবসা তেমন জমল না, ওকালতি পাশ করেছিলেন, সেটাই জীবনধারণের পথ হলো। আসলে পঞ্চাশোর্ধ্বে নিজেকে নতুন করে তৈরি করা সহজসাধ্য নয়, দিশেহারা না হয়ে রাস্তা খুঁজে বের করেছিলেন, যা করেছিলেন আরো লাখ লাখ মানুষ, আবার করতে পারেননি, তাও লাখ লাখ মানুষ। সুবোধমামার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, ঢাকার পুরনো সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ক্ষমতার শিখরে, মুখ ফিরিয়ে, পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন — যেন অচেনা, আমি নিজের চোখে দেখেছি। বাবা তাঁর পাশে থেকেছেন চিরকাল, ঠিক যেমন মা-বাবার জীবনে, বিশেষ করে প্রথম দিকের অর্থের টানাটানির সংসারে সুবোধমামা পাশে থাকতেন। ঋজু, লম্বা চেহারা, ওঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আলাদা, বড় মাপের, বড় মনের মানুষ ছিলেন, আমার এই রসিক মামা।

সহপাঠী ছিলেন শচীন চৌধুরী। বাবা তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিতেন। 'শচীন ক্লাসে আসতে শুরু করল একটু দেরিতে। একদিন ক্লাসরুমে বসে আছি, দেখি একটি ছিপছিপে লম্বা ছাত্র ঢুকছেন, পরনে লুটিয়ে পরা কোঁচানো ধুতি, শৌখিন পাঞ্জাবি, উস্কোখুস্কো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনে জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল চোখ। প্রথম দিনই বুঝতে পারলাম এর মেধা অসাধারণ।' যে যুক্তি, তর্ক, আলোচনা শুরু হয়েছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাগানে, ক্লাসে, চায়ের দোকানে তা শেষ হলো শচীনকাকার জীবনের সঙ্গে ১৯৬৬-র ডিসেম্বর মাসে। বাবার অনুশীলন করার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলেছেন অশোক মিত্র, শচীনকাকার মধ্যে বাবা পেয়েছিলেন তাঁর জুড়ি। দাশগুপ্ত ও চৌধুরী পরিবারে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ঢাকার জিন্দাবাজার লেনের চৌধুরীবাড়িতে, তা আজো অটুট রয়েছে।

১৯৯০-এর আগস্ট মাসে ছোট ভাই শঙ্খ চৌধুরী শান্তিনিকেতনে মা-বাবার কাছে কয়েকদিন ছিলেন। দিল্লি ফিরে মায়ের কাছে চিঠি — দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের সম্পর্ক এবং ওঁর বিভিন্ন ধরনের সংগীতজ্ঞানের নিদর্শন :

> 'শান্তিবৌদি, আমাদের প্রথা অনুযায়ী আপনাকেই লিখছি। আপনিই রোজ আমাকে কী খাওয়াবেন তাই নিয়ে চিন্তা করতেন, নিজে গিয়ে মাছ কিনতেন, কাজেই আমার প্রথম কর্তব্য,
> 'প্রথমে বন্দনা করি দেবীর নাম নিয়া,'
> 'তারপরে দরবার করি দাদার কাছে গিয়া'—
> এই ধরনেরই আমাদের দেশে জারি গানওয়ালারা বা নারদনামা জারি করতো।'
> আমি আপনাদের বাড়ির খোলা জমি, ফুলের কেয়ারী, আর গাছপালার কথা প্রায়ই ভাবি।... প্রণাম নেবেন।
>
> ইতি
> শঙ্খ

খামখেয়ালি শচীনকাকা, ১৯২৬-এ হঠাৎ করে পরীক্ষা না দিয়ে ঢাকা ছেড়ে কোথাও চলে গেলেন। বাবা বলতেন, 'এমএতে প্রথম হলাম ঠিক, তবে শচীন না থাকায় ঠিক জমল না।' পরের বছর পরীক্ষার ঠিক আগে ফিরে বাবাকে বললেন, 'দেখুন না, নোট-টোট কিছু আছে কি না — পরীক্ষাটা দেব ভাবছি।' পরীক্ষা দিলেন, ফল আশানুরূপ হলো না, একেবারেই ভালো নয়। ১৯২৭, ঢাকা ছেড়ে দিলেন চিরকালের মতো, চলে গেলেন বোম্বাই। গতানুগতিকভাবে হয়তো এমএর ফল ভালো হলো না, তবে তা প্রতিভা কেড়ে নিতে পারে না। ১৯৪৯-এ *Economic Weekly* শুরু করে ভারতের চিন্তাশীল, বিদ্বান সমাজে আলোড়ন তুললেন। এর উত্তরসূরি, *Economic and Political weekly* আজ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। ছুরির কাঁটার ধারে উনি বিষয়ের গভীরে যেতে পারতেন, বলতেন, 'বুঝলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটোরিয়াল আর তোমার বাবার সঙ্গে সান্ধ্য আড্ডায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।' মা তাতে যোগ করতেন, 'হ্যাঁ, আর কম্বলের লোম বাছা!'[৬]

অর্থনীতির শিক্ষক কারা ছিলেন আমার বিশেষ জানা নেই। অশোক মিত্র লিখেছেন, 'ঢাকায় অর্থনীতিতে অধ্যাপকরা নিজেরা নামকরা না হলেও বিষয়ের ভিত্তি পোক্ত করে দিতে পারতেন।' প্রফেসর পানান্ডিকর, বাবাদের প্রথম বছরের বিভাগীয় কর্তা, খুব ভালো পড়াতেন। পড়ানোর সঙ্গে ছাত্ররা কে কেমন, কী করছে নিরীক্ষণ করতেন। বহু বছর পর উনি যখন নব্বইয়ের ঘরে ওঁর জামাতা[৭] জিজ্ঞেস করেছিলেন ঢাকার ছাত্র অমিয় দাশগুপ্তকে মনে আছে কি না। জবাব দিলেন, 'মনে আছে, কেন মনে থাকবে না। কৌতূহলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র ছিল, ভালো প্রশ্ন করত। আরেকটি কথা বেশি করে মনে আছে, ওর অভ্যেস ছিল খাতায় নিজের সই (signature) বারবার মকশো করা।' বাবা বললেন, একেবারে ঠিক কথা, সাধারণ ব্যাপার, 'সই'! তাকে সুন্দর করার প্রচেষ্টা লেগেই থাকত। আশ্চর্য, ষাট-পঁয়ষট্টি বছর পার হয়ে গিয়েছে, প্রফেসর সাহেব ভোলেননি। অমনোযোগী ছাত্র নয়, বুদ্ধিমান অথচ সই নিয়ে মকশো করে ক্লাসে সময় কাটাচ্ছে এর জুড়ি পাওয়া দুষ্কর।

ইকোনমিক থিওরি পড়াতেন কৃষ্ণবিনোদ সাহা, কড়া শিক্ষক। নির্দেশ দিতেন, প্রশ্নের উত্তরে বা প্রবন্ধতে অবান্তর কথা যেন না থাকে, সোজাসুজি বক্তব্য লেখা চাই। 'থিওরি অব ডিমিনিসিং মার্জিনাল ইউটিলিটি'র ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন, পরিমলকাকা সাহিত্যিক, ভদ্রতায় বিশ্বাসী — লিখলেন, 'তৃষ্ণা নিবারণ করতে কারো কাছে জল চাইলে প্রথম গ্লাস তৃপ্তির সঙ্গে খাব, দ্বিতীয়টি কম তৃপ্তিতে, তৃতীয় গ্লাস দেওয়া হলে 'ধন্যবাদ' বলে ফিরিয়ে দেব।' খাতা ফিরে এলো, মন্তব্য 'ধন্যবাদ' অবান্তর, ফিরিয়ে দেওয়াটা আসল। মূল্যবান শিক্ষা, হুকুম কাজ করেছিল। বাবা ও পরিমলকাকার অবান্তর কথা ও অতিরঞ্জনবর্জিত লেখায় বিশেষ্যের ব্যবহার কদাচিৎ, সোজাসুজি এঁরা চলে যেতেন মূল তথ্যতে। পরে শচীনকাকার *ইকোনমিক উইকলি*র সাপ্তাহিক সম্পাদকীয় বা প্রবন্ধর সম্পাদনায় একই জিনিস লক্ষ করেছি। সুবোধমামা একে বলতেন, 'হোমিওপ্যাথিক ডোজ'। ১৮১৭-তে ইংল্যান্ডে লেখা ডেভিড রিকার্ডোর *Principles of Economics*-এর ইংরেজি এ রকম আড়ম্বরহীন; সাহাসাহেব প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। ১৯২০-এর দশক ছিল ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সের যুগ, অ্যাডম স্মিথ দাদামহাশয়, রিকার্ডো পরের প্রজন্মের সর্বোচ্চ, ওঁর তত্ত্ব ক্লাস, বাড়ি, বাবাদের চিন্তা-ভাবনা, এমনকি আমার ছোট্ট বাগানেও[৮] ছেয়ে থাকত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তি হওয়ার আনন্দ অভিজ্ঞতা, ছাত্র হয়েও স্বাধীনতা আবার নিয়ম পালন করার তর্জনীর সম্মুখীন হওয়ার বিবরণ দিয়ে গেছেন পরিমল রায়।

'মনে পড়িতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তি হইয়া আমাদের কী আনন্দ। সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রমনার সাত সমুদ্র ছড়াইয়া ছিল। 'চামারি' হইতে নীলক্ষেত তরুণ বিদ্যার্থীর বিপুল সাম্রাজ্য, রীতিমতো দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার আমন্ত্রণ। আমরা নতুন আগন্তুকরা কিছুদিন দিশাহারা আত্মহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যাহা দেখি, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যাই। কমনরুম দেখিয়া বিস্ময় মানিলাম, লাইব্রেরিতে ঘুরিয়া অভিভূত হইলাম, সুবেশ অধ্যাপকদের দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইলাম, দীর্ঘ করিডরগুলি রুদ্ধশ্বাসে হাঁটিয়া ফিরিলাম, ঘোমটাপরা তরুণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যার্থিণীদের দেখিয়া চক্ষু কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বৎসর ছাত্রজীবন কাটাইয়াছি। তাহার প্রত্যেকটি দিন মুক্ত স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। ইচ্ছা হয় ক্লাশে যাও, ইচ্ছা না হয় যাওয়ার আবশ্যক নাই, — আমাদের কালে হাজিরা গোনার নিয়মই ছিল না। দরকার হইলে লাইব্রেরিতে যাইতে পার, না হইলে গাছের তলায় গিয়া জুটিতে পার। আদিত্যর চায়ের দোকানে আড্ডা জমাইতেও বাধা নাই, কমনরুমে গিয়া কুশন-আঁটা চেয়ারে তোফা ঘুম লাগাইতেই বা দোষ কী? প্রতি সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও না কোথাও কিছু একটা হইতেছে, — কোনো হলে ডিবেট, কোনো হলে ড্রামা, কোথাও সেমিনার, কোথাও বা বক্তৃতা। রমনার প্রতি সন্ধ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ উৎসবে আলোকিত, যেখানে খুশি গিয়া বসিলেই হয়। জনতায় ভিড়িবার ইচ্ছা না থাকে, রমনার দীর্ঘায়িত পথগুলিতেও হই হই করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, ক্ষুধার উদ্রেক হইবে।

সে বয়সটা ছিল ভালো লাগিবার বয়স। যাহা দেখিতাম তাহাতেই আনন্দ। অধ্যাপকদের দেখিয়াই কী ভালো লাগিত। যাঁহারা তরুণ বয়স্ক, তাঁহাদের প্রতিদিন নিখুঁত নিভাঁজ ধোপদুরস্ত পরিধান, মার্জিত সুশ্রী চেহারা, প্রসপেক্টাসে পড়িতাম এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ। ভাবিতাম ইহাদের মতো যদি একদিন হইতে পারি, তবে জীবন ধন্য। কিন্তু আমার কি তাহা হইবে? অত বিদ্যা কোথা হইতে আসিবে? তাছাড়া আমার চেহারা কি উহাদের মতো সুন্দর, কিংবা পরিধেয় অত চমৎকার? অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অধ্যাপকদের দেখিয়া সম্ভ্রমের অন্ত ছিল না। অনেকেই ডক্টর। ওই শব্দটির দ্যোতনা বড় সুন্দর লাগিত। ভাবিতাম আমাদের পড়াইবার জন্য কী বিরাট রাজসূয় আয়োজন! উনি কে? সত্যেন বসু। ইনিই সত্যেন বসু? উনি? ডা. জ্ঞান ঘোষ। ইনি? ডা. রমেশ মজুমদার। আর উনি? ডা. সুশীল দে, ইংরাজি ও সংস্কৃতের প্রতিভা। বিদ্যার বিপণিতে যেন হালখাতার উৎসব। চতুর্দিকে একটা নেশাধরা আমন্ত্রণ।'[৯]

১৯২২-এ পরিবেশ ভিন্ন ছিল না। যতই সাহিত্য, সংগীত, আড্ডা, 'সই'র মকশো করার শখ থাকুক, মূল লক্ষ্য পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুধু বড়দাদার নানা আশা বা নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, পুরো পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত বহু আগে তিনি নিয়েছিলেন; পরীক্ষার ফল ভালো করা প্রয়োজন ছিল। ছুটিতে গ্রামে, বাকি সময় ঢাকায়, চারটি বছর বড় আনন্দে কাটল। এমএ পরীক্ষার শেষ দিন, কলেজের শেষ দিন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনা করার দিন; হঠাৎ করেই এলো দুঃসংবাদ, দুঃখ, বিষাদ। পরীক্ষা শেষে বিকেলে হোস্টেলে ফিরে এসে জানতে পারলেন দুদিন আগে ঠাকুর্দামশায় মারা গেছেন। বাবাকে জানানো হয়নি পরীক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য। এটা নিজস্ব পারিবারিক দুঃখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এর পরের ঘটনা ঢাকা হলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত; লিখছি কারণ শিক্ষকরা যে সবসময় ছাত্রদের সহানুভূতির সঙ্গে দেখতেন তা নয়, নিষ্ঠুরও হতেন। পিতা হারানোর পর বাবার ঢাকা হলের অভিজ্ঞতা তারই এক নিদর্শন।

১৯২৬-এ নিয়ম ছিল যে পরীক্ষা হয়ে গেলেও ছুটি না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের হোস্টেলে থাকতে হবে। অনুমতি ছাড়া হোস্টেল ছাড়া সম্ভব নয়। ঠাকুর্দামশায় নেই — সে খবর বাবা যখন পেলেন, ছুটি হতে তখনো কিছু বাকি। বাবা তিনবার ওয়ারডেনের ঘরে গিয়ে তাকে পেলেন না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাদামতলী না পৌঁছলে সে রাতে স্টিমার পাবেন না। যখন কিছুতেই ওয়ারডেনের সঙ্গে দেখা হলো না, পুরো পরিস্থিতি বুঝিয়ে, কেন ছেড়ে যেতে হচ্ছে জানিয়ে, ওয়ারডেনের ঘরে চিঠি লিখে রেখে, কোনোমতে স্টিমার ধরলেন — বরিশাল হয়ে গৈলা যাবেন, দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ সময়।

শ্রাদ্ধশান্তির পর কলেজে ফিরে এসে দেখেন রূঢ় ভাষায় ওয়ারডেনের কড়া চিঠি, 'তুমি অনুমতি না নিয়ে ছুটির আগে চলে গিয়েছ, তোমাকে ৫ টাকা দণ্ড দিতে হবে।' দণ্ড দিতে হলো, তা নইলে হয়তো ডিগ্রি পাবেন না। কে জানে। দুঃখিত ও অপমানিত হয়ে বাবা চিফ ওয়ারডেনকে সবিস্তারে লিখলেন। চিফ ওয়ারডেনের লম্বা উত্তর এলো, 'অল্পবয়সে পিতৃহারা হওয়ার দুঃখ আমি জানি।' এরপর নানা উপদেশ — যাতে বাবা নিরাশ না হয়ে যান। চিঠির শেষে লেখা, 'তোমাকে দণ্ড দিতে বলা উচিত হয়নি। আমি নিজে তোমাকে এ টাকা ফিরিয়ে দেব।' বলাবাহুল্য, সে টাকা কখনো আসেনি, তার অপেক্ষাও কেউ করেননি।

বাবার আসল ক্রোধ ছিল ঢাকা হলের ওয়ারডেনের ওপর। প্রতিশোধ নেওয়ার পথ নেই। পথ বার হলো কিছুদিন পর। ছুটির পর কলেজ খুলেছে, বাবা এখন শিক্ষক। কলেজের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, মুখে সিগারেট। সেই (ঢাকা হলের) ওয়ারডেন উলটোদিক থেকে হেঁটে আসছেন। কাছাকাছি আসতেই সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে বাবা এগিয়ে গেলেন। ওয়ারডেন বিষচোখে বাবার দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া সরাতে সরাতে চলে গেলেন; একজন শিক্ষককে কিছু বলা সম্ভব নয়। হলো প্রতিশোধ নেওয়া। বাবারও একসময় ছেলেমানুষি ছিল তা আমাদের বিশ্বাসের বাইরে।

আমার বোঝার ভুল, এতে ছেলেমানুষি ছিল না, কোনোভাবেই না। শুধু অপমানবোধ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিত মানুষ, যার দায়িত্ব ছাত্রদের প্রতিপালন করা, তিনি এত রূঢ়, হৃদয়হীন, সংবেদনশীলতাহীন হতে পারেন, তাও আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে, তেইশ বছরের যুবকের কল্পনার বাইরে ছিল। শিক্ষা, মনুষ্যত্ব, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন ছাত্রজীবনে তা মনে রেখেছিলেন সারাজীবন, তবে এ অপমান ভুলতে পারেননি। শেষ জীবনে যখন এ গল্প বলতেন, যেমন অশোক মিত্রকে বলেছিলেন, অনুভব করেছি অট্টহাসির পেছনে লুকিয়ে থাকা আঘাত।

* * *

গরমের ছুটি কাটালেন গ্রামে, মাকে থান পরা অবস্থায় দেখতে কষ্ট হয়, বেশি করে সময় কাটালেন মায়ের কাছে। ছুটি প্রায় শেষ, পরীক্ষার ফল বের হওয়ার অপেক্ষা; বাবা এখন সাবালক, চাকরির চিন্তা, পরিবারের ভরণপোষণের চিন্তা। এমএর ফল প্রকাশ হয়নি, চিঠি এলো বাবাকে লেকচারার ক্লাস টু (মাইনে ১২৫-২০০ টাকা) নিযুক্ত করা হয়েছে। জীবনে আমরা কিছু না কিছু হতে চাই, বাবার স্বপ্ন ছিল কোনো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হওয়ার, না চাইতেই তা পেয়ে গেলেন, তাও ঢাকায়, এ সৌভাগ্য কজনের হয়। দুঃখ ছিল তাঁর বাবা দেখে গেলেন না পুত্র এবারো প্রথম ভাগে প্রথম, তার কর্মজীবনের শুভ অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

বাবার মতো অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ একজনকে কী করে নিযুক্ত করা হলো? রাজ্জাক সাহেব বলেছেন, 'অমিয় দাশগুপ্ত এমএ পরীক্ষা দিয়েছেন। রেজাল্ট এখনো বেরোয়নি। এমন সময়ে ডিপার্টমেন্টে লেকচারার নেওয়ার কথা উঠল। ডিপার্টমেন্টের হেড তখন জে সি সিংহ। তিনি রিকমেন্ড করলেন কলকাতার এক লোককে। কিন্তু ভিসি হারটগ হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি বললেন, বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে ডিপার্টমেন্টের। ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাত্র বেরিয়েছে। তাহলে তাদের কেন নেওয়া হবে না। অমিয়বাবুর কথা উঠল। হারটগ বললেন, If he gets first class in his M.A. he will be appointed. (ও যদি এমএতে ফার্স্ট ক্লাস পায় তাহলে ওকে চাকরিতে নেওয়া হবে)। এভাবে অমিয়বাবু লেকচারার হলেন।'[১০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ইতিহাসে দেখতে পাই এখানকার দূরদর্শী কর্ণধাররা যেমন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করতেন, তেমনি সদ্য পাশ করা মেধাবী ছাত্রদের নিযুক্ত করতে দ্বিধা করতেন না। একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে অর্থনীতি বিভাগের প্রথম প্রমুখ, এস এস পানান্ডিকর। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডউইন ক্যাননের ছাত্র হয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ডিএসসি করে চব্বিশ বছর বয়সে সোজা চলে এলেন ঢাকায় অর্থনীতি বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। শিক্ষকতা ও গবেষণার দিকে মন বেশি ছিল, 'ডিন' হতে রাজি হলেন না, খুব বেশি দিন ঢাকায় না থাকলেও অর্থনীতি বিভাগকে পোক্তভাবে গড়ে তুললেন। বিশ ও তিরিশের দশকে দেখি নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগের অধ্যাপকরা অল্পবয়সী সদ্য পাশ করা, যেমন অর্থনীতিতে অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, বীরেন গাঙ্গুলী, ইংরেজিতে মন্মথ ঘোষ, অমলেন্দু বোস, ইতিহাসে পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অজিত সেন। এরপর দেখা যায় এঁদের ছাত্রদের; অর্থনীতিতে পরিমল রায়, আব্দুর রাজ্জাক, মজরুল হক, সমররঞ্জন সেন, এম এন হুদা, নরেশ রায় — এঁরা নিযুক্ত হতেন তাঁদের মেধার জন্য, বয়স বা অভিজ্ঞতার জন্য নয়।

প্রায় সমবয়সী, ধীরে ধীরে সবাই মিলে গবেষণা ও আড্ডার একটি চমৎকার গোষ্ঠী তৈরি করে নিলেন; দিনে একত্র হতেন কলেজের কমনরুমে, সন্ধ্যেয় কারো বাড়িতে। আড্ডা চলত রোজদিন। গান-বাজনা, সাহিত্য, থিয়েটার, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই ছিল এর অঙ্গ। এঁরা ঢাকা শহর ও তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবাসতেন; কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় রমনা ও পল্টনের মাঠের মতো মনোরম জায়গা তাঁদের নজরে বিশেষ আসত না। কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের পরস্পরের একটি বন্ধন হয়ে উঠেছিল, যা সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের ছোটদের কাছে এঁরা কাকা-কাকি, মাসি-মেসো, একই পরিবার, একই গ্রন্থিতে বাঁধা। পরের দিকের ছাত্রছাত্রীরা হলেন দাদা-দিদি, যেমন সমরদা; শুধু আব্দুর রাজ্জাক রয়ে গেলেন রাজ্জাকসাব — অথচ উনি চিরকালই কাছের মানুষ!

শিক্ষকরা ছিলেন ছাত্রবৎসল এবং ছাত্ররাও মাস্টারমশাইদের শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। ক্লাস ও টিউটোরিয়াল নিয়ে মাস্টার-ছাত্রের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ, আলোচনা-প্রশ্নোত্তর প্রচুর হতো। পড়ানো, পড়াশোনার সঙ্গে চলত গবেষণা। ছাত্রদের প্রশ্ন মাঝেমধ্যে হতো শিক্ষকদের চিন্তাধারার উৎস। আমার বাবার প্রথম জীবনের অর্থনীতির তাত্ত্বিক লেখা ঢাকা থেকে শুরু এবং ওঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত প্রবন্ধ যাতে উনি দেখিয়েছেন Keynes-এর General Theory আমাদের দেশে কেন প্রযোজ্য নয়, এর চিন্তাধারা ১৯৪২-এ ওঁর ক্লাসে কোনো ছাত্রের প্রশ্ন থেকে শুরু হয়েছিল।[১১] বাবাকে যে ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক আলোচনার পথপ্রদর্শক বলা হয়েছে তার অঙ্কুর ও বিকাশ ঢাকায়। এঁরা যাঁর যাঁর বিষয়ে মগ্ন ছিলেন, আলাপ-আলোচনায় দিন কাটাতেন। পরিমলকাকার স্মৃতিচারণে আছে

> '১৯৩১ হইতে ১৯৪৫ — চৌদ্দ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ঢাকা হইতে বিদায় লইয়াছি। [এই] চৌদ্দ বৎসর পূর্বতন শিক্ষকদের নিবিড়তর সহায়তায় বিদ্যাশিক্ষার কিছুটা গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই সম্পর্কে শিক্ষক ও সুহৃদ অমিয়কুমার দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার যে সখ্যস্থাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়াছিল, তাহা জীবনের পরম সৌভাগ্য। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরস্পর যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছিলাম, বোধকরি গ্রন্থসংসর্গের উহাই শ্রেষ্ঠ বিকল্প। দুজনে সত্যসত্যই ইকোনমিক্সে ডুবিয়াছিলাম। রমনার কৃষ্ণচূড়ারঞ্জিত পথে কত সন্ধ্যা ডিমান্ড ও সাপ্লাইর বিশ্লেষণ শুনিয়া ফিরিয়াছি। অমিয়বাবু, বীরেনবাবু, অজিতবাবু (সেন) আমাদের ছাত্রকালীন আদর্শ ছিলেন।'[১২]

রমনার রাস্তা পার হয়ে প্রায় দিনই আলোচনা আমাদের বাড়িতে পৌঁছত। আসতেন রাজ্জাক সাহেব, পরিমলকাকা, সমর সেন, এম এন হুদা, মজরুল হক, নরেশ রায়, অমিতা দত্ত। শুধু অর্থনীতি কেন, অন্য বিষয়ের অধ্যাপকরাও আসতেন, মন্মথ ঘোষ, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, অমলেন্দু বসু, মাঝে-সাঝে ছাত্রছাত্রীরা। আড্ডা চলত দীর্ঘ সময় অবধি — শুধু মনে আছে আমার কাজ ছিল বইয়ের আলমারি থেকে বই আনা। Hicks-এর *Value and Capital* সোনালি অক্ষরে নাম লেখা — আর তার মাঝে ছবির মতো ডায়াগ্রাম। খুব অল্প বয়সে শিখেছিলাম দুটি ইংরেজি শব্দ, ডিমান্ড আর সাপ্লাই। Theory of value নিয়ে এঁরা আলোচনা করতেন, লিখতেন, সুতরাং এই দুটি শব্দ তো শিখবই।

শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে ঢাকায় এঁদের সুনাম ছিল; বাইরে নাম হয় সে ইচ্ছে থাকা অস্বাভাবিক নয়। খ্যাতি অর্জন করার একটিই রাস্তা ছিল, মনোযোগ দিয়ে অধ্যাপনা করা ও প্রবন্ধ লেখা। নাম কেনার জন্য এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করার ইচ্ছে বা অভ্যেস এঁদের ছিল না। ঢাকার বাইরে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে যেতেন নিশ্চয়ই, পরীক্ষা নিতে বা 'সিলেবাস' বানানো জাতীয় কোনো কাজে, আজকাল যাকে 'নেটওয়ার্কিং' বলা হয় সেজন্য নয়। সীমিত পরিমাণে 'নেটওয়ার্কিং' তখনো ছিল, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস টু লেকচারারের যে আভিজাত্য ছিল, তা ভাঙতে কেউ রাজি ছিলেন না। ছোট জায়গা, কেউ ভাঙলে ব্যঙ্গ-কৌতুকের শিকার হয়ে যেতেন, এমনকি হয়তো ছড়ার নায়কও হয়ে যেতেন!

নাম ও টাকার জন্য ছোটাছুটি করার ওপর একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য। ছাত্র অসিত হালদারকে লিখছেন গুরু শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর '—র মতো যদি নাম ও টাকা খুঁজিয়া বেড়াও তবে তোমার দশা কিরূপ হইবে জানো

গৃহী ত্যজিকে ভয়ে উদাসী
বনখণ্ড তপকো যায়।
চোলী থাকি মারিয়া
বেরই চুনি চুনি খায় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হইল উদাসীন, তপস্যার জন্য গেল বনখণ্ডে, দেহকে মারিল ক্লান্ত করিয়া — এত করিয়া শেষে বাছিয়া বাছিয়া খাইতে লাগিল জঙ্গলী কুল!!

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী অবনীন্দ্র[১৩]

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা, অর্থনীতিবিদ জোন রবিনসন লিখেছিলেন, 'আমার শিক্ষক পিগুসাহেব বলেছিলেন জনতার সমর্থন বা অনুমোদন পাওয়ার জন্য নিজের মতামত তৈরি করো না। সত্যকে তুলে ধরা জন্মগত অধিকার, তাকে জনতার সম্মতির জন্য বা শাসকদলের খুশির জন্য কখনো ত্যাগ করো না। এই উপদেশ ছিল অমিয় দাশগুপ্তর জীবনদর্শন ও অর্থনীতিচর্চার দৃঢ় খুঁটি।'[১৪]

ঢাকা ইউনিভার্সিটির বড় সুন্দর ছবি এঁকেছেন ভবতোষ দত্ত। 'ঢাকায় যে কত সহজ ও স্বাভাবিক এই স্বজনবোধ সেটা তাঁরাই জানেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সময়ের আবহাওয়ায় যাঁরা বড় হয়েছেন। সেখানকার পরিবেশই ছিল আলাদা। শহরের উপকণ্ঠে রমনার কয়েকশো একর জমি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। উদার সবুজাস্তীর্ণ মাঠে মোগল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত ছড়িয়ে থাকা সেসব সুরম্য সৌধ, মাঝেমধ্যে টলটলে বাঁধানো পুকুর, সবুজের মধ্যে গড়িয়ে যাওয়া পিচের কালো রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে গাছ বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষীর মতো। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকাশ্রেণি আরেকদিকে ছাত্রাবাস, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল। কার্জন হল ও লিটন হলে বসত সান্ধ্য অনুষ্ঠান — সাহিত্যসভা অথবা নাটকের অভিনয়। আজ এতদিন পরে যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় যেন রূপকথার রাজ্য পেরিয়ে এসেছি।'[১৫]

অন্তরঙ্গ পরিবেশে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, বন্ধুত্ব; দেশবিভাগ, দূরত্ব কেড়ে নিতে পারেনি; ঢাকার মোহ বহুজনের মনে চিরজীবন থেকে গেছে। প্রতাপশঙ্কর লাহিড়ি তাঁর বাবা, সংস্কৃতের নামি অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ি সম্বন্ধে লিখেছেন :

বাবার শিক্ষক জীবন ১৯২৫ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হওয়ায় তিনি খুব তৃপ্তি লাভ করেন। ঢাকা, কলকাতা, বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। বাঙালির সাহিত্য, সংগীত এবং সাংস্কৃতিক পীঠস্থান এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, নলিনী ভট্টশালী, চারুচন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দ্যোপাধ্যায়, শহীদুল্লাহ সাহেব প্রভৃতি গুণীজনের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। মোহিতলাল মজুমদারের স্ত্রীকে আমাদের পরিবারের লোকেরা 'বড়মা' বলে ডাকতেন। শরীর ভেঙে পড়লেও বৃদ্ধ বয়সে সুদূর বেহালা থেকে আমাদের সিঁথির বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে আমার মার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। অদ্ভুত আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা ছিল এই গুণী পরিবারগুলো। খুব সম্ভবত ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ থেকে জাহিদা খাতুন এলে, আমার দিদি গীতা চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে মিলে ঢাকা আনন্দময়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী নলিনী মিত্রের (বামফ্রন্ট সরকারের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের মা) সঙ্গে দেখা করে বিপুল আনন্দে উদ্ভাসিত হতে দেখেছি। নাটকের প্রতি ছিল বাবার অপরিসীম আগ্রহ। ওঁর পরিচালনায় শুনেছি অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। ঢাকা বেতারকেন্দ্র ছিল আমাদের পরিবারের ঘরবাড়ি। সুধীরলাল চক্রবর্তী, উৎপলা সেন (ঘোষ), প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নির্মলা ভট্টাচার্য প্রভৃতি সুরকার ও নাট্যপরিচালকদের সঙ্গে ঘটে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আমার মামা বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক। বুদ্ধদেব বসু, অশোক মিত্র, অজিত দত্ত, ভবতোষ দত্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি অসংখ্য গুণী ব্যক্তির বীজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোপিত হয়েছিল।

বাবার কথা শেষ করার আগে আমার মায়ের কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই উদারমনা অসামান্যা ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে সংসারের সব বোঝা নিজে বহন করে বাবার পড়াশোনার সুযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। রন্ধনশিল্পে ও সংগীতের প্রতি ছিল মায়ের অসীম অনুরাগ। বৈচিত্র্যপূর্ণ রন্ধনকার্যে অনেকজনকে খাইয়ে আনন্দ পেতেন।

বাবার অগণিত ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীর জন্য আমাদের বাড়িতে যে-কোনো সময়েই ছিল অবারিত দ্বার। আমার মা হাসিমুখে সাধ্যাতীত পরিশ্রমে নিজেকে বাবার সুযোগ্যা সহধর্মিণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।[১৬] — মনে হয় দাশগুপ্ত বাড়ির কথা, আমার মা-বাবার কথা।

ঢাকার বেতনের হার ছিল স্বল্প, কোনো কারণে পদোন্নতি ছিল সময়সাপেক্ষ বা উপেক্ষিত, তা-ও বাবা-কাকারা ঢাকায় থাকতে ভালোবাসতেন। কারণ ছাত্র, পরিবেশ ও সহকর্মী নিয়ে কলেজের আবহাওয়া ছিল গবেষণার পক্ষে অনুকূল। বিশ-তিরিশের দশকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে লেখা অর্থনীতির প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায়, বই ও দেশি-বিদেশি পত্রিকায় (জার্নালে) ওখানকার গ্রন্থাগার কত সমৃদ্ধ ছিল। বই আনানো বোধহয় অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু দেশ-বিদেশ থেকে খোঁজ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন পত্রিকা আনানো সহজসাধ্য নয়। কত জায়গা থেকে জার্নাল আসত তার নিদর্শন পাই বাবার প্রথম দিকের লেখার সূত্র/টীকা থেকে। ১৯২৮ থেকে বিভিন্ন প্রবন্ধে বিবিধ সূত্র *American Economic Review, Economica, Economic Journal, Journal of the Royal Statistical Society*, লম্বা ফর্দ। বইয়ের ভাণ্ডার অফুরন্ত। জানতে ইচ্ছে করে কে বা কারা গ্রন্থাগার শুরু করেছিলেন, লালন-পালন করে এত শীঘ্র একে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ছিলেন দূরদর্শী; ভালো বই, জার্নাল পড়ার সুযোগ না দিলে ভালো ছাত্র তৈরি হয় না, ভালো গবেষণা হয় না। উপার্জন কম, অনেক ক্ষেত্রে টানাটানির সংসার, তবু বাবা-কাকারা অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবেননি, একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল গ্রন্থাগার, এমনটি চট করে পাওয়া যায় না। কর্মজীবন এখানে কাটাবেন, এর বাইরে কেউ ভাবেননি।

গবেষণা, অধ্যাপনা ছাড়া বন্ধুবর্গের সময় কীভাবে কাটত তা জানার জন্য আবার পরিমলকাকার শরণাপন্ন হতে হয়। 'অধ্যাপক হিসাবে আমাদের মাসিক দর্শনী সামান্যই ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কোনোদিন ভাবি নাই, বেতন এত কম কেন। তখন সস্তার দিন ছিল, পরিমিতসংখ্যক পরিবারের সংসার সামান্য টাকায় স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত, চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। কোনোদিন Ph.D হইতে পারিলে selection grade-এ পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া রোমাঞ্চিত হইতাম। বিশ্বাস করুন, বহুদিন অতি সচ্ছল সংসার সলিলে অবগাহন করিয়া দিন কাটাইয়াছি। আড্ডা দিয়া, গল্প করিয়া, পড়াশুনা করিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে জীবন যাপন করিয়াছি। আমরা house tutor হইতে চাই নাই, বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করি নাই, কাহারও মুখাপেক্ষার প্রয়োজন বোধ করি নাই, কোথাও ছোট হইবার দরকার মনে হয় নাই। আমাদের যে গোষ্ঠীটি ছিল, তাহা ছিল নিতান্তই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিছুরই অভাব ছিল না, বহির্বাণিজ্য অপ্রয়োজনীয় ছিল। আমরা প্রতি সন্ধ্যায় একত্র হইয়া রাজাউজির মারিতাম। পরদিন দেখা যাইত, তাহারা আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে! আবার মারিতাম। সে-সকল রাজাউজিরকে আমরা বোধ করি খুব সস্নেহে বধ করিতাম। তাই কখনওই রাহুগ্রাসের অধিক ফল ফলিত না।'[১৭]

অন্যত্র যাওয়ার কথা বাবা-কাকারা ভাবেননি এ কথা ঠিক, ঢাকার জীবনে তৃপ্তিবোধ করতেন সে কথাও ঠিক, তবে এ-ও মনে রাখা উচিত যে, স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চাকরি ছিল না।

যা ছিল তা দূরে, যেমন বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ — ভিন্ন ভাষা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন চলন — এমন জায়গায় যাওয়া খুব সুখপ্রদ ছিল না। এ-ও মনে রাখা দরকার যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রায় সীমার বাইরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয় ১৯২১-এ, তবে এ নিয়ে কথাবার্তা চলছিল অন্তত দশ বছর ধরে। শেষ পর্যন্ত 'সেন্ট্রাল লেজিসলেচারের অ্যাক্ট অনুযায়ী ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার আশুতোষ ঘোর বিরোধিতা করলেন, ফট ইট টুথ অ্যান্ড নেইল দ্বিতীয় ইউনিভার্সিটি হলে তাঁর জমিদারি খাটো হয়ে যাবে।'[১৮] বিরোধিতা সংক্রামক ব্যাধি, সেই যে ঢাকার স্নাতক বা অধ্যাপকদের প্রতি কলকাতার তরফ থেকে অবজ্ঞা শুরু হলো, কোনোদিন মুছে গেছে কি না জানি না।

অশোক মিত্রের মতে, ঢাকার ছোঁয়া থাকলে কলকাতা তাকে ছুঁয়ে দেখবে না। বাবা দেশ-বিদেশে বহু জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন, অতিথি প্রফেসর হয়ে গিয়েছেন, কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ, বেঙ্গল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য সংস্থায় বক্তৃতা দিয়েছেন বহুবার, বাবার জীবনের শেষ বক্তৃতা কলকাতায়, জীবনের শেষ সংবর্ধনা কলকাতায়, 'বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদে', কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওঁকে কখনো ডাকেনি। ঢাকার ছাত্র-মাস্টারদের কলকাতায় চাকরি পাওয়া একসময় প্রায় অসম্ভব ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন নতুন, উচ্চপদে অনেককেই কলকাতা থেকে আনা হয়, সবাই তো জ্ঞান ঘোষ বা সত্যেন বোস মশায়ের মতো নন, সংকীর্ণ মনের অধ্যাপকও ছিলেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ রাজনীতি ভেদাভেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এনেছিলেন, যদিও শুনেছি ধর্মীয় ভেদাভেদ করতেন না।

উন্নাসিকতা একতরফা ছিল না। ঢাকার ছাত্রদের মনে হতো কলকাতায় বইবিদ্যে প্রচুর, কিন্তু বিশ্লেষণ, চিন্তা, প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয় না। এ নিয়ে চূড়ান্ত একটি গল্প প্রচলিত ছিল। কলকাতা থেকে প্রথম ভাগে B.A. Hons. পাশ করে কোনো মেধাবী ছাত্র ঢাকায় M.A. পড়তে ইচ্ছুক। বিভাগীয় হেড, সম্ভবত রেন সাহেব তার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। নানা প্রশ্নের পর ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শেক্সপিয়র পড়েছ?' উত্তর এলো, 'হ্যাঁ স্যার, পড়েছি।' প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বই পড়েছে?' শোনা যায় ছাত্রটি বলেছিলেন, '*Seven Ages of Man*'। হয়ে গেল তার ঢাকার ছাত্র হওয়ার ইচ্ছে। সত্য ঘটনা কি না জানি না, তবে উন্নাসিকতার পরিচয় পরিষ্কার হয়ে আসে।

ঢাকায় বলা হতো কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা রাশি রাশি বই পড়ে, তবে সারমর্ম বুঝে নিজের মতামত তৈরি করতে পারে না। স্যার উইলিয়ম হার্টগের মন্তব্য (যা প্রথম দিকে লিখেছি) কি কলকাতার শিক্ষাকে লক্ষ করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭; দেশ স্বাধীন, বিভক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকদের মধ্যে আবদ্ধ নেই, বেশিরভাগই ছেড়ে চলে গেছেন। দুপক্ষের উন্নাসিকতা বা রেষারেষি থামেনি, রসিকতার লড়াইতে পরিণত হয়েছে। এই তারিখে বাবার কাছে লেখা পরিমলকাকার চিঠি — বাবা কটকে, পরিমলকাকা দিল্লিতে।

'অমলেন্দু এবং মনিবাবু থাকাতে আমাদের আড্ডাটা বেশ হয়। অমলেন্দুকে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির নামকরা ছাত্র) নিয়ে পরিহাসটাই উপভোগ্য। ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তুলনামূলক আলোচনাটা মাঝেমধ্যে খুব exciting হয়। আমি বলি, তোমরা M.A. (CAL) অর্থাৎ মাকাল ফল। বাইরের চাকচিক্যই সার। ও বলে, সেই 'বুধ করির' গল্প। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন একটি ঢাকার ছেলেকে ওহে, তোমাদের শহীদুল্লাহ্, শুনেছি, খুব পণ্ডিত লোক? ছেলেটি বলেছিল 'বুধ করি'।'

ঢাকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা বিভাগীয় কর্তা বা 'সিনিয়র' যাঁরা ছিলেন তাঁদের কূট রাজনীতির সঙ্গে বাবা-কাকারা পাল্লা দিয়ে উঠতে পারতেন না, ব্যঙ্গ-কৌতুকের অস্ত্র গোপন তূণে রেখে দিতেন, সময়মতো ছুড়ে দেওয়ার জন্য। আগস্ট ১৫, ১৯৪৭-এর পর ব্যঙ্গ বাক্যই রয়ে গেল, বাকি সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার ঝুলিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে থেকে ছাত্রীরা ভর্তি হয়েছেন জানি না, তবে অর্থনীতি বিভাগের চারজন মেধাবী ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। ১৯২৯ কি ১৯৩০-এ ভর্তি হলেন কমলা, সম্ভবত গুপ্ত, অসাধারণ মেধাবী। বাবার সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে, যে তালিকায় আমিও আছি, ইনি ছিলেন অন্যতম। ডাক নাম 'খুনু', মায়ের স্কুলজীবনের বান্ধবী, বিয়ে করেছিলেন বাবার বন্ধু সুধীর সেনকে। উনি নিজেই আমাকে বলেছেন, 'তোমার বাবার আফসোস ছিল ওঁর প্রথম মেধাবী ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে ঘর-সংসার করল।' দ্বিতীয়ত, ১৯৩৫-এর স্নাতক সাধনা সেন, ইনিও প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন, পরে যতদূর জানি শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন। ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় মাকে লেখা ওঁর বড় সুন্দর একটি চিঠি আছে, মায়ের আপ্যায়ন কোনোদিন ভুলবেন না। এঁকে কাশীতেও দেখেছি। ১৯৩৯ নাগাদ ছাত্রী ছিলেন অমিতা চৌধুরী, তীরসম যুক্তিতর্ক, খিলখিলে হাসি, আড্ডার ভাগ আমিও পেয়েছি। ইনি বোধ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন একসময়; লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস থেকে পিএইচডি করে আসেন — কর্মজীবন কেটেছে অর্থনীতির অধ্যাপনায়। ২০০৮-এর ৪ ডিসেম্বরে কলকাতায় বাবার 'Collected Works'-এর উদ্বোধনে এসেছিলেন, ছোটখাটো, সুন্দরী, সর্বদা হাসিমুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অমিতাদি। ১৯৪৫-এর স্নাতক মীরা আইচ (বসু), আজো টেলিফোনে কথা হয়। সহপাঠী সত্যব্রত বসুকে বিয়ে করেছিলেন, আমি দুজনার কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ পেয়েছি।

* * *

ইউনিভার্সিটি শক্ত কথা, আমরা কলেজ বলতাম। কলেজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দূর থেকে, যাঁরা বাড়িতে আসতেন তাঁদের দেখতে পেতাম, বাকি সব 'নাম' বা শোনা ঘটনা। মা-বাবার কথাবার্তা থেকে অনেক কিছু জানতে পারতাম; বাবার অভ্যেস ছিল কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মাকে তাঁর দিনপঞ্জি বলা; কার সঙ্গে দেখা হলো, ক্লাস কেমন হলো, কোন ছাত্রের 'ক্ষুরধার মস্তিষ্ক', কে আশানুরূপ করছে না, বিভাগীয় রাজনীতিতে কী অসুবিধে হচ্ছে, নিজের নয় ছাত্রছাত্রীদের। আমার মা ঘরোয়া গৃহিণী হলেও বাবার কাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তাছাড়া যেহেতু এই কলেজের স্নাতক, ওঁর সঙ্গে অনেকের পরিচয় ছিল। আমার কাছে এঁরা শুধু 'নাম', শুনে কল্পনায় তাঁদের এঁকে নিতাম।

'কমনরুম' কথাটা প্রায়ই শুনতাম — রহস্যময় রোমাঞ্চকর জায়গা, সেখানে বাবা-কাকারা ক্লাসের মাঝে, বিকেলে আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচনা রিকার্ডো, মার্শাল হতে পারে, পরিমলকাকার কৌতুক রচনা, ছড়া হতে পারে আবার কলেজের কারো প্রতি বিরক্তিও হতে পারে। 'কমনরুম' দেখতে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, মনে করলাম দোতলায় একটি বিরাট ঘর, ৫নং-এর বসার ঘর থেকে চারগুণ বড়, শিক দেওয়া দুটি জানালা, দরজা একটি। ছড়িয়ে রাখা কয়েকটি গোল চায়ের টেবিল, গদি লাগানো কেদারা এদিক-ওদিক, আবার কাছাকাছিও, বিক্ষিপ্ত বসার ঘরের মতো। বিকেলে চায়ের পর্ব, সুদৃশ্য পাতলা চিনেমাটির পেয়ালা-পিরিচ, সুগন্ধি চা, হয়তো অরেঞ্জ পিকো (এর থেকে ভালো আমি কিছু জানতাম না), সঙ্গে অভিজাত বিস্কুট, 'হান্টলি পামার'।

মা-বাবার কথাবার্তার টুকরো টুকরো কথা শুনে আমরা বাইরের জগতের কথা কিছুটা আন্দাজ করতাম। পাড়া নিরিবিলি, চল্লিশের দশকের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ছাত্র আন্দোলন কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছত না — ছোটদের কাছে তো নয়ই। বাবার দিনপঞ্জি থেকে জানতে পারলাম কীভাবে একটি ছাত্র হঠাৎ করে আহত হয়ে কমনরুমে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কপালে, মাথায় লাঠির বাড়িতে তার শরীর রক্তাক্ত। কে, কেন বুঝতে পারলাম না। এটুকু বুঝলাম কলেজ নিরাপদ স্থান নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা-কাকাদের জন্য চিন্তা শুরু হতে লাগল। চিন্তা আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে 'কমনরুম' সম্বন্ধে স্বপ্নভঙ্গ কিছুটা হলো। বাবা যেভাবে ছেলেটির আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে ছুটে এসে দরজার কাছে পড়ে যাওয়ার কথা বললেন, মনে হলো দোতলা নয়, ঘরটি নিচতলায়। দরজা ঘরের মাঝে, একদিকে নয়, ছবিটা বদলে দিতে হলো। মনে তো কত কিছু কাজ করে। সন-তারিখ জানি না — এটা অনেক আগের কথা, ৫নং-এর আগে, যখন অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা ছোট বারান্দা দেওয়া এক বাড়িতে থাকতাম। কলেজে অশান্তি; শহরে অশান্তি, রাস্তায় লোক চলাচল কম, রোজ সন্ধ্যেবেলা উৎকণ্ঠা নিয়ে মা ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, বাবা কখন বাড়ি ফিরবেন সে চিন্তা নিয়ে। বাবা ফিরলে দিনপঞ্জি।

কমনরুম রাজনীতির আলোচনায় সরগরম থাকত। আব্দুর রাজ্জাক, মজরুল হক, সমররঞ্জন সেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তিনজনেই পড়াচ্ছেন। প্রথম দুজন মুসলিম লীগ, তৃতীয়জন গান্ধিবাদী — দেশবিভাগে মত নেই। আলোচনা উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতো, ঘোর (verbal) বিবাদ দুপক্ষে, কিন্তু বন্ধুত্বে এর আঁচ পড়েনি। ঢাকা থেকে জোড়া ইলিশ দিল্লিতে সমরদার বাড়িতে নিয়মিত পৌঁছেছে, রাজ্জাক সাহেব পাঠাতেন।[১৯]

রাজনীতির কথায় মনে পড়ে একদিনের আলোচনা। কমনরুমে জোর তর্ক হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও বিশ্বের রাজনীতি নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালু, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী? এই ঘরের দেয়ালে বিশ্বের মানচিত্র টাঙানো থাকত। বাবার ভাষায়, হঠাৎ রাজ্জাক উত্তেজিত হয়ে লাফ দিয়ে ম্যাপের কাছে গিয়ে বলল, সব লাল হয়ে যাবে, লালে লাল হয়ে যাবে। এ কথা চীন লাল হওয়ার অনেক আগে; ভবিষ্যদ্বাণী আশা না নিরাশা থেকে তা অবিশ্যি জানা হয়নি কখনো। রাজ্জাক সাহেবের উত্তেজিত হতে সময় লাগত না, ছেলেবেলায় যখন দেখেছি। পরে ধীরস্থির মানুষটিকেও দেখেছি। 'লালে লাল হওয়া' আশা বা নিরাশা জিজ্ঞেস করিনি, কেন করিনি, তার উত্তর নিজেই দিয়েছি। আমার অভ্যেস হচ্ছে খবর, ঘটনা, মন্তব্য, গ্রহণ বা সংগ্রহ করে স্মৃতির ঝুলিতে ভরা, কেউ কেউ একে স্মৃতির সংগ্রহালয় (Museum of memories) বলেন, কৌতূহল দেখিয়ে প্রশ্ন করা ধাতে নেই।

রাজ্জাক সাহেব আর সমরদা মতবিরোধ ও বন্ধুত্ব নিয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে গেলেন পিএইচডি করতে, রাজ্জাক সাহেব প্রফেসর ল্যাস্কির সঙ্গে, সমরদা প্রফেসর হায়েকের সঙ্গে। ওখানে পরিচয় এবং গভীর বন্ধুত্ব হলো মেধাতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অর্থনীতির ছাত্র ফ্র্যাঙ্ক হানের সঙ্গে। এত নিকট বন্ধু যে ফ্র্যাঙ্কের বিয়েতে এঁরা দুজন হলেন সাক্ষী। ফ্র্যাঙ্ক হাঙ্গেরিয়ান, স্ত্রী ডরথি খাঁটি ইংরেজ, সাক্ষীদের একজন পাকিস্তানি, অন্যজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানি/ভারতীয়; এমন আন্তর্জাতিক বিবাহ অনুষ্ঠান চল্লিশের দশকে শোনা যেত না।

একসময়, এখন জানি চল্লিশের দশকে, সান্ধ্য আলোচনায় 'মুনীর' নামটি প্রায়ই শুনতাম। তখন ছাত্র আন্দোলন, রাজনীতি নিয়ে উত্তেজনা চতুর্দিকে। মুনীর কে, কী করেন জানি না, শুধু কথার মধ্যে নামটি ঘন ঘন এসে পড়ে। রাজ্জাক সাহেব বলতেন, মুনীর কইছে, বুঝতে পারলাম মুনীরের কথার গুরুত্ব আছে। কখনো দেখিনি একটি মানুষ, সর্বদা যা করতাম, মনে মনে ঠিক করলাম একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কেউ, যাকে ইংরেজিতে বলা যায় firebrand ছাত্র, চেহারাও নিশ্চয়ই এঁকেছিলাম, আজ খেয়াল নেই। সত্যি firebrand ছিলেন কি না জানি না, তবে ভাবতে ভালো লাগত। বহু বছর, আমার অনেক বয়স হওয়া অবধি, এই মানুষটির ওপর কৌতূহল থামেনি — রাজ্জাক সাহেবের কথায় এমন জাদু ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করার অভ্যেস ছিল না, বাবাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারতাম, করিনি। অথচ ওঁর ব্যক্তিত্ব বাবাদের আলোচনা থেকে বালিকা মনে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই এত বছরের প্রশ্ন। যখন জানতে পারলাম, উনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, দেরি হয়ে গিয়েছে।

অন্য কৌতূহলের পাত্র ছিলেন হায়দারদা — শান্তিনিকেতনের হায়দারদা। দেখতে ছোটখাটো, একটু খাটো সাদা পাজামা আর খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে পুরো আশ্রম ঘুরে বেড়াতেন। আড়ম্বরহীন ভালো মানুষ। বিদ্যা ভবনের ছাত্র, বিদ্যা ভবন সম্বন্ধে এটুকুই বুঝতাম, সবচেয়ে উঁচু ধাপের ছাত্র। এর বেশি জানার কৌতূহল ছিল না, উনি যাই পড়াশোনা করুন না কেন, গুরুগম্ভীর লেখাপড়া করেন, বন্ধুর মতো আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। কত চড়ুইভাতিতে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একসঙ্গে খোয়াইতে হেঁটে গিয়েছি। শুকনো দিন হলে আমাদের জন্য নেহাতই অকেজো শুকনো খেজুরপাতা পেড়ে দিয়েছেন। একবার গরমের ছুটির পর শান্তিনিকেতন গিয়ে শুনলাম হায়দারদা ঢাকা চলে গিয়েছিলেন। কিঞ্চিৎ ঈর্ষা হয়েছিল বৈকি — ঢাকা, পুরানা পল্টন, গেণ্ডারিয়া তো আমার। সে ছিল ক্ষণিকের জন্য, আমরা ছোটরা একটি বন্ধু হারিয়েছি, মন কেমন করত। অমন ভালো মানুষটির কথা ভেবেছি, ওঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল না কোনোদিন — কোথায় আছেন, কেমন আছেন তা জানার রাস্তা আমাদের জানা ছিল না। এ তো 'গুগল'-এর দুনিয়া নয় যে হায়দারদা, শান্তিনিকেতন করে খবর পাব। যতদিনে জানতে পারলাম ইনিও এক প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক, নাম মফজ্জল হায়দার চৌধুরী, আবার দেরি হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একা একা বসে চিন্তা করি — মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি কী করছিলাম? দিল্লিতে — ভারত যুদ্ধে নামার আগে, বিশেষ খবর আসত না। মুক্তিগানের গায়ক/গায়িকাদের জন্য গানের অনুষ্ঠান করতে সাহায্য করেছি, স্ট্যাটিস্টিয়ান/গায়ক বেনুর বন্ধুত্ব পেয়েছি, হয়তো একটু যত্ন করেছি, এর বেশি কিছু নয়। আমার স্বামী অনেক গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। আমার সংসার মা-বাবার মতো ছিল না, বাবা যেমন ডিপার্টমেন্ট থেকে বাড়ি এসে সব কথা বলতেন, আমাদের ঠিক উলটো। সরকারি কাজে, বিশেষ করে উচ্চপদে, গোপনীয়তা অপরিহার্য। রেহমান সোবহান আসতেন মুক্তিযুদ্ধের সময়, কী কথা বলতেন জানি না, নানা গম্ভীর আলোচনা হতো — আমার শ্রুতির বাইরে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রধান পরামর্শদাতা পি এন দার আসতেন ভারতের বিদেশি কর্মপন্থা (পলিসি) নিয়ে আলোচনা করতে; আরো কেউ কেউ আসতেন। জানি কী নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি দূরে। একবার সাহস করে দার সাহেবকে বলেছিলাম, 'এখনো মুক্তিযুদ্ধে, যুদ্ধের বেশে সাহায্য কেন করছ না, কত দেরি করবে?' আরেকবার বলেছিলাম, 'পূর্ববঙ্গ যখন স্বাধীন হবে, যদি সম্পর্ক ভালো রাখতে চাও — সমানে সমানে কথা বলো, বড়ভাই হওয়ার চেষ্টা করো না। আমাদের বাঙালদের আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত বেশি।'

ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের জীবনের কেন্দ্র হলেও আমাদের সম্পর্ক মুখে মুখে শুনে। প্রফেসর সত্যেন বোসের বাড়ির বাগান, বিশেষ করে খর্বকায় মোটা সবুজ ডাঁটায় লাল, গোল বল লিলি ছাড়া কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। স্পোর্টসের দিন একটি দিন পরিবারসহ সবাইকে নেমন্তন্ন করা হতো। মহিলা, ছেলেমেয়েরা একদিকে তাঁবুর নিচে, পুরুষরা অন্যদিকে। মাঝে খেলার মাঠ। আমরা এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াই, পরিচিত কাউকে দেখলে মা সম্ভাষণ জানান। দেখা হলো প্রফেসর সুশীল কুমার দের সঙ্গে — মা এঁর ছাত্রী ছিলেন। মায়ের কোলে ভাই, খুব ছোট, তার তখনো নামকরণ হয়নি। মা তাঁর মাস্টারমশাইকে অনুরোধ করলেন ভাইয়ের জন্য একটা ভালো নাম দিতে। মনে পড়ে লম্বা, দোহারা চেহারা, অত্যন্ত সুপুরুষ, একটু চিন্তা করে বললেন, 'পার্থ — পার্থসারথী, অর্জুনের সারথী, শ্রীকৃষ্ণের নাম — এই নাম দাও।' বড় সুন্দর নাম হলো ভাইয়ের। সময়টা ছিল ১৯৪২-এর ডিসেম্বর বা ১৯৪৩-এর শুরু।

সেদিনেরই আরেকটি ঘটনা। মা ভাইকে কোলে নিয়ে তাঁবুর নিচে বসা — আমি যথারীতি পাশে দাঁড়িয়ে। এক বয়স্ক মহিলা ভাইকে দেখতে এসে প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে, বেশ জোরগলায় বললেন, 'দেখো, দেখো, শান্তির ছেলে কেমন হয়েছে। কী সুন্দর হয়েছে, কী সুন্দর দেখতে! যেমন রং,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন চুল।' একটু থেমে, 'আহা! মেয়েটা এ রকম হলো না।' ওঁর দোষ কী — খর্বকায়, কৃশ, কালো, চোখসর্বস্ব মেয়ে — ফর্সা গোলগাল ভাইয়ের পাশে তো এ মন্তব্যই শুনবে। সেদিন বড়রা আমাকে নানা কথা দিয়ে বুঝ দিয়েছিলেন, ভবিষ্যৎ জীবনে এ নিয়ে হাসাহাসি করেছি।

এই মহিলা মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়ি আসতেন দুপুরের পর বেড়াতে। মাকে স্নেহ করতেন বা মা নিঃশব্দে ওঁর কথা শুনতেন, কারণ বলা মুশকিল, রিকশা করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসতেন মেদবহুল মানুষটি, বেশ অনেকক্ষণ থাকতেন। মা কিঞ্চিৎ ভয়ে থাকতেন কারণ, কার বাড়ির অন্দরমহলের ঠিক, বেঠিক, শোনা, আধশোনা গল্প শুরু করবেন কিছু বলা যেত না। একদিন, যথারীতি এসে মায়ের ঘরে চেয়ারে বসেছেন; মহিলারা ভেতরের ঘরেই বসতেন। আমি আর কোথায় যাব — কাছাকাছি ঘুরঘুর করছি গল্প শুনতে। হঠাৎ শুনলাম, 'তারপর বুঝলে শান্তি, দরজা তো খোলা যাচ্ছে না, ভেতর থেকে বন্ধ, কোনো সাড়া-শব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত দরজা ভাঙতে হলো, দেখা গেল মেয়েটি, কদিনইবা বিয়ে হয়েছে, মাটিতে শোয়া, প্রাণ নেই; বন্দুকের গুলিতে নিজেকে মেরে ফেলেছে, বুঝলে — আত্মহত্যা করেছে। সারা বুক গোল হয়ে পুড়ে একেবারে কালো। আহা বৌটি হিংয়ের কচুরি খেতে কী ভালোবাসত।' আজ অবধি জানি না এটা কোনো সত্যি ঘটনা, নাকি কোনো রহস্য-বইয়ের কাল্পনিক কাহিনি।

স্বভাবসুলভভাবে দেখতে পেলাম একটি সুন্দরী বধূ, অল্প বয়স, আমাদেরই ঘরের মেঝেতে চিত হয়ে শোয়া, তার সারা বুক পুড়ে গেছে, রয়ে গেছে এক নিটোল গোল পুড়ে যাওয়ার কালো ছাপ। পাশে দোনলা বন্দুক। মেয়েটির জন্য দুঃখ হলো। এই কাল্পনিক ছবি আমার মনে গাঁথা, আজো দুঃখ হয়, সত্যি যদি এমন কিছু হয়ে থাকে।

'কালো'র ওপর মন্তব্য আরো শুনেছি। এক মাস্টারমশায়ের স্ত্রী লম্বা, ফর্সা — যেহেতু ফর্সা, সর্বসম্মতিক্রমে সুন্দরী। এক-আধ দুপুরে আসতেন মায়ের কাছে, আসতেন বলছি, তবে ওঁর অবয়বের আগে ঢুকে পড়ত সাদা পাউডারের প্রলেপ। কথার মাঝে একদিন বললেন, 'জানেন, কালো বললেই যে কুৎসিত হবে তা ঠিক নয়। ভাইয়ের জন্য মেয়ে দেখতে গেলাম, কালো মেয়ে, মুখখানা কিন্তু মন্দ নয়, তবে কালো তো!' বেচারি মা, পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামবর্ণা কন্যা, যাকে কালো কুৎসিত বললেও হয়তো ভুল হতো না, কী করে যে আমাকে আগলে রাখতেন। আমার মনঃকষ্ট নিশ্চয়ই হতো, তা নয়তো মনে থাকবে কেন? কলেজে বিভিন্ন রকমের মানুষ, বিভিন্ন পরিবেশ, সবকিছু কী নির্মল, স্নিগ্ধ, সংবেদনশীল, সর্বোপরি বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য অভিজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখের। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবা নিয়ে গেলেন কার্জন হলে, ছাত্রীরা থিয়েটার করবেন, *যবনিকার অন্তরালে*। নাচ-গান হবে তাও শুনেছিলাম। পৌঁছতেই দাদা-দিদিরা অর্থাৎ বাবার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে সামনে বসিয়ে দিলেন শতরঞ্চির ওপর অন্য ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। বাবা তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কোথাও চেয়ারে। আমি তো আনন্দে আত্মহারা, বাবার বিখ্যাত কলেজে এসেছি। যতদূর চোখে ভাসে একটি ছোট মেয়ের নাচ হলো, তার মাথায় মুকুট ও ওপর হাতে ডাকের সাজের গয়না। হঠাৎ দেখি গণ্ডগোল, চেঁচামেচি, হুল্লোড়, ছাত্ররা দুহাতে চেয়ার নিয়ে উত্তেজিত হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছেন, চেয়ার ছোড়ার জন্য দৌড়ে আসছেন। পুরো প্যান্ডেলে pandemonium বা অরাজকতা। বলি ভয় পাইনি; কিন্তু ছাত্ররা চেয়ার নিয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছেন সেই ছবি আজো ভুলিনি। যাই হোক, ভয় পাওয়ার বিশেষ সময় পাইনি, সত্যব্রতদা ও আরো অনেকে, হয়তো মনুদা, তোজাম্মলদা বা অজানা কেউ আমাকে কোলে তুলে নিয়ে এক কোল থেকে আরেক কোলে প্রায় ছুড়ে দিলেন, এ ছবিও স্পষ্ট দেখতে পাই। দাদাদের কাছ থেকে কীভাবে বাবার কাছে বা বাড়ি পৌঁছলাম জানি না। এটা জানি দাদারাই[২০] আমাকে চেয়ারের আঘাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

নাচের ব্যাপারটা মনে হয় আমার কল্পনা। কেউ বলেছেন কার্জন হলের পর্দায় কিছু আঁকা ছিল, যার বিরোধে কিছু ছাত্র উত্তেজিত হন। সত্যব্রত বসু লিখেছেন, বন্দে মাতরম বন্দনা করা হয়েছিল বলে এই ঝড়। সত্যব্রতদার কথা ঠিক, কারণ পুরো ঘটনা সেদিনের ও পরবর্তী কদিনের, ওঁর বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আরো অনেকে নিশ্চয়ই লিখেছেন। আমি কিন্তু মেয়েটির নাচের চলমান ছবি আজো দেখতে পাই!

সানাউলদা অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় কার্জন হলে উপস্থিত ছিলেন না। বন্ধু সত্যব্রত বসু লিখছেন, 'বিশেষভাবে মনে পড়ে সানাউল হকের কথা। সে সাহিত্যপ্রেমী ও কবি। তাঁর কাব্য উচ্ছ্বাসের প্রকাশ সহমর্মী ছাত্রদের কাছে। সেখানে জাতি-ধর্ম বিচারের কোনো প্রশ্ন নেই। আবেগময় ব্যথিত কণ্ঠে সানাউল প্রশ্ন করেছিলেন, কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এই মারামারি ও উন্মত্ততা।'[২১] আজ এত বছর পর কবি সানাউলদা, সমাজচিন্তক সানাউলদা, অর্থনীতিবিদ সানাউলদাকে স্মরণ করে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, 'আজো এই প্রশ্ন আমাদের তাড়া করছে, জবাব আজো অজানা। উত্তর আজো আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।'

এই ছোট বয়সে যাদের দাদা-কাকা বলতাম তাঁদের ছাড়া কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হতো না, হওয়ার কথা নয় — দেখতাম তাঁদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রফেসর সত্যেন বোস আসতেন, গল্প করতেন, দেখেছি; আপনভোলা মানুষ, একটি মেয়ে ঘোরাফেরা করছে তা হয়তো লক্ষ করেননি। ওঁকে পরে দেখেছি কলকাতায়, অমিয়র মেয়ে বলে স্নেহ করতেন, বাবা, উনি, বীরেন জেঠা মিলে 'খোজ পরিষদ' বলে যে একটি সংস্থা গড়েছিলেন চল্লিশের দশকে, সে কথা বলতেন। দীর্ঘায়ু না হলেও খোজ পরিষদের কাজ হয়েছিল খুব উঁচু মাপের। স্বাধীনতার পর কিছু চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী দেশের উন্নতির পথ খুঁজতে শুরু করেছিলেন এই পরিষদের মাধ্যমে: মুদ্রাস্ফীতি; কালোবাজার, ডিভ্যালুয়েশনের ওপর চর্চা হয়েছে, বই বের হয়েছে। আমি কলকাতা যাওয়ার বহু আগে খোজ পরিষদ বন্ধ হয়ে গেছে, প্রফেসর বোসের মনে এ কাজের মূল্য ও স্মৃতি তখনো আছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ১৯৪৩-এর হাঙ্গামার প্রথম দিন প্রফেসর বোস ছাত্রদের নিরস্ত করতে বা বাঁচাতে যা করেছিলেন, তা উনিই করতে পারতেন। সত্যব্রত বসু লিখেছেন, 'কার্জন হল প্রেক্ষাগৃহের নিকটবর্তী ঘরে গবেষণারত ছিলেন ঢাকা হলের প্রভোস্ট প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। দুই বিরোধী ছাত্র গোষ্ঠীর দাঙ্গা কার্জন হল সম্মুখ প্রাঙ্গণে চলে আসে। হট্টগোলে বিচলিত হয়ে বিজ্ঞানসাধক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মাথাভর্তি অবিন্যস্ত চুল সমন্বিত মানুষটি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই বিবদমান ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে।'[২২] নিশ্চয়ই বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, 'করছিস কী তোরা?'

পরে কাশীতে, দিল্লিতে যখনই দেখেছি, মনে হয়েছে বহু পরিচিত দাদু-সমান কেউ। ছাত্রবৎসল, বন্ধুবৎসল, মানুষটি ছিলেন বিরাট মাপের। ওঁকে ঘিরে পরিমলকাকার মজার গল্প আছে — ঢাকার কথা। হঠাৎ করে কারো সঙ্গে দেখা হলে প্রফেসর সত্যেন বোস কী কথা বলবেন ভেবে পেতেন না। সাধারণ বাক্যালাপ সহজে আসত না। পরিমলকাকার সঙ্গে আলাপ ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল না। রমনার রাস্তায় দেখা হয়ে যেত, কাকাকে দেখলে প্রতিবার এই প্রশ্নোত্তর

> প্রফেসর বোস : পরিমল, তুমি সেই বাড়িতেই আছ?
>
> উত্তর হ্যাঁ, ওটা আমার নিজের বাড়ি।
>
> প্রফেসর বোস : ও হ্যাঁ, বলেছিলে বটে।
>
> স্বল্প বিরতি।
>
> পরিমল, কান্তি তোমার মামা হন?
>
> উত্তর : না, কান্তি আমার পিসতুতো ভাই।
>
> প্রফেসর বোস : হ্যাঁ, বলেছিলে বটে।

এরপর যে যার পথে হেঁটে চলে যেতেন। পরিমলকাকা বলতেন, 'ভাবছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর দেখা হলে বলব, আমি সেই বাড়িতেই আছি, কান্তি আমার পিসতুতো ভাই।'[২৩]

প্রফেসর সত্যেন রায় থাকতেন সেগুনবাগানের কাছাকাছি 'উশ্রী' নামক বাড়িতে — রাঁচির জলপ্রপাত থেকে বোধহয় নাম নেওয়া। তিনি সাইকেল করে এদিক-ওদিক যেতেন, ৫ নং-এর গেটের সামনে সাইকেলে হেলান দিয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করছেন, ছবিটি স্পষ্ট। ওঁর মেয়ে ফুল্লরা, স্বভাবে এবং চেহারায় ফুলের মতো সুন্দর, পরে দিল্লিতে দেখেছি। এঁকে নিয়ে পরিমলকাকার গল্প আছে। অত্যন্ত ভালো মানুষ, মেকি কথা জানেন না, মনের কথা বলেন। পরিমলকাকার মা গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য বাড়িতে একটি স্কুল চালাতেন; বলা বাহুল্য, স্কুলে অর্থাভাব, এদিক-ওদিক থেকে টাকা তুলে চালাতে হয়। রাস্তায় একদিন পরিমলকাকার সঙ্গে প্রফেসর রায়ের দেখা। উনি বললেন, 'পরিমল, তোমার মা গরিব বাচ্চাদের জন্য স্কুল চালাচ্ছেন, বড় ভালো কথা। এরকম কাজ কজন করেন? টাকার প্রয়োজন জানি, আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাই।' পরিমলকাকা পুলকিত। সহজ-সরল মন থেকে বলা মোক্ষম বাক্য 'কিন্তু পরিমল, মুশকিল কি জানো — আমার কোনো টাকা নেই।'[২৪]

প্রশ্ন হতে পারে, এসব ঘটনা শুধু পরিমলকাকার সঙ্গে কেন হতো, হতো নিশ্চয়ই অনেকের সঙ্গে; পরিমলকাকা মনে রাখতেন, তার থেকেও বড় — আড্ডার মধ্যে রসিয়ে গুছিয়ে বলতে পারতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যাপক ছিলেন যাঁর মনে ঈর্ষা একটু বেশিমাত্রায় ছিল। নিজে উচ্চপদে আছেন, অবিচারের শিকার কোনোদিন হননি — তবু কারো ভালো হলে, অর্থাৎ কেউ লেকচারার ক্লাস টু থেকে ক্লাস ওয়ান হলেই তাঁর নিদ্রার অন্তর্ধান হতো। সান্ধ্য আড্ডায় এ নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি হতো। ভদ্রলোককে পরে কলকাতায় দেখেছি, কাকাদের বিচার একেবার ঠিক। ধরা যাক, ওঁর নাম 'হিংসুটে মাস্টার', বড়-ছোট কেউ ঈর্ষা দেখালে, বাবা-কাকারা অমনি বলে উঠতেন, 'আরে একি! এ তো দেখছি হুবহু হিংসুটে মাস্টার!' বুদ্ধদেব বসুর 'আশ্চার্য' নামক ছড়ার দ্বিতীয় ছত্র হয়তো 'হিংসুটে মাস্টার'কে উদ্দেশ করে লেখা, কে জানে? উনিও তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

> 'চোখে-মুখে মিথ্যা বলো তুমি নিত্য
> কাউকে দেখলে সুখী জ্বলে যায় পিত্ত'।[২৫]

আয়ার সাহেবকে মনে পড়ে, ধুতি অন্যভাবে পরা, পাঞ্জাবির ধাঁচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাদা। ছোটখাটো মানুষ, মাথায় টিকি (এটা কি কল্পনা? পাগড়িও তো পরতেন)। বাবাকে পড়িয়েছেন; মা-বাবা ওঁকে সম্ভ্রম করতেন। সেগুনবাগানে ওঁরা এক বাড়িতে থাকতেন। মাঝেমধ্যে আসতেন পুরানা পল্টনের বাড়িতে, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতেন। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, মনে হতো নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে ভালোবাসেন। ছোটরা আমরা বুঝতে পারতাম না ওঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, ইংরেজি-বাংলা ভিন্ন রকমের কেন। মাদ্রাজ থেকে কত দূরে এসেছিলেন, ভেবে অবাক লাগত — আমরা তো পাড়ার বাইরেই যাই না।

অর্থনীতি বিভাগের, শুধু তাই কেন — পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য সভ্য ছিলেন, 'ফেকন'।

কাগজে-কলমে পিয়ন হলেও তাকে ছাড়া বিভাগ চলত না। কাজের চিঠিপত্র অফিসে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা, চিঠিপত্র ডাকঘরে নিয়ে যাওয়া, এ কাজে গাফিলতি করলে অনেক কিছু অচল। পরিমলকাকার গলায় মাঝেমধ্যে শুনতাম, 'মেজাজ খারাপ হবে না? ফেকন আজ কী করেছে জানেন' — অর্থাৎ ফেকন আজ কোনো জরুরি কাজ করেনি তার বিবরণ। কলকাতা থেকে আসা বিভাগের এক ক্ষমতাবান প্রফেসরের সে ছিল প্রিয়, তাকে কিছু বলা যেত না, বললেও লাভ হতো না। অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাকে সবাই পছন্দ করতেন, মধ্যবয়সী ফেকনের মধ্যে ছিল এক ছেলেমানুষি সরলতা আর একগাল হাসি।

ফেকনকে আমার মনে পড়ে প্রতিবছর রং খেলার দিনের জন্য। উঁচু করে ধুতি আর খয়েরি রঙের শার্ট পরে ফেকন প্রতি দোলের দিন সকালে আসতেন আমাদের বাড়িতে দুগালে লাল আবীরের দুটি ফোঁটা লাগিয়ে দোল খেলার জন্য। ফেকনের ধুতি ও টাকা তৈরি থাকত মায়ের টেবিলে। বিহার থেকে আসা, বাংলা ছিল 'একঠো-দুঠো' ভরতি — আর ওই একগাল হাসি। চোখের ধারটা কুঁচকে, চোখের হাসি ছিল বিশিষ্টতা।

মা-বাবার বিয়েতে ফেকন ছিলেন বরযাত্রীদের একজন। বিয়ের পর মা-বাবা বরিশাল গেলেন, পরিবারের আর সবার মতো ফেকন সঙ্গে। বিয়ের যৌতুক সামলে রাখার ভার তার হাতে। অর্থনীতি বিভাগে মাঝেমধ্যে গাফিলতি করলেও তার মতো বিশ্বাসযোগ্য কজনকে পাওয়া যায়? এই সফর নিয়ে তার বিস্ময় কুড়ি-বাইশ বছর পর বলেছিলেন নামি সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তকে। 'কীরকম জায়গা, বরিশাল — সারা পথ শুধু জল আর জল, জল বেড়েই চলে, কোথাও যেন ডাঙ্গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। আর ধানক্ষেত তাও তো জলে? এত জল আছে কে জানত?' ফেকনের অভিজ্ঞতার কথা পড়েছিলাম *চতুরঙ্গের* পাতায়;[২৬] কোথা থেকে কোথায় যোগসূত্র এসে যায় আশ্চর্য লাগে।

* * *

শিক্ষক হিসেবে সব ছাত্রছাত্রীর প্রতি বাবার স্নেহ-মমতা ছিল; যাঁরা বাড়িতে আসতেন তাঁরা মায়ের যত্ন-আপ্যায়নের অঙ্গ হয়ে যেতেন। মীরা বসু (আইচ) লিখেছেন, 'এই সংগীতপ্রেমী বিদ্বান মানুষটির আর যেদিকটা আমাকে অভিভূত করত তা হলো ওঁর ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক টান ও মধুর ব্যবহার।... ছাত্রদের অবারিত দ্বার সে-বাড়িতে ছিল। নিজের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে ছাত্রদের দিয়ে বলতেন, 'বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না — এখানে বসে পড়তে হবে।'... আমরা কত সৌভাগ্য নিয়ে এসেছিলাম যে, এমন শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়েছি।'[২৭] বাড়ির একটি ঘর রাখা ছিল ছাত্রদের বই পড়ার জন্য, এ সুযোগ পেয়ে তাদের আনাগোনা বেশি ছিল। তবে শুধু কি বই পড়া? বাবার সঙ্গে আলোচনা, মায়ের তৈরি জলখাবার, নাম তো মনে নেই, আসতেন অনেকে, সম্পর্ক গড়ে উঠত।

১৯৭৬-এ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি বিভাগে উচ্চপদে (বোধ হয় প্রফেসর) নিযুক্ত করার জন্য বাবাকে করা হলো 'এক্সটারনাল এক্সপার্ট'। বিরাট ফাইল আছে: বাবা খুব মনোযোগ দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন পড়েছেন ও বিশদ উত্তর দিয়েছেন। বলতেন, 'পাশ করানো সোজা, কাউকে তৃতীয় বিভাগ দিতে বা ফেল করাতে হলে খুব ভালো করে পড়ে, চিন্তা করে নির্ণয় নিতে হয়।' এখানেও একই ব্যাপার — যাঁদের উপযুক্ত মনে করতেন না কারণ জানিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতেন। এমনও আছে, 'এই নামে আমার এক ছাত্র ছিল, এ কি সেই ছেলেটি? খুব বুদ্ধিমান।' এত বছর পরও ছাত্রদের নাম মনে আছে। তাঁরা যে আর 'ছেলে' নেই, মধ্যবয়সি, সে কথা ভুলে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে বাবার জীবনের শেষ দশ বছর ঢাকার অনেকের সঙ্গে দেখা হতো — পরিচিত অনেকের খোঁজ পেতেন। কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলে চিঠি চলে যেত হুদা সাহেবের কাছে, 'এই দুঃসংবাদ শুনলাম। বিচলিত বোধ করছি, সত্যি কি; সত্যি যদি হয় ওঁর পরিবারকে আমার সমবেদনা জানিয়ো।'

ঢাকা এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আবার যোগাযোগ হওয়ায় শুধু খুশি নয়, মনে শান্তি পেয়েছিলেন — বাবা তো অন্তরের গভীর থেকে ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো ছেড়ে আসতে পারেননি।

বাবার অধ্যাপনার জীবন ১৯২৬-৮২ — মাঝে দিন গুনে তিন বছর ওয়াশিংটনে আর ছাব্বিশ দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে। কোনো কমিশনের সভ্য হলেও অধ্যাপনা ছাড়েননি। অর্ধশতাব্দীর শিক্ষকতা জীবনে যেমন লিখেছি, কোনো ছাত্র দেখিনি, যার সঙ্গে বাবার সুসম্পর্ক নেই বা স্নেহ করেন না। এটাও মানতে হবে, ঢাকার ছাত্রদের সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এক কাশীতে অশোক মিত্র ছাড়া আর কোথাও হয়নি। ঢাকার সব নাম জানি না, তবে চিঠিপত্রে বুঝতে পারি এম এন হুদা সাহেবের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। খুব কাছের ছিলেন মজরুল হক, সমর সেন, সত্যব্রত বসু, মীরা আইচ, অমিতা চৌধুরী, তোজাম্মল হক — এঁদের নাম নিচ্ছি কারণ আমি নিজে দেখেছি এঁদের সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক। চারটি ছাত্রছাত্রীর নাম আলাদা করে নিতে হয়, কারণ তাদের সঙ্গে যা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা ছাত্র-শিক্ষকের বাইরে অনেক গভীরে : পরিমল রায়, আব্দুর রাজ্জাক, অশোক মিত্র ও আমি। অশোকদা কাশীতে ছাত্র, এ লেখার বাইরে, আমি কন্যা, তদুপরি কাশীতে ছাত্রী, আমিও বাইরে। অন্য দুজনের কথা আলাদা করে লেখা প্রয়োজন। পরিমলকাকা বাবার ছাত্র, পরে সহকর্মী, লিখলে কিছুই বলা হয় না। ওঁদের বন্ধুত্ব কিংবদন্তি রূপ ধরেছিল, তা বললেও অপূর্ণতা থেকে যায়। স্নেহ, সম্ভ্রম, সম্মান, বিশ্বাস, নির্ভরতা, পারিবারিক সান্নিধ্য, ইউনিভার্সিটি — বিশেষ করে অর্থনীতি বিভাগের রাজনীতি, একজনের (বাবার) প্রাণখোলা হাসি, অন্যজনের মুচকি হাসি দিয়ে যেন আলতো করে রসিকতা, গম্ভীর হয়ে অর্থনীতি বা সাহিত্যের আলোচনা, পরিচিত সহকর্মী বা প্রতিবেশীদের নিয়ে মন্তব্য, সবকিছু মিলিয়ে ছিল এঁদের সম্পর্ক। আত্মিক নৈকট্য ছিল, যা বোঝানো সম্ভব নয়। আমার অভিজ্ঞতাভরা দীর্ঘ জীবনে এমন 'অহম' বা 'আমিত্ব' বর্জন বন্ধুত্ব দেখিনি। পারিবারিক সান্নিধ্যের উদাহরণ দিই। ১৯৪৭-এ কটকে আমাদের বাড়ি বিভ্রাট। ৪-৪-৪৭-এ পরিমলকাকা লিখছেন, 'শুনলাম আপনি গৃহচ্যুত হয়েছেন। কারণ বুঝলাম না। শ্রীমতী দাশগুপ্ত লিখেছেন কোনো সমাধান না হলে 'পরমভবনে'র (ঢাকায় পরিমলকাকাদের বাড়ি) দোতলায় গিয়ে বসবাস করবেন। বাহুল্য হলেও আমার আগ্রহ জানিয়ে রাখি।'

মা যে সহজে 'পরমভবনে' থাকার কথাটা বলতে পারলেন সেটাই সান্নিধ্যের নিদর্শন।

অর্থনীতিতে পরিমলকাকার প্রবন্ধের তালিকা ছোট, যা লিখেছেন তা প্রশংসিত। তবে, বাবার মন্তব্য বা 'হ্যাঁ' না পেলে উনি কোনো লেখা সম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন না বা জার্নালে পাঠাতেন না। ১-৪-৪৭-এ বাবাকে লিখেছেন, 'আমার হাতের লেখাটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। পদে পদে সেই স্বরচিত ছড়াটা মনে পড়ছে :

লিখতে আমি যা চাই —
এবং লিখতে যাহা না চাই,
তা' ঝুঁটা কিংবা সাঁচা-ই
করতে চাই যাচাই।
অর্থাৎ আপনার 'হাঁ' কি 'না' চাই —
আর সঙ্গে এক কাপ চা চাই।'

পরিমলকাকাকে হারানোর শোক নিজের দিদি, দাদাদের হারানোর থেকে কম ছিল না। নিউইয়র্কের হাসপাতাল থেকে মৃত্যুসংবাদের ফোন বাবার কাছে এসেছিল। খবর পেয়ে দিশেহারা হয়ে বসে পড়লেন, মনে হলো পড়ে গিয়েছেন, দুহাতে মাথা রেখে বলতে লাগলেন, 'পরিমল নেই, আমি এখন কী করব, আমি এখন কী করব!' এই ভ্রাতৃসম বন্ধুত্বের দ্বিতীয় উদাহরণ আমি দেখিনি।

রাজ্জাক সাহেব বাবার থেকে বয়সে অনেক ছোট, উনি যখন ছাত্র হয়ে এসেছেন, বাবা পাঁচ বছর ধরে পড়াচ্ছেন। ওঁদের সম্পর্ক নিবিড় হলেও বন্ধুত্ব বলব না। ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি ওঁর প্রতি বাবার অপত্য স্নেহ আর গুরুর প্রতি ছাত্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা। প্রায়দিন বাড়ি আসতেন, কোনো না কোনো উত্তেজনা নিয়ে। বিশ্ব রাজনীতি, লীগ-কংগ্রেসের সম্পর্ক, সর্বোপরি ছাত্রদের মঙ্গল (ততদিনে উনি সহকর্মী), সবকিছু আগ্রহ নিয়ে, বিচার করে কথা বলতেন। এই যে জড়িয়ে যাওয়া, বিশেষত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ, তাদের পাশে থাকা, পরামর্শ দেওয়া, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখবার চেষ্টা করা, বুঝতে পারা, রাজ্জাক সাহেবের এই উদ্যমকে বাবা সম্মান করতেন, প্রাণ দেখতে পেতেন। উনি এলেই বাড়ি সরগরম, ওঁর জন্য মা-বাবার মনে আলাদা জায়গা ছিল। 'বাবা' ওরফে 'টিচার', রাজ্জাক সাহেব লেকচার দিতে ভালো না বাসলেও ছিলেন 'টিচার' — উনি ছাত্রদের প্রেরণা দিতে জানতেন। গুরু-শিষ্যর মধ্যে যে আলাদা সম্পর্ক ছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। চুলচেরা বিচার, অনুশীলন এঁদের মধ্যেও ছিল, তবে তা Hicks, Marshall নিয়ে নয়, ছিল শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার পরিবেশ ও উন্নতি নিয়ে। আজকাল higher education নিয়ে কত লেখালেখি হয়, তখন কজন মাস্টারমশাই এ নিয়ে ভাবতেন? যখন ওঁদের দুজনের কথা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঁদের তর্ক, আলোচনা, মায়ের জলখাবার নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে দুচারটে কথা বলা মনে পড়ে, ভাবি কী মধুর সহজ-সরল সম্পর্ক ছিল ওঁদের।

রাজ্জাক সাহেব পিএইচডি করলেন না, এ নিয়ে তখন প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে — যদিও কাকারা সবাই ঢাকা ছেড়েছেন। চিঠিপত্রেও এ কথা পড়েছি — বাবার এ নিয়ে মন্তব্য অপছন্দ ছিল। 'রাজ্জাকের' প্রচণ্ড পড়াশোনা, লেখাপড়া নিয়ে থাকা, তার প্রখর বুদ্ধি দিয়ে চিন্তাভাবনা করা, এই ছিল মুখ্য, ডিগ্রি নয়। প্রসঙ্গত, জেমস মিড, যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৭-এ, তাঁর পিএইচডি ছিল না, ক্ষতি হয়নি। রাজ্জাক সাহেব যা সম্মান পেয়েছেন, ডিগ্রির খোঁজ কি কেউ করেছিল? কত গর্ব করে বাবা বলেছিলেন, 'রাজ্জাক ন্যাশনাল প্রফেসর হয়েছে।'

ছোটবেলায় চারপাশে ঘুরঘুর করতাম, রাজ্জাক সাহেব কতটা নজর করতেন জানি না। ওঁর সঙ্গে সময় কাটিয়েছি ১৯৬০-এ হার্ভার্ডে। বাবার মেয়ে বলে আমার স্থান আলাদা ছিল, নিজে রান্না করে খাইয়েছেন। খাদ্যরসিক ও আড্ডাপ্রিয় প্যাটেল সাহেবের সঙ্গে রাজ্জাক সাহেবের বন্ধুত্ব হয়েছিল। উনি সবকিছু খেতেন, আমার বাছবিচার আছে (সেটা ধর্মীয় না অনভ্যাস, মনস্থির করতে পারিনি), এ ব্যাপারে রাজ্জাক সাহেবের নজর থাকত পুরো, কেউ নজর না দিলে তিরস্কার করতেন। রাজ্জাক সাহেবের অপর নাম 'খেয়াল রাখা'। এতদিনে তিনি শান্ত-ধীরস্থির।

বাবা, সমরদা কেউ তো ঢাকায় নেই, আপ্যায়ন কী করে করবেন রাজ্জাক সাহেব; নিজেই ব্যবস্থা করলেন, সম্ভব হলেই মাছ পাঠিয়ে দিতেন। ২০০২-তে যখন ঢাকা গেলাম, কোনো সাবেক বা তখনকার মন্ত্রী সাহেব বলেছিলেন, 'আপনার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল, রাজ্জাক সাহেব মাছ পাঠিয়েছেন, নিয়ে গিয়েছি।'

দিল্লি বা শান্তিনিকেতন, মাছ পাঠানো বন্ধ হয়নি। শান্তিনিকেতনে বাবার সেক্রেটারি শিবনারায়ণভাই বলেছিলেন, 'রাজ্জাক সাহেবের পাঠানো মাছের ভাজা, ঝোল আমিও খেয়েছি, মা রাঁধতেন। অপূর্ব স্বাদ পূর্ববাংলার মাছে।' অবাক লাগে, কোথায় ঢাকা, কোথায় দিল্লি, শান্তিনিকেতন, বাবার অতি স্নেহাস্পদ ছাত্রটি তাঁর গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা কত ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ করছেন।

রাজ্জাক সাহেব এত কাছের ছিলেন যে, চিঠি লেখেন না বলে ক্ষুণ্ন হয়ে বাবা অভিযোগ করতেন। চিঠি চলে যেত হুদা সাহেবের কাছে। 'রাজ্জাক চিঠি লেখে না, লিখলে উত্তর দেয় না, ঠিক করেছি আমিও আর লিখব না!' অগাধ স্নেহ-ভালোবাসা না থাকলে এমন চিঠি লেখা যায় না। চিঠি দিতেন না ঠিক, উনি তো লিখতেই ভালোবাসতেন না, বিরাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডিত্য ছাত্রদের সঙ্গে মৌখিক আলোচনায় ভাগ করে নিতেন, তাও বাবার কাছে লেখা তিনটি চিঠি আবিষ্কার করেছি। ১৯৭৭-এ অতীতের কথা ভাবছেন। লিখছেন, 'আপনাদের কথা প্রায়ই বলাবলি করি। আশ্চর্য কালকের কথা মনে থাকে না, অথচ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পূর্বের ঘটনা পরিষ্কার মনে হয়। আশাকরি আবার দেখা হবে। আশীর্বাদ করিবেন, স্নেহের আব্দুর রাজ্জাক।' দেখা হয়েছিল দিল্লিতে।

১৯৭৫-এর প্রথম দিকে রাজ্জাক সাহেব ব্যবস্থা করে বাবা-মাকে নিয়ে গেলেন ঢাকাতে, Grants Commission-এর নিমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে। যাবার আগে মা জানতে চেয়েছিলেন ওখানে থাকবার ব্যবস্থা কী হবে, এবং এই মর্মে বাবা রাজ্জাক সাহেবকে লিখেছিলেন। মর্মাহত বা অভিমান করে উনি জবাব দিলেন যা একজন অতি প্রিয়জন, কাছের মানুষ দিতে পারেন। ২/১/৭৫-এ কিঞ্চিৎ অভিমানের চিঠি।

> 'স্যার, আপনার চিঠি পাইয়া দুঃখিত হইয়াছি। আপনারা দুইজনে ঢাকা আসিবেন, আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হইবে কি না, ইহা চিন্তার বিষয়! Grants Commission আপনাদের থাকার ব্যবস্থা অবশ্য করিবে — যদি মেহেরবাণী করিয়া আপনারা দুইজন আমার সঙ্গে থাকেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। যদি বিশেষ অসুবিধা হয়, পরে Grants Commission-এর ব্যবস্থা অনুযায়ী থাকিলেই হইবে। আশাকরি আর চিন্তা করিবেন না।... ইতি স্নেহের আব্দুর রাজ্জাক।'

মা-বাবা ওঁর কাছেই ছিলেন। পুরোপুরি 'লাল গালিচা'র অভ্যর্থনা, যত্ন। কুলসুম আপা, বেগম এম এন হুদার কাছে শুনেছি, সন্ধ্যাবেলা সবাই একত্র হতেন ওঁদের বাড়িতে। বাবা একটু উঁচু চেয়ারে বা খাটে, বাকিরা নিচে গালিচায় বসা, আলোচনা-প্রশ্নোত্তর নানা বিষয়ে, সবারই চেহারা উজ্জ্বল। বছরের পর বছর ঢাকায় উৎসুক, কৌতূহলী, মেধাবী ছাত্র পেয়েছেন, আর কোথাও তা পাননি বাবা, অন্তর থেকে তৃপ্তি আমি বুঝতে পারি। জীবনে নাম-যশ প্রচুর পেয়েছেন, তবে ঢাকার ছাত্রদের সঙ্গে সময় কাটানো দিয়েছে ভিন্ন আনন্দ, পূর্ণতা।

মা-বাবা ঢাকা কখনো ফিরে যাবেন কল্পনা করেননি। রাজ্জাক সাহেবের বাড়িতে ভ্রাতৃবধূ হেলির যত্নে, প্রচুর আনন্দে কটা দিন কাটিয়েছেন। নিরাশ হলেও বাপের বাড়ি উমাকুটির দেখে এসেছিলেন, ৫নং পুরানা পল্টনে আপ্যায়ন পেয়েছেন,[২৮] সর্বোপরি বহু অতীতের বন্ধুত্ব স্নেহ-ভালোবাসার দেশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এর থেকে বড় গুরুদক্ষিণা বাবাকে কেউ দিতে পারতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৮-এ যখন ঢাকা যাই, অনেকে আমাকে বলেছেন, আপনার বাবা তিনি তো প্রবাদপ্রতিম, তিনি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির Legend — এমন শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৫-৪৭-এর কথা মনে করে ভেবেছিলাম এ কি পরিহাস? নিজের ভুল বুঝতে সময় লাগেনি — সে তো ছিল রাজনীতি, বাবার স্মৃতি ঢাকায় থাকবে Legend হয়ে। রাজ্জাক সাহেবের মতো ছাত্র, নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের মধ্য দিয়ে।

* * *

রায় পরিবার ও দাশগুপ্ত পরিবার একই সূত্রে বাঁধা ছিল। ছেলেবেলার কথায় মনে পড়ে রোজ বিকেলে পরিমলকাকা মিহি করে কুচি করা ধুতির কোঁচা হাতে, হেঁটে আমাদের বাড়ি আসছেন। চা-জলখাবারের সঙ্গে চলত রসিকতা, ছড়া, ছবি ও Hicks বা মার্শালের অনুশীলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, পুরানা পল্টনের সঙ্গে এঁদের ছিল আত্মিক যোগ, ছিল নিশ্চিতি, নিশ্চিন্তি।

হঠাৎ তা ভেঙে গেল। ১৯৪৫-৪৬-এ ছমাসের ব্যবধানে দুজনেই ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন সুদূর দিল্লি, বাবা কমার্স কলেজে, পরিমলকাকা রামযশ কলেজে। পরিচিত, প্রিয় সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া মনে করিয়ে দেয় শিল্পী গণেশ হালুইর লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তি।

‘তুমি আছো
আমি আছি
অনিশ্চিতের মাঝামাঝি,
নিশ্চিত তাড়িয়ে মারে
অনিশ্চিতের পথে।’[২৯]

এঁরা ঢাকা ছেড়ে ‘অনিশ্চিতের পথে’ চলে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি বলে। তবে দুজনের ঢাকা ছাড়ার কারণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

যুদ্ধের বাজার, কালোবাজার, মুদ্রাস্ফীতি, ডি.এ বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষের আপত্তি, পদোন্নতিতেও কর্তৃপক্ষের আপত্তি — সব মিলিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। পরিমলকাকা লিখেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় অন্যায়, অবিচার, অনাচার কায়েমি হইয়া উঠিল। যোগ্যতার পুরস্কার অন্তর্হিত হইল। কিন্তু যুদ্ধের পুরা ছয় বৎসর ঢাকাতেই কাটাইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিয়াছি। ডি.এ-র জন্য দরবার করিয়াছি, বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি, চল্লিশ টাকা মণে চাল কিনিয়াছি, নিজ বাড়ি মিলিটারিকে ভাড়া দিয়া ছোট ভাড়া বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছি। এই দুর্ভাগ্য ঢাকায় বসবাসের জন্য নয়, সভ্যতার মহাসংকটে পড়িয়া আমাদের যেন সবার গলা আটকাইয়া গেল। আমরা *ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ইকোনমিকস* ব্যতীত অন্য কোথাও প্রবন্ধ ছাপাইবার কথা ভাবিতাম না। এখন অর্থাগমের উদ্দেশ্যে এখানে-ওখানে লেখা পাঠাইতে লাগিলাম। রেডিওতে দু'একটা বক্তৃতার সুযোগে অনুগৃহীত বোধ করিতে লাগিলাম।

এই গ্লানির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যখন ঢাকা পরিত্যাগ করিলাম, তখনো ভাবিয়াছি, দরকার কী, ঢাকাতেই থাকিয়া যাই। এ দুর্দিন চিরকাল থাকিবে না, মিলিটারি ছাউনি উঠিয়া গিয়া রমনার পুরাতন বৈভব আবার ফিরিয়া আসিবে।

দিল্লিতে আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আছি। ইতিমধ্যে দেশ বিভক্ত হইয়া গেল, পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মীদের কেহ কেহ দিল্লিতে আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গ ও সান্নিধ্যে পূর্বস্মৃতি খানিকটা ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু ঢাকার সেই পুরাতন পূর্ণিমা আর কোথায় পাইব?'[৩০]

সাম্প্রদায়িকতাকে কিছুটা দায়ী করেছেন উনি। দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, 'ঢাকার পরিচ্ছন্ন, মসৃণ ও বর্ণাঢ্য জীবনে প্রথম চিড় ধরাইল ১৯৩৭ সালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং তাহার পর ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।'

দুঃখের সঙ্গে অভিমান ছিল। চোদ্দ বছর অধ্যাপনার পর পদোন্নতির আশা অস্বাভাবিক নয় — তা হয়নি। ছাত্রবৎসল শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল, গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন। তবু লেকচারার ক্লাস টু থেকে ওয়ান হতে পারেননি। ডি.এ বাড়ানো হবে, ঢাকা ফিরে আসবেন — এই আশা মনের কোনো কোণে রেখে ছুটি নিয়ে দিল্লি গেলেন; ফেরা হয়নি।

১-৪-৪৭ থেকে ২৯-১১-৪৮ অবধি বাবাকে লেখা পরিমলকাকার বারোটি চিঠি আছে; একটি শেকড়হীন মানুষের প্রচ্ছন্ন বেদনার সংলাপ। বিষয়বস্তু দুভাগে ভাগ করা যায় প্রথম, ওঁর চাকরির সমস্যা। রামযশ কলেজে শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে, একটু সম্মানযোগ্য চাকরি কোথাও যদি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ঢাকা শহর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অবস্থা। ঢাকার ভালো ছাত্র, সম্ভ্রম, বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল সহকর্মীদের ছেড়ে রামযশ ওঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ৭-১০-৪৭-এর চিঠির শুরু, 'বাঁচান, আমাকে বাঁচান, রামযশ কলেজের হাত থেকে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচান।' ওপরে লেখা S.O.S। নানা জায়গায় ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, এমনকি অস্থায়ী সরকারি কমিশনেও চেষ্টা করছেন, সফল হচ্ছেন না। পাটনা গেলেন ইন্টারভিউ দিতে, সেখানে ঢাকার আরো কজন (ভিন্ন বিভাগের) ছিলেন — কারোই হলো না। নেওয়া হলো বিহারের কাউকে। ঢাকার সবাই অপরিচিত, যতই সুনাম থাকুক না।

ঢাকায় কাকা ছিলেন সম্মানিত শিক্ষক, গবেষক, সাহিত্যিক, শহরের বিদ্বৎসমাজের শ্রদ্ধেয় সভ্য, দিল্লিতে তিনি বিদেশি। ওখানকার জ্ঞানী-গুণীরাও ভালো ভালো কথা বলেন বা 'আর একটু সবুর করো' বলে ফিরিয়ে দেন। অর্থনীতির মুরব্বিরা তাঁদের নিজেদের তৈরি গণ্ডির মধ্যে রাজত্ব করেন, সে চক্রব্যূহ কাকা কী করে ভেদ করবেন? দিল্লিতে উনি কারো 'আপনজন' নন, ওঁর 'আপনজন' ঢাকাতে।

অমিয়কুমার দাশগুপ্তকে বলা হয় অবিভক্ত ভারতবর্ষে অর্থনীতিতে তাত্ত্বিক গবেষণার পথপ্রদর্শক, পরিমল রায় ছিলেন তাঁর এক উত্তরসূরি। ওঁর প্রবন্ধ নানা জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি পাচ্ছে, বই লিখেছেন — ছাপাবার চেষ্টা চলছে, তাও তিনি বাইরের, ওঁর কাজের মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা ছিল দিল্লির অর্থনীতিবিদদের, ছিল না ইচ্ছা। হতাশ হয়ে ছড়া লিখলেন

'অদ্ভুত নাম আপ্পাদোরাই,
কেয়ার তাকে করি থোরাই,
নেহাৎ লোকটা সেক্রেটারি
তাই এসেছি তাড়াতাড়ি,
ছাপতে হবে গ্রন্থখানা,
তাই দুবেলা দিচ্ছি হানা,
নয়তো হেথায় আসে কে?
আসতে ভালোবাসে কে?'[৩১]

বইখানা ছাপা হয়নি — কারণ জানি না। নিরাশ হয়ে লিখছেন, 'আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় অপার, আশার সঙ্গে ভরসাও চাই তো।'

হাতবদলের সময়কার ঢাকা শহর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি পাই কাকার চিঠিতে। অশান্ত সময়, ঢাকা ছাড়তে উদগ্রীব পুরনো বন্ধুরা, আমাদের পুরানা পল্টনের প্রতিবেশী মাস্টারমশাইরা, মন্মথ ঘোষ, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, অজিত সেন, বিনয় রায়, নরেশ রায় — সবাই ঢাকার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কে কোথায় ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, ফল আশাপ্রদ কি নয়, তালিকা আছে চিঠিতে। বন্ধুদের জন্য দুশ্চিন্তায় দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটছে। জানাচ্ছেন — অমলেন্দু বোস ও নিখিল রঞ্জন রায় বিলেত থেকে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ফিরছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য, কিন্তু তাঁরা যেতে ইচ্ছুক নন। ১৯৫০-এর মধ্যে এঁরা সবাই ভারতে বিভিন্ন জায়গায় চলে আসেন।

অর্থনীতি বিভাগের খবর : 'প্রবোধ ঘোষ (জগন্নাথ কলেজে ছিলেন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। ক্লাস টু-তেই হয়তো। কারণ ক্লাস ওয়ান-টা তো M. Haq পেয়েছেন।' ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ওঁর নৈকট্য, মনের যোগ কোনোভাবেই শিথিল হয়নি। খবর পাচ্ছেন যাঁরা আসা-যাওয়া করেন তাঁদের মারফতে — ঢাকা-দিল্লি এত পরিচিত মানুষ যাতায়াত করছেন একটু আশ্চর্যের — বেশিরভাগ চিঠিতে। আমি ভাবি ১৯৪৭ — উথালপাথালের সময়, আমরা উতলা; ট্রেন, গোয়ালন্দ স্টিমার সবই চলছে, পোস্ট অফিস তার কাজ করে চলছে, তাদের কোনোদিকে তাকাবার বা উদ্বিগ্ন হবার সময় নেই।

ঢাকার হাতছানির আকর্ষণ প্রবল। সমররঞ্জন সেনকে রাজনৈতিক কারণে ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ করেই ভারতে আসতে হয়েছিল। দিল্লিতে সরকারি উচ্চপদে আছেন, মন ঢাকাতে, মা ঢাকাতে। 'সমর সরকারি কাজের purposeless-এ বিক্ষুব্ধ। ছেড়ে দিয়ে পড়ানোর লাইনে যেতে চায়। ভাবছে ঢাকাতে প্রফেসরশিপ সম্বন্ধে সন্ধান করবে কি না। আমাকেই বলছে মোয়াজ্জমকে চিঠি লিখতে। আমি বলেছি, 'নৈব'। ...রামযশ কলেজের কুঞ্জবিহারী ব্যানার্জী ঢাকায় দর্শনের প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছেন। যাবেন কি যাবেন না' (৫/৯/৪৭)।

সবচেয়ে বড় খবর, 'কাণ্ড শুনেছেন? পালের কাণ্ড?' দিল্লিতে আসছেন 'পুষা'র Registrar হয়ে। আমাকে বাড়ির জন্য চিঠি দিয়েছেন। বুঝুন তা হলে ঢাকার অবস্থাটা। এবার সত্যসত্যই পালে বাঘ পড়িল। অথবা পাল সত্যসত্যই ছিন্নভিন্ন হইল!'

চিঠি পড়লে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙন ধরেছে — সেটা কারো পক্ষেই সুখের নয়। আমিও 'ভাঙন' ভাবতাম; ভুল ধারণা। হয়তো কিছুদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে, কিছু বিভাগ টলমল করেছে, কিন্তু ভাঙন ধরতে দেওয়া হয়নি। প্রয়োজন হলে বিলেত থেকে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন কর্তৃপক্ষ ও উপাচার্য, সৈয়দ মোয়াজ্জম হুসেন।

বারবার জানাচ্ছেন ঢাকা শহরে কত বদল এসেছে। লোকসংখ্যা অনেক বেশি — সেই ছোট ঢাকা, 'আমাদের' ঢাকা আর নেই। আশ্চর্য, — চল্লিশ বছরের ওপর ঢাকার বাইরে থেকেও শেষ জীবন অবধি বাবা কিন্তু বলতেন, 'আমাদের ঢাকাতে।' শহরে বাড়ির অধিগ্রহণ শুরু হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— পৃথ্বীশকাকা গৃহচ্যুত হয়েছেন। পরিমলকাকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দুঃখের। 'বাড়িটা (পরম ভবন, পৈতৃক বাড়ি) দুদিনের নোটিসে অনির্দিষ্টকালের জন্য হাতছাড়া হলো — অধিগ্রহণ। ভেবে ভালো লাগে না। মা ওয়ারীতে আমার ভগ্নির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ছোট ভাই গিয়ে নিয়ে আসবে। আমাদের সঙ্গে এলেন না কিছুদিন পরম ভবনে থাকার লোভে। হলো কৈ?' (৩১/৮/৪৭)।

সমস্যা-হতাশার মাঝেও রসিকতা থামেনি। দিল্লির অর্থনীতির কর্ণধার আমেরিকা যাচ্ছেন, ক্লাস নিতে পারবেন না বলে নোটিস

'আমি ওয়াশিংটন যাচ্ছি একটি চার ইঞ্জিনের ডাকোটা প্লেনে। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম পাইলট ও সহযোগীদের মধ্যে এই প্লেনের পাইলট, সহযোগীদের গোনা হয়। ।' অতঃপর (নাম নাইবা দিলাম) — কে কী বলবেন? ওঁকে বুঝি চেনেন না? ইনি আমার বড় শ্যালকের খুড়শ্বশুর। একদিন ঢাকা স্টেশনে দেখা হতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী খবর, কোথাও যাচ্ছেন নাকি?' জবাব — 'না, যাচ্ছি না কোথাও। আমার মেয়ে আবার second class-এ ময়মনসিংহ গেল ওকে see off করতে এসেছিলাম।'

বন্ধু ছিল, আড্ডা ছিল; ঢাকার প্রাণ ছিল না। ঢাকাতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিলে তিলে এঁরা নিজেদের গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, হঠাৎ করে দিল্লিতে বহু বছরের সহমর্মী সম্পর্ক, অন্তরঙ্গতা কী করে পাবেন?

১৯৪৮-এর মাঝামাঝি ভালো কাজ পেলেন I.A.S. training School-এর প্রিন্সিপাল। I.C.S.-এর জায়গায় ভারতীয়রা এখন I.A.S. পরীক্ষা দেবেন; যারা সফল হলেন তাদের training দেওয়ার কলেজ। যমুনার তীরে বিরাট বাড়ি, রোজ বিকেলে আড্ডা,[৩২] তবু মন ভরে না। বাবার সান্নিধ্য থেকে ভৌগোলিক দূরত্ব, ঢাকার আড্ডা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ওঁকে একা করে দিয়েছিল। চিঠি (১/৪/৪৭)।[৩৩]

'বন্ধুরা (দিল্লির) একত্র হলেই আপনাদের কথা হয়। কেনইবা এলেন, কেনইবা গেলেন sentimental আলোচনা। আমি ভাবি, সেই যে হঠাৎ বিনা সংবাদে বেলা তিনটের সময় আপনাদের ওখানে গিয়ে চা খেতে বসা, কুম্ভকর্ণের আহার সামনে দিয়ে মিসেস দাশগুপ্তর খাদ্যের স্বল্পতা সম্বন্ধে লজ্জা প্রকাশ করা, মোজার দুর্মূল্যতা প্রসঙ্গের মাঝখানে হঠাৎ আপনার Forward Exchange-এর অবতারণা — এই সকল পরম বস্তুগুলো কি আবার ফিরে আসবে?' ফিরে আসেনি।

১৯৪৭-এর ৫ সেপ্টেম্বর লিখছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা ফিরতে একেবারেই ইন্টারেস্টেড নই, বিশেষত ওখানকার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর। বাড়িটার জন্য মাঝে মাঝে কষ্ট হয়।' এটা মনকে বুঝ দেওয়া। ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে যাবার উপায় থাকলে উনি শান্তি পেতেন, আমার বিশ্বাস। শহরে যতই বদল আসুক, রমনার রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া আরো বহুদিন ফুটেছে, রক্তিম আভায় পথ আলোকিত করেছে। সে ছবি ওঁর মন থেকে মুছে যায়নি। বেদনা ও স্বপ্নে ভরা রোমন্থন 'ঢাকার কথা'র শেষ :

'আর কিছুদিনের মধ্যে রমনার কৃষ্ণচূড়া-শাখাগুলো রঙে রঙে উদ্ধত হইয়া উঠিতে শুরু করিবে। অতি মুগ্ধ চোখে তাহার স্বপ্ন দেখিতেছি' (১৫ এপ্রিল, ১৯৫০)।

টুকরো টুকরো ঘটনা, টুকরো টুকরো খবর; কারো মনে রাখবার বা লিখে রাখবার কথা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় একশ বছরের পরিপ্রেক্ষিতে এ ছিল অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ। কিন্তু এঁদের দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ইতিহাস, ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে — এঁরা সবাই ইতিহাসের পাতা।

* * *

বাবার ঢাকা ছাড়ার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমত, দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হয় — ইউনিভার্সিটির কোনো কাজে বা সিদ্ধান্তে বাবা সাম্প্রদায়িকতা দেখেননি, অনুভব করেননি। বাবার ঢাকা ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাওয়া দীর্ঘ কাহিনি, দীর্ঘ দুবছরের ওপর চলেছে। প্রথমেই জানিয়ে রাখি সাম্প্রদায়িকতার কথা বাবার মনে কখনো আসেনি, উঁকিও দেয়নি।

অনেক চিঠিপত্র, কথোপকথনের পর বাবার মতো আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, বাবার রিডারশিপ, পরে প্রফেসরশিপ না পাওয়ার পেছনে যে রাজনীতিই থাকুক, ধর্মীয় ভেদাভেদ তার মধ্যে ছিল না। আজো মনে করি অন্তত শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ বনাম পূর্ববঙ্গ বাবার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে প্রফেসর অরনসনের[৩৪] জায়গা আর কাউকে না দিয়ে অমলেন্দু বোসের জন্য রেখে দেয়, উনি অক্সফোর্ড থেকে ডি.ফিল করে আসছেন বলে, (পরিমলকাকার চিঠি ১৩-৪-৪৭), সেই বিশ্ববিদ্যালয় আর যাই হোক ১৯৪৭-এ ধর্ম দেখে কাউকে উচ্চপদে নিযুক্ত করত না।

উনিশ বছর শিক্ষকতা করার পর এবং মাঝে পিএইচডি করার পর ১৯৪৫-এর প্রথম দিকে বাবা রিডারশিপের প্রার্থী হলেন। ওঁকে দেওয়া হলো না, পেলেন পশ্চিমবঙ্গের কেউ। ক্ষুণ্ন হয়ে বাবা গেলেন কলকাতা, ৭ আগস্ট ১৯৪৫ — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো বিভাগে পরামর্শদাতা হিসেবে, ৯৫০ টাকা মাইনে, রাজ্জাক সাহেব বলেছেন। ছাব্বিশ দিন কাজ করে ঢাকা ফিরে এলেন সেই আগের ৪০০ টাকা মাইনেতে। এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বলেছিলেন 'ছেলেমেয়েরা বলবে, 'বাবা অফিস গিয়েছেন' — কী কর্কশ, কলেজ গেছেন, তার ধ্বনি কত সুন্দর।' শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্যে মীরা বসু (আইচ) লিখেছেন, 'কোনো একসময় ডক্টর দাশগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতায় আসেন বঙ্গ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা হয়ে। খুব অল্পদিনের মধ্যে সেসব ছেড়ে ঢাকা ফিরে এলেন। কেন ফিরে এলেন জিজ্ঞেস করতে বলেন, দূর ওখানে কাজ করা যায়? অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে stock exchange দেখা। ওই পরিবেশে কাজ করা অসম্ভব। আসল কথা, শিক্ষা ও শিক্ষকতার পরিবেশের বাইরে ভালো লাগছিল না।... এই ছিলেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার মশাইরা।'[৩৫]

৯০০ থেকে বাবা ৪০০ টাকা মাইনের কাজে ঢাকায় কেন ফিরলেন জিজ্ঞাসা করায় রাজ্জাক সাহেব বলেছেন, 'অমিয়বাবুর (ওখানে) সইল না।' ফিরে এসে বললেন, 'ওসব চাকরি আমার পোষায় না, দশটা-পাঁচটা করা আমার দ্বারা হবে না। তাঁর মিনিস্ট্রির হেড জাঁদরেল আইসিএস এসে বলল দাশগুপ্ত, what are you doing. কিন্তু অমিয়বাবু তবু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিরে এলেন। অমিয়বাবুর মতো আরো যারা ছিলেন... ইচ্ছা করলেই ইউনিভার্সিটি ছেড়ে বাইরে যেতে পারতেন; কিন্তু যাননি। [দেশবিভাগে যখন] ক্লাস টু বা ওয়ান লেকচারাররা ঢাকা ছেড়ে যান তখন অনায়াসেই প্রফেসর হয়ে গেছেন।'[৩৬]

ছাত্র না পড়িয়ে ক্লাস না নিতে পারলে বাবার জীবনে শূন্যতা থাকত — ফিরে আসার একটা কারণ তাই। এটা সম্পূর্ণ কাহিনি নয়। ইউনিভার্সিটি থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ফিরে এলে রিডারশিপ দেওয়া হবে — কর্তৃপক্ষ সে কথা রাখেনি। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবিবেচনাপ্রসূত আচরণে বিরক্ত হয়ে ছেচল্লিশের প্রথমদিকে অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত ঢাকা ছেড়ে যাওয়া স্থির করলেন।'[৩৭]

১৯৪৭-এ Professor of Economics and Commerce হয়ে বেনারস ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিলেন। ঢাকা কথার 'খেলাপ' করেছে। রিডারশিপের কথা দিয়ে কথা রাখেনি, এটা বিশ্বাসের বাইরে ছিল — ক্ষুণ্ন, নিরাশা-নৈরাশ্য শুধু নিজের জন্য নয় — ঢাকা ইউনিভার্সিটি এমন করতে পারে সেই নৈরাশ্য নিয়ে ঢাকা ছাড়লেন। মনের কোণে আশা ছিল ফিরে আসবেন, হয়নি।

১৯৪৬-এ কবে বাবা ঢাকা ছাড়লেন, সঠিক জানি না। কাহিনি চলল এক বছরের ওপর, এর কোনো ব্যাখ্যা আমি পাইনি। দিল্লিতে ভালো আছি, পরিমলকাকা, আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকি, সান্ধ্য আড্ডা চমৎকার চলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন বন্ধুবান্ধব হয়েছে, দিল্লিতে বাবার অনেক পুরনো বন্ধু বিশেষ করে বীরেন জেঠা। জীবনে ছন্দ এসে গেল। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭-এ লেখা তিনটি চিঠি খুঁজে পেয়েছি, তা আজকের দিনে বোঝা মুশকিল। প্রথম চিঠি দিদিমার, মায়ের কাছে, (জানুয়ারি) 'অমিয়র ঢাকা ফিরে আসিবার ইচ্ছা বুঝিতে পারি, সে যা করিবে ভাবিয়াই করিবে, তবু লিখি, অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়া যেন নির্ণয় নেয়।' দ্বিতীয় চিঠি সপ্তাহ দুই পরে, 'কাগজে দেখিলাম অমিয়কে এখানে প্রফেসর নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভালো কথা — শ্রীমান ফিরিতে চায়। তবু বলি অনেক চিন্তা করিয়া নির্ণয় নিবা।'

পরের মাসে, ফেব্রুয়ারিতে ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রারের (নাম বলতে পারছি না) কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত, রূঢ় চিরকুট (ইংরেজিতে) 'প্রফেসরের প্রার্থী হইয়া তুমি যে তোমার আগামী বইয়ের সূচিপত্র ও সারমর্ম পাঠাইয়াছ, পাঠাইয়া দিলাম।' ৯ ইঞ্চি আর আড়াই ইঞ্চির চিরকুট। ঠিকানা ভুল — Commerce College-এর জায়গায় লেখা Commercial College. দিল্লি ছোট শহর — পৌঁছে গেল।

কাহিনি এতে শেষ হলো না। কোনো পালমহাশয় ঢাকায় রেজিস্ট্রার বা সেই অফিসে কাজ করতেন। তাঁর কাছ থেকে অভদ্র চিঠি গেল বাবার কাছে, সেটা আমার কাছে নেই, তবে পরিমলকাকা লিখছেন (১-৪-৪৭), 'পালের কাণ্ড দেখলাম। উত্তরটা কী লিখলেন? একটা কড়া রকম কিছু লিখবেন। ভদ্র হয়ে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যদি বলেন তো খসড়া পাঠাই — পাল ছিন্নভিন্ন করে নৌকোডুবি গোছের।' খবর পাচ্ছি পরিমলকাকার চিঠি থেকেই।

১১-৫-৪৭ — লিখছেন, 'হাসানকে চিঠি লিখেছেন জেনে সুখী হলাম। ওর চেয়ে কড়া লেখা ভালো হতো না। ইহাই যথেষ্ট।' অর্থাৎ ঢাকার সঙ্গে কথাবার্তা এখনো চলছে, অপ্রিয় হলেও জারি।

উপরোক্ত চিঠির আদান-প্রদানের পর, দেশবিভাগের অল্প আগে ঢাকা যাচ্ছি মে মাসের শেষে বা জুনের প্রথম, ১৯৪৭। গোয়ালন্দ স্টিমারের ডেকে এলেন উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান। মা ওঁর ছাত্রী ছিলেন। বারবার মাকে বললেন বাবাকে ঢাকা ফিরে আসতে রাজি করাতে, এমন অধ্যাপক পাওয়া দুর্লভ। অর্থনীতি বিভাগের অবস্থা দুঃখজনক, এক দাশগুপ্ত ফিরে এলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে — আগের মতো। মা মৃদু হেসে, অন্য কথায় চলে গেলেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই নরম-গরম ব্যবহারের ব্যাখ্যা পরিমলকাকা অনেক আগে করেছিলেন। (১৩-৪-৪৭) 'EC resolution-এর interpretation বুঝি আর শেষ হলো না। আসল কথাটা আপনি ধরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝেছে, আপনি আর ফিরবেন না, সে ক্ষেত্রে আপনাকে একটা permanent appointment দিয়ে জব্দ হওয়ার পথ খুলবে কেন? ইচ্ছা করেই এমনসব বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করছে, যাতে আপনার না যাওয়াটা ওদের পক্ষে cent percent পরাজয় না হয়।' EC resolution নিয়ে কোনো কাগজপত্র আমার কাছে নেই।

'জব্দ', 'জয়-পরাজয়', পরিমলকাকার আন্দাজ; বাবা ঢাকা ফিরতে অনিচ্ছুক সে-কথা হয়তো সঠিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতল-উষ্ণ ব্যবহারে বাবার প্রতিক্রিয়া কাকার মতো ভালো আর কেউ জানতেন না। আমার নিজের বিশ্বাস, ঢাকা ফিরে না যাওয়ার নিশ্চিত নির্ণয় বাবা বহু পরে নিয়েছেন, বহুদিন অপেক্ষা করেছিলেন যথাযথ সম্মানযুক্ত চিঠির জন্য। সে চিঠি আসেনি। ওঁর কর্মজগৎ ছিল অধ্যাপনা, ছাত্র, গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ঘিরে, রেজিস্ট্রারের রূঢ় ব্যবহার বা EC-র রাজনীতি ওঁকে নিরস্ত করতে পারত না। বাবার ক্ষেত্রে চাকরির অনিশ্চিতি ছিল না, ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র আকর্ষণ। ওঁর বিরুদ্ধে কোন রাজনীতি কাজ করেছে জানি না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থনীতি বিভাগ ও ছাত্ররা চাইতেন বাবা ফিরে যান। তাই উপাচার্যের মায়ের কাছে অনুরোধ। ততদিনে দেরি হয়ে গিয়েছে, বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে, ফেরা সম্ভব নয়।

এটা মনে রাখা দরকার, খবরের কাগজের খবর, উপাচার্যের অনুরোধ, পরিমলকাকার চিঠি (৫/৯/৪৭), 'পানি শুকাইয়া গিয়াছে, অর্থনীতি বিভাগ আপাতত গুণ টানিয়া চালানো হইতেছে', সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অতি প্রয়োজনীয় নিয়োগপত্রটি আসেনি — কোনোদিন এলো না।

১৯৪৭-এ যেমন বাবা ঢাকা ফিরে যেতেন না, ১৯৪৫-এ ঢাকা ছেড়ে যাবার কোনো ইচ্ছেও ছিল না — যেতে হয়েছিল। এ বিষয়ে মনকে চঞ্চল করা একটি কথোপকথন। ১৯৫৩, ডিসেম্বর মাস, লন্ডনের হোবর্ন স্টেশন। বাবার সঙ্গে হঠাৎ দেখা ওঁর প্রথম দিকের প্রিয় ছাত্র মো. শরীফের সঙ্গে। কথায় কথায় বাবা বলেছিলেন, 'মাহমুদ হাসান যদি একটু মাইনে বাড়াতেও রাজি থাকতেন তা হলে কি আমি তখন (১৯৪৫) ঢাকা ছাড়ি? প্রশ্নই উঠত না।'[৩৮] ছেড়ে যাওয়া বললেই ছেড়ে যাওয়া যায় না, আবার ছেড়ে গেলে সব ফুরিয়েও যায় না। বাবার বাকি জীবন সূর্যকিরণে ভরা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখস্মৃতির প্রদীপ শিখা ছিল সদা-উজ্জ্বল।

একটি উদাহরণ, অভিজ্ঞতা, এক অধ্যাপকের বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে কিছু নয়। বিশদভাবে লিখেছি কারণ এক বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগ ও ছাত্রদের সঙ্গে এক প্রকৃত শিক্ষকের কতটা আত্মিক যোগ থাকতে পারে, এ তার উদাহরণ। ১৯৪৬-৪৮ ছিল অশান্তি-অনিশ্চিতির কাল, তার একটুকরো ইতিহাস জানালে ক্ষতিটাইবা কী?

ছোট-বড় যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে তার নিজস্ব রাজনীতি থাকে, ঢাকাতেও ছিল। নিয়মমতো চলে অধিকাংশ সময়, আবার কখনো যোগ্যতা কাজ করে না, নেকনজরে পড়লে প্রমোশন হয়, মাইনে বাড়ে, সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়। নেকনজরে পড়ার কথায় একটি গল্প মনে পড়ল, ঢাকা নয় গৈলা গ্রামের কথা, তাও লিখছি।

গ্রামেই আমাদের বাড়ির কাছে থাকতেন বাবার দূরসম্পর্কের এক কাকা। প্রতাপশালী ব্যক্তি, গ্রামের কাছারির বিচারক। সরকার দ্বারা, গ্রামের বাসিন্দাদের দ্বারা বা নিজের শক্তি দেখিয়ে বিচারপতি হয়েছিলেন কি না জানি না, তবে গরিব মানুষদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে ছিলেন পাকা খিলাড়ি। এহেন কাকা এক ছুটিতে বাবাকে দেখে জেরা শুরু করলেন। 'শুনি তুমি ঢাকাতে পড়াচ্ছ, মাইনে কত? উন্নতির আশা আছে?' উত্তর শুনে বুঝতে পারলেন বাবার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বললেন, 'তোমার বড় সাহেব নিশ্চয়ই ইংরেজ। মন দিয়ে কথা শোনো — খোঁজ করো সাহেব কখন অফিসে ঢোকেন এবং কখন বেরোন। রোজ ঠিক সেই সময় দরজার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকবে, সাহেবকে দেখলে সেলাম করবে। প্রথম দিকে কিছু বলবেন না: দেখবেন তো? জেনে রেখো একদিন তাঁর কৌতূহল হবে, জিজ্ঞেস করবেন, ইয়াং ম্যান, তুমি কে, কী করো? রোজ তোমাকে দেখি। সব গুছিয়ে বলবে — ব্যস, তুমি ওঁর নেকনজরে পড়ে যাবে। এই জায়গায় থাকতে হবে না, কে আটকায় তোমাকে? সেলাম করতে ভুলো না কিন্তু।' উপদেশ উপেক্ষা করলেন, লেকচারার ক্লাস টু থেকে ওয়ান হতে পনেরো বছর লাগল; রিডার বা প্রফেসর, কোনোটিই হতে পারলেন না!

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, রাজনীতি — কোনো কিছুর সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিল না। অধ্যাপনা, আলোচনা, আড্ডা, পরিবারের দেখাশোনা নিয়ে খুশিমনে দিন কাটত।

হঠাৎ করে আবিষ্কার, আশুজেঠা, ডা. আশুতোষ সেনের (রসায়ন) দুদিন (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১ মার্চ, ১৯৪৬) ধরে বাবাকে লেখা চিঠি অবাক করে দিলো। চিঠি আট পৃষ্ঠার, বিষয় ১৯৪৬-এর অ্যাসেম্বলি ইলেকশন; বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাকে ভোট দিয়ে পাঠানো উচিত, কী করে ভোট জোগাড় হবে, গোপনে আলোচনার ব্যবস্থা, পরিষ্কার করে লেখা। পরিষ্কার হলেও আমার বোধের বাইরে। জিজ্ঞাসা করাতে অশোক মিত্র লিখেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডা. আশুতোষ সেন ইউনিভার্সিটির ইসি এবং পরিচালনায় জড়িত ছিলেন। ওঁদের নিজস্ব দল ছিল, তাতে ঢাকার শিক্ষিত, ক্ষমতাবান মানুষেরা যুক্ত ছিলেন। এঁরা একসঙ্গে জোট করে ভোট দিতেন।' এরপর ১৯৩৭-এর অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের ব্যাপারে রাজ্জাক সাহেবের বক্তব্য পড়ে চিঠির গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। এ-ও মনে হলো, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার পরিবেশের ইতিহাসে এ চিঠি ঐতিহাসিক।[৩৯]

আশুজেঠা ১৯৪৫-এর প্রথম দিকে ঢাকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে গেলেন। কারণ জানতে চাইলে পুত্র অমর্ত্য বললেন, 'ওঁর মনে হলো বহুকাল অধ্যাপক হয়ে থেকেছেন, কলকাতা গেলেন ব্যবসা করবেন বলে।' ব্যবসা শব্দটা ভালো শোনায় না, চাইছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বনির্ভর করার জন্য কিছু তৈরি করা, চিনেমাটির বাসন, যা বাইরে থেকে আসত, তা বানাতে শুরু করলেন। (Bengal Pottery-র সন-তারিখ জানি না, তবে পূর্বজ বা সমসাময়িক হবে হয়তো)। বলা বাহুল্য, ব্যবসা জমল না। ১১-৫-৪৭-এ পরিমলকাকা বাবাকে লিখছেন, 'ডা. আশুতোষ সেন ভারতীয় সরকারের soil chemist নিযুক্ত হয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য বিলেত রওনা হয়েছেন।'

ঢাকা ছেড়ে গেলেও ইউনিভার্সিটি পরিচালনার রাজনীতির জট ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে ওঁর সময় লেগেছে। চিঠির সারমর্ম দেওয়ার চেষ্টা করছি।

'অ্যাসেম্বলি ইলেকশন নিয়ে ঢাকা নিশ্চয়ই এখন সরগরম। আমার নির্ণয় হয়ে গেছে, ফজলুল রহমানকে চিনি, নুরুল হুদাকে চিনি না। রহমান যাতে জিতে যান সে প্রচেষ্টা তুমি করো।' বাবার ওপর ভরসা ছিল না, সুতরাং 'যা করো সন্তর্পণে করবে, আমাদের কাজ হচ্ছে রহমানকে বেশি করে হিন্দু ভোট পাওয়ানো। ঢাকার হিন্দুরা ভীষণভাবে রহমানের বিরুদ্ধে, তারা বা আমাদের বিরোধী পার্টি যদি জানতে পারে সব হিন্দু ভোট হুদার কাছে চলে যাবে। এখানে আমাদের পার্টি মিটিংয়ে রহমানের বিরুদ্ধে অনেক মেজাজ দেখানো হয়েছে, আমি আমার মত জানিয়ে দিয়েছি।

আজ পার্টির নেতা ঢাকা যাচ্ছেন পুরো সিন পর্যবেক্ষণ করতে। রহমান যতই লীগের মানুষ হোন, উনি আমাদের সাহায্য করবেন কথা দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে ইউনিভার্সিটির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, এখন সেতু বাঁধবার প্রয়োজন। রহমান সেই সেতু বাঁধবেন যদি হিন্দু ভোট ওঁর পক্ষে যায়। রহমানকে জেতালে আমরা হিন্দুদের সাহায্য করব।

আমি আমার ধর্মে বিশ্বাস করি, নিজেকে হিন্দু মনে করি; যখন ইসির সভ্য ছিলাম হিন্দুদের কল্যাণে প্রচুর কাজ করেছি, যদিও তাতে আমার নিজের 'প্রমোশন' বন্ধ হয়েছে।' [১৯৪৫-এ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ সম্ভবত প্রমোশন না পাওয়া।]

এবার হিন্দুদের ভালো করার জন্য ফজলুল রহমান কী আশ্বাস দিয়েছেন তার তালিকা। আশ্বাসের ফর্দ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে রহমান সাহেবের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোর জন্য, যেমন অল্পবয়সী চাকরিপ্রার্থী, বাঙালি বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্নাতকদের প্রথম স্থান দেবেন, বাইরের বয়স্ক মরচে ধরা অধ্যাপকদের বাইরে রাখাই ভালো। 'অমিয়, ইউনিভার্সিটির মুসলমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ঢাকার হিন্দুরা ওঁকে rank communal মনে করেন, সে কথা ঠিক নয়। ওখানকার হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে যাবেন জানি, এটা যে ইউনিভার্সিটির ভালোর জন্য করছি, কোনো না কোনো দিন সে কথা বুঝবেন।'

এরপর strategy, লুকোচুরি খেলা — কারা বিশ্বস্ত, কারা বাইরের, রহস্য নাটকের মতো চলে। বাবার রাজনীতি করার ক্ষমতায় বিশ্বাস নেই, বিস্তারিত নির্দেশ। 'কাল সকালে চিঠিটা পেয়ে গিরিজার (কে জানি না) বাড়ি গিয়ে পুরো চিঠিটা দেখাবে। রোববার সকালে তোমার বাড়িতে মিটিং রাখবে আর যাঁদের নাম দিচ্ছি তাদের নিজে গিয়ে আসতে বলবে — এঁরা গিরিজার সঙ্গে আসবে। মিটিংয়ে পুরো চিঠি পড়ে শোনাবে না — যা যা ব্র্যাকেটে লিখেছি, শুধু সেটুকুই পড়বে। মনে রেখো পেনসিলের ব্র্যাকেটে যা আছে শুধু সেটুকু। যদি চিঠি দেরিতে পৌঁছয়, মিটিং না হয়, আমাদের পার্টির কর্তা শৈলেশ গুপ্তের অনুমতি নিয়ে পার্টি মিটিংয়ে ওই ব্র্যাকেটওয়ালা ভাগ পড়ে শোনাবে — ভুল যেন না হয়। পড়ার পর বেরিয়ে এসো, আলোচনায় থাকবে না।' কত হিন্দু ভোট জোগাড় করতে পারবেন পার্টির সদস্যরা তার জন্য মিটিং — বাবা নেহাতই ডাকহরকরা, তিনি এসবের মধ্যে নেই!

এরপর ভোট গুনতি — রহমান নিশ্চয়ই জিতবেন, প্রশ্ন হচ্ছে, কতটা হিন্দু ভোট পান। 'যদি অভাবনীয় ফল হয়, নুরুল হুদা জিতে যান, আমরা খুবই লাঞ্ছিত হব, তবে আমাদের বিবেক থাকবে পরিষ্কার।' ফজলুল রহমান জিতেছিলেন জানি, তবে জেঠাদের 'পার্টি'র কাজ কতটা সফল হয়েছিল জানার উপায় নেই, জেঠার কাছ থেকে আর কোনো চিঠি নেই।

চিঠিটা পড়ে হয়তো অন্যায়ভাবে, কিছুটা কৌতুক বোধ করেছি, গভীরভাবে বিচলিত হয়েছি। কৌতুক, কারণ স্বাধীনচেতা মানুষ, বাবা, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতুলানন্দ ছাড়া কারো আদেশ বা নির্দেশ পালন করতেন না বলেই জানতাম। প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালন করতেন।

আশুজেঠা যে অপর একটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো আদেশ-নির্দেশ দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন, ও বিশ্বাস আছে যে রাজনীতির আঁকাবাঁকা পথ অমিয়র যতই অচেনা, অপ্রিয় হোক, তিনি ওঁর কথা মানবেন, এ নতুন আবিষ্কার। কৌতুক বোধ করি এই ভেবে যে, কাজপাগল বাবা, ঢাকার কড়া মেজাজের রোদে, হোক না বসন্তের শুরু, টিকাটুলিতে তারাকুটিরের পাশের বাড়িটি, বকশীবাজারে হোসেনি দালানের পর এক বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আরো কত ঠিকানা। মা চা-জলখাবারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত — যুদ্ধ শেষ, কালোবাজার — কী পাওয়া যায়, না যায় কে জানে। ওদিকে মিটিংয়ে বাবা চেষ্টা করছেন ভুল করে পেনসিলের ব্র্যাকেটের বাইরের কিছু পড়ে না ফেলেন!

এত সব কল্পনা করার প্রয়োজন ছিল না। পরে খামের ওপর পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে বুঝি চিঠি দেরিতে পৌঁছেছিল। মিটিংয়ের সময় পেরিয়ে গেছে ততদিনে। তাছাড়া আমরা যতদূর বাবাকে জানি, বাবা বাড়িতে মিটিং ডাকতেন না। জেঠার বিশ্বাসের গিরিজাবাবুর কাছে চিঠি পৌঁছে দিতেন, তার বেশি নয়। যে-কোনো 'দল' থেকে উনি দূরে রাখতেন নিজেকে। আবার আশুজেঠার কথার বিরুদ্ধে হয়তো যেতে চাইতেন না। সবই আন্দাজ।

কৌতুকের কারণ আরো আছে। বাবা আর আশুজেঠা স্বভাবে ছিলেন একেবারে বিপরীত। আমুদে, থিয়েটার, গান-বাজনায় সন্ধ্যা কাটে — সেই আশুজেঠাকে আমি দেখিনি — সে ছিল পুরনো দিনে। আমার কাছে উনি ছিলেন ধনী, বৈষয়িক, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, ঢাকার বন্ধুমহল থেকে সরে আসা, সীমিত মানুষের জন্য বন্ধুত্ব, প্রাণখোলা হাসি, ভ্রমণ ও মাছধরার নেশায় মশগুল, পুরুষানুক্রমে ঢাকার আভিজাত্যে ঘেরা, আমার অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও ভালোমানুষ জেঠামশায়। বাবা গ্রামের ছেলে, সবদিক থেকেই 'মাটির' মানুষ, প্রাণখোলা হাসি সবার জন্য, সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশী বা দুর্দান্ত-মেধা অর্থনীতিবিদ/বৈজ্ঞানিক/সাহিত্যিক বা আর কিছু, লেখাপড়ায় মশগুল, পুরুষানুক্রমে পাণ্ডিত্যের আভিজাত্যে ঘেরা, ছাত্রবৎসল অধ্যাপক। অথচ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব — একে অপরের প্রতি চিরকালের স্নেহ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস।

বিচলিত — একটু বেশিমাত্রায় বিচলিত। দাঙ্গার কথা শুনেছি, আল্লাহু-আকবর ও বন্দে মাতরম ধ্বনি নিঝুম রাতের স্তব্ধতাকে খানখান করে ভেঙেছে, বইতে-কাগজে আজো উপমহাদেশের, বিশ্বের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে পড়ি, তবু আমার কাছের কেউ বারবার হিন্দু-মুসলমান বলে মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করছেন, তাঁর হিন্দুত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য হচ্ছেন, সে ব্যথা নিজস্ব, ব্যক্তিগত। সত্তর বছর আগে পূর্ববঙ্গের যে পরিস্থিতি ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আশুজেঠা হয়তো ঠিক লিখেছেন, পাকা জহুরির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন — আমি মন্তব্য করবার কে? তবু বিচলিত, দুঃখিত, কারণ সত্তর বছর আগেও বাড়িতে কখনো হিন্দু-মুসলমান বলে শুনিনি। ছাত্র-ছাত্র, বন্ধু-বন্ধু, সহকর্মী-সহকর্মী; এরপর কিছু যোগ করা হতো না। মনুদা (কবির), সত্যব্রতদা, সানাউলদা, সমরদা, তোজাম্মলদা, নরেশদা, রাজ্জাক সাহেব কাউকে ভিন্ন ভাবতে শিখিনি, আজো ভাবি না। ওঁরা কেউ নেই সে-কথা ভেবে যখন বেদনা বোধ করি, তখন কারো ধর্ম মনে আসে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা শহর, যার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ ছিল স্বচ্ছতা, অন্তরঙ্গতা, আপ্যায়ন, স্নেহ-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সেই সম্প্রীতির রাজ্যের অন্য পরিচয় পেতে ভালো লাগে না।

* * *

বাবার কর্মজীবনে দুটি লক্ষ্য ছিল, প্রাণমন দিয়ে পড়িয়ে উৎসাহ জাগিয়ে ছাত্র তৈরি করা আর অর্থনীতির তত্ত্বের ওপর গবেষণা করা। দুটিতেই তিনি সফল হয়েছেন। ২০০৩-এ ওঁর শতবর্ষ উদযাপনের পর *কালি ও কলম* (ঢাকা) ও কলকাতার খবরের কাগজে কিছু চিঠি বেরিয়েছিল। ঢাকার এক ছাত্র লিখেছিলেন, 'প্রফেসর দাশগুপ্তের বক্তৃতায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম, এত পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষায় উনি অর্থনীতির গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। শুধু মেধাবী ছাত্রদের নয়, ওঁর বিশেষত্ব ছিল আনমনা ছাত্র, যাদের অর্থনীতিতে মনোযোগ নেই তাদের মধ্যেও কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারতেন। সহজ-সরলভাবে আমাদের একজন হয়ে উনি পড়াতেন।'[৪০] 'আমাদের একজন হয়ে' পড়ে মনে পড়ল শিষ্য অসিত হালদারকে লেখা গুরু অবনীন্দ্রনাথের আরেকটি চিঠি।

প্রিয় অসিত,

...এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে গুরুমশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না। মনে রেখো যে পাখী পড়াতে হলে পাখীর সঙ্গে নিজেও পাখী হতে হয়।

ইতি
শ্রী অবনীন্দ্র[৪১]

বাবার গবেষণার ওপর কিছু লেখার যোগ্যতা বা আস্পর্ধা আমার নেই। লিখেছেন সমরঞ্জন সেন, অমর্ত্য সেন, বি আর ব্রহ্মানন্দ, আশীষ দাশগুপ্ত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেফরি হারকোর্ট ও আরো অনেকে। শতবর্ষে ওঁর কাজের ওপর বই বেরিয়েছে, অর্থনীতি পরিষদের (ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট) বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে, এর বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। শিক্ষক হিসেবে কেমন ছিলেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে জানায় *শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য* নামক মূল্যবান গ্রন্থ ও কিছু কথোপকথন।

ঢাকাতে মোহাম্মদ শরীফ বাবার ছাত্র ছিলেন ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩। ৭০ বছর পর আমার সঙ্গে ওঁর কথোপকথন থেকে উদ্ধৃত করছি।

> তোমার বাবা, ছিপছিপে চেহারা, টিকোলো নাক, কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, উজ্জ্বল চোখ, রং শ্যামলা তাতে ধবধবে সাদা কোঁচানো ধুতি আর পাঞ্জাবি, গরমে সাদা রুমাল বার করে মুখ মুছছেন, ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা আজো দেখতে পাই। ওঁকে আমরা 'black prince' বলতাম।
>
> ওঁর পড়ানো? কি বলব — ওরকম আর হয় না। ছোট ছোট প্রশ্ন তুলতেন, Socratic method. তার উত্তর দিয়ে এমন বোঝাতেন যে, অর্থনীতির কঠিন প্রশ্ন ও সমস্যা, তত্ত্ব ও তার বিচার পরিষ্কার হয়ে যেত।
>
> ওঁর বকশীবাজারের বাড়িতে কতবার গিয়েছি। মেডিকেলের পাশে চৌরাস্তার পর মন্দিরওয়ালা বাড়ি। বীরেন গাঙ্গুলী ভালো গাইতেন। আমার ছবি আঁকা, গান গাওয়া ও অন্যান্য অনেক কিছুতে তোমার বাবা উৎসাহ দিয়েছেন।

শরীফ সাহেবের এত শ্রদ্ধা ছিল বাবার প্রতি যে, কর্মসূত্রে একবার যখন বরিশাল যাওয়ার আমন্ত্রণ এলো, উনি শর্ত করে নিলেন তাঁর শিক্ষক অমিয় দাশগুপ্তর গ্রাম গৈলা নিয়ে যেতে হবে, তবেই তিনি বরিশাল যাবেন। গিয়েছিলেন, ১৯৬১-তে; গৈলা তখন পড়ন্ত, জৌলুস চলে গিয়েছে, আমাদের বকশীবাড়ি জনশূন্য! শুধু বাবার পূর্বপুরুষের শুরু করা স্কুল একলা দাঁড়িয়ে গ্রামের ঐতিহ্য বহন করে যাচ্ছে।

ওঁর ছেলে ফজলুল রহমান আমাকে বলেছিলেন, 'ছেলেবেলা থেকে তোমার বাবার কথা আব্বাজানের কাছে শুনেছি, ওঁর উপস্থিতি সর্বদা ছিল আমাদের বাড়িতে। দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, তোমাকে কাছে পেয়ে মনে হচ্ছে আব্বাজানের ছাত্রযুগের ছোঁয়া আমাদের কাছে এলো।'

জানুয়ারি ৯, ২০০৩-এ শরীফ সাহেবের পুত্র, ভাইজান শামসুর রহমান ভাই লিখছেন, 'আব্বাজানকে আপনার চিঠি পড়ে শোনাবার পর ওঁর মুখ ও আওয়াজ যেভাবে উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল হলো, তা ভুলবার নয়। আপনাকে অনেক আশীর্বাদ জানিয়েছেন ওঁর শ্রদ্ধেয় গুরুর স্মৃতি নতুন করে কাছে নিয়ে আসাতে। আমাদের ছেলেমেয়েদের ঈর্ষা হওয়ার সময় হলো। বারবার বললেন কি অভিজাত (majestic)ভাবে ডা. দাশগুপ্ত ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে মগ্ন হয়ে থাকতেন। প্রফেসর দাশগুপ্ত সম্বন্ধে আরো অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চাইছেন, ওঁর খ্যাতি শিখর থেকে উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছে, এ জানতে পারা যেন আব্বাজানের পুরস্কার। আপনাকে কেচকি মাছের চচ্চরি পাঠাইনি বলে আব্বাজান অসন্তুষ্ট।'

ভবতোষ দত্ত চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তবে অর্থনীতিতে নয়। *শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্যে* লিখেছেন, 'অধ্যাপকরা আসতেন কেউ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, কেউ স্যুট পরে নিখুঁত সাহেবি পোশাকে। তাঁদের দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখতাম আমরা। কে কোন বিষয়ের অধ্যাপক জানতে দেরি হতো না। এমনি করে আমি জেনেছিলাম অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তকে। নাতিদীর্ঘ শ্যামবর্ণ শানিত চেহারার মানুষটি শান্তভাবে ফোলিও ব্যাগ হাতে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন। তাঁর দৃষ্টি-উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি ভেতরের ঝকঝকে বিচারপরায়ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিত। আমার অর্থনীতি পড়া বন্ধুদের কাছে জেনেছিলাম, ইনি অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক অর্থনীতির গবেষণায় ভারতবর্ষে অগ্রগণ্য।

কর্মজীবন শেষ করে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। পূর্বপল্লীর বাড়িতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। অর্থনীতি ছাড়াও কত বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তিনি [শান্তিনিকেতন] এসেছিলেন অবসর জীবনে শান্ত পরিবেশ পাবেন বলে। শান্তিনিকেতনের গাছপালা, মাঠ, জনবিরল প্রাঙ্গণ, খোলা আকাশ বোধহয় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোকে মনে করিয়ে দিত'।[৪২]

শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্যে আহমদুল কবিরের উক্তি Socialism ও Capitalism সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে তাঁর (আমার বাবার) মন্তব্য 'The minimum requirements of a person must be met by society through the State, thereafter variety is the spice of life.' আমার ষাট বছরের সমাজদর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি গুরুদেবের এই কথাটির ভিত্তির ওপর। আজ সারা পৃথিবীর দিকে তাকালে সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সব দেশেই এই মন্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[৪৩]

অশোক মিত্র বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে বাবার ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আসলে উনি ঢাকার ছেলে, মনেপ্রাণে ঢাকার ছেলে। আমার মা-বাবা দুজনেই প্রয়াত হওয়ার পর লিখেছিলেন, 'পরলোকে বিশ্বাস করি না, ঈশ্বরচিন্তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, তা হলেও জীবনে যা হলাম, যা পেলাম, সমস্ত কিছুর জন্যই তো কারো না কারো কাছে আমরা ঋণী আমার সর্বাধিক ঋণ গুরু ও গুরুপত্নীর কাছে।'[৪৪]

শ্রদ্ধার্ঘ্য পড়ে অভিভূত হয়েছি, অভিভূত শব্দটি বড় কৃপণ, কতটা মনে দাগ কেটেছে প্রকাশ করে না। কিন্তু আমার কাছে আর তো কোনো শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। বড় সৌভাগ্য ছাত্রছাত্রীদের অনেকের সৌহার্দ্য, স্নেহ পেয়েছি, পাচ্ছি; এঁদের লেখা নতুন করে মনে করিয়ে দেয় এমন মা-বাবার কন্যা হওয়ার সৌভাগ্য। সঙ্গে সঙ্গে এঁদের ও আরো অনেককে হারানোর দুঃখ। অতীত নিয়ে চিন্তা করলে ভালো লাগার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে বেদনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাবার জন্য, অভিজ্ঞতা তাঁর অভিজ্ঞতা, দিনপঞ্জির মাঝ দিয়ে। তাই ওঁর কথা দিয়েই কলেজের একটা সময়কার কথা লিখছি। আরো মাস্টার মশাইরা ছিলেন, প্রিয়, শ্রদ্ধেয় — যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অজিত সেন, তাঁদের কথা আমি কী করে লিখি? বাবার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করলে অবাক লাগে, আনন্দ হয়। গ্রামের ছেলে, ওঁর ইচ্ছে ছিল সাদামাটা ইউনিভার্সিটির লেকচারার হতে পারলে আর কিছু চাই না। সহজেই সে ইচ্ছা পূর্ণ হলো। পরিবারের আর্থিক অবস্থা পড়ন্ত, দাদার মনের জোরে ঢাকাতে পড়তে এসেছিলেন; নিজের মনের জোরে ধার নিয়ে বিলেতে পিএইচডি করতে গিয়েছিলেন, তাও অর্থনীতির তত্ত্বের কোনো বিষয়ের ওপর। লন্ডন যাওয়ার আগে কলকাতার এক অভিজ্ঞ অধ্যাপক বাবাকে সতর্ক করেছিলেন, 'অমিয়, তুমি ভুল করছ, Economic Theory-তে গবেষণা করবার চেষ্টা করো না, Theory ওদের (অর্থাৎ ইংরেজদের) জন্য, আমাদের নয়। বিফল মনে ফিরে আসতে হবে।'[৪৫] জিদ গেল না, সফল হয়েই ফিরলেন। উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা ছিল, উচ্চপদের নয়। ১৯৩৬-এ লন্ডন ছাড়ার আগের সন্ধ্যায় বারবার লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের চারদিকে হেঁটে বেড়ালেন, আর তো কখনো আসবেন না। অনেক কিছু শিখেছেন এখানে দু'বছর।

কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা কাটিয়ে দিলেন অধ্যাপনা করে; শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেন; ১৯৭০-এর দশকে পুত্র পার্থসারথী LSE-তে প্রফেসর হলেন, নিজে LSE-র অনারারি ফেলোর সম্মান পেলেন, ১৯৮৪-তে জামাতা হলেন LSE-র ডিরেক্টর। ১৯৩৬-এ ভেবেছিলেন আর কখনো লন্ডন ফিরবেন না, ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ প্রতিবছর মা-বাবা বিলেতে লন্ডন আর কেমব্রিজে মাসতিনেক কাটিয়েছেন। দুই জায়গায় প্রচুর বন্ধু।

জীবন (১৯০৩-৯২), প্রায় পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে, বাস করেছেন পরাধীন দেশে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাগ নিয়েছেন, দেশকে স্বাধীন ও বিভক্ত হতে দেখেছেন। গরিব ঘরের গ্রামের ছেলে পরিপূর্ণতা পেয়েছিলেন গ্রামের স্কুল, বিএম কলেজ, ঢাকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। যেমন আগে লিখেছি গৈলা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওঁর অন্তর থেকে কখনো দূরে যায়নি — এরা ছিল ওঁর অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের খুঁটি।[৪৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ জীবনে ছোট্ট একটি খাতায় বাবা লিখে গিয়েছেন, 'ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা ভেবে আনন্দ হয়। গতানুগতিক শিক্ষার ভেতর না গিয়ে এখানকার লক্ষ্য ছিল ধর্ম-জাত-বিত্ত নির্বিশেষে ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষা দেওয়া। আমার মতো গ্রামের ছেলে শুধু ঢাকাতেই এই উঁচু মাপের উচ্চশিক্ষা পেতে পারতেন। আমাদের জীবন শুধু পড়াশোনা, ক্লাস বা নিজেদের বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; সাহিত্য, সংগীত, নাট্য আলোচনা, নানা ধরনের বক্তৃতা — সবই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ ঢাকার মতো আমি আর কোথাও দেখিনি।'

শান্তিনিকেতনে ওঁর স্মৃতিসভায়, ছাত্রসম অশোক রুদ্র, নিজে বিশাল পণ্ডিত, বলেছিলেন, 'মাস্টারমশাই চলে গেলেন। হ্যাঁ, মাস্টারমশাই চলে গেলেন।' 'মাস্টারমশাই' হতে চেয়েছিলেন, ছাত্ররা, স্নেহাস্পদরা সেভাবেই ওঁকে মনে রেখেছেন; স্মৃতিতে 'মাস্টারমশাই' হয়ে থাকবেন।*

AMARBOI.COM

* পরিশিষ্টে ১৯৭৫-এ ঢাকায় দেওয়া বক্তৃতার কিছু অংশ দেওয়া হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার কথা লিখতে বসে স্বর্গীয় ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মনে এলো'র কথা মনে পড়ছে। আমার এ লেখা ওই 'মনে এলো'র পর্যায়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অনেক কথাই মনে পড়ছে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর ঢাকায় কাটিয়েছি। প্রথমে ছাত্র হিসেবে, পরে শিক্ষকের পদে। ঢাকা ছাড়ি ১৯৪৬ সালে — পার্টিশনের বছরখানেক আগে। আমার মতো অনেকেই তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতে গিয়ে মুখর হয়ে ওঠেন। আমার মতো অনেকের জীবনের একটি রোমান্টিক অধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিশ-পঁচিশ বছর। আমি এখানে সেই অধ্যায়ের কথা বলতে বসিনি — তা বলতে গেলে আত্মজীবনীর মতো শোনাবে। ইদানীং আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে পার্টিশনের পরে ঢাকায় গিয়ে ছেলেদের কাছে যে টুকরো টুকরো কথা শুনেছি তাই। যখনকার কথা বলছি তখন আমি ওখানে পরদেশি।

পার্টিশনের পরে দুবার ঢাকা গিয়েছি। একবার ১৯৪৯ সালে কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশনের কিছুদিন আগে, আরেকবার ডিভ্যালুয়েশনের অব্যবহিত পরে। দুবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অনুরোধে কিছু বলতে হয়েছে। অর্থনীতিতে বিভাগীয় অধ্যক্ষ ছাড়া শিক্ষকরা সবাই আমার পুরনো ছাত্র। এঁদের সঙ্গে কয়েকবারই আলোচনা-বৈঠকে বসেছি। ছাত্র-শিক্ষকরা বারবার বলেছেন, আমরা হিন্দু শিক্ষকরা এঁদের বড় অপরিণত অবস্থায় ফেলে চলে এসেছি। 'আর পাঁচটা বছরও যদি আপনারা থেকে যেতেন, স্যার, তবে আমরা তৈরি হয়ে নিতে পারতাম — এখন এই ভ্যাকুয়াম কীভাবে পূরণ করি।'

কথাগুলো মনে খুব দাগ কেটেছিল। ন্যায্য অভিযোগ — সত্যিই তো, আমরা যখন চলে আসি বিশ্ববিদ্যালয়ের কী অবস্থা হবে সেকথা তেমন তীব্রভাবে কি ভেবেছিলাম, যেমনটা ওখানকার ছাত্রসমাজ ভেবেছিল? যে বছর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসি সে বছর (১৯৪৫-৪৬) একাদিক্রমে প্রায় বিশজন হিন্দু শিক্ষক ওখান থেকে অন্যান্য জায়গায় চলে আসেন, প্রত্যেকেই নিজের নিজের কারণে — পার্টিশনের সূচনা তখনো হয়নি। একসঙ্গে এতজন চলে গেলাম, এর অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজতে কাগজেও লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু গত প্রায় তিন দশকের ইতিহাস পড়ে আমি মনে করি দেশবিভাগের আগে-পরে হিন্দু শিক্ষকদের অবর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ক্ষণস্থায়ী; অচিরেই তার পূরণ সম্ভব হয়েছিল। এটা আমাদের গর্বের বিষয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার নিজের বিষয় (অর্থনীতি) সম্বন্ধে বলতে পারি — গত পঁচিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্র বেরিয়ে এসেছেন, যাঁদের খ্যাতি আন্তর্জাতিক।

পার্টিশনের পরবর্তী যুগের অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। এবং এঁরাই আজ স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেন্দ্রের ভার নিয়েছেন। এটা আমাদের গর্বের বিষয়।

সেবারকার ঢাকার স্মৃতিতে আরেকটি কথা বিশেষভাবে জেগে আছে। পার্টিশন বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, এমন সময় একটি ছাত্র বলে উঠল, 'স্যার, পার্টিশন ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেকথা থাক — কিন্তু আমাদের একটা বড় দুঃখ থেকে যাবে — রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিজেদের দেশের কবি বলে স্বীকার করতে পারব না। এ আমাদের মস্ত ক্ষতি।' কথাটা শুনে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে মনে অবাকও হয়েছিলাম — কত শক্তি একটি কবির যে, এত বড় একটা ঘটনার হিসাব-নিকাশ তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছিল যুবক সম্প্রদায়ের কাছে, এই ভাবনায় যে তাদের কবি পরদেশি হয়ে গেল। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারছি, সে সময়কার উক্তিটি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কবিকে ওরা পরদেশি হতে দেয়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের সোজাসুজি সম্পর্ক না থাকলেও বাবা-কাকাদের ঘনিষ্ঠতার কারণে আমরাও এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম। 'ছেড়ে যাওয়া' যেমন বাবা-কাকাদের বিচলিত করেছিল, পায়ের তলার পোক্ত মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এঁদের পরিবারের পক্ষেও কঠিন হয়েছিল, সেকথা ভুলে যাওয়া সংগত হবে না। গৃহ-গৃহস্থালি, বন্ধু-গোষ্ঠী, আত্মীয়-পরিজন, পরিচিত পরিবেশ, সাজানো সংসার ছেড়ে অজানা-অচেনা দূরদেশে যাওয়া সহজ নয়; মা-মাসি-কাকিরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, সহজসাধ্য না হলেও সময়ে নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে তাকে আপন করে নিয়েছেন। মায়েদের প্রজন্মে 'মানিয়ে নেওয়ার' আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, তাই বলে প্রথমদিককার মানসিক আলোড়ন অস্বীকার করা যায় না। আবার ধীরে ধীরে নতুন অভিজ্ঞতা থেকে তৃপ্তি বা আনন্দ নেওয়াও অস্বীকার করা যায় না।

মাসি-কাকিদের মনোভাব নিয়ে লিখবার অধিকার আমার নেই; যেটুকু বাইরে থেকে দেখেছি, লিখছি। মীরামাসির জীবনে প্রচুর ধকল এসেছিল। Alex Aronson[১]-এর জায়গা না পেয়ে মন্মথকাকা (ঘোষ, ইংরেজি সাহিত্য) বাধ্য হয়ে অতি স্বল্প মাইনেতে দিল্লিতে 'দিল্লি কলেজে' যোগ দিলেন। সুনামি অধ্যাপক হিসেবে অবসরপ্রাপ্তি অবধি সেখানেই রইলেন। অর্থের অসংকুলান পুরানা পল্টনে আমাদের অজানা ছিল না। ঢাকায় জিনিসপত্র অপেক্ষাকৃত সস্তা, মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও টানাটানি করে সংসার চলে যেত। দিল্লি রাজধানী, খরচপত্র রাজার হালে; ঢাকাতে যা প্রয়োজন হয়নি, মীরামাসি পেয়িং গেস্ট রেখে, চাকরি করে যৌথ সংসার ও অতিথিদের রান্না করে, বাইরের কাজ নিজে করে সংসার চালিয়েছেন। ঢাকার 'আপ্যায়ন' কোনোদিন বন্ধ হতে দেননি। কী করে করতেন জানি না। আজকাল 'multitasking' (বিভিন্ন কাজ একসঙ্গে করা), 'time management' (সময়কে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা) নিয়ে লেখা হয়, মীরামাসি বহু আগে এসব করে দেখিয়েছেন। ওঁর মতো কর্মঠ, সুবিবেচক মহিলা কম দেখেছি। ঢাকার কথা বলবার, হয়তো মনে আনবারও সময় ছিল না তখন। বহু বছর পর যখন পারিবারিক দায়িত্ব কম হয়েছে, খাটুনি কমেছে, বসে গল্প করার সময় হয়েছে, আমাকে বলেছিলেন, 'ঢাকার জীবন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা — সে মাধুর্য আর কোথাও পাবি না, বুঝলি?'

মন্মথকাকা বিষয়-আশয় ভালো বুঝতেন, তবে দৈনন্দিন সংসারের বিধিব্যবস্থা ওঁর জগতের বাইরে ছিল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও ওঁদের প্রথম জীবনের দু-একটি গল্প লিখি। মীরামাসি ঢাকাতে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকাকে বললেন স্কুলে পরে যাওয়ার মতো কয়েকখানা শাড়ি এনে দিতে (তখন মেয়ে-বৌরা বড় একটা বাজারে যেতেন না)। মন্মথকাকা শাড়ি নিয়ে এলেন, ঠিক একরকম পাঁচটি মিলের শাড়ি, প্রত্যেকটির পাড় ঢালা কালো। ধোয়া, পরিষ্কার শাড়ি চাই, রকমারি পাড়ের কী প্রয়োজন।

নিঃসন্দেহে খামখেয়ালি, ঢাকাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর বক্তৃতা শুরু করলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক লম্বা কবি'। শ্রোতারা বুঝলেন না, উনি 'tall figure' হিসেবে কথাটা ব্যবহার করেছেন, নানা মন্তব্য হলো, বক্তৃতার আমন্ত্রণ কমে গেল। 'আপিলা-চাপিলা'তে অশোক মিত্র কাকার জীবনকে বলেছেন একটি tragedy।[২] নৈরাশ্য ওঁকে অল্প বয়স থেকে তাড়া করেছে; সেই যখন বিলেতে Ph.D করবার জন্য সব তৈরি, স্যুট ইত্যাদিও বানানো হয়েছে, জাহাজের জন্য রওনা হওয়া বাকি — মা অসুস্থ হলেন, যাওয়া হলো না। কোনোদিনই যাওয়া হলো না। সেই থেকে নৈরাশ্য, দায়িত্ব এড়াতে পারেননি। সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে Harold Robbins পড়ে হয়তো নৈরাশ্য থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। বাড়িতে পড়াশোনা করুন, না করুন, পড়ানোতে কখনো গাফিলতি ছিল না, অশোকদা যেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর লেকচার শুনতেন, দিল্লির ছাত্ররাও ঠিক সেভাবেই শুনতেন, সম্মান করতেন।

অজিত সেন মেসো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্মানিত অধ্যাপক, সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন, 'এ. কে. সেন বা অজিত সেন। তিনি মানে, তাঁর আচার ব্যবহার ক্লাসে বাংলা ভাষায় সহজ করে বিষয়ের ব্যাখ্যা দান এগুলো আমাদের খুব inspire করত।'[৩] রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন, এই ছাত্রবৎসল লেকচারারদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লেখাপড়ার প্রতি একটা গুরুত্ব আরোপের মনোভাব সৃষ্টি করত। (ছাত্রদের) চরিত্রের অন্যান্য দিকেও এর প্রভাব পড়ত।'[৪] মেসো ও জুনোমাসি দেশবিভাগের পর ঢাকাতে থেকে গেলেন।

১৯৫০-এ ঢাকা শহরের পরিস্থিতি অনিশ্চিত, অশান্ত। মেসো ঢাকা ছেড়ে কলকাতা যাবেন ঠিক করলেন। ১৯৪৭ থেকে 'বেশির ভাগ হিন্দু অধ্যাপক ঢাকা ছেড়ে যাওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সংকটজনক' — মন্তব্য করেছেন রাজ্জাক সাহেব। ১৯৫০-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগ পূর্ব গৌরবে ফিরে যায়নি। অজিত সেন মেসোদের কন্যা, অনিতা — মিষ্টিদি বলেছেন, 'বাবা উপাচার্যকে বললেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেবার কথা। উপাচার্য রাজি নন। পরিস্থিতি এমন যে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্তি ছিল না। উপাচার্য বাবাকে দেহরক্ষী দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাবা বললেন, 'আমাকে তো আপনারা নিরাপদে রাখলেন, আমি মনোযোগ দিয়ে পড়াব কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, আমার পরিবারের জন্য সর্বদা দুশ্চিন্তায় থাকব।' ছেড়ে দিয়ে ১৯৫০-এর কোনো সময় কলকাতার এক কলেজে কাজ নিয়ে এলেন।'

পুরানা পল্টনের 'পল্টন ভিলা', ৪নং-এর সুসজ্জিত, ঝকঝকে বাড়ি, সংসারের প্রিয়, স্মৃতিভরা জিনিসপত্র হারিয়ে (আমার মায়ের মতো) এলেন সংকীর্ণ বাসাতে, বাড়িটি পুরনো। পরিবারের সবাই একসঙ্গে, সুস্থ সবল — এই শান্তিতে জুনোমাসি হাসিমুখে নতুন সংসার শুরু করলেন। ভগবান হাসি কেড়ে নিলেন, ১৯৫৪-তে হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মেসো মারা যান। এর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার সম্পর্ক আছে তা বলবার অধিকার নেই — বিশ্ববিদ্যালয় তো ওঁকে ছাড়তে চায়নি, ছেড়েছিলেন পরিস্থিতির জন্য — গভীর মানসিক টানাপড়েন ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। জুনোমাসি একা হয়ে গেলেন। বহু বছরের ছত্রছায়া হারিয়ে মাসি নিজেকে দিশেহারা হতে দিলেন না। ওঁর গর্ব ছিল নিপুণ সংসার, বাইরের কাজ মেসো দেখতেন। নিজেকে সংযত করে মাসি ঘর-বার, ঝড়ঝাপ্টা সামলে কাটালেন অন্তত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। যে কারণেই ঢাকা ছেড়ে আসুন, জীবন বড্ড কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

মিষ্টিদি আর আমি ঘরসংসার করে সুখে-দুঃখে চাওয়া-পাওয়া-হারানো নিয়ে এত বছর কাটিয়েছি। আজো দেখা হলে কিন্তু সেই পুরানা পল্টন, ইডেন স্কুল, পুতুল খেলা, নাচ-গান, নাটকে ফিরে যাই। স্মরণ করি কাছের মানুষ যাদের হারিয়েছি।

মা কতটা নিরাশ হয়েছিলেন তা সহজভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। শীঘ্র ঢাকা ফিরে আসা হবে এই আশা নিয়ে মা-বাবা ৩২নং পুরানা পল্টন ছাড়লেন। ভাড়া বাড়ি, পরিচিত, সুহৃদ, অধ্যাপক, বাড়িটি নিলেন; আমাদের আসবাবপত্র, বাসনপত্র, রান্নাঘরের প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় জিনিস একটি ঘরে গুদাম করে রাখা হলো। এ ঘরের ভাড়া বাবার ভাগে। সুরক্ষিত থাকবে, ফিরে এসে যেখানেই থাকি সহজে গুছিয়ে নেওয়া যাবে, এসব চিন্তা করেই ব্যবস্থা। ক'মাস পর ১৯৪৭-এর গরমের ছুটিতে ঢাকাতে ৩২নং-এ যাওয়া হলো, জিনিসপত্র নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত আছে, তবে গৃহস্বামী-গৃহকর্ত্রীর ব্যবহারে — গুদাম খালি। ততদিনে বাবা ঠিক করেছেন ঢাকা ফিরবেন না, নিয়োগপত্র এলেও না, আমাদের স্থিতি নেই, অন্যত্র কোথাও পুরো সংসার নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, বিলিয়ে দিতে হতো। তবু মায়ের বিয়ের খাট-পালঙ্ক, এডওয়ার্ডিয়ান ফ্যাশনের ড্রেসিং টেবিল, প্রথম সংসারের শখের, প্রয়োজনের নানা কিছু, স্মৃতিভরা ছোটখাটো বাক্স বা কৌটো, আমার ও ভাইয়ের ছেলেবেলার খেলনা, পুতুল — নিজের অজান্তে বেহাত হয়ে গেল, মায়ের মনে ধাক্কা লেগেছিল। স্বল্পভাষী মানুষ, শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'আমার অমন পছন্দের, সুন্দর কুলাখানাও নিয়া নিছে।' আর কখনো কিছু বলেননি। নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত আমরা ছেলেমেয়েরা, ওঁর মনের গভীরের ব্যথা, বিরক্তি, অনাসক্তি, কিছুই জানবার চেষ্টা করিনি।

মায়ের মধ্যে পৃথিবী সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল; হলুদমাখা মিলের শাড়ি পরে রান্নাবাড়াতে সময় কাটালেও কৌতূহল যায়নি। যে পরিস্থিতিতেই থাকুন আনন্দ নিংড়ে নিতে পারতেন। সন ১৯৪৬ দিল্লিতে অব্যবস্থার, অল্পদিনের বাসা — তারই মধ্যে পার্লামেন্ট হাউসে সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনে দর্শক হয়ে যাচ্ছেন। ছোট ডায়েরিতে লেখা, 'জহরলাল নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল, লিয়াকত আলি ও আরো অনেকে ছিলেন। পন্ডিত নেহরুর debate সব চাইতে ভালো লাগে।' বিড়লা হাউসে গিয়ে গান্ধিজিকে দেখে এসে লিখলেন, 'আজ বিশেষ দিন, যতই দূরে থেকে হোক, গান্ধিজিকে দেখে এলাম। তবে আজ তিনি মৌন, শান্ত হয়ে বসে ধ্যানস্থ।' এরকম নানা কিছু বিশেষ বা খুঁটিনাটি। লিখছেন, 'কুতুব থেকে ফেরার পথে Aerodrom দেখি — একটা এরোপ্লেন নামিতেও দেখা গেল।' ১৯৪৬ — ঢাকা শহরের আমাদের কাছে এরোপ্লেন দেখা নতুন অভিজ্ঞতা, অবাক হবার নয়। আমারও ধু-ধু মনে পড়ে একটি এরোপ্লেন নামছে। (দরিয়াগঞ্জ থেকে কুতুব মিনার ঘুরে আসা সারাদিনের সফর, 'টঙ্গাভাড়া ১০ টাকা' জানাচ্ছে ডায়রি)।

আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ: বাবার পক্ষে বিলেত গিয়ে পড়াশোনা করা ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। ঢাকার খুঁটি হারানোর কষ্ট ছিল নিশ্চয়ই, তবে মায়ের কাছে বৃহত্তর জগতের আস্বাদ ছিল উপভোগ্য। দিল্লির শীতের রোদে ছাদে বসে আড্ডা, কাঁথার দেশের মানুষ আমরা দরদস্তুর করে পাঞ্জাবে বোনা 'খেশ' কেনা, টঙ্গা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পুরনো দিল্লি দেখা, সাধারণ ঘটনা — মা খুশি থাকতেন। অসুবিধা ছিল না তা তো নয়। বাড়ির মালিক জৈন ধর্মাবলম্বী, মাছ রান্না করা মানা, বাঙালি মাছ ছাড়া এমনিতেই অসহায়, তার ওপর যে বাড়িতে সধবা থাকেন, সেখানে মাছ খাওয়া হবে না, এ কল্পনার বাইরে।

প্রথম কিছুদিন শর্ত মানা হলো, রানীকাকিমা রাস্তা বার করলেন। আমরা তেতলায়, ওঁরা দোতলায় — দুবাড়ি কোনাকুনি, (এল ছাপের)। আমাদের জানালা দিয়ে ঢিল ছুড়লে ওদের বারান্দায় পড়ে। মাছ রান্না মানা, খোলা সিঁড়ি দিয়ে কাঁচা মাছ তেতলায় আনাও অসম্ভব; রাঁধা মাছ খাওয়া যাবে না সে কথা কেউ বলেননি। রান্না হতো পরিমলকাকাদের বাড়িতে, আমাদের জানালা থেকে দড়ি ছুড়ে দেওয়া হতো ওদের বারান্দায়, তাতে টিফিন ক্যারিয়ারে রাঁধা মাছ বেঁধে দেওয়া হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিক থেকে টান দিলে হেলতে দুলতে মাছ আমাদের বাড়িতে আসত। এ খেলা বেশিদিন ভালো লাগে না।

আরো নানা অসুবিধে সবার জন্যই ছিল। আর ছিল ঢাকার প্রতি প্রাণের টান। টান যতই থাকুক, জীবনযুদ্ধ যত বড় হোক, অভিযোগ করে মন ভার করে বসে থাকার মতো নির্জীব ছিলেন না আমার মা-মাসি-কাকিরা।

আমার কথা — সে কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি। ঢাকা ছেড়ে আসার কোনো স্মৃতি নেই, কবে বাবা এলেন, গোছগাছ হলো, কী নেওয়া হলো, কী রেখে যাওয়া হলো, কবে কোথায় ট্রেন ধরলাম, সব বিস্মৃতির গহ্বরে। মনে আছে তুফান মেল, রেলের লম্বা সফর, দিল্লি যাবার উৎসাহ-উদ্যম। তখন কে জানত সামনের এক বছর কতটা সময় কাটবে একটির পর একটি ট্রেনে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটবে বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হোল্ডল বা সুটকেসের ওপর বসে। কে জানত বাসস্থান হবে কখনো চোরকুঠুরির মতো অন্ধকার ঘর বা মাছ রাঁধা মানা এক জৈন মালিকের বাড়ি, কখনো নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে কোণঠাসা হয়ে, আবার কটকে র‍্যাভেনশ কলেজের এক বিশাল অট্টালিকায়। যদি জানতাম তা হলেও বিচলিত হতাম না — এ যে নেহাতই নিরানন্দের জীবন সেটা বুঝবার পক্ষে ছোট ছিলাম।

আমি ছিলাম মহানন্দে। ১৯৪৬-এ ঢাকার ছোট পরিবারে লালিত হওয়া একটি নয় বছরের মেয়ের পক্ষে তুফান মেলে ('চলো তুফান মেল' গানটি সম্ভবত এর আগে বেরিয়েছে!) ঐতিহাসিক দিল্লি যাওয়া ছিল 'স্বপ্ন হলেও সত্যি'। উপমহাদেশে ট্রেনের অভিযান আজো বৈচিত্র্যময়; কখনো নদী, কখনো গ্রাম, ছোট শহর, রেললাইনের সামনের ছোট ছোট বাড়িতে ফুল-সবজির বাগান, পেঁপে গাছ, সজনে গাছ, কোথাও চাষের জমি, আবার ধূসর অবহেলিত মাঠ। রাতের অন্ধকার, স্টেশনের আলো, যাত্রীদের দৌড়োদৌড়ি, কোলাহল, বড় স্টেশনে নেমে জলের বাসনে জল নেওয়া, কেলনার কেটারারের মুরগির স্টু, সবকিছু নতুন — দেখবার, জানবার। আমাদের মেল ট্রেন, যে স্টেশনে থামে না, যাত্রীদের জন্য কষ্ট হতো, আহা রে ওরা ট্রেন পাবে তো? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? আমি ভালো মানুষ নই, মেল ট্রেনে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবার গর্ব ছিল।

এরকম চোখ জুড়ানো, চোখ তাতানো দৃশ্যের পর হঠাৎ বোর্ড দেখলাম, 'শোন নদী'। মন্মথকাকা বিভিন্ন বিষয়ের 'জ্ঞানের' পরীক্ষা নিতেন, সে থেকে শিখেছিলাম ভারতবর্ষের সবচেয়ে দীর্ঘ সেতু 'শোন' নদীর ওপর। অন্তহীন নদী, অন্তহীন সেতু দেখবার সৌভাগ্য হবে কখনো ভাবিনি, মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিহরণ জাগল। মনে পড়ল কবছর আগে যুদ্ধের মাঝে তিন ট্রেন বদলে গিয়েছিলাম আসামে জোরহাট, এক জেঠামশায়ের বাড়িতে। পথে সাতটি টানেল বা গুহা, তার মধ্যে একটি এরকম অন্তহীন। দাদা গেয়ে উঠলেন, 'শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে পথের শেষে'? সেবারে পথের শেষে ছিল পাহাড়, জঙ্গল, ঘন সবুজ। শোন নদীর অন্ত ছিল, সেতুর শেষে আবার বসতবাড়ি, ক্ষেতখামার, গ্রাম, জলাশয়, গাছ, আগাছা, রেলের গেট বন্ধ হওয়ায় সাইকেল হাতে বা এমনি দাঁড়ানো মানুষ। পরবর্তী জীবনে নানাবিধ সেতু দেখেছি, কিন্তু প্রথম দেখা শোন নদীর সেতু মনকে আঁকড়ে রেখেছিল।

অনেক পাতা ওলটাতে হবে, ছেষট্টি বছরের খাতার পাতা — ২০১২ অক্টোবর, আমি ইংল্যান্ডে কেমব্রিজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করছি। আমার বয়সী এক ইংরেজ ভদ্রলোক এসে তাঁর প্রমাতামহর পুরনো ডায়েরিগুলো archive থেকে এনে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। অবিলম্বে এসে গেল। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নদীটাকে তোমরা 'শোন' বলো না 'সোন' বলো? ওর ওপর যে সেতু তা আমার মায়ের ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন। এই দেখো ১৮৫১-র ডায়েরি।' সবুজ মলাটে ঝকঝকে সোনালি রঙে লেখা ডায়েরি ১৮৫১, আনকোরা, নতুনের মতো দেখতে। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩-তে একটি পাতায় আঁকিবুঁকি, নানা মাপ, নদীর প্রবাহের সম্ভাব্য চিত্র। লিখছেন, 'প্রথম চ্যানেলে (চ্যানেল বলতে কী বোঝাচ্ছেন জানি না, হয়তো শাখা নদী) পৌঁছলাম বিকেল ৫টায়, বেশ তাড়াতাড়ি এলাম, ৬ ঘণ্টায় ২৫ মাইল। মনোরম জায়গা, অনেক মুসলমান সমাধি, মাঝে মন্দির, পুরনো যুগের অনেক খণ্ডর, ইট ও পাথর মিলিয়ে তৈরি স্তম্ভ। সুন্দর পুকুর, বিভিন্ন ঘাট।' এরপর বালুর মাপ, কী জাতের মাটি (alluvial), প্রথম চ্যানেল থেকে প্রমুখ চ্যানেলের দূরত্ব, চ্যানেলে জল নেই, মাঝে কয়েকটি পুকুরের মতো খণ্ড খণ্ড জলাশয়, দুটি ঘাটের নাম 'লুনমাঠা' (যদি ঠিক পড়ে থাকি) ও কুলওয়ার। ইঞ্চি, ফুট, গজের মাপে ভরা এ পাতা। লেখক ইঞ্জিনিয়ার জর্জ টার্নবুল।[৫]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব, তখনো মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শেকল হাতে নেননি, ৭৫ বছরের আমি ফিরে গেলাম সেই সময়, ঠোকাঠুকি, ভাঙচুর, সাহেবদের গর্জনে শ্রমিকরা ভীত, সেতু তৈরি চোখের সামনে, যা প্রায় একশ বছর পর আমাদের নদী পার হতে সাহায্য করেছিল। প্রথমবারের শিহরণ ফিরে এলো। জীবনে এরকম গোলচক্র পূর্ণ হওয়ার নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে।

হাওড়া স্টেশন টার্নবুল সাহেবই তৈরি করেছিলেন, ডায়েরিতে তার বিবরণ আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হাওড়া স্টেশনের জন্য এতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমির প্রয়োজন বোধ করেনি — বাদ-বিসম্বাদের পর জমিটি পাওয়া গিয়েছিল। চারদিক দিয়ে কাটা-ছাঁটা, চুপসে যাওয়া হাওড়া স্টেশন কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম।

তুফান মেলে ফিরে আসি। আত্মীয়স্বজন, নিকট বন্ধু যাঁরা দেশের বাড়ি থেকে দূরে থাকতেন, দেখাসাক্ষাৎ তাঁদের সঙ্গে কম হতো। ট্রেন যদি তাঁদের কারো শহরে থামে, প্রথা ছিল পোস্টকার্ডে দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া। ওঁরা আসতেন, ট্রেন বেশিক্ষণ থামে না — চোখের দেখা। ওঁরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, আমরা উঁচুতে ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে — 'কেমন আছ?', 'ভালো' — 'তোমরা?' — 'ভালো', এর বেশি কথা হতো না। তবু তাঁরা আসতেন, বাবা-মা ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করতেন চোখের দেখা দেখবার জন্য। বয়োজ্যেষ্ঠ হলে উপহার নিয়ে আসতেন, কনিষ্ঠ হলে উপহার নিয়ে যেতেন। এ ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের বন্ধন।

কানপুরে ট্রেন থামে অনেকক্ষণ; একগাল হাসি নিয়ে এলেন বকুলদা, মায়ের বোনপো ও প্রিয় বন্ধু, সঙ্গে বিপদভঞ্জনদা ও দুই টিফিন ক্যারিয়ার ভরা প্রচুর খাবার। দ্বিতীয়জন কীভাবে দাদা জানি না, তবে কোনো এক হিসেবে মা ছোট বোন, পরিবার নিয়ে সফরে যাচ্ছে, আপ্যায়ন করা প্রয়োজন — বাড়িতে না হোক, স্টেশনেই সই; পূর্ববঙ্গের, নাকি বিক্রমপুরের রেওয়াজ। আলো-আঁধারে ওঁদের চেহারা মনে পড়ে, 'বিপদভঞ্জন' নাম ও সুস্বাদু খাবার ভুলতে পারিনি।

দিল্লি পৌঁছলাম, আমি তখনো মহানন্দে। স্কুল নেই, পড়াশোনা নেই, পরিমলকাকাদের পাশের বাড়িতে থাকার হইচই, কাকার কাছ থেকে জোর করে ছড়া আদায় করার আনন্দ, ছুটির দিনে বেড়ানো; আর কী চাই। আসন্ন ধর্মীয় বিরোধ, রক্তবন্যা, দেশবিভাগের কালো বা উজ্জ্বল ছায়া বুঝবার পক্ষে ছোট আমি, পৃথিবীকে রঙিন চোখে দেখেছি।

রোজদিন বেড়ানো হয় না। বই পড়ার আদৌ ইচ্ছে নেই, মা-বাবা কিছু বলতেন না, তাঁদের অন্য নানা চিন্তা ছিল। জৈন ভদ্রলোকের বাড়িটি বড়, চকমেলানো। তেতলার সরু বারান্দার রেলিংয়ে ভর করে পর্যবেক্ষণ করতাম নিচে কী ঘটছে। নিচের জমিতে ঘাসের ওপর গুটি তিনেক গোল খাবার টেবিল ও চেয়ার রাখা। রং ফর্সা, মোটাসোটা মহিলারা বেশ ঢিলে সালোয়ার-কামিজ পরে, পাতলা উড়নি জড়িয়ে এসে বসতেন। সালোয়ার স্যুট হালকা রঙের সিল্ক সাটিনের, নিচু সালোয়ার লুটিয়ে পরত, বেশ লাগত দেখতে। কালো ফ্রেমের চশমা পরা গৃহস্বামিনী কর্কশ গলায়, আমার অবোধ্য ভাষায় আদেশ দিতেন। 'পরাঠা' আর 'রোটি' বুঝতে পারতাম। গলা কর্কশ হলেও মুখে কমনীয়তা ছিল। এঁদের চলাফেরা, খাওয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসি-মশকরা দেখে ভালো লাগত — অন্য জীবনের স্বাদ; এ-ও শিক্ষা।

শুরু হলো দিল্লি দর্শন। দিল্লি যেন দুটি আলাদা শহর — নতুন দিল্লি ঝকঝকে, জৌলুস ভরা, সরকারি বড় সাহেব বা রাজনীতির নেতাদের জন্য। মোটরগাড়ি ঘোরে, গোনাগুনতি ট্যাক্সি। নতুন দিল্লি গাছপালা, নানা ফুলে ভরা, সবুজের মাঝে রঙের খেলা, ফুলে ভরা বাগান নিয়ে বড় বড় বাড়ি। মাঝে বেঙ্গলি মার্কেট সাধারণ মানুষের দ্বীপ, কী করে হলো জানি না। রাত নটার পর এ দিকটা জনশূন্য। একতলা ছড়ানো বাংলো দেখে মনে হতো এসব আমাদের নাগালের বাইরে। কে জানত বছর পনেরো পর জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়াবেষ্টিত এরকম একটি বাড়িতে আমি বহু বছর বহু বসন্ত কাটাব। মা-বাবাও কবছর থাকবেন সুসজ্জিত, সুদৃশ্য এ পাড়ার একটি বাড়িতে।

পুরনো দিল্লির বড় রাস্তা চওড়া হলেও ভেতরের রাস্তা সরু, বাড়ি ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি, গাছপালা কম, পাড়া-পাড়া ভাব একেবারেই নেই, দোকান পসারের কোলাহল, যানবাহন — এক্কা বা টঙ্গা। এক্কাগাড়ি ছুটত তীরবেগে, পা বাইরে ঝুলিয়ে উঁচুতে বসা ছিল ভীতিকর। বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে বসে অভ্যস্ত আমরা খোলা টঙ্গা চড়ে শহর দেখতে ভালোবাসতাম। একদিন টঙ্গাওয়ালা বললেন, তিনি তাঁর মা ও বাবার দিক থেকে পৃথ্বীরাজ চৌহান ও রানা প্রতাপের বংশধর। বিশ্বাস করলাম, মনে সম্ভ্রম এলো। এই না হলে ঐতিহাসিক দিল্লি?

ঢাকাতে আমাদের সীমাবদ্ধ জীবন, সবাই প্রায় এক ছাপামার্কা ছিলাম, দিল্লি এসে বুঝলাম জগতে বিভিন্নতা আছে; ভিন্ন ভাষা, চেহারা, আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া — আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে দূর। এ শহরের মানুষরা একরকম নন; ঢাকাতেও ছিলেন না, তবে সেটা আমরা দেখতে পেতাম না। দিল্লিতে বিভিন্নতা প্রকট। পুরনো দিল্লির একটা সমাজে তাদের নিজস্ব আভিজাত্য আছে; ভাষা, বাড়িঘর, আচার-বিচার, ব্যবহার তাঁদের আপনার। এঁরা নতুন দিল্লির পশ্চিমি কায়দায় কনট্ প্লেসে ব্যবসা করলেও নিজের সত্তা বদলান না। আবার মোগল ঐতিহ্য, আদব-কায়দা, ভাষা, আভিজাত্য নিয়ে আছেন পুরনো দিল্লির অনেক পুরনো বাসিন্দা। যাঁরা নতুন দিল্লির সরকারি কাজে লিপ্ত তাঁদের জীবন ইংরেজি আদবে ঘেঁষা। স্যুপ, রোস্ট, শামিকাবাব, বিরিয়ানি আর শুদ্ধ শাকাহারি মিলিয়ে দিল্লির রং। সীমাবদ্ধ জীবনের দরজা খুলে গেল; ছানা-দুধের মিষ্টিতে অভ্যস্ত, হঠাৎ করে পেয়ে গেলাম ঘন্টিওয়ালার সোহন হালুয়া আর দরিবা কালানের গরম জিলিপির স্বাদ।

এবারে ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাবার পালা। প্রত্যেক ছুটির দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও না কোথাও যাওয়া হতো — লাল কেল্লা, পুরনো কেল্লা, ফিরোজ শাহ কোটলা, হুমায়ুনের সমাধি, ইতিহাসভরা শহর — দিল্লি। হঠাৎ করে 'মহানন্দ' হারিয়ে গেল — যেখানেই যাই সমস্যা। হুমায়ুনের গ্রন্থাগারের সিঁড়ি এত উঁচু উঁচু, আমিও সম্রাটের মতো পড়ে যাব সে চিন্তায় ব্যস্ত, লাল কেল্লার দেয়ালে থামের কারুকার্য দেখব কী, ভাবছি, আর কতটা হাঁটতে হবে। পুরনো কেল্লা যেতেই গাইড জাতীয় কেউ বললেন, 'ওই থামগুলোর পেছনে পঞ্চপাণ্ডব লুকিয়েছিলেন।' আজগুবি মনে করে কেল্লার প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কেল্লা বিশেষ ছিলও না।

এক পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দেখতে যাওয়া হলো। বেড়াতে যাওয়া মানে সাজগোজ করা, সাজগোজ মানে শাড়ি, তাও বেনারসি। রানী কাকিমা শৌখিন, আমাকে তাঁর আকাশি নীল রঙের জরির কাজে ভারী ক্রেপ বেনারসি শাড়ি পরালেন। বেলুনের মতো ফুলে একের পর এক তাজমহলের গেট পার হলাম। যতক্ষণে শুভ্র স্মৃতিসৌধ সামনে এলো, কোনো সৌন্দর্য চোখে এলো না, আমি বেলুন ঠিক করতে ব্যস্ত, বিব্রত। ঘুরেফিরে বারান্দায় বসা হলো, পরিমলকাকা বললেন, 'বিবি, 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান' গানটি গাও।' বিবির অবস্থা সঙ্গিন, শাড়ি ও সুর মেলানো সোজা কাজ নয়! সমস্যা সত্ত্বেও তাজের খোদাই করা কারুকার্যের রং-বেরঙের মসৃণ পাথর অবাক করে দিলো। বড় হয়ে এসব রঙের মালা পরে আনন্দ পেয়েছি। এখন ভাবি, 'হ্যায়, শাড়ি-গয়না ভালোবাসা বিবি, তাজ দেখে শুধু রঙিন পাথর পছন্দ হলো?'

আমার বোধহয় সৌন্দর্যবোধ ছিল না। কত ঐতিহাসিক জায়গা, শ্বেতপাথরে সজ্জিত, লাল পাথরের প্রাসাদ, আকাশচুম্বী 'বুলন্দ দরওয়াজা' দেখলাম, মনে রয়ে গেল 'খুনি দরওয়াজা'র দুটি গুলির গর্ত, যেখানে ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের দুই পুত্রকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। গুলি তাঁদের ভেদ করে দরজায় গেঁথেছিল, গাইড বললেন। (প্রসঙ্গত, 'গাইড' মানে ইতিহাস জানা কেউ নন, এমনিই কেউ এসে কাহিনি বলতেন — সত্যতা সেভাবে নেওয়া উচিত।) ছোট দুটি ছেলের চেহারা কল্পনা করে মন দুঃখে ভরে গেল। বিদ্রোহ, স্বাধীনতা, মুক্তির ঢেউ তখন সারাদেশে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহের গর্ব ছোটদের মনেও জেগেছিল।

ভালো লেগেছিল কুতুব মিনারের খোদাই কাজ, খোলা পরিবেশ, নির্জন নীরবতা। সেখানেও দুঃখ; গাইড একটি কুয়ো দেখিয়ে বললেন, 'এই কুয়োতে ঠেলে ফেলে দিয়ে সম্রাজ্ঞী রাজিয়া সুলতানাকে হত্যা করা হয়েছিল।' মনে বিষাদ এলো — আমি কি শুধু খুন-হত্যা কাহিনি শুনতে পছন্দ করি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতুব দেখতে যাওয়া ছিল বিশেষ অভিযান। শহর থেকে দূর, নির্জন পথ, দু-তিন পরিবারের পক্ষে যাওয়া নিরাপদ নয়। ডিসেম্বর মাসে পৃথ্বীশকাকা এলেন ঢাকা থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলোটি ছাত্র সঙ্গে নিয়ে — দিল্লি আগ্রার ঐতিহাসিক স্থান দেখাতে। ওঁরা কুতুব দেখতে যাবেন, সুবর্ণ সুযোগ, রায়-দাশগুপ্ত পরিবার ছাড়া আরো কয়েকটি পরিবার সঙ্গে নিলাম। দশ-বারোটি টঙ্গা একসঙ্গে লাইন করে গেলে ভয় কম। শেষ বেলার আগে ফিরতে হবে, শুধু ডাকাত নয়, বাঘ-ভালুকের ভয় আছে। বেলা পড়ে এলো, ফিরে এলাম দরিয়াগঞ্জ — পৃথ্বীশকাকার দুঃখ 'তুগলকাবাদ' যাওয়া হলো না, সে আরো নির্জন বসতিহীন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ষাটের দশকে তুগলকাবাদ ছিল শীতের দুপুর কাটানোর এক মনোরম জায়গা। পনেরো-কুড়ি বছরে রাজধানী দিল্লিতে বদল এসেছে — শহর, এমনকি নতুন দিল্লি, জনবহুল, ট্যাক্সি, অটোরিকশার হর্নের আওয়াজে পাখির কাকলি শান্ত, স্তব্ধ। সাহেবি আমেজ অস্তাচলে, ভারতের আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় অর্থনীতিবিদ ও অন্য বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণ।

'বিশেষ অভিযানে'র প্রধান কারণ ভিন্ন। কুতুব যাবার দিন সকালে আমাদের বাড়ির বারান্দায় সবাই জড়ো হচ্ছেন, শীতের নম্র রোদের সকাল বড় সুন্দর, পৃথ্বীশকাকা ছাত্রদের নিয়ে এলেন, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। ষোলোজনের পনেরোটির মুসলমান নাম — একজন হিন্দু, দাশগুপ্ত। আমার চোখ-কান সদা খোলা, শুনতে পেলাম এক মহিলা, চিনতাম না ভালো করে — কে মনে নেই, স্বগতোক্তির আওয়াজে কোনো মহিলাকে বলছেন, 'এই বৈদ্যকুলকলঙ্কটিকে পৃথ্বীশবাবু কোথা থেকে জোগাড় করে নিয়ে এলেন?' বুঝলাম দেশবিভাগ অবশ্যম্ভাবী: সেদিন হলো আমার ব্যক্তিগত বিষাদ, ক্রমে তা ছেয়ে হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষের বিষাদ।

এখন মনে হয় আমরা অল্পদিনের পথিকের মতো দিল্লিতে থাকতাম, তাড়াহুড়ো করে সবকিছু দেখা, যদি ঢাকা ফিরে যাওয়া হয়। ১৯৪৭-এর প্রথমদিকে বাবা বুঝতে পারলেন ঢাকা ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। ফিরে যদি নাই যান, তবে দিল্লির কমার্স কলেজে কেন থাকবেন? আমরা যাচ্ছি কটক, নামকরা কলেজ র‍্যাভেনশ কলেজ, তার অর্থনীতির 'হেড' বাবা। বার হলো সুটকেস, হোল্ডল, বই-বাসনের ঝোলা। গোছগাছ করার কথা উঠলেই মা বলতেন, 'ভাবলেই আমার হাত-পা অব্বশ হইয়া যায়।' অবশ হাত-পা-তে, বাবা, দাদা, যতিনদার সাহায্যে জিনিসপত্র ভরা হলো — বিশেষ কিছু ছিল না — কোনো একদিন দিল্লি ছাড়লাম।

এই প্রথম রায় ও দাশগুপ্ত পরিবার 'মাঠের পাড়ি'র থেকে দীর্ঘ দূরত্বে গেলেন, কষ্টকর প্রত্যেকের পক্ষে। পরিমলকাকার মেয়ে ছোট, মা তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভূতি' ডাকতেন। মায়ের কাছে রানী কাকিমার চিঠি আছে, 'তোমার ভূতি তার জেঠিমার জন্য খুব কান্নাকাটি করে।' ভূতির বয়স দু'বছর হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার একটা বিশাল ক্ষত বা ক্ষতি ছিল দুই পরিবারের ভৌগোলিক ব্যবধান। ঠাকুরমা (পরিমলকাকার মা) থেকে ভূতি ওরফে মনিকুন্তলা কষ্ট পেয়েছেন।

দিল্লির পর শুরু হলো ট্রেন বদলানো, বিভিন্ন বাড়িতে থাকা ও প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা। আবার আশ্চর্য, দু-একটি ঘটনা ছাড়া আমার কিছু মনে নেই। কিছুদিন ছিলাম ঋষিতুল্য মেজ জেঠামশায়ের কাছে বর্ধমানে। কর্মঠ, বুদ্ধিসম্পন্না মেজ জেঠিমা, জমিদারবাড়ির মেয়ে, সংসার চলত তাঁর কঠিন নিয়মে ও নজরে। মেজ জেঠা ছাড়া আর সবার, বংশধর আমার ছোট ভাইয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব গোপন রাখা হতো না। এতে আমার আপত্তি ছিল না। অমন সুন্দর ছোট ভাই, শান্তশিষ্ট, দিদি অন্তপ্রাণ, নিজের মনে খেলা করে, সে ভালোবাসা পেলে মনে শুধু আনন্দ নয়, আমার মনটা কেমন নরম হয়ে যায়। পাঁচ দিদির একজনও আমাকে পছন্দ করতেন না, তাতেও আপত্তি ছিল না, কারণ আমিও তাঁদের কঠিন শাসন পছন্দ করতাম না। মেজমা বাইরে থেকে মনে হয় কঠিন, ওঁর স্নেহ বুঝতে সময় লেগেছে।

মেজমার সংসার চলত 'উষ্ট' বা 'এঁটো' ঘিরে। মুড়ির টিন ধরলে হাত এঁটো হয়, হাত ধুয়ে চিঁড়ের টিন ধরো। মা ঘোমটা দেওয়া ছোট বৌ, নিয়ম মেনে চলতেন। 'উষ্ট'র যন্ত্রণায় খেতে বসে ডান হাত দিয়ে জল খেতে হতো। প্রতিবাদ করা বৃথা। কেউ কথা শোনেন না; একদিন লম্বা ভাষণ দিলাম 'ছোঁয়া'র ওপর। অমিয় দাশগুপ্তর মেয়ে, কিছুটা যুক্তি, ভাষণ দেওয়ার যোগ্যতা থাকা উচিত। ভাষণ শুরু হলো — 'থালা থেকে খাবার নিচ্ছি, হাত উষ্ট, সে থেকে আমার হাত যা ছুঁয়েছে, অর্থাৎ আমি, আমার পিঁড়ি, মেঝে — যাতে পিঁড়ি, থালা, গ্লাস রাখা, সব উষ্ট। মেঝে উষ্ট মানে তো পুরো বাড়ি উষ্ট, তাকে কী করে বাঁচানো যাবে?' মনে হলো অকাট্য যুক্তি; মায়ের কাছে মন্দ হলাম, দিদিরা অবাধ্য, অভদ্র বলে আমাকে আরো দূরে ঠেলে দিলেন। মেজমা বললেন, 'হ্যাঁ, সব উষ্ট, ডান হাত দিয়াই জলের গ্লাসটা ধরো।' প্রতিবাদের ইতি এখানেই।

প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা, তাও হোল্ডলের ওপর, ছিল অসহ্য। মা ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত, দাদা ঘোরাঘুরি করে নানা খবর জোগাড় করছেন, মাঝে মাঝে উধাও হয়ে মাকে চিন্তিত করছেন, যতিনদা এদিক-ওদিক থেকে খাবার আনছেন — ডাব, কলা, চা, বিস্কুট ইত্যাদি। বাবা যে-কোনো অবস্থায় অর্থনীতিতে ডুবে থাকতে পারতেন। দাঁড়িয়ে বা পায়চারি করে বোধহয় মুদ্রাস্ফীতি বা কালোবাজার নিয়ে চিন্তা করতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ এ দুটি বিষয়ে ওঁর বই/প্রবন্ধ এ সময়কার। অস্থির হওয়া ছাড়া আমি কী করি? কোথাও চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল, চার ঘণ্টা চুল আঁচড়েছিলাম। মা কিছু বলাতে জবাব দিলাম, 'আর কী করার আছে?' এমন নির্বোধ কথার ওপর মন্তব্য হয় না।

কটকে ছ-সাত মাস থেকে আবার গোছগাছ, হোল্ডল বাঁধা, কাশী যাচ্ছি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। কটকের ট্রেন হাওড়া স্টেশন পৌঁছোয় ভোরবেলা, কাশীর ট্রেন সন্ধ্যাবেলা — সারাটা দিন প্ল্যাটফর্মে বসে থাকতে হবে। কলকাতা শহর সম্বন্ধে মায়ের প্রচণ্ড ভীতি, নিজেও যাবেন না, আমাদেরও যেতে দেবেন না। জিনিসপত্র নিয়ে কোথাও যাওয়া সহজ নয়, বুঝি, কিন্তু আমরা কারো সঙ্গে কেন যাব না? 'কেন'র উত্তর নেই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব দেখা করতে আসছেন, কেউ খাবার নিয়ে, কেউ আড্ডা দিতে। কেউ আবার পালা করে আমাদের রেস্টুরেন্টে খাইয়ে আনছেন। অনেকে রাজি আমাদের শহর দেখাতে, মায়ের একই উত্তর, 'না, না — কলকাতা শহরে কেউ যায়?' এ 'ভীতি' কেন ছিল জানি না।

দুপুরে এলেন সুবোধমামা — ওঁরা এখন কলকাতাবাসী। মাকে বকুনি দিয়ে বললেন, 'এইটা কি করতেয়াসস্ — নিজে না গেলি, সমীর, বিবিরে যাইতে দিবি না ক্যান? আমি নিয়া যাই।' ওঁর ওপর কোনো কথা মা বলতে পারতেন না, বেরোলাম স্টেশন থেকে, হাওড়া ব্রিজের শোভা দেখতে দেখতে। বাসে করে শহর দেখলাম, খানিকটা হেঁটে বিখ্যাত নিউ মার্কেট দেখলাম বাইরে থেকে। কথায় ছিল, নিউ মার্কেটে যা চাও সব পাওয়া যায়, চাইলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়!

বাসে ঘুরছি, বিশেষ করে মনে পড়ে হাল ফ্যাশনের স্টুডিবেকার গাড়ি। রং খুব হালকা, হালকা সবুজ, নীল, গোলাপি, বেগুনি, যেন রাজমহলের রানীদের শিফন শাড়ি। বাসের উচ্চতা থেকে দেখছি হালকা রঙের খেলা, তেজগতির মোটরগাড়ি, যেন হাজার হাজার লজেঞ্চুস ডিগবাজির ঢেউ খেয়ে ভেসে যাচ্ছে। রং ছাড়াও এ গাড়ির আর এক বিশেষত্ব ছিল — ডিজাইনের। মাঝখানটা, চালক ও যাত্রী বসবার জায়গাটা উঁচু — সামনে ইঞ্জিনের দিক, পেছনে বাক্স রাখবার দিকের উচ্চতা, মাপ, ডিজাইন হুবহু এক। কোনটা আগের দিক, কোনটা পেছনের বলা ভার। ঢাকার রসিক গাড়োয়ানরা দেখলে হয়তো বলতেন, 'বাবু, আপনে আয়েন না যায়েন?'

পরদিন ভোরে পৌঁছোলাম কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় — ঠিকানা এবার সত্যি বদলে গেল — ৩২নং পুরানা পল্টন থেকে ফিলপট সাহেবের বাংলো। কোনো ফিলপট সাহেব একসময় এ বাড়িতে থাকতেন। এক বছর পর আমাদের স্থিতি হলো, বাবা অর্থনীতি ও কমার্স বিভাগ চালাতে খুশি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যস্ত। দিল্লি দূর নয়। মা যেন জীবনে এই প্রথম স্বাধীন হলেন — রিকশা করে একা বাজারে যাওয়া, মন্দিরে যাওয়া। শীতের বাজার, নভেম্বর মাস — বাজারে বিবিধ টাটকা সবজি, সাদা গোল বেগুন পেয়ে মা খুশি। ভাই সারাদিন বন্ধু রবির সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত। দাদা ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়ায় মনোযোগ দিচ্ছেন। যতিনদা ঢাকা ভুলে গেলেন, সাইকেল, পরে গাড়ি চালিয়ে শহর ঘুরে বেড়াতেন, বন্ধুত্ব সহজেই হতো।

হিন্দি জানি না, কাশীতে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ঢাকা ছেড়ে আসার মাসুল শেষ পর্যন্ত আমাকেও দিতে হলো, যেতে হলো বনবাসে — শান্তিনিকেতনের হোস্টেল শ্রীভবনে। ঢাকার স্মৃতি মনে এলো — মিষ্টিদি, ডলি, টুমনি, টুটু, নাজমা, পুতুল খেলা, বই পড়া, একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া। কোথায় গেলেন ৩নং-এর অঞ্জুদিরা, নীলজ্যোতির ঝর্ণাদি, আলোকদা, ঝুমকা? খোলামেলা পুরানা পল্টন, শাসনের মাঝেও স্বাধীনতা, সব ফেলে এসেছি। আমি একা। ভাবতাম, ঢাকা না ছাড়লে কেমন হতো? বাবা তাঁর নিয়মমতো কলেজ যেতেন, বাড়ি এসে দিনপঞ্জি বলতেন, বাড়ি থাকত নিত্য সরগরম। দাদা ম্যাট্রিক পাশ করে জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন, ভাই সেন্ট গ্রেগরিতে ভর্তি হতো। আমি? আমি ইডেনের মেয়ে হয়ে কামরুন্নিসাতে যেতাম, টুটুর মতো বন্ধুদের ওপর দম্ভ দেখাতাম, 'আমরা ইডেনের মেয়ে!'

কল্পনা 'বৈতরণীর ন্যায় — অপার।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. সৌজন্য : মোঃ শামসুর রহমান।
২. করিম : *চল্লিশ দশকের ঢাকা*, পৃ ৮৮।
৩. ঐ, পৃ ৯০।
৪. রেষারেষি শুরু হতে সময় লাগেনি। পরিমল রায় (ছাত্র ১৯২৭ থেকে) *ঢাকার কথা*তে লিখেছেন সেকথা। 'বাসন্তিকা', 'শতদল' শুরু হয়ে গিয়েছে ততদিনে।
৫. দ্রষ্টব্য : পরিচ্ছেদ-২।
৬. দ্রষ্টব্য : পরিচ্ছেদ-১।
৭. অর্থনীতিবিদ দীনা ঘটঘটে। অধুনা আমেরিকাবাসী।
৮. দ্রষ্টব্য : পরিচ্ছেদ-২।
৯. পরিমল রায়, *ঢাকার কথা*, দিল্লিতে ১৫ এপ্রিল, ১৯৫০-এ নববর্ষ উপলক্ষে বক্তৃতা। *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, পৃ ২১৫-২১৭।
১০. করিম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৫৬।
১১. এ কে দাশগুপ্ত, *Collected Works*, Vol. 11 পৃ ৩২২।
১২. রায় : *ঢাকার কথা*।
১৩. অসিত হালদার : *চারুকলা*, পৃ ৪৩।
১৪. জোন রবিনসন, *ইকোনমিক জর্নাল*, জুন, ১৯৬৬।
১৫. ভবতোষ দত্ত : শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, পৃ ৪৫।
১৬. *আরেক রকম* : একটি পারিবারিক গাথা, প্রতাপশঙ্কর লাহিড়ী, তাঁর বাবার সম্বন্ধে লিখেছেন। *আরেক রকম*, অষ্টাদশ সংখ্যা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ৩০ ভাদ্র, ১৪২০।
১৭. রায় *ঢাকার কথা*।
১৮. করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৩৩।
১৯. কথোপকথন অনিতা সেন (সমররঞ্জন সেনের স্ত্রী)।
২০. ১৯৪১-৪৫, সহপাঠী আহমেদুল (মনু) কবির, সানাউল হক, সত্যব্রত বসু, তবারক হুসেন, তোজাম্মল হক ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গামা, শহরের দাঙ্গা, সত্যব্রতদার ভারতে চলে আসা, এঁদের বন্ধুত্বের মাঝে এসে দাঁড়ায়নি। বাবার অনুগত, মেধাবী ছাত্র নিশ্চয়ই প্রতিবছর থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বা অন্তরঙ্গতা হয়নি, অন্তত ১৯৩৯-এ অমিতাদির পর নয়। এই পাঁচজনের মধ্যে আলাদা কিছু ছিল, যা লিখে বোঝানো যায় না, জানতে গেলে বাবার প্রতি শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্যে মনুদার অসাধারণ লেখাটি পড়তে হয়।
বাবাকে এঁরা অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন, সেই থেকে কী করে যেন এলো তাঁর পরিবারের সঙ্গে আন্তরিকতা, তাদের প্রতি দায়িত্ববোধ। নানা বিপদে এঁরা আমাদের আগলে রেখেছেন। অভয় দিয়েছেন। ছেলেবেলায় আমার প্রতি এঁদের স্নেহের স্মৃতি মধুর। এই দাদাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা চিরকালের।
২১. বসু : পৃ ৯১।
২২. ঐ, পৃ ৮৮।
২৩. প্রণব বর্দ্ধন, *স্মৃতি কুণ্ডয়নে* আমার বাবার কাছে শোনা গল্প বলে এ ঘটনার বর্ণনা যেভাবে দিয়েছেন তা সঠিক নয়। বাবার নাম দিয়েছেন বলেই উল্লেখ করছি।
২৪. প্রণব বর্দ্ধন এই কথোপকথনে ঘটনাতে সত্যেন বসুর নাম দিয়েছেন, বাবার কাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে শুনে লিখেছেন। বাবার নোটবুকে লেখা আছে, এ কথা বলেছিলেন সত্যেন রায়।

২৫. বুদ্ধদেব বসু : আশ্চর্য্য, *রংমশাল*, বৈশাখ, ১৩৫৩, পৃ ২।

২৬. দুর্ভাগ্যবশত, *চতুরঙ্গের* এই সংখ্যা আমার কাছে নেই। স্মৃতি থেকে লিখছি, হুবহু মিল না হতে পারে।

২৭. মীরা বসু : শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, পৃ ১২।

২৮. ৫ নং পুরানা পল্টনে তখন থাকতেন মীজানুর রহমান, পাকিস্তান ট্যারিফ কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। পুরনো বন্ধুর মতো যত্ন নিয়ে মা-বাবাকে চায়ের আমন্ত্রণ করেছিলেন। বহু সুখস্মৃতি জড়িয়ে ছিল ৫ নং-এর সঙ্গে, সেখানে নিজের মতো করে ফিরে যাওয়া, বাড়ি-বাগান ঘুরে দেখা দিয়েছিল অবিমিশ্র আনন্দ। রহমান সাহেব নিজের লেখা *নজরুল ইসলাম* বইটি বাবা-মাকে উপহার দিয়েছিলেন। পরে চিঠিতে (১৭/১/৭৫) লিখছেন, '৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ ছিল আধুনিক উর্দু কবিতার জন্মদাতা, শামসুল উলেমা আলতাফ হুসেন হালির মৃত্যুদিনের তিরিশ বছর। কলকাতাতে সেদিন একটি অনুষ্ঠান করা হয়, যাতে সরোজিনী নাইডু তাঁর 'হালি কাকা'র ওপর দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।' পরদিন ১ জানুয়ারি ১৯৪৫, মিসেস নাইডু মীজানুর রহমানকে চিঠিতে লিখছেন, (আমার পক্ষে অনুবাদ করা সম্ভব নয়, তবে এমন সুন্দর উক্তি প্রকাশ না করে পারছি না।),

The Syrian poet Khalil Gibran told me an Arab proverb long ago — 'Poets are the foundation on which God builds his throne.' (জিব্রানের দেশ ছিল লেবানন)

২৯. মোহিনী ধর, *চারুকলা*, পৃ ১৯১।

৩০. রায়, *ঢাকার কথা*।

৩১. রায়, *রংমশাল*, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৫৪, পৃ ৪৩৮, তিনটি ছড়ার দ্বিতীয়। আপ্পাদোরাই মহাশয় দিল্লিতে Indian Council of World Affairs-এর সেক্রেটারি ছিলেন এবং *India Quarterly* বলে একটি উচ্চমানের জর্নাল বার করতেন। আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি। অমায়িক, নম্র, ভদ্র, ভালো মানুষ, ক্রোধটা শুধুই ওঁর নামের জন্য কি?

৩২. এই আড্ডা সম্বন্ধে অশোক মিত্রের একটি গল্প আছে। উনি কোথাও লেখেননি বলে আমাকে লিখতে বলেছেন, তা নয়তো 'হারিয়ে যাবে।' ১৯৫১-র প্রথম দিক, পরিমলকাকার বাড়ির নাম Metcalfe house, পেছনে যমুনাতীরে বিরাট বাগানে আড্ডারত অশোক মিত্র, সমররঞ্জন সেন, পরিমলকাকা, বুদ্ধদেব বসু, রবি দাশগুপ্ত। 'বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিমলবাবুর গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু বুদ্ধদেবকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়তেন না। বাগানে বসা, যমুনায় জল কম, অনেকটা অবধি বালু — দূরে কিছু প্রাণী দেখা যায়, শোয়া, বসা, হাঁটা। বুদ্ধদেব চেয়ার থেকে উঠে সেদিকে তাকিয়ে কবি-মনভাবে বললেন, 'দ্যাখো পরিমল, কী সুন্দর দৃশ্য, হরিণ হেঁটে যাচ্ছে।' তোমার পরিমলকাকা গম্ভীরমুখে বললেন, 'ওটা হরিণ নয়, ওটা একটা বাছুর।' [এ গল্প ওঁর *আপিলা-চাপিলাতে* আছে]

৩৩. বারোটি চিঠির সঙ্গে ১৯৫০-এ আমাকে লেখা পরিমলকাকার একটি ছড়া আবিষ্কার করেছি। আমি আর ছোটটি নেই, শাড়ি-গয়নায় শখ শুরু হয়েছে, তাই বিষয়বস্তু 'শাড়ি'। 'কটকি শাড়ি' বোধহয় কটকে ছিলাম বলে। পরিমলকাকার যে-কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়া আমার কাছে মূল্যবান; তবু মনে হয় দিল্লিতে ভিন্ন পরিস্থিতি, পরিবেশের ছায়া এতে পড়েছে। কিঞ্চিৎ এলোমেলো, গোলমেলে, ধার কম, আগের সহজ-সরলতা যেন নেই।

অলকনন্দা
ওরফে
বিবি
ওরফে পদী পিসির শাড়ী-গান

পদী পিসি হঠাৎ গেলেন কটকী শাড়ী কিনতে,
কটকী শাড়ী কোথায় মেলে, সেই তো মহা চিন্তে,
কিনতে গেলেন ফরাশডাঙায়, সেখানে থেকে হাবড়া,
মূল্য শুনে মুখের ওপর মারলো কে যে থাবড়া!
ভাজের মুখে ছুটলো কথা — শাড়ী কেনা হয় নি!
নাতবৌ যে দুপুর থেকে একটি কথা কয় নি!
তার সঙ্গে আজকে নাতির জমবে তেমন ভেট কি,
সন্ধ্যেবেলা চুপড়ী ভরে ক্ষ্যান্ত আনে ভেট্‌কী,
ভেট্‌কী মাছের ঝোলের সাথে ঝালর-ওলা সবজী,
কাঁটা দিয়ে তুলতে গিয়ে ভাঙলো হাতের কবজী
নুলো হাতে ফিরলো যত বেয়াই বাড়ীর লোকরা,
লবডঙ্কা দেখিয়ে গেল গুটি তিনেক ছোকরা।
অপমানে পদী পিসি বিষম বধেন গর্জে
কেঁদে-কেটে রাত কাটিয়ে করে দিলেন ভোর যে।

কটকী শাড়ী মেলে নি তো জামদানীতে দোষ কী?
বুদ্ধিখানা কেমন করে হঠাৎ গেল ফস্‌কি!
খই-ভাজানো ভাজের মুখে ছুটলো আবার তুবড়ি,
মাখন এলো দুপুর রাতে, গিয়েছিল ধুবড়ী,
মাখন বলে, বকছো মিলাই, বলছি শোনো, ভয় নাই,
না হয় কিছু বেশী করে গড়িয়ে দিও গয়না-ই,
স্যাঁকরা এলো সকাল বেলা সাড়ে-দশটা বাজতে,
পদী পিসি গেছেন তখন এঁটো বাসন মাজতে,
সকাল থেকে দুপুর হয়ে সন্ধ্যা এলো গড়িয়ে,
নিতাই চন্দ্র অন্ধকারে আসছে ছেলে পড়িয়ে,
পাশ কাটিয়ে গন্নাকাটা হঠাৎ গেল ছুটে,
নিতাই চাঁদের মাথার ভিতর ফন্দী গেল ফুটে,
পিছন থেকে লম্ফ দিয়ে ধরলো ঠেসে জোরসে
গন্নাকাটা বিনি চোখে দেখছে তখন সরষে,
চমকে পিলে গন্নাকাটার থরোথরো ঠোঁট কি,
ব্যাপারখানা কেমন তরো? গায়ের শাড়ী কট্‌কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁয়ের লোকের উঁকিঝুঁকি — শেষকালে কী দাঁড়ায়,
ননদ-ভাজের চুলোচুলি নাতবৌ-তে ছড়ায়।

পরিমলকাকা

দিল্লি
৮/১/১৯৫০

৩৪. Aronson নাম প্রথম শুনি পরিমলকাকার চিঠিতে এই পরিচ্ছেদ লিখতে শুরু করে। পুরনো বই ঘাঁটতে ভালোবাসি। *Current Thought*-এর পাতা উলটোচ্ছি, অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৪৬-এর সংখ্যায় Alex Aronson-এর প্রবন্ধ 'A note on the sociolgy of the best seller', সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি মিলিয়ে উপন্যাস ও পাঠকের সম্বন্ধের অনুশীলন। সচরাচর এ-জাতীয় বিষয়ে লেখা সে সময় দেখা যেত না।

১৯৩৯-এ শুরু ত্রৈমাসিক জর্নাল, *Current Thought* প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। সম্পাদকমণ্ডলী কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে ছিলেন না, উদ্দেশ্য ছিল যুক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। লেখকরা বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, লিয়াকত আলি খান, রবি দাশগুপ্ত, নির্মল ভট্টাচার্য্য, বুদ্ধদেব বসু — এই মানের আরো অনেকে। যতদূর জানি ১৯৪৮-এর পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৩৫. মীরা বসু, শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, পৃ ১২।

৩৬. করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়..., পৃ ৫৬-৫৭।

৩৭. সত্যব্রত বসু, পৃ ১১৮। ১/১১/২০০৩-এ সত্যব্রতদা আমাকে লিখেছেন, '১৬ই জুলাই স্যারের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন-প্রাক্তনী এবং অধ্যাপক দাশগুপ্তের গুণগ্রাহীদের সমাবেশে এই সভা এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। অর্থনীতি তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হিসেবে যিনি জগৎ-সমক্ষে সমধিক পরিচিত, তিনি আদর্শ শিক্ষক ও মানুষ রূপে আমাদের কতটা প্রভাবিত করেছেন সবাই শুনলেন।'

৩৮. মোঃ শরীফ কথোপকথন

৩৯. সত্তর বছর পর এ চিঠি কেউ পড়বেন বা আলোচনা করবেন বাবা বা আশু জেঠা ভাবেননি। ইতিহাস লেখায় রাখঢাকের স্থান নেই, মূল্যবান হোক, না হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থার পেছনে যে দাবার খেলা থাকে, তার উদাহরণ না দিয়ে পারলাম না। রহমান সাহেবকে জিতিয়ে দেবার পরিকল্পনা, হিন্দুদের লাভের হিসেব, সম্ভাব্য ভোটের হিসেব ছিল 'maximisation under uncertainty', অনিশ্চিতির মাঝে সর্বাধিক সংখ্যা লাভের চেষ্টা। আশু জেঠা চিন্তা করে দক্ষতার সঙ্গে হিসেব করেছিলেন; প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল।

ওঁর পুত্র অমর্ত্য সেন ও আমি 'পার্টি' বলতে কী বোঝায় এ নিয়ে আলোচনা করেছি। যেভাবে চিঠিতে 'পার্টি'র নির্দেশ, নির্ণয় লিখেছেন, শুধুই জোট করে ভোট দেওয়া 'পার্টি' মনে হয় না। অমর্ত্য বললেন জেঠা ও বাবা দুজনেই কংগ্রেস পার্টি সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছিলেন এবং কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৬ — হঠাৎ আমার মনে হলো, 'ফরওয়ার্ড ব্লক' হতে পারে। কোনো পার্টির সদস্য এঁরা ছিলেন না, তবে চল্লিশের দশকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতি সহানুভূতি থাকা আশ্চর্যের নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমর্ত্য বললেন, 'হ্যাঁ, হতে পারে।' আরো নানা প্রশ্নের মতো এর জবাব পাব না, 'হতে পারে,' 'হয়তো'র ছকে থেকে যাবে।

৪০. এল চন্দ, 'চিঠি', *স্টেট্সম্যান*, কলকাতা, ৩১/৫/৯১।

৪১. অসিত হালদার, *চারুকলা*, পৃ ৪৬

৪২. ভবতোষ দত্ত : শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, পৃ ৪৫-৪৬।

৪৩. কবির, ঐ, পৃ ১৫।

৪৪. মিত্র, ঐ, পৃ ৫৩। ঢাকায় পড়াশোনা করা অশোক মিত্র, ১৯৪৯-এ এমএ পড়েছিলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। তখন বাবার ছাত্র হন। ততদিনে ঢাকার মাস্টারমশাইরা অনেকেই ভারতের নানা জায়গায় ঢাকার ছাত্রবাৎসল্যতার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন।

৪৫. বাবার কাছে শোনা — লিখিতভাবে আমার কাছে আছে। নাম নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

৪৬. *আরেক রকমের* এক সংখ্যায় পড়েছিলাম মেক্সিকোর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী, ফ্রিদা কাহ্লো লিখে গিয়েছেন, 'প্রাণখোলা হাসি, অট্টহাসি দেয় আত্মপ্রত্যয়, মনের বল।' বাবার হাসি ছিল প্রাণখোলা। *আরেক রকম* চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা, ১-১৫ মে, ২০১৬, ১৬-৩০ বৈশাখ ১৪২৩।

AMARBOI.COM

পুনশ্চ তথ্যসূত্র

১. রাজ্জাক সাহেব বলেছেন, 'অধ্যাপক অ্যারনসন, অধ্যাপক এজি স্টক, তাঁদের সরল অনাড়ম্বর জীবনাচরণ এবং পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে বিভিন্ন সময়ে উন্নত করে তুলতে সাহায্য করেছেন।' করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৮৬।

২. অশোক মিত্র, *আপিলা-চাপিলা*, পৃ ৩৭।

৩. করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১১২। অধ্যাপক অজিত কুমার সেন, দ্রষ্টব্য : করিম, চল্লিশ দশকের ঢাকা, পৃ ১৪৩-১৪৪।

৪. ঐ

রাজ্জাক সাহেবের বক্তব্য — বড় শিক্ষকদের অন্যান্য দায়িত্ব থাকত, তাঁরা ছাত্রদের সময় দিয়ে উঠতে পারতেন না, খুব প্রতিভাবান ছাত্র না হলে। ক্লাস ওয়ান-টু লেকচারাররাই ছাত্রদের সময় দিয়ে শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করতেন।

৫. জর্জ টার্নবুলের ডায়েরি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for South Asian Studies-এর archive-এ সংরক্ষিত আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকিটাকি

গত কয়েক বছর ধরে পুরনো কাগজপত্র, পুরনো চিঠিপত্রের মাঝে দিন কাটে। হঠাৎ করে নতুন-পুরনো তথ্য পেয়ে যাই, অর্থাৎ আগের লেখা নতুন করে আমার নজরে আসে। ক'দিন আগে খুঁজে পেলাম *কালি ও কলমের* সম্পাদক মহাশয়ের কাছে, সম্ভবত ২০০৩-এ লেখা, দুটি ঐতিহাসিক চিঠি। উদ্ধৃত করছি।

পাঠকের চিঠি

অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত

কালি ও কলমে অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য নামে স্মারকগ্রন্থটির ওপর অনবদ্য একটি রচনার জন্য সনৎকুমার সাহাকে ধন্যবাদ। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের প্রকাশনায় কলকাতা থেকে ছাপানো এই বইটি, সত্যি কথা বলতে গেলে, পুস্তকপ্রেমিকদের কাছে একটি সংগ্রহের বস্তু (collector's item) বলে বিবেচিত হতে পারে। অমিয়বাবুর বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী, পরিবারের সদস্য, অনুরাগী এবং অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের নিজের কয়েকটি রচনা-সমৃদ্ধ এই বইটি সম্পর্কে বেশ বড় এবং বিশদ একটি আলোচনা করে সনৎবাবু সবার কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

সনৎকুমার সাহার লেখাটি পড়লেই বাংলাদেশের তথা সমগ্র উপমহাদেশের অর্থনীতি শাস্ত্রের গুরুস্থানীয় এক মহত্তম শিক্ষক সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে। এই পত্রলেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল এই মহৎ শিক্ষক এবং অসাধারণ মানুষটিকে কয়েকদিনের জন্য বেশ কাছে থেকে দেখার।

সেটা সম্ভবত ১৯৭৪ সাল। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরি কমিশনের সচিব। একদিন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী, সংক্ষেপে 'ম্যাক' স্যার, আমাকে ডেকে বললেন, 'বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত ঢাকায় আসছেন কয়েকদিনের জন্য। আমরা গ্র্যান্টস কমিশন থেকে ওঁর দেখাশোনা করব। আপনি রাজ্জাক স্যারের কাছে চলে যান, স্যারের কাছ থেকে কী করতে হবে সব জেনে আসুন।' বলাবাহুল্য, আমি অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম না এবং তখনো অমিয়বাবুর নাম শুনিনি। রাজ্জাক স্যারের কাছে গেলাম। তিনি যেভাবে অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের বর্ণনা দিলেন তাতে অবাক হয়ে গেলাম। এতদিন আমি 'স্যার'কেই গুরুদের গুরু বলে জানতাম। কিন্তু সেদিন জানতে পারলাম 'স্যারে'রও একজন স্যার আছেন। এর কয়েকদিন পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমিয়বাবু সপরিবারে এলেন এবং মঞ্জুরি কমিশনের অতিথি ভবনে না থেকে রাজ্জাক স্যারের বাসাতেই উঠলেন। আমাকে মাঝেমধ্যে একাজে-সেকাজে ফুলার রোডের সেই বাড়িতে যেতে হতো। সেখানে এই একদা গুরু-শিষ্য এবং পরবর্তীকালে একদা-সহকর্মীর মধ্যে যে অপূর্ব সম্পর্ক দেখেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একদিন দুপুরে স্যার তাঁদের বাড়িতে আমাকে তাঁদের সঙ্গে খেতে ডেকেছিলেন। আরো অনেকে ছিলেন। ওঁরা যেসব কথাবার্তা বলছিলেন মুগ্ধ হয়ে শোনা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। মনে আছে, 'স্যার' নিজে ঢাকার বাজার থেকে এতবড় কৈ মাছ এনেছিলেন, যা এর আগে আমি কোনোদিন খাওয়া তো দূরের কথা, দেখিইনি।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর স্যারের কাছে অমিয়বাবুর সম্বন্ধে আরো অনেক গল্প শুনেছি। দিনে দিনে অমিয়বাবু সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেড়েছে। অবশেষে অশোক মিত্রের *আপিলা-চাপিলা* পড়ে এই মহান শিক্ষক সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য হয়েছে। জানতে পেরেছি যে, অর্থনীতির এই বিশিষ্ট শিক্ষককে কীভাবে কলকাতার বিদ্যোৎসাহী মহলে, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রায় অবহেলাই করা হয়েছে। অবাক হয়ে যাই যখন দেখি যে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান* বইটিতে অমিয়বাবু সম্পর্কে (*সংসদ বাঙালি অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড, জানুয়ারি ১৯৯৬) যে ভুক্তিটি আছে তাতে তিনি পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় পড়িয়েছেন, গবেষণা করেছেন এবং কাজ করেছেন সব সন-তারিখসহ দেওয়া আছে। শুধু নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এবং তিনি যে ১৯২৬ থেকে '৪৬ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র উল্লেখ।

সনৎবাবুর লেখাটিতে ওই বইয়ের বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিচারণ থেকে এই একনিষ্ঠ শিক্ষক এবং অত্যন্ত বড়মাপের অর্থনীতিবিদের ব্যক্তিগত জীবন এবং অর্থনীতিচর্চার অনেক কিছুই জানতে পারলাম।

সবগুলো লেখাই তথ্য-সমৃদ্ধ। তবে অম্লান দত্ত, এস আর সেন, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় এবং জামাতা আই জি প্যাটেল — এঁদের লেখায় একজন অর্থনীতিবিদের তত্ত্বচিন্তাগুলোও কীভাবে ধীরে ধীরে তাঁর পড়াশোনা, গবেষণা এবং শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে তা বেশ ভালোভাবেই বোঝা গেছে। যদিও পুত্র পার্থ দাশগুপ্ত পিতা সম্পর্কে লিখেছেন, 'The teacher in him won over the scientist. Unlike any other scientist I have known, even professionally he wrote to explain, not to create.' তবু অম্লান দত্ত, এস আর সেন এবং অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলো পড়ে মনে হয়েছে ছাত্রদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতির নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে অমিয়কুমার দাশগুপ্ত বোধহয় কিছু তত্ত্বকে নবরূপে সৃষ্টিও করে গেছেন। যদিও নিজে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে 'Keynesian Economics and Underdeveloped Countries' (বক্তৃতা, লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯ এবং পরে *ইকোনমিক উইকলিতে* ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত) লেখাটির জন্য কোনো বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করেননি, তবু ওই লেখাটি যে শুধু রিকার্ডোর তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তা বিশ্বাস করা কঠিন। মনে হয়, নোবেল কমিটিও তা মানেনি। তা না হলে আর্থার লুইসকে ১৯৭৯ সালে প্রায় একই তত্ত্বের জন্য বোধহয়, নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতো না। এখানে বলে নেওয়া ভালো, আমি এই স্মারকগ্রন্থটি হাতে পেয়েছি এবং পড়েছি।

দু-একটি জিনিসের অনুপস্থিতি মনটিকে একটু অতৃপ্ত করেছে। যদিও মেয়ে অলকানন্দা এবং আরো অনেকের লেখা থেকে ওঁর জীবনের প্রায় সবগুলো পর্যায় সম্পর্কে অনেক জানা গেছে, তবু একটি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি থাকলে বইটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠত। আরেকটি জিনিস, যার হয়তো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, না থাকায় মনটা খুঁত খুঁত করছে, তা হচ্ছে অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের আরেক মহৎ শিষ্য এবং পুত্রবৎ অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের লেখার অনুপস্থিতি।

অধ্যাপক সনৎকুমার সাহাকে আরেকবার ধন্যবাদ। এমন একটি সুন্দর লেখা প্রকাশনার জন্য *কালি ও কলমকে* কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ জেড এম আবদুল আলী
উত্তরা, ঢাকা

সনৎকুমার সাহাকে ধন্যবাদ

অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা উপমহাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের শতবার্ষিক-শ্রদ্ধাঞ্জলি-বিষয়ক একটি গ্রন্থ-আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক দাশগুপ্তের জীবনদর্শন বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে *কালি ও কলমের* পাঠকের জন্য তুলে ধরেছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপককে আমাদের নিকট নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা।

অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের কাছে অসংখ্য শিক্ষার্থীর অর্থনীতির জটিল বিষয়ে হাতেখড়ি হয়েছিল। ভারতবর্ষে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রী ছড়িয়ে আছে। অনেকে আজ খ্যাতিমান অধ্যাপক, কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোজনা কমিশনে, কেউ বিদেশে কর্মরত। তাঁর পুত্র-কন্যা-জামাতা — তিনজনই আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত।
শ্রীদাশগুপ্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও যৌবনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনোদিন ভোলেননি। বরং বাংলাদেশের উন্নয়ন, স্ব-উদ্যোগ, সম্ভাবনা ও কল্যাণচিন্তা নিয়ে তিনি সর্বক্ষণ চিন্তা করেছেন। সেজন্য এক ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছিলেন বাংলাদেশ-ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে দুই দেশের অর্থনীতিবিদরা যদি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন তাহলে খুব ভালো হয় এবং দুই দেশের অর্থনীতিচর্চা প্রাণসঞ্চার করে। বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা।

রোকসানা মাজেদ লিজা
অগ্রণী কলেজ, ঢাকা

সনৎকুমার সাহাকে আমারও আন্তরিক ধন্যবাদ।

একই কাজকে দুই বুদ্ধিজীবী ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন, মতভেদ থাকতে পারে; ভাই পার্থর যে উক্তিটি পত্রলেখক উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে আমি একেবারে সহমত নই। আলী সাহেব ঠিক বলেছেন, শিক্ষকতার মাধ্যমে নানা প্রশ্নোত্তর দিয়ে অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত 'কিছু তত্ত্বকে নবরূপে সৃষ্টি করেছেন'। 'শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্যে' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, হীরেন্দ্রলাল রায়ের 'স্মৃতিমন্থনে' এ-কথা পরিষ্কার।

'অমিয়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে যখন আমি এমএ ক্লাশে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। সম্ভবত খোজ পরিষদের এক সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। অর্থ ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা তখন মূল্যস্ফীতি, চলতি ভাষায় যাকে সবাই inflation বলি। মূল্যস্ফীতির ব্যাখ্যায় তখন যেসব তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া হতো সেগুলো মূলত ছিল মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বভিত্তিক। মূল্যস্তর বৃদ্ধির ওই ধ্রুপদী তত্ত্বটির সাহায্যেই ভারতীয় ইনফ্লেশনের ব্যাখ্যা করছিলেন তৎকালীন প্রথম শ্রেণির ভারতীয় অর্থতাত্ত্বিকরা। ওই ইনফ্লেশনের ওপরেই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। তিনি quantity theory of money-র পরিবর্তে কেইনসীয় saving investment theory-টিকে গ্রহণ করে মূল্যস্ফীতির নতুন একটি ব্যাখ্যা দিলেন। এই নতুনত্ব শ্রোতৃবর্গের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটাই হলো অমিয়বাবুর বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক যে-কোনো ঘটনা, যা আমাদের সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়, তার বিশ্লেষণ করতে তাত্ত্বিক অমিয়বাবু সর্বদাই নতুন পথের সন্ধান করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিশীল মানসিকতার যা লক্ষণ। পরিচিত বাঁধা পথে অগ্রসর হওয়ার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে তাঁর চিন্তাধারা সেই অর্থে কখনো বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠত না — তাঁর চিন্তাভাবনা শিকড়হীন ছিল না, পূর্বসূরিদের পথ ধরেই তিনি প্রথমে এগোতে শুরু করতেন এবং যেখানেই সমস্যা বোঝার এবং সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়ার পথে প্রাচীন চিন্তা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত, সেখানেই তাকে বর্জন করে নতুন ভাবধারা গ্রহণ করতেন।

প্রায় ওই একই সময়, অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালে, অমিয়বাবু আরেকটি বক্তৃতা দেন যার শিরোনাম ছিল 'The Theory of Black Market Prices.' প্রবন্ধটি পরে ওই একই নামে ১৯৫০ সালে *ইকোনমিক উইকলি*তে ছাপা হয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তথাকথিত কালোবাজারের রমরমা কারবার স্বাভাবিক কারণেই চলতে থাকে। জিনিসপত্র কালোবাজারে নিজস্ব একটা দামে কেনাবেচা হয়। অমিয়বাবুর জিজ্ঞাসা হলো যে, কালোবাজারে দাম নির্ধারণ কী পদ্ধতিতে হয়। এক্ষেত্রেও অমিয়বাবু সচেতনভাবে একজন তাত্ত্বিক অর্থশাস্ত্রী। এ ঘটনা থেকে একটি বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। অধ্যাপক দাশগুপ্ত নিছক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিত পাঠ্য তালিকার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন না। বাইরের সমাজের যেসব অর্থনৈতিক ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলেছে তার মূল্যায়ন করার দায়িত্বও যে একজন সমাজ-সচেতন অধ্যাপকের ওপরেই বর্তায়, এ কথা অধ্যাপক দাশগুপ্ত বহুবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এরপর দীর্ঘদিন অধ্যাপক দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয় দীর্ঘদিন পর, যখন অমিয়বাবু অবসর গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। আমাকে বিশ্বভারতীর নানা কাজে প্রায়ই শান্তিনিকেতনে যেতে হতো, একনাগাড়ে চার-পাঁচদিন থাকতেও হতো। ওই সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওঁর বাড়িতে যেতাম। ছিমছাম সাজানো বাড়ি। অমিয়বাবুর ফুলের শখ ছিল। মালি থাকলেও নিজেই বাগানের দেখভাল করতেন। ওঁর বাড়িতে যাওয়ার দুর্নিবার আকর্ষণ এড়াতে পারতাম না। ভয় হতো যে উনি হয়তো আমার ঘন ঘন উপস্থিতিতে বিরক্ত বোধ করছেন। একথা ওঁকে একদিন বলাতে উনি বলেন, অর্থশাস্ত্র নিয়ে কথা বলব এতে বিরক্তির কী আছে, এতে যদি কেউ বিরক্ত বোধ করে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তিটি মনের দিক থেকে মৃত। একথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করি। দীর্ঘ সময় ধরে নানা বিষয়ে ওঁর সুচিন্তিত মতামত শুনি। আলোচনা ও কথোপকথন যে শুধু অর্থশাস্ত্রের বাঁধা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তা কিন্তু নয়। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠও ওঁর খুব সীমিত ছিল না। ওঁর মুখেই শুনেছি যে ওঁদের পূর্বপুরুষেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদী সংস্কৃত ব্যাকরণেরও চর্চা করতেন। ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞানও তাঁর খুব কম ছিল না। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধে একদিন অনেক কথাই উনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। এ-ধরনের অনেক আলোচনাই তখন ওঁর সঙ্গে করেছি, যার থেকে প্রতিক্ষেত্রেই আমার মানসিক উন্নতি ঘটেছে; প্রতিক্ষেত্রেই আমি সমৃদ্ধতর হয়ে ফিরে এসেছি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, অমিয়বাবু তাঁর *Epochs of Economic Theory* গ্রন্থটি রচনা করছেন। ওই গ্রন্থটিতে অধ্যাপক দাশগুপ্তের অনন্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। ওঁর মতের দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয়, অনেকের মতো, আমাকেও বিস্মিত করত। সাধারণত সাহেব-সুবোরা কিছু বললে তার বিরুদ্ধাচরণ করা ভারতীয়দের পক্ষে সহজ কাজ হয় না। অমিয়বাবু এর একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তিনি যেভাবে এবং যে যুক্তি সহকারে জোসেফ শুম্পেটারের মতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তা আমাদের সবারই অনুকরণযোগ্য।'[১]

হীরেন বাবুর লেখায় একটি কৌতুক কাহিনি আছে। ১৯৪৩ সাল, অর্থনীতি পড়তে সদ্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকেছেন — বিষয়টি গোলমেলে, ভেতরের কলকাঠি কেউ বুঝিয়ে দিলে সুবিধে হয়। পরিচিত কোনো মাস্টারমশাই (অর্থনীতির নন) বললেন বাবাকে তাঁর সমস্যাগুলো জানাতে। উনি 'অনন্যসাধারণ শিক্ষক, মননশীল এবং ছাত্রবৎসল।... বলতে দ্বিধা নেই যে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের তথাকথিত নাক-উঁচু ছাত্রদের মধ্যে আমিও একজন — খটকা লেগেছিল। মফস্বলের একটি ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জুনিয়র লেকচারার অর্থতত্ত্বের এত বড় পণ্ডিত একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।' কলকাতা বনাম ঢাকা নিয়ে উন্নাসিকতার কথা লিখেছি, অতিরঞ্জন নয়।

দ্বিতীয় চিঠি : দুই বাংলা মিলে অর্থনীতির পত্রিকা বের করার কথা বাবা বলেছিলেন বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৮২)। দুই বাংলার যোগাযোগ উনি অন্তর থেকে চাইতেন; এ কাজ আগে বাড়েনি। আরো দুঃখের — ২০০৭ অবধি দেখেছি বঙ্গীয় অর্থনীতি-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে অন্তত দুই অধ্যাপক আসেন। দশ বছর হতে চলল, তা বন্ধ হয়ে গেছে। বাবার এই ভাষণ ছিল বাংলায়। মাতৃভাষা ও শিক্ষার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান অপরিহার্য। এবং সেজন্য একটি আন্তর্জাতিক ভাষাও অপরিহার্য। কিন্তু সাধারণ জিজ্ঞাসুর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক ভাষাই প্রশস্ত একথা অস্বীকার করা যায় না। জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে যেমন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি, আমদানি-রপ্তানির জন্য বিদেশি ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য হলেও আঞ্চলিক সরবরাহের জন্য চাই মাতৃভাষার প্রচলন — যে ভাষায় জিজ্ঞাসু কথা বলে, চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে। আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যবস্থা শুধু যে শ্রেয় তা নয়, এ ব্যবস্থা সম্ভবপরও বটে। এ আমার বহুদিনের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের পক্ষেই আমি বর্তমান ভাষণটি বাংলা ভাষায় তৈরি করেছি। আমার মনে হয় বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের কার্যক্রমও বাংলা ভাষাতেই সূচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি এ-ও মনে করি বাংলা ভাষায় লেখা পাঠ্যবই ছাড়াও বাঙালি অর্থবিজ্ঞানীদের কর্তব্য একটি অর্থনৈতিক ত্রৈমাসিক চালু করা, যেটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের গবেষণার ফল প্রকাশ করবে বাংলা ভাষায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালি অর্থবিজ্ঞানীদের অবদান আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সেসব গবেষণার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য এই বিদেশি ভাষার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, একথা মানি। তবুও বাঙালি গবেষকদের কাছে এই দাবি জানাতে চাই যে, তাঁরা যেন তাঁদের গবেষণার খানিকটা অংশ — অন্তত যেসব গবেষণা আমাদের জাতীয় সমস্যার সঙ্গে জড়িত — বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। আমি মনে করি যে, এ বিষয়ে বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদ সচেষ্ট হলে একটি সম্ভ্রান্ত পর্যায়ের ত্রৈমাসিক চালু করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমার বিশেষভাবে মনে আসছে। আমরা কি এই বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারি না? আমি মনে করি, সে ব্যবস্থায় উভয় পক্ষেরই লাভ। আমার নিজের এ বিষয়ে একটুখানি দুর্বলতা আছে। 'ওপার বাংলা'তেই আমার অর্থনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা। বহু বছর অধ্যাপনাও করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানে আমার একটি ছাত্র সম্প্রদায় আছেন যাঁরা আজো আমাকে স্মরণ করেন, এবং যাঁরা অনেকেই আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বাংলা ভাষায় এঁদের অনুরাগও প্রচুর। আমাদের এপার থেকে সহযোগিতার আহ্বান জানালে এঁরা আন্তরিক সাড়া দেবেন, এটা আমি খুবই আশা করি। এবং এ-ও মনে করি, এঁদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে — সাধারণভাবে পরিষদের, আর বিশেষভাবে আমার প্রস্তাবিত ত্রৈমাসিকের, সমৃদ্ধির দিক থেকে।'[২]

বাবার জীবনের শেষ সংবর্ধনা কলকাতাতে বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের তরফ থেকে। সংবর্ধনার কিছুটা স্মরণ করে লিখেছিলেন অর্থনীতিবিদ ডা. রাজকুমার সেন, 'ডা. অমিয় দাশগুপ্ত স্মরণে'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে আছেন, ঢাকা আমাদের জীবন থেকে কখনো দূরে নয়।

ড. অমিয় দাশগুপ্ত স্মরণে

'বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের দ্বিতীয় সম্মেলন (১৯৮২) উপলক্ষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. অমিয় দাশগুপ্তকে সভাপতির ভাষণ দিতে শুনেছি ঠিক দশ বছর আগে। তার দু'বছর পর পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসেও অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু এই সেদিন, গত ৯ অক্টোবর তাঁরই সংবর্ধনা সভায় তাঁর যে অনবদ্য (বিশেষণটি আসলে ড. ভবতোষ দত্তের) ভাষণটি শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার ফলে সেদিন যেন তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ওই সভাই ছিল বোধ হয় তাঁর সর্বশেষ সংবর্ধনা সভা। যখন আমরা অধীর আগ্রহে তাঁর নবতিতম জন্মদিনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তাঁরই সম্মানে প্রকাশিতব্য গ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, তখন ১৯৯২-এর শুরুতেই (১৪ জানুয়ারি) তিনি শান্তিনিকেতনে চিরবিদায় নিলেন। তাঁর শেষ সংবর্ধনা সভার কিছু বর্ণনা দিয়েই বরং আজ তাঁর স্মৃতিতর্পণ করি।

সেদিন সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বর্ষীয়ান অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত, যিনি ড. অমিয় দাশগুপ্তের ছাত্র হতেও পারতেন — কারণ অমিয়বাবু ১৯২৬ থেকে ৪৬ পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র বিভাগে আর সেখানে ভবতোষবাবুর কয়েকজন সহপাঠী ছিলেন অমিয়বাবুর ছাত্র। ওইদিন পরিষদের সভায় সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য রাখলেন বা বলা যেতে পারে খানিকটা ঘরোয়া আলাপ করলেন ঊননব্বই বছরের শ্রদ্ধেয় অর্থশাস্ত্রী, যিনি নিজে কানে প্রায় শুনতেন না, অনেক সময় নাম ভুলে যান, কিন্তু কী আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি স্মৃতির সুতোর ছিঁড়ে যাওয়া মালাকে চকিতে জুড়ে নিয়ে অনায়াসে বাক্যের গভীরতায় সবাইকে মুগ্ধ-আবিষ্ট করে রেখেছিলেন সেই সন্ধ্যায়। আমরা যারা ওঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি দুই প্রজন্ম পরে জন্মানোর ফলে, তারা উপলব্ধি করলাম যে সত্যিই আমরা কী দুর্লভ সংসর্গ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

প্রায় চল্লিশ মিনিট কি তারও বেশি সময় ধরে অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন সেদিন, কিন্তু সেই সন্ধ্যা ছিল শুধু কান পেতে আর মন ভরে শোনার, ছাত্রের মতো হাতের খাতায় টুকে রাখার নয়। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন সেই যন্ত্রটাও হাতের কাছে ছিল না, যা দিয়ে তাঁর কথা সেলুলয়েডের ফিতেতে ধরে রাখা যেত, যাঁরা সেদিন আসতে পারেননি পরবর্তীকালে তাঁদের শোনানোর জন্য। তাই অনেক কথাই হয়তো হারিয়ে গেল, তবু যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে তা-ই বা কম কী। দুটো খুব দামি কথা উনি সেদিন বলেছিলেন — আমার মনে হয়েছে দুটিই অর্থশাস্ত্রের মূলভিত্তিকে চিহ্নিত করে — যা আয়ত্ত করতে না পারলে আমাদের অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণতা পায় না, উর্বরতা লাভ করে না, সামাজিক সমস্যা সমাধানের সময় যথার্থ আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়। এ দুটি বিষয় আবার যথাক্রমে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ড. দাশগুপ্ত বলেছিলেন যে, একজন ভালো অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে যা থাকা খুবই জরুরি তা হলো তাঁর দর্শনশক্তি (উনি Vision শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন), যা না থাকলে যে-কোনো সমস্যার আলোচনাই শুধু নিষ্ফলা অর্থনৈতিক কচকচিতে পর্যবসিত হয়, এগিয়ে যাওয়ার বা সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অতি প্রয়োজনীয় দর্শনশক্তি থাকলে তবেই বলা সম্ভব যে গৃহীত আর্থিক নীতি বা পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ আমাদের অর্থব্যবস্থাকে নিকট বা দূর ভবিষ্যতে ঠিক কোথায় নিয়ে যাবে। এই দর্শনশক্তিকে আরেকভাবেও কাজে লাগানো যেতে পারে। যদি আমাদের অর্থব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি যথার্থ হয় তবে ভবিষ্যতে আমাদের অর্থব্যবস্থাকে যেখানে বা যে স্তরে উন্নীত করতে চাই, তা করতে হলে কী কী নীতি বা পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত — তাও আমরা অনেকটা সঠিকভাবে আন্দাজ করতে পারি।

অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা তিনি সেদিন বলেছিলেন তা ছিল অর্থশাস্ত্রের আলোচিত সম্পর্কগুলোর সম্পর্কে। অর্থশাস্ত্রে সাধারণত বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কে আলোচিত হয় উৎপাদন সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে। কিন্তু এই আলোচনা আরো বিশদ ও বিস্তৃত করা উচিত। কারণ সম্পর্কগুলো আসলে শুধু বস্তুর সঙ্গে বস্তুর নয়, মানুষের সঙ্গে বস্তুর এবং সবশেষে — সেটাই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — মানুষের সঙ্গে মানুষেরও বটে (কারণ অর্থশাস্ত্র তো সামাজিক বিজ্ঞান)। এই তিন ধরনের সম্পর্কই অর্থশাস্ত্রীদের আলোচনা করা দরকার। যদি কোনো এক ধরনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেই আমরা থেমে যাই তবে আমাদের আলোচনা শুধু যে অসম্পূর্ণ থাকে তা-ই নয়, সেই আলোচনা থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্তগুলো সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ড. দাশগুপ্তের পরিহাসবোধের কথা উল্লেখ করলেন ড. ভূপেশ মুখার্জী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসের অধিকর্তা ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ড. আয়ার। একবার ছাত্ররা কোনো বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে ড. আয়ারের পথ অবরোধ করেছিলেন। খুব রেগে গিয়েছিলেন তিনি, তখন ড. দাশগুপ্ত ড. আয়ারকে ঠাট্টা করে বলেন যে, উনি কেন ছাত্রদের তাঁর পবিত্র সুতো বার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাচ্ছেন না — তাহলেই তারা ভয় পেয়ে যাবে! আবার ড. দাশগুপ্তের পড়ানোর উচ্চস্তরে পৌঁছানোর ক্ষমতা তাদের ছিল না বলে ওখানকার সাধারণ স্নাতক শ্রেণির ছাত্ররা একবার মেঝেতে জুতো ঘষার আওয়াজ করে তাঁকে বিরক্ত করেছিল। ড. দাশগুপ্তও তাদের পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ তথ্য আমাদের জানালেন তাঁরই এক ছাত্র অক্ষয় কুমার সেনশর্মা। সব মিলিয়ে সেদিনের সন্ধ্যা আমাদের সবার কাছেই স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। সবশেষে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ দিতে উঠে তাই মনে হচ্ছিল যে, ধন্যবাদ বোধহয় আমার নিজেকেই জানানো উচিত — সেদিনের সভায় উপস্থিত থেকে নিজেই ধন্য হওয়ার জন্য।'[৩]

সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে আলাপচারিতাতে রাজ্জাক সাহেব বলেছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস টু লেকচারার হয়ে যাঁরা আসতেন, অধ্যাপনা-গবেষণা করে জীবন কাটাবেন এই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। মেধাবী তাঁরা, ইচ্ছা করলে অনেক বেশি মাইনেতে সরকারি বা অন্য চাকরি নিতে পারতেন, এঁরা তা করেননি, নানা দুর্যোগের মধ্যেও অধ্যাপনা ছেড়ে যাননি। আরো অনেকের মতো বাবাও ছিলেন এরকম একজন শিক্ষক।

ওঁর মৃত্যুর পর নানা চিঠি এসেছে। আজ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬, আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস। মাকে সংবেদনা জানিয়ে ঢাকার ছাত্র সমর গুহ মহাশয়ের চিঠি দিয়ে এ দিবস পালন করি।[৪]

কলকাতা থেকে ১৭/১/৯২-এ লেখা

পরম শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু,

ড. দাশগুপ্ত চলে গেলেন — গেলেন যাওয়ার বয়সেই। তবু আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম — এই সংবাদটি পড়ে বিশেষভাবে বেদনা বোধ করছি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। তবুও নানা কাজে, নানা অনুষ্ঠানে ড. দাশগুপ্তের আন্তরিক সান্নিধ্য ও সহযোগিতা পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সেদিনের কথাগুলো আজও মনে এলে আনন্দবোধ করি। সেদিন আমরা যারা চরমপন্থী স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তাদের প্রতি ড. দাশগুপ্তের স্নেহ ও শুভেচ্ছার মাত্রাটি ছিল অনেকটাই বেশি। ছিলাম আমি ঢাকার গেণ্ডারিয়াতে। তাই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা-সাক্ষাতের সহজ অবকাশ ছিল।

ভারতের একজন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদের অধিকারীরূপে ড. দাশগুপ্ত ছিলেন ভারতের গৌরব। তাঁর প্রয়াণে ভারতের বড় বড় ব্যক্তিরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। কিন্তু আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তাদের কাছে অমিয়বাবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন একান্ত আপনজন। তাই তাঁর পরলোকগমনের সংবাদটি পড়ে মনটা খুব বিষণ্ন হলো।...
ড. দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ইতি সমর গুহ

মাঝে মাঝে নিজেকে দোষী মনে হয়, বাবার কথা বেশি লিখেছি বলে। ঢাকা শহরকে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করে দেখতে পারি না, স্মৃতি ফিরে যায় কার্জন হলে, টিচারদের কমনরুমে, কৃষ্ণচূড়া পল্লবিত রমনার রাস্তায়, বিভাগীয় রাজনীতিতে বা বাবার সহকর্মী-বন্ধুদের কাছে, বাবার চোখ দিয়ে দেখা নানা দৃশ্য। অধ্যাপক হিসেবে বাবাকে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল — কাশীতে; ঢাকার কথা আলাদা। সেখানকার পরিবেশ, ছাত্রদের মেধা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, শিক্ষকতার ধারা ভিন্ন, অনন্য। বাবা একা নন, বহু জ্ঞানী-গুণী-অধ্যাপক-গবেষক সেখানে ছিলেন। আবার বলি, তাঁদের কথা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়, বাবার দৃষ্টান্ত দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্টতার আভাস-আন্দাজ দিই। হয়তো এটা আমার দর্প যে, আমার পরিবারকে, আমার বাবাকে সমাজের একটি স্তরের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক মনে করি। জানি না।

'৫নং পুরানা পল্টন' পরিচ্ছেদে দুই মাসি-কাকির কথা লেখা হয়নি, এঁরা পুরানা পল্টনে থাকতেন না তাই। ছিলেন কাছের মানুষ। রিনি কাকিমা, অমলেন্দু কাকার (বসু) স্ত্রী ছিলেন রূপসী, অমন বুদ্ধিদীপ্ত, মায়ালু চোখ বিরল। জিন্দাবাহার লেন থেকে প্রায়ই আসতেন, আড্ডা তো পুরানা পল্টনের ঘরে ঘরে, উনি এলেই মিষ্ট হাসিতে ঘর ভরে যেত, চট করে ভালোবাসা যায় এমন কাকিমাকে। কাছে কাছে থাকতাম, সৌন্দর্যের ঘ্রাণ নিতে। দেশবিভাগের পর ওঁরা কিছুদিন বেনারসে ছিলেন, মাকে-রিনি কাকিমাকে দেখেছি তখন, দুই বোনের মতো। রোজ আসতেন, ঢাকার অভ্যেসমতো মেঝেতে বসে চলত দুজনের গল্প।

এরপর বহুকাল রিনি কাকিমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ২০০৭ কি ২০০৮, কলকাতা গিয়ে শুনলাম উনি খুব অসুস্থ; বহু বছর ধরে একা সে কথা জানতাম। ঢাকার সম্পর্ক মেটে না, দেখা করতে গেলাম। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, ওরকমই সুন্দরী, উজ্জ্বল চোখ। ষাট বছরের ব্যবধান উড়ে গেল, কাছে বসে কত কথা বললাম। বারবার বললেন, 'দিদি — দিদি কী ছিলেন, তোরা বুঝবি না। আমার সুখে-দুঃখে চিরকাল দিদি আমার পাশে। বিয়ে করে ঢাকা গেলাম, হাত ধরে সংসার করতে শেখালেন দিদি। দেশবিভাগে দিশেহারার মতো গেলাম কাশী, সেখানেও দিদি পাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর কাকা গেলেন, সাহস পেলাম দিদি, অমিয়দার চিঠিতে। সে কী দিন ছিল, ঢাকায় বোনা সম্পর্ক কেমন ছিল, আজ যেন বিশ্বাস হয় না।'

মাকে যেমন 'মেজবৌদি' হাত ধরে সংসার করতে শিখিয়েছিলেন, জুনো মাসির পাশে তাঁর মা ছাড়া ছিলেন চাঁপাদি, অর্থনীতির বিভাগীয় কর্তা, ড. এইচ এল দের স্ত্রী, সেরকম রিনি কাকিমার ছিলেন মা।

ওঁদের ছেলে তীর্থঙ্কর আমার বইপড়া বন্ধু, গম্ভীর ধরনের বন্ধুত্ব ছিল। যোগাযোগ আছে, মাঝে মাঝে দেখা হয় — ঢাকার পর কত বছর কেটে গেছে, বন্ধুত্বে ভাটা পড়েনি।

পৃথ্বীশকাকার স্ত্রী মুকুল মাসির ছিল শান্ত-স্নিগ্ধ শ্রী। কথাবার্তা সেরকমই শান্ত, নম্র, মিষ্টি হাসি — উচ্চহাসি নয়। কোথায় থাকতেন জানি না, ৫নং-এ আসতেন প্রায়ই। হালকা রঙের তাঁতের শাড়ি হালফ্যাশনে পরতেন, মা-জুনো মাসির মতো সাধারণ করে নয়। ছাই রঙে গাঢ় নীল পাড় শাড়িতে ওঁকে দেখতে পাই, মায়ের ঘরে মেঝেতে বসে গল্প করছেন, আঁচল গায়ে জড়ানো। মাজা রং, গালে কোথাও একটা তিল ছিল, যাকে পরে আমরা বলতাম, 'beauty spot' — ভারি সুন্দর লাগত গাম্ভীর্য ও মিষ্টত্ব মেলানো এই মাসিকে। আড়ালে থাকা মানুষ, মায়ের থেকে বয়সে ছোট, ওঁর প্রতি মায়ের স্নেহ ছিল, এছাড়া কিছু নজরে আসেনি।

ঢাকার পর মুকুল মাসিকে দেখিনি, ঘনিষ্ঠভাবে কোনোদিনই জানতাম না। পৃথ্বীশকাকার সঙ্গে শুধু দাশগুপ্ত পরিবারের নয়, প্যাটেল পরিবারেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দিল্লিতে আমাদের বাড়িতে আসতেন, ইতিহাস, ভ্রমণ, নানা আলোচনা হতো। আমুদে মানুষ, হাসি স্বগতোক্তির মতো, মৃদু — প্রায় নিজের জন্য, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আড্ডা দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে সময় টেলিফোনের চল ছিল না, সময় পেলে এসে যেতেন। ওঁর জন্য চা সবসময় তৈরি! বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

বাবার মৃত্যুর পর মাকে লেখা মুকুল মাসির চিঠিতে ওঁকে নতুন করে, নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করলাম। অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, চিঠির ভাষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমন চিঠি যিনি লিখতে পারতেন তাঁর না জানি কত পড়াশোনা, গুণ ছিল। আফসোস হয় ওঁকে কাছে থেকে জানিনি বলে।

চিঠি (১৮-১-৯২)

প্রিয় শান্তিদি,

ড. দাশগুপ্তের প্রয়াণ সংবাদ কাগজে পড়ে ভয়ানক আঘাত পেলাম — বিষাদে মন ছেয়ে আছে। এতদিন মনে হতো আমাদের সেই ঢাকার 'group'-এর সবাই একে একে এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিনি তিনি তো আছেন — কেমন অব্যক্ত একটা শক্তি মনের ভেতর ছিল — সে স্থানও আজ চিরশূন্য হয়ে গেছে — ভাবতেও বেদনা বোধ করি, অসহায় লাগে।

শান্তিদি, আপনাকে এ সময় সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা আমি করব না, ভুক্তভোগী আমি।

যত বড় দুঃখ হোক, কালের আবর্তে তা আংশিক হলেও চাপা পড়ে যায় — তা না হলে মানুষ তার পড়ে থাকা দিনগুলোতে তো পথ চলতে পারে না — তা ভগবানেরই বিধান। আপনার এই বিয়োগ-ব্যথার দিনে আমি সমব্যথী হয়ে রইলাম।

ইতি মুকুল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব ছিল অধ্যাপক-ছাত্রর অনুশীলনের ক্ষমতা, বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল, সর্বোপরি নিকট সম্পর্ক। পরিবেশ ছিল পারিবারিক আন্তরিকতার। চিঠি-স্মৃতিচারণ তার উদাহরণ।

নরেশদা, নরেশ গুহ, বহুবার বলেছেন, 'তোমার মায়ের ওপর কিছু লেখো। ওঁর মতো একজনের কথা অজানা থাকা উচিত নয়।' মা তো মা — সন্তানের পৃথিবী, তিনি কেমন ছিলেন কী করে লিখব? তিনি তো ধরিত্রী, আঁকড়ে থেকেছি, দূর থেকে কাচের লেন্স দিয়ে তো তাঁকে দেখতে পারি না। মা-বাবার, আমাদের পরিবারের কথা নানা সূত্র ধরে লিখেছি, জানাতে চেষ্টা করেছি একটি সাধারণ পরিবারের সুখ-সংগ্রামের কথা।

মাকে হারিয়েছি তাও পনেরো বছর। এখন বুঝি মাকে চিনতে পারার অর্থাৎ ওঁর মনের কোণে লুকিয়ে রাখা সাধ-আহ্লাদ-অভিমান-অভিযোগ, কিছুরই খোঁজ রাখিনি। রাজনীতি, বইপত্র, গান-বাজনা নিয়ে মন্তব্য করতেন, মতামত যুক্তি দিয়ে জানাতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বুঝতে দেননি। প্রিয়জনদের সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত, দোকানে গেলে কোন শাড়িটি ওঁর বেশি পছন্দ তাও বলতে ইতস্তত করতেন। বছরের পর বছর পরিবারের যত্ন নিতে নিতে নিজের প্রয়োজন ভুলে গিয়েছিলেন।

মনের গভীরে কোথায় আক্ষেপ লুকিয়ে ছিল তার আভাস পেলাম যখন বাবাকে হারিয়ে মা স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে। সাদা শাড়ি দেখিয়ে বললেন, 'ভালো না, ভালো না, রঙিন শাড়ি এনে দে।' শৌখিন মানুষ, সমাজের নিয়মে বাধ্য হয়ে অল্প বয়স থেকে সাদা শাড়ি পরতে বাধ্য হয়েছেন, পাড় যতই নকশা করা হতো না কেন। এ তার প্রতিক্রিয়া। গহনা ছিল না; পরে বাবা, আমরা যা দিয়েছিলাম চোরের হাতে চলে গেল দিল্লিতে। বরোদাতে বললেন, 'সোনা-রুপা দিস না, আমি সামলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখতে পারি না, বোধ হয় আমার সয় না।' রঙের ওপর পক্ষপাতিত্ব জানতাম, ওঁর জীবনের শেষ দশ বছর রঙিন শাড়ি, রঙিন পাথরের মালা, চুড়ি, আংটি পরেছেন, পছন্দের যেটুকু দিতে পেরেছি। আঙুলে আংটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন, হাসিমুখে বলতেন, 'বড় সুন্দর রে'। একটু থেমে, "বরিশালে এরে কয় 'পিতলা আউশ', কউক গিয়া।"

কবিতা ভালোবাসতেন। সেই যে কবে ইডেন কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে Palgrave-এর কবিতার Golden Treasury পড়েছিলেন, সেই থেকে। W. B. Yeats, Robert Frost পড়তেন দেখেছি। ডায়েরির মাঝে আবিষ্কার করলাম মায়ের হাতে লেখা Ezra Pound-এর Paradise। কঠিন কবিতা; মায়ের মন, চিন্তন ছুঁয়েছিল, নিজের কাছে রেখে দিলেন। কবে, কোথায় পড়লেন জানি না, জানবার চেষ্টা করেছি কি না তাও জানি না।

বই ছাড়া থাকতেন না; জীবনের একেবারে শেষ দিকে যখন দৃষ্টি ক্ষীণ, পড়তে বিশেষ পারেন না, বসে রবীন্দ্রসংগীত গুনগুন করতেন, কোলে বই বা পত্রিকা। একটা সময় এলো দৃষ্টি এত ক্ষীণ, হাতের পত্রিকার পাতাটি যে উলটো তাও দেখতে পান না, তখনো ছাপার অক্ষর হাতছাড়া করেননি।

লেখাপড়ার জগতে যুক্ত থাকলেও ব্যক্তিগত পৃথিবী আবেগ দিয়ে দেখতেন। শান্তিনিকেতনের কাহিনি মা অল্প অসুস্থ, প্রতিবেশী এসে বললেন, 'মাসিমা আপনি খাবার জলটা ফুটিয়ে খাবেন।' মা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'হ্যাঁ, ওনার খাবার জলটা ফুটিয়েই দিই!' এরপর কিছু বলার নেই।

সংসারে প্রচুর খাটুনি ছিল কিন্তু পরিস্থিতি-পরিবেশ যে রকমই হোক, আগেও যেমন লিখেছি, মা আনন্দের উৎস খুঁজে নিতেন। ৫নং-এর বাগান মুখে হাসি ফোটাত, 'আরে মীরা, আসো-আসো, বসো' করে আড্ডা মেরে খুশি হতেন; আবার ছাত্র-ছাত্রীদের, বাবার সহকর্মীদের আপ্যায়ন করে তৃপ্তি পেতেন। বেড়াতে ভালোবাসতেন, ছোট-বড় কত জিনিস নজরে আসত। পুরিতে সমুদ্রের ধারে ঝিনুকের রাশি, সেখানে তেকোনা টুপি পরা 'নুলিয়া', যারা সমুদ্রে স্নান করতে সাহায্য করে, তাদের কথা, শুধু পূর্ণিমা রাতের সমুদ্র নয়, অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের রূপ মায়ের নজর এড়ায়নি।

পরে যখন নিয়মিতভাবে বিলেত, ইউরোপ যেতেন, নদী-পাহাড়, ট্রেনের সফর, ফুল-পাতা, সবকিছু ডায়েরির পাতায়। ১৯৭৮, মে মাস — ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনির সঙ্গে মা-বাবা বিলেতে কর্নওয়াল বেড়াতে গিয়েছেন। ২২ শে মে লিখছেন, 'দুপুরের পর St. Mawes Castle দেখতে বের হলাম। ২৫-৩০ মাইল দূরে। Henry Viii এটি তৈরি করেন River Fal-এর মুখে। সেখানটাতে Fal সমুদ্রে পড়েছে। অন্য পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়ের ওপর আরেকটি Castle তৈরি করেছিলেন, যাতে France বা অন্য শত্রুরা ভেতরে ঢুকতে না পারে। ভারি মনোরম দৃশ্য। Castle-টি সুন্দর। চারদিকে বাগান — নানারকম ফুল আছে। একটি পদ্মফুলের জলাশয়ও করেছে। প্রচুর কুঁড়ি এসেছে। আমরা দুজনে অনেকক্ষণ ওখানে বসে সমুদ্রের শোভা দেখলাম।'

শুধু বিদেশ নয়। শান্তিনিকেতনে যেখানে আমি ভাবতাম বিশেষ কিছু হয় না, ডায়েরি ভর্তি, মায়ের বেরোবার তালিকাতে। ১৯৮২ — 'বাংলা বর্ষশেষ, সন্ধ্যায় মন্দিরে গেলাম, অপূর্ব আবৃত্তি ও পাঠ শ্রী সুপ্রিয় ঠাকুরের।... বাংলা নববর্ষ। ভোরে মন্দিরে গেলাম, মন কেড়ে নেওয়া সমবেত সংগীত হলো।... সন্ধ্যায় বাংলাদেশের বুলবুল অ্যাকাডেমির গায়ক-গায়িকাদের গান শুনতে গেলাম। নাচও ছিল। Liberation-এর নাচ ইত্যাদি, খুব ভালো ছিল।... ২৫ শে বৈশাখ উপলক্ষে ভোরে একা মন্দিরে গেলাম। ভালো লাগে মন্দিরের শান্ত পরিবেশ।'

দুজনেই থিয়েটার ভালোবাসতেন। দিল্লি, কলকাতা, ওয়াশিংটন, লন্ডন কত নাটক যে দেখেছেন; মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছি শিশির ভাদুড়ি, জন গিলগুডের কথা। একসাথে দেখেছি বহু বাংলা, ইংরেজি নাটক; আমি নাম ভুলে গিয়েছি, ডায়েরিতে ঠিক ধরা আছে। অপছন্দ ব্যক্ত করতে দ্বিধা নেই। কার অভিনয় ভালো লাগেনি, কার ব্যবহার পছন্দ হয়নি, 'বিবির গান আজ তেমন জমেনি' — সবই আছে ছোট্ট খাতার পাতায়।

ভ্রমণ ছাড়া আছে সুহৃদ, সমবয়সী, বাবার সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, ছাত্রবৎ স্নেহের পাত্র, বিশাল পরিধির 'আপনজন', তাঁদের আসা-যাওয়া, একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, খেতে যাওয়া, খেতে ডাকা — যেখানেই থাকেন, বিরাম নেই। জীবনে, সমাজে, ভারতীয়-বিদেশি সংস্কৃতিতে গভীরভাবে জড়িয়ে না থাকলে, মানুষ ও জগৎকে ভালো না বাসলে এত উৎসাহ, এত কৌতূহল থাকতে পারে না।

মা স্বাধীনতা ভালোবাসতেন। গাড়ি থাকলে গাড়ি, নয়তো রিকশা নিয়ে সংসারের বাজার করা, মায়ের ভাষায় 'একটু ছাতু-নাতু কেনা', মন্দিরে যাওয়া, কোনো বাড়িতে ঢুঁ মেরে আসা — অমিতা মাসি বলতেন, 'তোর মায়ের পায়ে তো চাকা।' বেড়াতে যাবার কথা উঠলে বাবা, মা, মাসি তিনজনের একজনও পিছুপা হতেন না — লন্ডনে, প্রতিবছর একত্র হতেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ওখানে দুপুরের লাঞ্চ, 'এল্‌গিন মার্বল' দেখা, কোথাও বসে গল্প করা — একজন আশির বেশ ওপর, দুজন আশির কাছাকাছি — ওঁদের বন্ধুত্ব, মনোবল, আনন্দ নেওয়ার বা গল্প করার ক্ষমতা অবাক করে দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তরের দশক থেকে দায়িত্ব কমে যায়, হাতে সময় থাকে, ডায়েরির পাতা বিশেষভাবে জমাট বাঁধে। একই দিনে নানা জায়গায় যাচ্ছেন, কতজন আসছেন — বন্ধুত্বের শক্ত মুঠিতে প্রাণশক্তি পাচ্ছেন। দিল্লি, শান্তিনিকেতন, লন্ডন — বিশেষ করে ঢাকার কথা আছে। পুরনো ছাত্ররা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার কেউ আসছেন। দিন, ক্ষণ, নাম লেখা।

মা ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগে যাঁদের বলা হতো 'ডায়েরিস্ট', ডায়েরির পাতায় দিনপঞ্জি তাঁদের জীবনের পথ ও পাথেয়। নিজের বিনোদনের জন্য লেখা, হয়তো ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বয়সে অবসর বিনোদনের আশায়।

সব কিছু ছাপিয়ে মায়ের মধ্যে ছিল অন্তর থেকে আপন করে যত্ন নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা। আপনজন ও আপ্যায়নের ভিন্ন সংজ্ঞা। ভেদাভেদ ছিল না মনে — শান্তিনিকেতনে দেখেছি, বিকেল চারটে নাগাদ মালিরা, কোনো রিকশাওয়ালা, পরিচিত ফেরিওয়ালা এলেই মা বলতেন, 'যাই, চা করি, ওদেরও তো চা খাবার সময় হলো।' প্রতিবাদ করতাম, নিজের চা-টা তো শান্তিমতো খাবে? — উত্তর : 'তুই বুঝবি না, এটা করতে হয়।' বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, 'প্রতিবাদ করিস না, এতেই তোর মা আনন্দ পান।'

ডায়েরি, ফেব্রুয়ারি ৫, ১৯৮৮। 'নরেশ সন্ধ্যেবেলা এলো, এসে অসুস্থ বোধ করলে ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার rest নিতে বললেন। বাড়িতে একা থাকবে, চিনু (ওঁর স্ত্রী) কলকাতায়, রাতে আমাদের কাছে রাখলাম। সকালে সুস্থ বোধ করলে বাড়ি পাঠালাম।' চিনুদি না আসা অবধি নরেশদার খাওয়া-দাওয়া মা-বাবার কাছে, ডাক্তারের পথ্য অনুযায়ী। এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

২০১৫-তে একটা আশ্চর্য কাণ্ড হলো। ৪নং-এর মেধোদা যাঁর কথা আগে লিখেছি, যিনি সত্তর বছর ধরে হারিয়ে গিয়েছিলেন আমার জগৎ থেকে, ফিরে এলেন। ফেসবুকের বলিহারি, আমি ফেসবুক করি না, ওঁর মেয়ে ঈশানি কী করে যেন ফেসবুক থেকে আমাকে খুঁজে পেল। ওর বাবার ডাকনাম 'মেধো' বলতেই কানে বাজল মায়ের গলায় 'মেধো, এলি, আয়, আয়।' ঈশানি লিখছে, 'তোমাদের কথা ছোট থেকে শুনে আসছি।' বাবা বারবার বলেন, 'কাকিমার (অর্থাৎ আমার মা) মতো অসাধারণ মহিলা উনি জীবনে দ্বিতীয় দেখেননি।' পরে মেধোদা-বৌদির সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম কলকাতায় একই কথা বললেন, 'কাকিমা ছিলেন অসাধারণ।' ছোটবেলায় 'সমীর মেধো'র মধ্যে মেধোদা পার্থক্য দেখেননি, শুনেছেন স্নেহপূর্ণ ডাক — 'ওই তো মেধো এলো' — মায়ের এই স্নেহ ওঁর বালক মনে গেঁথে গিয়েছিল।[৫]

একবার অশোক মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি এতজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর লেখেন ওঁর গুরুমায়ের ওপর কেন লেখেননি? জবাবে বলেছিলেন, 'যাঁরা আমার খুব কাছের মানুষ, যেখানে গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক, তাঁদের সম্বন্ধে আমি লিখতে পারি না।' আমার কন্যা তার অশোক মামাকে প্রশ্ন করেছিল, তার দিদিমার মধ্যে উনি কী পেয়েছিলেন, দেখেছিলেন — যা ওঁকে এত কাছে টেনে নিয়েছিল। অশোকদার উত্তর, 'দ্যাখো, ভালো মানুষ অনেকে হন, আদর-আপ্যায়ন করেন, দায়িত্ব পূরণ করেন, তোমার দিদিমার বৈশিষ্ট্য ছিল যা করতেন পুরো অন্তর থেকে, মনের গভীর থেকে করতেন। এমন ক্লিষ্টতাহীন অন্তর দেখা যায় না।'

অর্থনীতিবিদ অরুণ মজুমদার শান্তিনিকেতনে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই যে দীর্ঘ ষাট বছরের গবেষণা, অধ্যাপনা, খ্যাতি, শান্তিপূর্ণ জীবন, মাসিমা ছাড়া কি সম্ভব হতো?' বাবা মাথা এদিক-ওদিক দুলিয়ে হেসে হেসে বলেছিলেন, 'never, never, never' — কখনোই নয় — কখনোই নয়। অধ্যাপকদের অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে মা-মাসি-কাকিদের অবদান মনে রাখা প্রয়োজন, অবহেলা করা অন্যায়।

এ লেখা ঢাকার স্মৃতির — যদিও প্রায়ই এদিক-ওদিক পায়চারি করি — হয়তো লম্বা হাঁটাও হয়ে গিয়েছে। মূল কিন্তু ঢাকা; এবার ঢাকার সম্পর্ক-সম্বন্ধ নিয়ে কাহিনি লিখে 'টুকিটাকি' শেষ করি। ১৯৮৭-৮৮, সঠিক মনে নেই। শীতের সকাল। শান্তিনিকেতনে 'নিরালা' বাড়ির বাগানে হাঁটছি। বাবা বারান্দায় চেয়ারে বসা, বাগান নিয়ে কথা হচ্ছে। মা, যথারীতি রান্নাঘরে। মা-বাবার বিয়ে হয়েছে তেপ্পান্ন-চুয়ান্ন বছর। হঠাৎ এক ভদ্রলোক গেট খুলে দ্রুতগতিতে বাড়িতে ঢুকে, সুরকির রাস্তা ভেঙে সোজা গেলেন বাবার কাছে। ভদ্রলোকের চেক শার্ট প্যান্টে গোঁজা, পাতলা, বেশি লম্বা নন — বার্ধক্যের ছাপ একেবারেই নেই চেহারায়। বাবার কাছে গিয়ে কোনো ভণিতা না করে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কি গোপেনের বোনেরে বিয়া করছেন? তাই শুনলাম — গোপেন ঢাকায় আমার বন্ধু আছিল, সে নাই জানি। শুনলাম গোপেনের বোনরে বিয়া করছেন, ভাবলাম দেইখ্যা যাই।' ভালো মানুষ ভদ্রলোক, গল্প হলো — বোন-ভগ্নিপতিকে দেখা হলো। উনি চলে গেলে আমি খুব হেসে বললাম, 'দ্যাখো, অর্ধশতাব্দী পরও জামাই দেখতে কেউ আসেন।' এ বন্ধন ঢাকার নিজস্ব, রতনের মতো যত্ন করে রাখবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকিটাকি তথ্যসূত্র

১. শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, পৃ. ২৪-২৫
২. ঐ, পৃ. ১০৪-৫
৩. রাজকুমার সেন, বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের দ্বাদশ অধিবেশনের (১৯৯২) জন্য লেখা।
৪. সমর গুহ মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। একসময় দিল্লিতে লোকসভার সভ্য ছিলেন।
৫. মেধোদার কাছে জানতে পারলাম ৩নং পুরানা পল্টনের জ্যোৎস্না মাসি ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়ের ছোট বোন। ওঁরা তো সত্যি হারিয়ে গেলেন, আগে জানলে হয়তো খোঁজ নিতে পারতাম। মায়ের এত বন্ধু ছিলেন জ্যোৎস্না মাসি।

কিছু সম্পর্ক দেখা-সাক্ষাতের ওপর নির্ভর করে না। ঢাকায় তা-ই ছিল। মেধোদার সঙ্গে এতকাল পর দেখা হলো, রাস্তায় হলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম চিনতে না পেরে, সত্তর বছরে কত না বদল আসে — সারাটা দিন কীভাবে গল্পে-রোমন্থনে কেটে গেল, এত বছরে কই কোনো ফাঁক তো আসেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টুকিটাকি' অংশে মায়ের কথা বিশদভাবে লিখলাম কারণ মায়ের জীবনে একনাগাড়ে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কেটেছে ঢাকা শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে, গেণ্ডারিয়া, সেগুনবাগান, পুরানা পল্টন, ওয়ারী — বাসস্থান যেখানেই হোক। পিতা-মাতা, স্বামী ছাড়াও মনের গঠন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে, পরে বিভিন্ন অধ্যাপক, তাঁদের পরিবার, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সান্নিধ্যে। ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথ যতই বিস্তৃত হোক না কেন, পুরনো দিনের ঢাকার ভিত নরম হয়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগীত-সাহিত্য-আড্ডা

গুণী ও গুণগ্রাহীর সমাবেশে ঢাকা হয়ে উঠেছিল সংগীত-সাহিত্য-নাটকে অগ্রণী। শহরের নিজস্ব কলাকার গোষ্ঠী ও বাইরে থেকে আমন্ত্রিত কলাকার নিয়ে অনুষ্ঠানের অভাব ছিল না। কলাপ্রেমীরা প্রবীণদের শ্রদ্ধা-মান্য করতেন, নবীনদের উৎসাহ দিতেন। উৎসাহ আরো জমাট বেঁধে উঠল ১৯২১-এ বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হওয়াতে। শিক্ষকদের প্রেরণা ও সাহায্যে ছাত্ররা থিয়েটার, গান, সাহিত্য পত্রিকা দিয়ে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ নয়, পুরো শহরে আলোড়ন তুলে দিলো। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'সংস্কৃতি-চর্চা, খেলাধুলা, সংগীতচিন্তা, নাটক ও সিনেমা — এমন কোনো দিক নেই যা ঢাকা শহরের জীবনচর্চার উৎস নয়।'[১]

রামপুরের ওস্তাদ সালামত হুসেন খান, ধ্রুপদ অঙ্গের গায়ক, লম্বা সময় দিনাজপুরে কাটিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের আনাচে-কানাচে, গলি-ঘুচিতে আছে গান। স্বতঃস্ফূর্ত গান থেকে এসেছে বিবিধ অঙ্গের গানের প্রতি ভালোবাসা, রবীন্দ্রসংগীত, তখনকার অন্য কবি-সুরকারদের গান, পল্লীগীতি বা শাস্ত্রীয় সংগীত।'[২] কে আসেননি এ শহরে? ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তুরাগ' বোটে থাকা সর্বজনবিদিত। কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপ কুমার রায় একাধিকবার এসেছেন; ১৯৩৫-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনুরোধে এসেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত গায়ক জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, পেছনে সাথি গায়ক তারাপদ চক্রবর্ত্তী। অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়েছিল ঢাকাতে, লক্ষ্মীবাজারে — মামাবাড়িতে। এ শহরের সঙ্গে যেন ওঁর আত্মীয়তা ছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের বিস্তার কত দীর্ঘ ছিল — ছোটবেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারিনি, পরে জেনেছি। স্বনামধন্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ভাই আফতাবউদ্দিন খাঁ ঢাকাতে এসেছেন, থেকেছেন। ওঁরা পূর্ববঙ্গের, তাই অবাক হবার নয়। কিন্তু ওস্তাদ কালে খাঁ? পাতিয়ালা ঘরানার বিশাল গায়ক, তিনি ঢাকাতে কিছুদিন বসবাস করেছেন, তালিম দিয়েছেন। ঢাকার গান-বাজনার রেশ দূরদেশ অবধি পৌঁছাত, ভাবতে রোমাঞ্চ হয় যে পাতিয়ালার ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য ঢাকা পৌঁছে গেল।

শ্রোতাদের, বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে সংগীতের নেশা ছিল। সাইকেল বা পদব্রজে চলে যেতেন নবাবপুরে সংগীতের আসরে; ভালো লাগলে থাকা। মন বসল না, বেরিয়ে পড় অন্যান্য আসরের সন্ধানে — তাঁতীবাজার না ফরাশগঞ্জ, নাকি নারিন্দা? ওস্তাদ-পণ্ডিতে ভরা ঢাকা — আসরের অভাব নেই। বাবার কাছে নাম শুনেছি ভগবান সেতারির, কী চমৎকার ছিল তাঁর হাত। আর বলতেন তবলাবাদক গোলাপ খাঁর কথা, পরিষ্কার, স্বচ্ছ তাঁর হাতের বোল। তবলার দক্ষতার জন্য ঢাকা ছিল প্রসিদ্ধ, ভ্রাতৃদ্বয় গোলাপ খাঁ ও মেহতাব আলি, প্রসন্ন বণিক ও তাঁর ছাত্ররা — এঁদের হাতে ছিল ভিন্ন আমেজ; ফারুকাবাদ বা আজরারার মতো ঢাকার তবলা ঘরানা। তবলাকে সঙ্গত বলে অবমাননা করা হয় — কিন্তু যে-কোনো সংগীতের সফল পরিবেশন ও পরিবেশের জন্য প্রয়োজন তবলার লয়দার ঠেকা। গোয়ালিয়র ঘরানার সংগীতকাররা বলেন, 'তাল তো সংখ্যা গুনে মাত্রা হয়, পরিষ্কার বোল, লয়দার 'ঠেকা' তালকে দেয় ছন্দ, প্রাণ।' শিল্পী মাত্রই একথা মানবেন।

ঢাকার ঝুলন উৎসব আমার মনে আছে। বাড়িতে বাড়িতে ছোট দোলনায় রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি রেখে, ফুল দিয়ে ঘর সাজিয়ে, আলপনা দিয়ে, সম্ভব হলে রাধাগোবিন্দের বন্দনা গেয়ে পালন করা হতো। রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি সাজানো বিরাট কাজ, মোলায়েম আঙুল দরকার, সবই তো খুদে। দাদা এ কাজটা ভালো করতেন, যে মোলায়েম আঙুল দিয়ে ল্যাকটোজেনের পাউডার চুপি চুপি বের করে নিতেন,[৩] সে আঙুল সৎ কাজেও আসত। ওয়ারীর বাড়িতে রঙিন কাগজ দিয়ে ঘর সাজিয়ে কী সব যেন করেছিলেন, যাতে মনে হলো বৃন্দাবন আমার ছোট পড়ার ঘরে। নিজেদের বাড়িতে পুজো শেষ হলে আমরা বাড়ি বাড়ি ঘুরতাম ঝুলনের সাজ দেখতে, গান শুনতে।

ঝুলনের রাতে নানা মন্দিরে শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর থাকত। সংগীতে শৌখিনরা এক মন্দির থেকে অন্যত্র যেতেন বিভিন্ন কলাকারের গান শুনতে। কোথাও ভালো ধ্রুপদ হচ্ছে, বসে শুনছেন — আলাপের পর শুরু হলো ধ্রুপদিয়া-পাখোয়াজির লড়াই। লড়াইয়ের ধাক্কায় যখন সুর ও সংগীতে ভাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল, শ্রোতারা বেরিয়ে পড়লেন খেয়াল টপ্পার খোঁজে, অন্য কোনো মন্দিরে। সে রাতে শুধু মন্দিরের গান। জীবন্ত, সমাদৃত কলা — ঢাকার শাস্ত্রীয় সংগীত।

ধ্রুপদ-পাখোয়াজির লড়াইয়ের কথা জেনে মনে পড়ল প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ঠাকুর জয়দেব সিংয়ের একটি উক্তি, 'ধ্রুপদ-এর অবসান হলো প্রাণহীন লয়কারীর যুদ্ধে; খেয়ালের অবসান হবে তানকারীর কেরামতিতে। কোথায় গেল দীর্ঘ, শান্তিপূর্ণ আলাপ, রাগ-বন্দিশের রূপ।'[৪] রূপ বদলেছে, আজ তানকারীর পাল্লা ভারী, কিন্তু খেয়ালের অবসান হয়নি। ধ্রুপদ তো আদি, সে কখনো মুছে যাবে না।

খেয়ালে বন্দিশ শেখার নেশা সব শিল্পীর মধ্যে থাকে না। ঢাকার 'হেকিম' সাহেব বা ওস্তাদ 'হেকিম' মহম্মদ হোসেন আসর জমিয়ে গাইতেন; তার থেকে বড় কথা, ওঁর বন্দিশের ভাণ্ডার ছিল বিশাল, তালিম এসেছিল পাঞ্জাব ও লখ্নৌ থেকে হাবিব মিয়া ও হস্সু মিয়ার মাধ্যমে। আমার কাছে এঁরা নাম, কিন্তু 'হেকিম' সাহেবের শিক্ষা পদ্ধতি দেখে মনে হয় উত্তর ভারতের ঘরানার ওস্তাদদের মাঝে বসে আছি। ঢাকা তো কত দূরে। উনি শেখাতে শুরু করে সুকুমার রায়কে বলেছিলেন, '(গান) হবে, হবে। ভালো করে রেওয়াজ করতে হবে। পাকাপাকি করে টপ্পা আয়ত্ত করুন, তাহলে অন্যান্য গানও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। 'মুশকিলাৎ' আর 'জমজমা' তাল সহজ করে নিতে হবে গলার আড় ভেঙে।'[৫] চারটে টপ্পা শিখিয়েছিলেন গলার আড় ভাঙতে। আমার প্রথম গুরু, রামপুর ঘরানার ওস্তাদ রশীদ খান ঠিক একথা বলে শুরুতে দুটি টপ্পা শিখিয়েছিলেন — ভৈরবী ও খাম্বাজ রাগে। 'ভালো করে টপ্পা দুটির রেওয়াজ করো, যেখানে যেতে চাও গলা পৌঁছে যাবে।'[৬] — সেই আড় ভাঙার ব্যাপার। এ তালিম পেয়েছিলাম দিল্লিতে। 'হেকিম' সাহেব, কালে খাঁ সাহেব এবং রামপুর ঘরানার তসদ্দুক হুসেন খাঁ[৭] সাহেবের কাছ থেকে প্রচুর বন্দিশ সংগ্রহ করেছিলেন। উনি উচ্চ মানের গায়ক ছিলেন নিশ্চয়ই, তা নয়তো বন্দিশের শখ হতো না, ঘরানাদার ওস্তাদরাও ওঁকে শেখাতেন না। প্রায় অর্ধশতাব্দী আমি রামপুর ঘরানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তালিম পেয়েছি ঘরানার ওস্তাদদের কাছ থেকে। যে কথাটা বারবার শুনেছি তা হচ্ছে খেয়ালে বন্দিশের মাহাত্ম্য। বিভিন্ন ঘরানায় খেয়াল পেশ করার নিয়ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী-অন্তরা ঠেকার সঙ্গে মিলিয়ে নিপুণভাবে গাইতে হবে। শুধু তাই নয়, একই রাগে নানা বন্দিশ নিয়ে রেওয়াজ করা প্রয়োজন — বিভিন্ন বন্দিশের ওজন, স্বর-বিন্যাস আলাদা। নানা বন্দিশ শিখলে রাগের প্রাণ গূঢ়ভাবে উপলব্ধি করা যায়, রাগ বিস্তারের নতুন নতুন পথ পাওয়া যায়।[৮]

কথাটা ঠিক, তবে নিজের ঘরানার বন্দিশ তো সীমিত — অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের বন্দিশ পাই কী করে? যে সময় 'হেকিম' সাহেব শিখতেন তখন তো ঘরানা ওস্তাদরা নিজেদের ঘরের বন্দিশ, তাঁদের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য মুঠির মধ্যে শক্ত করে বেঁধে রাখতেন, যেন কুলুপ দিয়ে আঁটা।[৯] সেই মুঠি খুলিয়ে নেওয়া সোজা ব্যাপার নয়; 'হেকিম' সাহেবের গানে নিশ্চয়ই ঐতিহ্যের ছাপ ছিল (মনে হয় পাতিয়ালার), তাই তিনি বন্দিশ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

ঢাকা ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন কেউ কেউ কোনো বিশেষ গায়ক/বাদকের কাছে তালিম নেবার জন্য। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর রামপুর যাওয়ার কাহিনি আমাদের জানা। আর একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০-এ বা তার কিছু আগে ঢাকার এস জি মহিউদ্দিন চলে গেলেন সুদূর গোয়ালিয়র; স্বপ্ন, বিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ সাহেবের কাছে সেতার শেখা। রেলওয়ের চলাচল অত সুবিধের ছিল না, অনিশ্চিতের সন্ধানে এত পথ যাওয়া, সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন। ওঁর হাত নিশ্চয়ই সুরেলা ছিল, খাঁ সাহেব শিষ্য বানাতে রাজি হলেন। ক'বছর পর যখন মনে হলো হাত তৈরি হয়েছে, ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন বোম্বাই, সেখানে সিনেমা জগতে সুরকার ও অর্কেস্ট্রাতে বাজাবার জন্য দক্ষ, জ্ঞানী, গুণী শিল্পী প্রয়োজন। সিনেমার জগতে বহু বছর কাটালেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র তৈরি করলেন। অবশেষে যখন বোম্বাই ছাড়লেন, বোধকরি ঢাকার জন্য, ছাত্র রামলাল অর্কেস্ট্রাতে বাজাতে শুরু করলেন। লম্বা সফর, সফল সফর, ভাবলে মনে সম্ভ্রম জাগে।

নিজের অভিজ্ঞতা নয়, ঢাকার সংগীত জগতের বর্ণনা শুনেছি বড়দের কাছে, বিশেষ করে বড়মামা গোপেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্তর কাছে। কিছুটা বইপত্তর ঘেঁটে শেখা। তবুও শাস্ত্রীয় সংগীতের পর্ব লম্বা হয়ে গেল। আসল কথা, এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে আমার মন টপ্পার রেওয়াজ করা আড়ভাঙা গলার মতো হয়ে যায় — খেই হারিয়ে এদিক-ওদিক, নানা দিকে ছোটে। রাশ টানতে সময় লাগে।

* * *

বাবারা তিন তরুণ অধ্যাপক, বীরেন গাঙ্গুলী, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত (দুজনেই অর্থনীতিবিদ), অক্ষয় ঘোষাল (বিষয় জানি না) ১৯২৬-এ শুরু করে বকশীবাজারে একটি বাসা নিয়ে বহুকাল একসঙ্গে কাটিয়েছেন। 'গুপী' নামক অল্পবয়সী ছেলে এঁদের দেখাশোনা করত। গুপীর কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন — সে না থাকলে ওই বাড়ির আবহাওয়া অন্যরকম হতো, সান্ধ্য আড্ডা অত সহজে বসানো যেত না। আড্ডা ছাড়া বিকেল-সন্ধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র-ছাত্রী-মাস্টার-মেয়ে-বৌ কারোই কাটে না। মেয়ে-বৌরা পাড়ায় এ বাড়ি-ও বাড়ি যেতেন। ছাত্রদের জন্য ছিল পুরানা পল্টনের মাঠ, ভিক্টোরিয়া পার্ক, বাকল্যান্ড বাঁধ বা কারো বসার ঘর। ঘরোয়া আড্ডার জন্য কয়েকটি বাড়ি নামকরা ছিল, বাবাদের বকশীবাজারের বাসা তার মধ্যে একটি; আড্ডা, সংগীত, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, হাসি-মশকরা সমানতালে চলত। সঙ্গে সঙ্গে চা ও গুপীর হাতের তৈরি, পরিমলকাকার ভাষায় 'টা'[১০], অর্থাৎ জলখাবার। আমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই, ছাত্র, মাস্টারমশাই, বন্ধু-বান্ধব, তাঁদের অতিথি, সবার জন্য অবারিত দ্বার।

বাবা গান ভালোবাসতেন, গাইতেন না, তবে সেতার ও তবলা বাজাতেন। কবে, কার কাছে শিখেছিলেন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। শুনেছি ঘরোয়া বৈঠকে অধ্যাপক সত্যেন বোসের এসরাজের সঙ্গে বাবা তবলার সঙ্গত করেছেন। অক্ষয় জেঠার সংগীত-সাহিত্যে রস ছিল কিনা জানি না, তবে আড্ডাপ্রিয় ছিলেন সেটা আমিও দেখেছি। বীরেন জেঠা ভালো গাইতেন, সেই টানে এসে পড়তেন সংগীতপ্রিয় ছাত্র-বন্ধু অনেকেই। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুহম্মদ শরীফ অর্থনীতির ছাত্র। সুরেলা জলসা, বীরেন জেঠা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন, শরীফ সাহেব তার সঙ্গে গলা মেলাতেন, কখনো শিখতেন, কখনো একাই গাইতেন। বিবিধ প্রকারের গান নিয়ে আলোচনা চলত সঙ্গে সঙ্গে। গানের জলসা নয়, এ তো আড্ডা; আলোচনা, গল্প, সমালোচনা অপরিহার্য। সত্তর বছর পর ২০০২-তে আমি শরীফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ওঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে। বারবার বকশীবাজারের বাড়ির গানের কথা, বাবা, বীরেন জেঠার কথা, সংগীতের আসর-আড্ডা-আপ্যায়নের কথা বলেছেন। নানা খুঁটিনাটি ওঁর মনে ছিল। ওঁর বৃদ্ধ বয়সের গানের রেকর্ডিং শুনেছি, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, কিন্তু হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভক্তিমূলক গান গাইছেন। মরমি, সুরেলা গান।

বীরেন জেঠার গান শুনেছি ১৯৪৮/৪৯ সনে। বেনারসে এসেছেন আমাদের কাছে। আমি শান্তিনিকেতনে পড়ি, সুতরাং নিজেকে গায়িকা মনে করি। কয়েকটি গান শোনালাম। এরপর বাবা বললেন, 'বীরেন, একটা গান শোনাও। দূরে দূরে থাকি, কতকাল তোমার গান শুনি না।' বন্ধু আপত্তি করলেন, 'গান ছেড়েছি সেই কবে, বোধহয় ঢাকা ছাড়বার পর।' আর একটু জোর করাতে মাকে বললেন, 'আচ্ছা, একটু লবঙ্গ দিন — চেষ্টা করি।' দু-তিনটি রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন, পুরনো ধাঁচে। অনভ্যেসে গলা অত দরাজ নেই, কিন্তু সুরের জাদু যায়নি। শুধু তাই নয়, বাণী পেশ করার ভঙ্গি ছিল অন্যরকম। স্পষ্ট উচ্চারণে, সঠিক জায়গায় পঙ্ক্তি ভেঙে, গানের অন্তরের ভাব অনুভব করে গাওয়া। এতেও জাদু আছে। ছোট ছোট ঘটনা, অন্য যুগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরিয়ে আনে; সেদিন আমি, মা, দৃশ্যের বাইরে, দুটি তরুণ অধ্যাপক বকশীবাজারের বাড়ির সান্ধ্য আড্ডায় বসে আছেন।

বকশীবাজারের বাড়িতে সাহিত্য-সংগীতের আড্ডা সঙ্গে সঙ্গে চলত, তবে সাহিত্যের দখল ছিল বেশি। চিন্তাশীল, প্রগতিশীল, রক্ষণশীল সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের উপস্থিতিতে উত্তেজিত আলোচনা ও বীরেন জেঠার মতো শান্ত মানুষের ধীরস্থির অনুশীলনে আড্ডা জমজমাট হয়ে উঠত। তিন বন্ধু, কবি/সাহিত্যিক অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পরিমল রায় ছাত্র হলেও আসতেন এ বাড়ির সান্ধ্য আসরে যোগ দিতে। সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, নিজেদের লেখা পড়ে শোনানো, কবিতায় নতুন পথ খুঁজে আনা, তাকে নতুন ধাঁচে ঢালা, বিপরীত, বিদ্রোহী চিন্তাধারা, মতের মিল-অমিল নিয়ে যুক্তি-তর্ক-মৈত্রী। এ বাড়ির সন্ধ্যা প্রাণবন্ত।

এক সন্ধ্যের কথা বাবা রসিয়ে বলতেন। শিক্ষক-বন্ধুদের সঙ্গে কবি বন্ধুরাও এসেছেন। চায়ের পর্ব শেষে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এক অপরিচিত ভদ্রলোক এলেন কারো সঙ্গে। তিনি কবিতার অনুরাগী। হঠাৎ তিনি বাংলা ভাষায় কবিতার দৈন্য নিয়ে নানা কথা বলতে লাগলেন। তাঁর মতে জাপানি কবিতা অনেক উঁচু স্তরের। একথা বোঝাতে গিয়ে প্রায় টেবিল চাপড়ে বারবার বললেন, "দেখুন, জাপানে 'হাইক্যু' আছে — কি অপূর্ব শব্দ সংগঠন, ছন্দ, ভাষা, স্বল্পপরিসরে গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করা। বাংলায় আছে? কিছুই নেই — বাংলা কবিতাকে তো কবিতাই বলা যায় না।" সবাই বিরক্ত, ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলা যায় না, বাবার ভাষায় বলি, "হঠাৎ শান্ত, মিতভাষী, ধীরস্থির অজিত, লাফ দিয়ে উঠে ওপরে চলে গেল। ওর 'গ্রিক গড'-এর মতো চেহারায় বিরক্তি। কিছু সময় কেটে গেল, আমরা 'হাইক্যু' সম্বন্ধে শুনে চলেছি। হঠাৎ করেই আবার অজিত নিচে নেমে এলো, বলল, এই নিন, বাংলা ভাষায় 'হাইক্যু'।" মুখে মৃদু হাসি। আমরা নিস্তার পেলাম। বহু বছর পরেও সেদিনের কথা স্মরণ করে বাবার অট্টহাসি কানে বাজে। 'কুসুমের মাস'-এ (পৃ. ৫১-৫২) এগারোটি 'হাইক্যু' আছে। এর উৎস বকশীবাজারের আড্ডায় এক অপরিচিতের বিরক্তিকর মন্তব্য কিনা বা সেদিনের লেখা 'হাইক্যু'টি এর অন্তর্গত কিনা বলতে পারেন এমন কেউ নেই আজ।

আর একদিনের কথা। আড্ডা নিয়মিত চলে, তরুণ কবিরাও নিয়মিত আসেন। যদিও তাঁরা ছাত্র, এতদিনে বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের কাছে বাবা 'অমি'দা হয়ে গিয়েছেন। এ বাড়িতে সন্ধ্যে কাটাতে এঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসেন। একদিন আড্ডার মাঝে বকশীবাজারের বাসা ও বাবাকে নিয়ে অজিত দত্ত একটি ছড়া লিখে দিলেন —

ব্যাচেলার অমিদা
যদি কোন জমিদারের মেয়ে বিয়ে ক'রে ফেলেনই,
তবে এই বাসাতে
আসিব কী আশাতে
সে কথা তো কারো মনে খেলেনি। (১৯২৯)[১১]

চিন্তার কারণ ছিল না। 'বিয়ে করে' বাসা বদলাতে আরো পাঁচ বছর লেগেছে, তার অনেক আগে দুই কবি কলকাতা চলে গিয়েছেন। আসর? সে কখনো বন্ধ হয়নি।

ভবিষ্যৎ জীবনে বাবার কাছে পরিমল রায় ছাত্র, সহকর্মী, বন্ধু, ভ্রাতার অধিক ছিলেন। দুই কবির জন্য ছিল অপরিসীম স্নেহ বা তার থেকে কিছু গভীর। এঁদের লেখা পড়তেন, আমাকে বকুনি দিতেন 'মহাভারতের কথা'[১২] বা 'কুসুমের মাস'[১৩] পড়িনি বলে। বহু বছর বাদে পড়ে বুঝেছি বাবার বকুনি কতটা ন্যায্য ছিল। অনেক সময় বলেছি, "তোমার তো কত স্নেহের পাত্র আছেন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংগীত, নানা জগৎ থেকে। কিন্তু 'বুদ্ধদেব' আর 'অজিত', এই দুটি নাম যেন অন্য স্নেহ দিয়ে বলো।" উত্তরে বলতেন, 'তোরা তো জানিস না কী উজ্জ্বল প্রতিভা ছিল ওদের, কী সাহস নিয়ে ওরা সাহিত্যে নতুন যুগ এনেছিল? ভুলিস না, কুড়ির দশক — রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেয়ে আছেন, ঘিরে আছেন। তাও ওরা কবিতার মোড় ফিরিয়েছে। ওদের তীক্ষ্ণ মেধা, চিন্তার গভীরতা, সাহিত্যের প্রতি একাগ্রতা, ভাষা — তোরা কী বুঝবি?' পড়া না হলে কী হবে, 'কুসুমের মাস' নাম শুনে পুলক জাগত — দেখতে পেতাম ঋতু বসন্ত, দোল পূর্ণিমা, ফুল, রং, হোলি, ঠুমরি, দাদরা। মনে পড়ে খাম্বাজ রাগে অপ্রচলিত হোলি :

প্যারি দেখো, কুসুমঋতু আয়ি গয়ি,
হোরি খেলন জিয়া তরসায়ে রহি।

বন্দিশি ঠুমরিতে বর্ণনা :

সকল বন ফুল রহি সরসোঁ,
অম্বা বোরে টেসুঁ ফুলে
কোই করত সিঙ্গার
মালনিয়া গরওয়া লে আই করসোঁ॥

পলাশরাঙা দিন, ভালো লাগার সময়, ভালোবাসার সময়। তাই হয়তো অজিত দত্তকে বলা হতো 'ভালোবাসার কবি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই কবে দুই কবি ঢাকা ছেড়েছেন, দেখাশোনা, গল্প-গুজব কতটাই বা হয়েছে, বাবার স্নেহ বা ওঁদের শ্রদ্ধা কোনোদিন কম হয়নি। ওয়াশিংটনে একবার (১৯৫১-৫২ হবে) বুদ্ধদেব বসু আমাদের কাছে এলেন। কিছু আলাপ-আপ্যায়নের পর একই ব্যাপার — আমরা দৃশ্যের বাইরে, বাবা তরুণ শিক্ষক, বুদ্ধদেব নতুন যুগের কবি। স্থান : বকশীবাজার, ঢাকা। এ কিন্তু 'ফেলে আসা দিন' কেন চলে গেল বলে দুঃখ নয়, অতীতের স্মৃতিকে উপভোগ করে, তার পরের জীবনের আশা-নিরাশার কথা।

সাহিত্যের ওপর কিছু বলার যোগ্যতা বা অধিকার আমার নেই; শুধু এটুকু জানি যে, ১৯২৭-এ বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্পাদনায় *প্রগতি* পত্রিকা কবিতায় নতুন পথ দেখিয়ে সাহিত্য জগতে আলোড়ন তুলেছিল, চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে এই দুই কবি, মুষ্টিমেয় কয়েকটি নামের সঙ্গে হয়ে গিয়েছিলেন কবিতায় 'নবীন পন্থার অগ্রপথিক।'[১৪] প্রারম্ভিক পথচলা ঢাকাতে, সে কথা ওঁরা ভুলে যাননি। কলেজ জীবন শেষ হতেই দুই বন্ধু চলে গেলেন কলকাতা; ঢাকায় খানিকটা শূন্যতা রেখে গেলেন নিশ্চয়ই, তবে যে চাঞ্চল্য ওঁদের যুগ এনেছিল, তা মুছে গেল না। সমাজচর্চা, সাহিত্যচর্চাতে ঢাকা তার নিজস্ব সত্তা হারাল না, রয়ে গেল *সোনার বাংলা*, *শান্তি*, পরে *প্রতিরোধ* পত্রিকার পাতায় ও ছাত্রদের আড্ডায়।

১৯৩৯-এ সোমেন চন্দ ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত শুরু করলেন 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'। শুধু সাহিত্য নয়, এঁরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করতেন। "একসময় ঢাকা শহরের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর তরুণ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমল রায়, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ্য। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং কাজী মোতাহের হোসেনের উৎসাহ থেকেও 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' বঞ্চিত হয়নি। একসময় পুরানা পল্টনের এক বাড়িতে প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি সাহিত্যের আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।"[১৫] ছাত্রদের নানা পরিকল্পনায়, অনুষ্ঠানে, অধ্যাপকদের পরামর্শ, সহযোগিতা, যোগদান — এক হিসেবে 'মিলিত উদ্যোগ' ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ধারা, বিশেষত্ব। অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

জিন্দাবাহার লেনে চৌধুরীবাড়িতে ছিল আরেক আড্ডা। এই লেনে, কাছেই থাকতেন অমলেন্দু বসু, ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, পরে অধ্যাপক, শিল্পী পরিতোষ সেন ও আরো অনেকে, যাঁদের অমর করে গিয়েছেন শিল্পী তাঁর বিখ্যাত *জিন্দাবাহার লেন* বইতে। চৌধুরীবাড়ির ভাই-বোনেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতানুগতিক চিন্তাধারা বা শিক্ষায় বড় হননি, নানা বিষয়ে তাঁরা জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। বাবা ছাত্রজীবন থেকেই এ বাড়িতে যেতেন কারণ চৌধুরী পরিবারের বড় ছেলে শচীন্দ্র নারায়ণ বাবার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সহপাঠী ১৯২৭-এ ঢাকা ছাড়লেও, বাবার যাতায়াত বন্ধ হয়নি — একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

জামাতা মনীশ ঘটক প্রায়ই এ বাড়িতে আসতেন, সঙ্গে আসতেন সমসাময়িক অন্য সাহিত্যিকেরা। আলোচনা কোনো একটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকত না — অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, সংগীত, স্বাধীনতা আন্দোলন — নানা কিছু ছিল এ আড্ডার চিন্তার অঙ্গ। সংগীতে অনুরাগ ভাই-বোনদের ছিল; শুনেছি এক বোন কিছুদিন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর কাছে গান শিখেছিলেন। ছোট ভাই, প্রখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরীর সংগীতের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। ওঁর কাছে আমি জারিগান, কবিগান, পুরনো অঙ্গের বাউল থেকে শুরু করে শাস্ত্রীয় সংগীতে দেশ ও দেশ-মল্লারের সূক্ষ্ম ভেদ শুনেছি। গান করে শুনিয়েছেন কোমল গান্ধারের ছোঁয়া কী করে দেশ রাগে দেশ মল্লারের আমেজ আনে।

সেজভাই হিতেন চৌধুরীর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, হয়তো তাই কলেজ পাশ করে জীবনের শুরুর ধাপ পার করবার আগ্রহ আদৌ ছিল না। মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে চলে গেলেন বোম্বাই, সেখানে হয়ে গেলেন চলচ্চিত্র জগতের নামকরা প্রযোজক, ইম্প্রেসারিও। পৃথ্বিরাজ কাপুর, তাঁর পরিবার, দিলীপ কুমার, ওয়াহিদা রহমান — তিনি সবার বন্ধু, হিতৈষী, পরামর্শদাতা। সিনেমার ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির জগতে উনি দশকের পর দশক কী গভীর সম্ভ্রম, ভালোবাসা পেয়েছেন, তা আমি নিজে দেখেছি। চিত্রতারকার জগৎ ছাড়া যোগাযোগ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা ছিল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে, আবার শিল্পপতিদের সঙ্গে, পরামর্শদাতা হিসেবে। সংগীত জগতে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল শঙ্কর পরিবারের সঙ্গে। সত্তরের দশকে যখন আমরা পণ্ডিত রবিশঙ্করের নাম 'পণ্ডিত' শব্দটি যোগ না করে ভাবতেও পারি না, উনি অনায়াসে পণ্ডিতজীকে 'রবু' বলে ডাকতেন। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমাদের চিরাচরিত চিন্তাধারায় এঁর সম্বন্ধে সবকিছু মেলানো সহজ নয়, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে উনি ছিলেন অমায়িক, পরোপকারী, মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল, অতিথিপরায়ণ, মুক্তহস্ত ও রন্ধনশিল্পে সিদ্ধহস্ত, আমাদের অতি স্নেহপ্রবণ হিতুকাকা। বান্দ্রায় ওঁর সমুদ্রের হাওয়া চলাচল করা খোলামেলা বিশাল বাড়ি, ওঁর মতো দিলদরিয়া মানুষের জন্যই যেন তৈরি হয়েছিল।

১৯৩৯-এর ১৫ ডিসেম্বর বোম্বে প্রেসিডেন্সি উইমেন্স কাউন্সিলের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনি একটি নৃত্য-উৎসব পরিচালনা করেছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, সে সময়কার পক্ষে প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। মুম্বাইতে তখনো নাচ-গানের টিকিট করা বড় অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়নি। হিতেন চৌধুরী সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে নতুন পথ তৈরি করলেন। নৃত্য-উৎসবের অর্কেস্ট্রার শিল্পীর তালিকা লম্বা — প্রধান বাদক ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-সরোদবাদক। হিতেন কাকার সংগীতের জ্ঞান প্রখর না হলে এবং পরিচালকের ওপর খাঁ সাহেবের গভীর ভরসা ও নিকট সম্পর্ক না থাকলে, উনি অর্কেস্ট্রাতে বাজাতেন না। নৃত্য-উৎসব একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিল।[১৬] শঙ্খকাকা ও হিতেনকাকা দুজনেই বলতেন যে, তাঁদের সংগীত সাহিত্যের জ্ঞানের ভিত ছিল ঢাকার আবহাওয়া ও জিন্দাবাহার লেনের পরিবেশ।

আমার পরিচিতদের ঘরোয়া আসর ঢাকা শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে ১৯৪০-এর শেষের দিকে। তবে ঢাকায় সংগীত বা সাহিত্যের আড্ডা থেমে থাকেনি। মন্মথ নাথ নন্দী, 'ঢাকার নন্দী ডাক্তার' সম্বন্ধে লিখেছেন মন্দিরা ভট্টাচার্য্য[১৭] — সময় ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫

> নন্দীগৃহ ঢাকা শহরের সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। শামসুদ্দিন[১৮] ও ফয়েজের[১৯] যাতায়াত তো ছিলই। আসতেন, সানাউল হক, আহসান হাবিব, মুনীর চৌধুরী, মহম্মদ হাই, মফজ্জল হায়দার চৌধুরী, অজিত গুহ, কলিম শরাফী, জয়নাল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং আরো বহু সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমীর দল। শওকত ওসমান ছড়া লিখেছিলেন মন্মথের নামে —
>
> 'মন্মথ নাথ
> যার শরে যুবক বৃদ্ধ সকলেই কাত।'

* * *

শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর আমার কানে পৌঁছয়নি, সাহিত্য কী তা বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, কিন্তু ছ'বছর বয়সে থিয়েটার দেখেছি। পাড়ার ছেলেমেয়েদের স্টেজ বেঁধে শখের থিয়েটার নয়, হলে বসে পেশাদার থিয়েটার। বাবার বন্ধু রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী কলকাতার স্টেজে অভিনয় করতেন, তিনি ছিলেন এই নাটকে। তাই নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে যাওয়া। দুটি জিনিস মনে পড়ে — এক মহিলা (হয়তোবা মহিলা সাজে কোনো পুরুষ মানুষ), তাঁর মুখে প্রচুর প্রলেপ, নিঃশব্দ, নিথর হয়ে বসা। আর অবাক করেছিল চক্কর মারা পুরো ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরা স্টেজ — মহিলা একটি উঁচু চেয়ারে বসা, স্টেজটা ঘুরতে ঘুরতে এলো — তাঁকে দেখতে পেলাম। সত্যি কি এটা ঘটেছিল, না আমার স্মৃতির ভ্রম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য কলার মতো নাটকেও শৌখিন ছিলেন ঢাকার মানুষ। শিশির ভাদুড়ী এসেছিলেন রীতিমত নাটক নিয়ে ১৯৩৬-এ।[২০] *শান্তি* পত্রিকার তরফ থেকে রূপলাল হাউসে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। নাটক দেখতে যেতেন মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে-বৌরা। এতে বাধা ছিল না। আমার দিদিমার কথা শুনেছি, সাহিত্য পড়ার তৃপ্তি *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ* থেকে আসত, কিন্তু যৌথ সংসারের গৃহিণী তিনি, বহুজন ভরা সংসারে কাজের অন্ত নেই, ভালো নাটকের কথা শুনলেই সময় বের করে চলে যেতেন। কলকাতা গেলে, ননদ বা নাতিদের কাছে অনুরোধ ছিল নাটকের টিকিট যেন কিনে রাখেন। একাধিক নাটক না দেখে ফিরতেন না। আমি তাঁকে থান পরা, একাদশীর উপোস করা অবহেলিত অবস্থায় দেখেছি। তিনি পাড়ওয়ালা শাড়ি পরে মাথায় আধ ঘোমটা দিয়ে ননদ ভগিনীর সঙ্গে কলকাতার হলে থিয়েটার দেখছেন, এ ছবি কল্পনা করা মুস্কিল, কিন্তু অবহেলিত পরিস্থিতিতেও একবার তীর্থযাত্রার পথে কলকাতায় নাতিদের সঙ্গে গিয়ে নাটক দেখেছেন। তাই বলি, ঢাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে নাটক দেখার শখ ছিল প্রচণ্ড। কবিগান, যাত্রা, পালাকীর্তন, সত্যপীরের কাহিনি শুনে, দেখে, বড় হয়ে ওঠা বাঙালি, নাটক দেখার শখ থাকবে না কেন?

নাচের চল ছিল না মেয়েদের মধ্যে; সমাজের বাধা ছিল। একটু বড় হলেই মেয়েদের নাচ অশোভন। ছেলেদের তো নাচের প্রশ্নই উঠত না — এমন মেয়েলি কাজ তারা করবে? ছোটরাই হাত-পা ঘোরাতাম। আশু জেঠার স্ত্রী অমিতা মাসি ওয়ারীতে তাঁর বাড়িতে নাচের স্কুল করবার চেষ্টা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর নাচের সুনাম ছিল — তবে রবীন্দ্রনাথের গণ্ডি পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মেয়েদের নাচ শেখানো সহজসাধ্য ছিল না — পারেনওনি। ছোট মেয়েরা আসত কয়েকজন, তাদের সত্যিকারের শখ ছিল না। গল্প আছে, 'এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে', একটি লাইন যখন পাঁচবার গাওয়া হলো, পরিবারের সদস্যরা প্রতিবাদ করলেন। তবু তিনি অন্তত দুটি নৃত্যনাট্য করিয়েছিলেন, একটি কামরুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয়ে, অন্যটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো হলে। সে যুগে এটা বিরাট সফলতা।

মেয়েদের মধ্যে নাচের চল ছিল না, লিখেছি। তবে, নৃত্যকলাপ্রেমী প্রচুর ছিলেন। ১৯৩২ সনে যখন উদয়শঙ্কর তাঁর নাচের সঙ্গীদের নিয়ে এলেন, নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে ১০ হাজারের ওপর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন ওঁকে দেখতে। আরমানিটোলা পিকচার হাউসে তিনটি 'শো' হলো, সেখানে তিলধারণের স্থান ছিল না। সময়ের হিসেবে হলের ভাড়া ছিল বেশি, ১০০ টাকা এক এক 'শো'র। অর্থের কমতি ছিল না; যেখানে নবাব হাবিবুল্লা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেব ও কলারসিক যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় পৃষ্ঠপোষক, সেখানে অর্থ, কলা ও দর্শকের মাঝে আসে না। পৌর সংবর্ধনা হয়েছিল।

এসব হয়তো জানা কথা, আমি দেখি অন্যদিক থেকে — এর অভ্যর্থনা সমিতির তালিকা পড়ে মনে হয় যেন পারিবারিক ব্যাপার; মনীশ ঘটক, আমার মামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সুবোধ সেনগুপ্ত, টি-সেন্টারের মামা ও বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মৃণাল দাশগুপ্তা, আমার মাসি (মায়ের মাসতুতো দিদি) ও পরে সুবোধ মামার স্ত্রী, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, বাবাদের আড্ডার সঙ্গী — শুধু মীনা দে চৌধুরী একটি অপরিচিত নাম। যেহেতু 'যেন আমাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠান', ছোটবেলা থেকে অভ্যর্থনা সমিতির দায়িত্ব, কাজ নিয়ে আলোচনা শুনেছি। এত বড় অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলা, প্রচুর ধৈর্য ও কর্মক্ষমতার প্রয়োজন, বহু মানুষকে তুষ্ট রেখে এ কাজ করতে হয়। এ গল্প হয়েছে বহুবার, সঙ্গে হাসি-মস্করা। অপূর্ব নাচের কথা হতো, তবে তাতে কান দিইনি, কেনইবা দেব — নাচে তো শখ নেই। দাদা সমীর আমার থেকে পাঁচ বছরের বড়, ঢাকার গল্প, আড্ডা ওর বেশি মনে আছে। পরে মনীশ ঘটকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

আমাদের শিক্ষার মধ্যে 'মুখস্থ' করার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, গদ্য-পদ্য দুই-ই; শুধু গান নয়, কবিতা আবৃত্তির ওপর জোর দেওয়া হতো। 'ঘুমাও ঘুমাও সুখে ওরে বাছাধন, তোমা হেন শান্ত ছেলে দেখিনি কখন' ছড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ভোলানাথ' পেরিয়ে বড়রা চলে যেতেন 'যেতে নাহি দিব' বা 'কর্ণ-কুন্তি সংবাদ'-এ। অনুষ্ঠানে গান ও আবৃত্তি প্রায় সমপর্যায়ে হতো। আজো দুই বাংলাতে আবৃত্তির এই স্থান আছে। কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি, সামনের সিটে দুটি অল্পবয়সী ছেলে, পুরো পথ কবিতার কথা ও আবৃত্তি করে চলল। বর্ধমানের পর যখন ধানক্ষেত শুরু হয়, আমার আবছা আবছা মনে পড়ল, 'ধান কাটা হলো সারা'; অপরিচিত, তাও জিজ্ঞাসা করলাম ওদের একজনকে। চোখের নিমেষে 'সোনার তরী' শুনিয়ে দিলো। কলকাতায় কলেজ জীবনে এক বন্ধু ছিলেন,[২১] পরে নানা সরকারি কমিশন, কর্পোরেশনে অতি উচ্চপদে কাজ করেছেন, যাকে আমি বলতাম 'কাটখোট্টা চাকরি'; তাঁর আশি বছর বয়সেও দেখা হলে আড্ডা আলোচনার মাঝে সাবলীলভাবে রবীন্দ্রনাথ তো অবশ্যই, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ — এঁদের কবিতা আবৃত্তি করে যেতেন। বাঙালি মনে গান-কবিতা পা মিলিয়ে চলে, থাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

পরিচিত প্রায় বাড়িতেই গানের চর্চা ছিল; কেউ মা-মাসির কাছে, কেউবা টিচার রেখে গান শিখতেন। আমরা ছোট মেয়েরা গানের সঙ্গে অভিনয় করে নাচবার চেষ্টা করতাম। যেমন, 'সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা আকাশে ফুটিয়া।' সহজ ব্যাপার — ডান হাত সামনে ঘুরিয়ে দিলে 'সমুখেতে' হয়ে যেত, দুই আঙুল ওপরে উঠিয়ে হাত ঘোরালেই তারা, আকাশ হয়ে যেত। যতদূর মনে পড়ে, পা অচল রাখা হতো। চলাচল করলেও সেটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এক, দুই, তিন, চারের কুচকাওয়াজের বেশি ছিল না। বালখিল্য — আমরা আনন্দ পেতাম। মুস্কিল হতো কোনো অতিথি এলে গৃহকর্ত্রী যদি মেয়েকে বলতেন, 'একটু নাচ দেখাও তো মা', তবে অতিথি ফাঁদে পড়ে যেতেন। অনেকেই মুখে মুখে গান শিখতাম, যাদের বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল, 'রিড' টিপে গাইতেন, 'চামেলি-আঁখি মেলি চায়, গগন পানে, মেঘের ছায়ায়...'। গলা, সুর ও ছোট ছোট আঙুল দিয়ে হারমোনিয়ামের 'রিড' মেলানো সহজ নয়। বেশিরভাগ সময় তিনটি তিন দিকে ছুটত, শ্রুতিমধুর একেবারেই হতো না। আবার অভ্যেসে মাঝে মাঝে ঠিকও হয়ে যেত।

এ তো ছোটদের খেলা খেলা গান শেখা বা গানকে ভালোবাসতে শেখা। পুরানা পল্টনে বড়দের মধ্যে গায়িকা হিসেবে দু'জনকে মনে পড়ে। কলকাতা থেকে গান শিখে আসা রানী কাকিমা (পরিমলকাকার স্ত্রী) গাইতেন হিমাংশু দত্ত, ডিএল রায়, অতুলপ্রসাদের গান। গাইতেন, 'মাধবী রাতে মম মনবিতানে, মল্লিকা মঞ্জরি গুঞ্জরি হায়...।' সুর খুবই সুন্দর, তবে এখন মনে হয় অনুপ্রাস একটু বেশি। খুব তৈরি গলা ছিল রানী কাকিমার।

একসময় উনি কীর্তন গাইতে শুরু করলেন। কাশীর পালাকীর্তন গায়কদের মতো দরদভরা দরাজ গলায় গাইতেন :

অলপ বরস মোর শ্যামরসে জরজর
ও... অলপ বরস মোর।
না জানি কী হবে পরিণামে গো,
কী বা হবে, পরিণামে মোর কী বা হবে
অল্পে যদি এমন হোলো
পরিণামে মোর কী বা হবে।

দুটি ভণিতা কানে বাজে। প্রথমটি বোধহয় 'অলপ বরস...' কীর্তনের

আমায় কেহ বলে সতী, কেহ বা অসতী
কী বা মোর আসে যায়।
কৃষ্ণ নাম লব মুখে, জনম যাইবে সুখে,
যদু কহে এই বাঞ্ছা করি।

যদু কীর্তনকারের হয়তো অত নাম ছিল না, কিন্তু গানটি শ্যামরসে ভরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় ভণিতা :

বাসুলি উদাসে কহে চণ্ডীদাসে
দুখ দূরে গেলো সুখ বিলাসে
সকল দুখ দূরে গেলো
রাধাগোবিন্দের মিলনেতে।

পাড়ায় অন্য গায়িকা ছিলেন মীরা আইচ (বুলবুলদি)। ওঁর সুরেলা দরাজ গলায় গাওয়া, 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়...' গানের রেশ নিঃশব্দ, নিঝুম রাতে ভেসে আসত দূর থেকে। সেই সুর শুনে মুগ্ধ হয়ে এক বিকেলে বাবা-মা পৌঁছে গেলেন ওঁদের বাড়িতে, গান শুনতে। 'কে এত চমৎকার গান করে?' ধীরে ধীরে দুই পরিবারে গাঢ় বন্ধুত্ব হলো, বুলবুলদি চিরকাল আমাদের বাড়ির মেয়ে হয়ে রইলেন। ওঁর কাছে একটি 'মাটির গান' বা সাধারণ মানুষের গান শিখেছিলাম :

ঘরকাম সুন্দরিয়া লো
    চরকার বাজনা শুইনা[২২] যা লো।
কোন কুয়ারি বলে আমার চরকার বাজনা তুরা
    চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বান্ধা
হাতি লো, ঘোড়া লো
    রকমারি কুমকুম, বা কুম কুম কুম, চুকা দই,
পোড়া দই, হুক্কা আন, তামাক টানি
    ঘরকাম সুন্দরিয়া লো...

এ গান কোথাকার কিছুই জানি না, এত বছর পর কথায় গণ্ডগোল হতে পারে, তা-ও লিখলাম।

মাটির গানের কথায় — একবার শিখেছিলাম ছাদ পেটানোর গান। ছাদ পিটতে পিটতে, পেটানোর লয়ে মেয়েরা গাইতেন :

সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো
সারাদিন পিটি কার দালানের ছা... দ।
(প্রথম) তোর ঘরে আজ কী রান্না হয়েছে?
(দ্বিতীয়) ছেলে দুটো ভাত খায়নি পথ চেয়ে রয়েছে।
(প্রথম) আমিও ভাত রাঁধিনি, দেখ না চুল বাঁধিনি,
শাশুড়ি মান্ধাতার বুড়ি মন্দ কথা কয়েছে।
(দ্বিতীয়) আমার ননদ বড় দজ্জাল বজ্জাত গো,
সারাদিন পিটি কার...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত মার্জিত ভাষা। খুব একটা 'মাটি'র গান মনে হয় না, তবে মেয়ে-বৌদের জীবনের সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিন মনঃকষ্টের আভাস পাওয়া যায়।

বহুকাল আগে কোনো ইংরেজ পরিব্রাজকের লেখা পড়েছিলাম — সময়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ, হয়তোবা বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগের ঘটনা। পাঞ্জাবের কোনো শহর থেকে তিনি কলকাতা যাচ্ছেন। কলকাতা তখন চাকরিতে রমরমা। স্টেশনে ভিড়, স্বামীরা কলকাতা যাচ্ছেন কাজের জন্য, স্ত্রীরা এসেছেন বিদায় দিতে। হাসি-গল্প, হুড়োহুড়িতে স্টেশনে হট্টগোল। পুরুষেরা ট্রেনে উঠলেন, যেই ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল, যে মহিলারা এতক্ষণ হাসাহাসি করছিলেন, উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে তীব্র অশ্রুবর্ষণ শুরু করলেন। সাহেব অবাক হয়ে প্রশ্ন করাতে জানতে পারলেন, স্ত্রীরা বিরহের দুঃখ প্রকাশ করছেন। স্বামীরা দূরদেশে যাচ্ছেন, কে জানে আবার কবে দেখা হবে। স্বল্প কয়েকটি পঙ্ক্তি হৃদয়বিদারক :

রেলগাড়ি আমার সতিন,
ওগো রেলগাড়ি আমার সতিন।
আমার প্রিয়তমকে সে দূরে নিয়ে যায়,
রেলগাড়ি আমার সতিন।[২৩]

বিরহের গান, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গান, খাঁটি মাটির গান।

একটি মিষ্টি গান কানে বাজে।

ও... শাপলার ফুল নেবো না, পদ্মর ফুল এনে দে,
নইলে দেবো না বাঁশি ফিরিয়ে।

শাপলা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে চম্পার ফুল চেয়ে থাকতে পারেন এ গানের রাধা, সঠিক তো মনে থাকে না। আরো একটি গান মনে পড়ে, বোধহয় ছায়াছবি থেকে :

মধু বাসন্তিকা এলো রে,
খেলো আবির, ঢালো রাঙা কুমকুম।
আজি বনে বনে পলাশ রাঙা,
মুকুলিকার ভাঙিল ঘুম,
রাঙা কুমকুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটি কি সত্যি 'পলাশ'? আমার কেন যেন মনে হয় কথাটা ছিল 'শরম' — 'শরম রাঙা' — দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকা কলি বসন্তের মৃদু বাতাসে শরমে রাঙা হয়ে ফুটে উঠল। এ ছবির ছন্দ আছে, গতি আছে। আবার মনে হয় 'স্বপন রাঙা'ও তো হতে পারে — মধু বসন্ত তো স্বপ্ন দেখারই সময়।

কথায় কথায় অশোক মিত্র মহাশয় একটি গানের বাণী শোনালেন। রেকর্ডে শোনা, বহুকাল আগে, গায়িকা বীণা চৌধুরী।

পথিক আমি ফিরি একাকী —
দুয়ার খোলো আজি এ রাতে,
তোমার চোখে নামিল ঘুম,
আমি যে কাঁদি বেদনাতে।
দুয়ার যদি না খোলো প্রিয়
সারাটি রাত রহিব জাগি,
বুকের বীণা ছন্দহীনা
বাজিবে শুধু তোমারি লাগি।
তুমি কি মোরে রাখিবে দূরে
হবে না দেখা তব সাথে,
তোমার চোখে নামিল ঘুম,
আমি যে কাঁদি বেদনাতে।

AMARBOI.COM

'তখনকার প্রচুর গানের সুরকার ছিলেন কমল মজুমদার — এটার কথা ঠিক বলতে পারি না। ১৯৪৩, আরমানিটোলার উৎপলা, বোধহয় ঘোষ ছিলেন তখন, মাতিয়ে দিয়েছিলেন একটি গানে —

এক হাতে মোর পূজার থালা
আর এক হাতে মালা।'

বললেন, ঢাকার সংগীত-সাহিত্য আড্ডা ও তীক্ষ্ণ মেধার প্রতীক, অর্থনীতিবিদ অশোকদা।[২৪]

কাজের মাঝে অলস বেলায়, পড়ার মাঝে, গুনগুন করে গান গাওয়া প্রায় সবার মধ্যেই ছিল — কখনো শুধু সুরে, কখনো বাণীর সঙ্গে; রবীন্দ্রসংগীত, সিনেমার গান — যা ভালো লাগে। মাকে দেখেছি জানলার ধুলো ঝাড়ছেন, গলায় 'হে ক্ষণিকের অতিথি।' ছেলেরা অনেক সময় শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজতেন। আমি শিস দিতে পারতাম না বলে দুঃখ ছিল। তবে মেয়েদের ওই জাতীয় চটুল কাজ করা মানা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ নম্বর বাড়িতে গান-বাজনা সুবিধে হলেই হতো। তখন হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলার প্রয়োজন ছিল না, খালি গলায় গাইতেন সবাই। গায়িকা কেউ বেড়াতে এলে দুটি গান শুনিয়ে যেতেন। বাবা বিলেতে বাংলা গানের অভাব বোধ করতেন। ফিরে আসার পর মায়ের বোনঝি মীরা[২৫] ঢাকার বাড়িতে এসে প্রচুর গান শোনাতেন। এ অনেক, অনেক আগের কথা — গায়িকার বিয়ে, আমার জন্ম ও ৫নং বাড়ির আগে। আমার মনে পড়ে মীরা আইচ, করুণা গুপ্তার রবীন্দ্রসংগীত, কলকাতা থেকে আসা আমার প্রিয় মাসি, কণা মাসির কণ্ঠে গান, সিন্ধু নদী ও নূরজাহানকে মিলিয়ে।[২৬] এ গানটি আমার প্রিয় ছিল, বোধহয় নূরজাহানকে কল্পনা করে। ভারতের ইতিহাস বইতে সম্রাজ্ঞীর রূপ ও সজ্জা দেখে কে না মোহিত হয়েছে? সিন্ধু নদীর সাম্রাজ্যও কি কিছু কম ছিল? লাল-নীল রঙের ছাপার চওড়া পাড়ের শাড়ি পরে পড়ার ঘরে বসে কণা মাসি যখন সবাইকে গান শোনাতেন, নানা সাজ পরিয়ে তাঁকে গানের সম্রাজ্ঞী কল্পনা করতে আমার কোনো অসুবিধা হতো না।

মা গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত — 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও,' 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান', 'একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।' গানেরও ফ্যাশন আছে, এ গান আজ বড় শুনতে পাই না।[২৭] বাবা গাইতেন, 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছান পথে'। বকুল ফুল দেখিনি, কিন্তু একটি ফুল বিছানো পথ কল্পনা করতে অসুবিধে হতো না। 'গিয়াছ'র 'য়া'র পর মিড়সহ লম্বা টান বিরহ-বেদনা আরো গভীর করে তুলত। সিনেমা-পাগল ছোটমামা শোনাতেন, 'নাচো, নাচো, প্যারে মনকে মোর...' বা 'রাজার কুমার পঙ্খীরাজে...'। বৃদ্ধ বয়সে মা গাইতেন তাঁর ছোটবেলার গান, 'কোন অজানা দেশে নীল সরোবরে ফুটেছিল এক কমলিনী, একদিন মৃদু সমীরণ...'। আর মনে করতে পারতেন না, স্মৃতি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

দাদা সেন্ট গ্রেগরিতে পড়েন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে যাতায়াত আছে, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত। কলের গান শুনে এসে গাইতেন, 'রাধে, ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক শ্যামরায়, ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়।'[২৮] 'ঝাঁপ' বলার একটা আলাদা কায়দা ছিল, দাদা সেটা নকল করতেন আর আমাতে, দাদাতে গলা মিলিয়ে চেষ্টা করতাম আকুতি-মিনতি করা 'রাধা' ডাকটি। ছেলেমানুষ মনে বিভিন্ন অনুভূতি থেকে নতুন জগৎ সৃষ্টি করা দুরূহ নয়। লাল পাড় শাড়ি সাধারণ করে পরা রাধা, কাঁখে কলসি নিয়ে পদ্মা নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছেন বা কণা মাসি সম্রাজ্ঞীর সাজে গান শোনাচ্ছেন, এ যেমন কল্পনা করতাম, তেমনি বরের সাজে ক্ষীরের পুতুল আর পঙ্খীরাজ-চড়া রাজার কুমারকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসঙ্গে করে নতুন রূপ দিতেও অসুবিধে হতো না।

বাবা কাজী নজরুল ও ডিএল রায় ভক্ত। দিলীপ কুমার রায়ের গান খুব পছন্দ করতেন। রেডিওতে দিলীপ রায় গাইলে ছুটে যেতেন। অল্পসংখ্যক বাড়িতে রেডিও ছিল, আমাদের বাড়িতে ছিল না, পাশের বাড়ি গিয়ে শুনে আসতেন। খুব পরিষ্কার শোনা যেত না, তাও খানিকটা মন ভরত। দিলীপ রায়ের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে', কী নাম করেছিল। বাবাও গুনগুন করতেন। বৃন্দাবনের লীলা দিলীপ রায়ের মতো আর কেউ মনোশ্চিত্তে আঁকতে পেরেছেন বলে মনে করি না। আজো যখন শুনি 'ওরা জানে না, তাই হাসে, আমি জানি, তাই মানি, আমি অন্তরে তোমার বাঁশরি শুনেছি...,' ওঁর মধুর কণ্ঠের ভক্তিরস অন্তরের গভীরে পৌঁছে যায়। কিছুদিন আগে হঠাৎ বারবার মনে হলো বাবার কাছে শোনা কোনো গানের অল্প ঝলক, 'হেরো, সুধাসিন্ধু উছলিছে, পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।' আর কিছু জানি না। ভগিনীসম ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ানকে জিজ্ঞেস করতেই ঢাকা থেকে ফোনে আমাকে 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গানটি শুনিয়ে দিলেন। ডিএল রায়ের লেখা *চন্দ্রগুপ্ত* নাটকের বিখ্যাত গান (রেকর্ডে 'হেরো' নেই, 'দ্যাখো' আছে)।

কাজী নজরুলকে বাবা শ্রদ্ধা করতেন, শুধু তাই নয়, নজরুলের গান, কবিতা, আবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত হতেন। দৃঢ়কণ্ঠে শোনাতেন, 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার...', 'যাত্রীরা হুঁশিয়ার' বলতে গলা আরো দৃঢ় হতো। 'বিদ্রোহী' কতবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি' শুনে মনে রোমাঞ্চ লাগত, আবার ছেলেমানুষের মনে বইয়ের অর্ফিয়াস, ছবির নজরুল, 'পাইড পাইপার অফ হ্যামলিন' — সব এক হয়ে সবাইকে মাতিয়ে নিয়ে যেতেন সঙ্গে। দেশকে, দেশের মাটিকে বেশি করে ভালোবাসতে শিখেছি বাবার কাছে, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান' — নজরুলের বাণী আমাদের ছেয়ে থাকত।

বাঙালিত্বকে যদি বলি 'এক ধরনের সমন্বয়বাদী চেতনা'[২৯], যে চেতনা চেষ্টাকৃত নয়, যুক্তি দিয়ে আসেনি, এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তাহলে আমার বাবা ছিলেন পরিপূর্ণভাবে বাঙালি। ওঁর মানবিকতার মন্ত্র, যে মন্ত্রে আমাদের তিনি দীক্ষিত করেছিলেন, কবি নজরুলের পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায় :

> হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন,
> কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১। সেনগুপ্ত, পৃ. ১৯।

২। কথোপকথন, দিল্লি, ১৯৮৪।

৩। পরিচ্ছেদ ১৩।

৪। সুর-শৃঙ্গার আয়োজিত বক্তৃতা : আকাশগঙ্গা, বোম্বাই, সম্ভবত ১৯৭৮।

৫। সুকুমার রায়, পৃ. ৭৩-৭৪।

৬। ইনি জীবনের দীর্ঘ সময় কানপুরে কাটিয়েছিলেন। টপ্পা, ঠুমরি, দাদরা ও সারেঙ্গিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একসময় বেগম আখতার লখ্নৌ থেকে প্রতি সপ্তাহে কানপুর যেতেন ঠুমরি-দাদরার তালিমের জন্য। ওঁর প্রসিদ্ধ দাদরা 'তুম যাও যাও যাও, মোসে না বোলো', রশীদ খাঁ সাহেবের কাছে শেখা। দিল্লিতে একটি আসরে (এপ্রিল ৩, ১৯৭৩) আমি ওঁকে এই দাদরাটি গাইতে অনুরোধ করাতে, বেগম নিজেই এ কথা বলেছিলেন।

৭। আমি রামপুর ঘরানার একটি দীর্ঘ বংশতালিকা তৈরি করেছি — তাতে কোনো তসদ্দুক হুসেন খানের নাম নেই। তবে আমার তালিকাতে পুরো শাখা-প্রশাখা নেই, তাই হয়তো বাদ পড়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, দূর সম্পর্কের আত্মীয়, ইনি রামপুরের কাছে সাহেসওয়ানে থাকতেন, ছোট শহর যা ছিল ঘরানার সবার আদি নিবাস। বিখ্যাত গায়ক ও গুণীজন ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খান এবং লগন পিয়া ভণিতাতে ঘরানার বহু বন্দিশের লিপিকার/সুরকার ওস্তাদ ওয়াজিদ হুসেন খানের স্নেহভাজন, ইনি বহু বছর এদের সঙ্গে কাটিয়েছেন, সংগীতের তালিম নিয়েছেন। কী সূত্রে ঢাকা গিয়েছিলেন জানা নেই। সৌজন্য ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খানের দৌহিত্র, সম্মানিত গায়ক ওস্তাদ মকবুল হুসেন খান।

৮। ১০ মে, ২০১৫। গোয়ালিয়র ঘরানার প্রবীণ গায়ক লক্ষ্মণ কৃষ্ণরাওশঙ্কর পণ্ডিত বললেন, 'বিভিন্ন বন্দিশ শেখানো তালিম দেবার অঙ্গ — একটি রাগে অন্তত পনেরোটি বন্দিশ ছাত্রকে শেখানো হয়।' ডিডি ভারতি টেলিভিশন, 'বৈঠক'।

৯। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে আমরা যখন শিখতে শুরু করেছি, রাজদরবার নেই, শ্রোতা ও তাঁদের রুচিতে ধীরে ধীরে বদল এসেছে, পরিবারের বাইরে অনেকে শাস্ত্রীয় সংগীত শিখবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন: ঘরানাদার ওস্তাদদের অভিমত ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। সব ঘরানার, এমনকি বন্দিশের শেষ প্রহরী, রামপুর ঘরানার মুঠি শিথিল হলো। তাই আমরা প্রথমে অজানা, অচেনা, কিন্তু সংগীত শিখতে ইচ্ছুক, 'গান্ডাবন্ধ শাহগীর্দ' হতে পেরেছি।

১০। পরিচ্ছেদ 'খ'।

১১। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

১২। বুদ্ধদেব বসু।

১৩। অজিত দত্ত।

১৪। চক্রবর্তী, ভূমিকা, 'কুসুমের মাস'। অজিত দত্তকে 'ভালোবাসার কবি' বলেছেন এই ভূমিকাতে।

১৫। সেনগুপ্ত, পৃ. ৬০-৬১। আলোচনা হয়েছিল পরিমলকাকার বাড়ি 'পরম ভবনে', নয়তো আমাদের ৫নং এ — পুরানা পল্টনে আর কোথাও হতে পারে মনে হয় না। অধ্যাপক বোসের সঙ্গে বাবার নিকট সম্পর্ক ছিল, তাই হয়তো ৫নং। পরিমলকাকা সাহিত্যিক, তাই মনে হয় 'পরম ভবন'। উত্তর পাবার উপায় নেই, তবে ভাবতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো লাগে আমাদের নিজেদের ছোট পরিবেশে এমন কিছু হয়েছিল।

১৬। প্রধান, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

১৭। মন্দিরা ভট্টাচার্য্য *আরেক রকম*। প্রথম বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, ১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৩। পৃ. ১৩-১৬।
ওয়ারীতে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে ডা. নন্দী যে বাড়ি কিনেছিলেন, সেটা ছিল দিদিমার 'সুদূর দিদির', মায়ের সৌদামিনি মাসিমার। আমাদের ঘন ঘন যাতায়াত ছিল ও বাড়িতে, এত সুন্দর বাড়ি সচরাচর নজরে আসে না। বাইরে সাদামাটা, দৈর্ঘ্য প্রস্থের সামঞ্জস্যর ওপর নজর রেখে চকমেলানো দালান, বাড়ির মাঝে আকাশের রোদ-আলো ছোঁয়া ফুলের বাগান, চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা, পাশে ঘর। পুরোটা দোতালা নয়। সুদৃশ্য বাগানের ওপর দৈর্ঘ্যের একদিক থেকে অপরদিকে তার থেকে ঝুলত বিভিন্ন রকমের অর্কিড, অন্তত আমরা অর্কিড বলে জানতাম। এছাড়া ঝোলানো 'টব' জড়িয়ে রং-বেরঙের ফুল। আশ্চর্য লাগত, এমনও হয়? চল্লিশের দশকে এই দিদিমার সন্তান-সন্ততিদের সংসার, নাতি-নাতনিদের কলরবে বাড়ি থাকত সরগরম। ধীরে ধীরে সবাই কলকাতা চলে গেলেন, শুধু এক মামা, সুরেশ দাশগুপ্ত পৈতৃক ভিটেতে রয়ে গেলেন। পরে তিনি ডা. নন্দীকে এ বাড়ি বিক্রি করেন। ডা. নন্দীর ওপর প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয়েছিল সব কিছু আমার চেনা, যেন একটি যোগসূত্র রয়েছে। পরিচিতির জগৎ, আমার ঢাকা শহর।

১৮। শামসুদ্দিন আহমেদ। পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'প্রথমে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী — দেশভাগের পর কট্টর মুসলিম লীগপন্থী হলেও নন্দী পরিবারের সঙ্গে একই রকম যোগাযোগ ছিল।' *আরেক রকম*, প্রথম বর্ষ, ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, ১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৬।

১৯। ফয়েজ আহমেদ। বাংলাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক। ঐ পৃ. ১৬।

২০। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য অশোক মিত্র, কুমার রায় স্মৃতি বক্তৃতা, ২০১৩।

২১। প্রয়াত সুনীতি বোস।

২২। 'শুইনা' না হয়ে 'হুইনা' হতে পারে।

২৩। লেখকের নাম মনে নেই, খাতাতে ঘটনাটি লিখে রেখেছিলাম। অনুবাদ : লেখিকা।

২৪। কথোপকথন, লেখিকার সঙ্গে, অশোক মিত্রর বই পরিবৃত ঘর, কলকাতা, ৭ জুন, ২০১৫।

২৫। পরে দেববর্মন। মায়ের মাসতুতো দিদির মেয়ে।

২৬। প্রথম লাইনটি একেবারেই ভুলে গিয়েছি।

২৭। কিছুদিন আগে কলকাতায় গড়িয়াহাটের মোড়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনি দুই অল্পবয়সী ছেলের নিজেদের মাঝে কথা। এঁরা রাস্তায় শাড়ি বিক্রি করেন, আলোচনা চলছিল রবীন্দ্রসংগীতের ওপর। একে অন্যকে শোনাচ্ছিলেন, 'একটুকু ছোঁয়া লাগে...।' বাঙালির মন থেকে কোনো গানই হারিয়ে যায় না, কোনো না কোনো কোণ থেকে ভেসে আসে।

২৮। আমার স্মৃতিতে আছে 'প্রেমিক'। মহম্মদ শরীফ গাইতেন 'প্রেমের', জানিয়েছেন ওঁর পুত্র মহম্মদ শামসুর রহমান। এটাই সম্ভবত নির্ভুল। তবে আমার স্মৃতিকথাতে যা আমার মনে আছে তা-ই লিখছি।

২৯। আবদুর রাউফ, পৃ. ৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমলকাকা — ঢাকার পরিমল রায়*

ঢাকার কথা, আমার ছেলেবেলার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি পরিমলকাকা সম্বন্ধে আলাদা করে না লিখি। সে সময়কার অনেক আনন্দমুহূর্ত ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়; ঢাকার সন্তান, ঢাকা শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লালিত উজ্জ্বল প্রতিভা, পরিমল রায় ছিলেন শহরের বিদ্বজ্জনের তালিকায় এক জ্ঞানী-গুণী মানুষ। ইতিহাস তার নিজের নিয়মে চলে, কিছু মনে রাখে, কিছু ভুলে যায়। স্মৃতিচারণের প্রচেষ্টা থাকে কিছু ভুলে যাওয়া পাতাকে ফিরিয়ে আনা, তা যতটুকুই হোক। আমার লক্ষ্য একই — পরিমলকাকার জাদু একটু যদি ধরে আনতে পারি।

অর্থনীতিবিদ পরিমল রায় 'রম্যরচনা' লেখক হিসেবে পরিচিত, কিন্তু ছড়া ছিল ওঁর নিত্যসঙ্গী। রম্যরচনা বা অর্থনীতির তাত্ত্বিক রচনা লেখার জন্য ভাবনা-চিন্তার বা অন্তত টেবিল-চেয়ারের প্রয়োজন; কিন্তু ছড়া আসত স্বাভাবিক, সাবলীলভাবে। অর্থনীতি, রাজনীতির আলোচনার মাঝে হঠাৎ লিখে দিতেন, হাতে যা কাগজ পেতেন তাতেই। পোস্টকার্ডের পিঠে, খামের কোনায়, খাতার পাতায়, এলোমেলো কাগজে, যা সামনে পেতেন টেনে নিয়ে ছড়া লিখতেন। সঙ্গে কার্টুনের মতো ছবি। অনেক সময়ই খসড়াকে ভদ্র করা হতো না।

সান্ধ্য আড্ডার মাননীয় সভ্য, পুরানা পল্টন, ওয়ারী বা দিল্লি, কলেজ শেষে ওঁর আমাদের বাড়ি আসার রুটিনের ব্যতিক্রম হতো না। রাশভারী মানুষ, অট্টহাসি কখনো শুনিনি। মুচকি হেসে রসিকতায় আসর জমিয়ে দিতে পারতেন। তেমনি রাশভারী চেহারাতেই টুক করে ছড়া লিখে দিতেন, সঙ্গে থাকত ব্যঙ্গচিত্র। তখনকার দিনে বাবা-কাকাদের সঙ্গে ছোটদের খানিকটা দূরত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকত, ভালোবাসা ও ভীতি সঙ্গে সঙ্গে চলত। ছড়া লেখা ছিল ওঁর মনমেজাজের ওপর, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চাইলে বিরক্ত হতেন।

আমাদের সোফার হাতল ছিল চওড়া, যেই দেখতাম তার ওপর চিরকুট — আর কাকার হাতে পেনসিল-কলম — বুঝে নিতাম ছড়া লেখা হচ্ছে। বালিকাসুলভ ঔৎসুক্য থাকত মনে — কার নামে লেখা হচ্ছে, কাকে দেওয়া হবে, যদি আমি বাদ পড়ে যাই? ছড়া নিয়ে রেষারেষি পুতুলের বিয়ে নিয়ে মনকষাকষির থেকে কিছু কম ছিল না। আবদার করা বারণ ছিল, তা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই করতাম। তার প্রমাণ ১৯৪৩-এ লেখা এই ছড়াটি —

এ বাড়িতে আসি যেই
বিবি ধেয়ে আসে সেই,
ছবি চাই ছড়া চাই —
অতশত কোথা পাই?

Wills সিগারেটের প্যাকেটের পুরু সাদা খাপটিতে পেনসিলে লেখা।

পুনরায় তাগাদার ফল

'এক' যে আছে বিবি বলে' কন্যে,
তার তাড়াতে ছড়া বেঁধে হ'য়ে গেলাম হন্যে।
বিবি তবু হয় না খুশি,
অসন্তোষে উঠছে রুষি'
বল্‌ছে, 'তুমি কাকা কীসের জন্যে?'

নিচে রেখাচিত্রে পরিমলকাকার নিজের প্রতিকৃতি, 'আর কত ছড়া লিখব', এই প্রশ্ন নিয়ে।

পাড়া বেড়াতে ভালোবাসতাম ছোটরা। বড়রা সেটা সুনজরে দেখতেন না, বিশেষ করে সন্ধ্যের পরে বাইরে থাকা। ছড়া এলো

অলকনন্দা
হ'লো যে সন্ধ্যা
এখন যেয়ো না বাহিরে।
আসিছে বর্ষা
ভীষণ দর্শা
রক্ষে তো আর নাহি রে।

নিচে অত্যন্ত কাঁচা হাতে লেখা, 'বিবিকে দিলাম, পরিমল কাকা'।

ঢাকাতে একবার আমার গান শেখার প্রয়াস হলো, পরিমলকাকা একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরকুট পাঠালেন —

অলকাদি গলা ছেড়ে গানে দেন গিটকিরি
গর্জন শুনে তাঁর সবে দেয় টিটকিরি,
অলকাদি কন ক্ষেপে
ভয়ানক সংক্ষেপে
গলা কিছু ধরো ধরো ঘরে নেই ফিটকিরি।

টিটকিরি-ফিটকিরির কিছু ফল হয়তো হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পরে ১৪-১০-৪৯-এ দিল্লি থেকে পাঠানো ছড়ার দুই পঙ্‌ক্তি

গলায় তোমার সোনা গলেছে
গানের সুরের ফসল ফলেছে।

১৯৪৫-৪৬-এ কোনো বিয়েবাড়ি থেকে এসে নববধূ, বিবাহ, পুরোহিতের ওপর লেখা শুরু হলো।

বিবাহের শুরুতে,
লাগল দু'পুরুতে,
এ বলে 'দদানি', ও বলে 'দদে'
পাণ্ডিত্যে এ-ওর পরাণ বধে।
গোধূলিতে ছিল লগ্ন
লগ্ন বুঝি হয় ভগ্ন,
বাজতে আটটা দু'টি গাঁট্টা ঘনায় বরের ভুরুতে।

১৯৪৬, যুদ্ধ শেষ হলেও রেশনের কোপ শেষ হয়নি। আমার কাছে বিশেষ উপহার এলো, নববধূ, পালকি, হস্তী, কাহার, বর-কনের ছবিসহ 'পদ্য' — পরিমলকাকার ভাষায়। উনি ছড়া বলতেন না।

নববধূ এলেন ঘরে
চড়ে' রূপোর পাল্কি
আজকে না হয় পান্তা খাবেন
কিন্তু খাবেন কাল কী?
বর এসেছেন পাল্কিতে নয়,
চড়ে' বিশাল হস্তী
আর কিছুতে উঠলো না মন
এমন জবরদস্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বশুর বলে, "শাশুড়ি গো,
পোলাও হ'লো কমতি
এদিকে যে বসলো খেতে
নিরানব্বুই পংক্তি"!

এমন সময় উঠল বেজে
দারুণ জগঝম্প,
ব্যাপার দেখে ক্ষ্যাপার মতো
হস্তী দিল লম্ফ!

ছিটকে ছোটে বরযাত্রী
লোটায় মধুপর্ক
এরই মধ্যে দুই পুরুতে
সমস্কৃতের তর্ক।

কনে কাঁদে সভার মাঝে,
টোপর পানে লক্ষ্য
মিলছে না যে প্রজাপতির
রঙীন দু'টি পক্ষ।

হেনকালে চার কাহারে
পাল্কি আনে হুম্ হাম্
কনে পালায় বরের সাথে
সাঙ্গ যত ধুমধাম।

নববধূ এলেন ঘরে
চড়ে' রূপোর পাল্কি
আজকে না হয় পান্তা খাবেন,
কিন্তু খাবেন কাল কী?

নিচে লেখা, 'বিবি'কে — পরিমলকাকা ১২.৬.৪৬

সত্যিই তো — নববধূ কাল কী খাবেন? পান্তার জন্য ভাতের প্রয়োজন, চাল কোথায়?

বিবাহের জের আরো কিছুদিন চলল। এলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধিঙ্গি হ'ল কন্যে
বর জোটাবার জন্যে
হ'লাম যে ভাই হন্যে
বুঝবে কে তা অন্যে।

বর জুটল বগুড়ায়
সাব ডেপুটি জগু রায়,
আরেকটি বর যশোরের
ব্যবসা করে তসোরের
একটি ছেলে কাশীতে
বেতন শুরু আশি-তে।

বর তো জোটে মন্দ না,
কিন্তু শুনুন যন্ত্রণা,
বিবি মেয়ে বলে কি
এখন বিয়ে চলে কি?
অ্যাম্বাসাডার না হ'তে
আটকাবো বিবাহতে?
শুনুন কালের পরিণাম
চক্ষু বুজে হরিনাম।

পদ্যের পাশে একটি আধুনিক শাড়ি পরিহিতা, অত্যধিক লম্বা মেয়ের ছবি। নিজে বুদ্ধিজীবী হয়ে ঢাকাতে নিরাশ হয়েছিলেন, তাই বোধহয় অ্যাম্বাসাডার হবার প্রতি ভীতি। 'ধিঙ্গি' হব সেই আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

১৪/১০/৪৯-এর পদ্যের শুরু —

দৌড়ে এলাম দেখার গরজে
দেখছি তেমন হওনি বড় যে
এখনো সেই ছোট্ট বিবিটি
দীর্ঘ তো নয় দীর্ঘজীবীটি।

এরও নিচে লেখা 'পরিমলকাকা'

পরের ছড়াটি খুব সম্ভব আমার ভাইকে দেওয়া, যখন আমরা কাশীতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দন্তটি পড়ে গিয়ে আর ওঠেনি
দাঁত কিনে আনবার টাকা জোটেনি।
ইঁদুরের গর্ত কি খুঁজে পায় নি
অথবা কি ভয় পেয়ে কাছে যায় নি।
দাঁত বুঝি উঠে নাকো সেই জন্যে
কী হোতো হে ছেলে যদি হোতো কন্যে।
অদন্ত হাসিখানি তবু মিষ্টি
মুখ থেকে ঝরে যেন সুধাবৃষ্টি।[১]

এর একটি পূর্বজ আছে, 'তিলক তত্ত্ব' নামক এক ছড়ার গুচ্ছতে, নাম 'ফোকলা দাঁত'।

আধখানা উঠে হায়
আর ওঠে না,
ফুটো মুখে তাই আর
কথা ফোটে না,
ইঁদুরের গর্ত্ত যে
খুঁজে পায় নি,
পেয়েও তো ভয় পেয়ে
কাছে যায় নি,
পড়ে যেই গিয়েছে
ফেলে দিয়েছে
ছুটে এসে ইঁদুরেরা
কেড়ে নিয়েছে
ফুটো মুখে তাই আর
কথা জোটে না
আধখানা উঠে হায়
আর ওঠে না।[২]

শুধু আমার জন্যে তো নয়, বাড়ির ছোটরা, আত্মীয়-পরিজন অনেকের জন্যেই লিখতেন; আবার নিজের অবসর বিনোদন বা অসন্তোষ ব্যক্ত করতে লিখে যেতেন। ছড়ার তো এই গুণ, গুরুগম্ভীর না করে কত কঠিন তত্ত্ব এর মাধ্যমে বলা যায়। কিছু ছড়া সংরক্ষিত রাখতেন নিজের কাছে, কিছু চলে যেত *রংমশাল*-এর পাতায়। তার সুর মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে হতো অন্যরকম। বিভিন্ন নমুনা দিই — সব মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে ইচ্ছে করে।

'স্বয়ম্বর', মনে হয় ভাইঝি খুকু, আমার প্রিয় বান্ধবী কৃষ্ণাকে লেখা।

খুকু হবে স্বয়ম্বরা
রাষ্ট্র হ'লো দেশে,
বরের বাজার বসে গেল
চক্ষের নিমেষে।
খুকুর এমন বাছাবাছি
রুচলো না কেউ কাছাকাছি
সভা গেল ভেঙে,
শেষকালে এক বর জুটলো তে-মাথা তে-ঠেঙে।[৩]

ওই ছড়ার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিলে কি অন্যায় হবে?

শব্দ বা অক্ষর নিয়ে খেলা করা পছন্দ ছিল লেখকের, আর ছিল চা-জলখাবারের ওপর পক্ষপাতিত্ব। তাই —

"হচ্ছে না কি চা?
আর, চায়ের সঙ্গে টা?"
"চায়ের সঙ্গে টা নেই
এলো চায়ের টানেই।"[৪]

জলখাবারে মিষ্টি, বিশেষ করে ক্ষীরমোহন ছিল প্রিয়। মাঝে মাঝে বাবার কাছে চিঠি শেষ করতেন, 'শান্তিদেবীর কাছে ক্ষীরমোহন প্রার্থী পরিমল।' এটার ইতিহাস ঠিক জানি না, হয়তো মায়ের কাছে ক্ষীরমোহনের অনুরোধ পূর্ণ হয়নি তাই। আবার কোনো অজানা রসিকতা থাকতে পারে এর পেছনে।

Wills সিগারেটের প্যাকেটের কাগজে লেখা এই পরিচ্ছেদের প্রথম ছড়াটি আমার বহু পরিচিত, অস্পষ্ট হলেও পড়তে পারি। হঠাৎ আবিষ্কার করেছি সেই ছোট্ট কাগজটির উলটোদিকে আরেকটি ছড়া, যা আমার বিস্মৃতিতে ছিল। বয়সের ভারে কাগজ মলিন হয়ে খয়েরি রং ধারণ করেছে, পেনসিলের লেখা অস্পষ্ট। তবে শব্দ নিয়ে খেলা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৩-এর দশকের জীবনযুদ্ধ বুঝতে অসুবিধা হয় না।

টাকা আছে, চাল নাই,
নুন, তেল, ডাল নাই,
চাল মারা বন্ধ,
সেটা নয় মন্দ।

শব্দ নিয়ে খেলা দেখি 'তোলা' ছড়াতে।

একটি ফোঁটা যায় না পেটে, কেবলই দুধ তোলে,
ছেলেটা যে তুলবে পটল এমনটি রোজ হ'লে।
হেঁইয়ো জোয়ান,[৫] খুব হুঁশিয়ার, মুটে তুলছে বোঝা
মাথায় বোঝা তোলা-র চাইতে ফুল তোলাটা সোজা।
ঠাঁই হয়েচে, মশাইরা সব এবারে গা তুলুন,
হাই তুলছেন? খাবার সময় ঘুমের কথা ভুলুন।
বাপ-মা তুলে' গাল দিলে যে, শোধ তুলতে হবে,
চিঁ চিঁ করে' গান কর যে? গলা তুলবে কবে?
ওদের ওসব মিথ্যে কথা কানেই তুলো নাকো,
অঙ্কগুলো ফেয়ার করে' খাতায় তুলে' রাখো।
সিনেমাতে যাবে বলে, রব তুলেছে ছেলে,
মেয়ে তুলে' বিয়ে দেব এমন বরটি পেলে।
পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুলে' টাকা তোলো দেদার
লক্ষ টাকা জমলে পরে বাড়ি তুলবে কেদার।[৬]

১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে যুদ্ধ থেমে গিয়েছে, কিন্তু তার রেশ চলেছে বহুকাল। হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়া মানুষ সমাজকে ভিন্নপথে নিয়ে যাচ্ছে; রেশন ও কালোবাজারে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গিয়েছে। সেই দুর্বিষহ জীবনের কথা বড় দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন পরিমলকাকা, যাঁকে আমরা ছোটরা হাসিঠাট্টার 'ছড়াকার' ভাবতাম।

ঠাণ্ডা জলে প্রাণটি ভরে
ধর এলাম চানটি করে',
বুরুস দিয়ে বাগিয়ে সিঁথি
স্নানের পালা হ'লো ইতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর এখন খেতে বসে'
গিন্নি ঝেড়ে দিলেন কসে'
'ভাত দেব না দেব ছাই
দু'দিন ধরে র‍্যাশন নাই,
পোড়া মুখে খিদের শখ,
কুড়ের বাদশা আহাম্মক'
বোঝো তখন কাণ্ডখানা
কোথায় খিদে কোথায় খানা',
টাকা নিয়ে কয়েক হাজার
এক দৌড়ে কালোবাজার।[৭]

চোরাবাজার বা যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের ওপর মন্তব্য দিয়ে দুটি ছড়া।

১

সেজেগুজে দাঁড়িয়ে
মুখখানা বাড়িয়ে
কোথা পেলো শাড়ী এ
চোরাবাজারে?
চোরা শিখী পুচ্ছ
করে বটে তুচ্ছ
হেন লোক, বুঝ ছো,
কটা বাজারে?

২

বসে ঐ ভিখিরি,
'ভিক্ষে না করে কেন করে না ও ঝি-গিরি?'
বড়লোক বাবুদের
বোলচাল আছে ঢের,
আসলেতে ওটা কিছু না দেবার ফিকির-ই।[৮]

১৩৫৩-র *রংমশাল*-এ এডওয়ার্ড লিয়রের ছড়া আছে প্রায় প্রতি সংখ্যায়, অনুবাদ প্রেমেন্দ্র মিত্রের। লিয়রের ওপর সম্পাদক মশাই লিখেছেন, ছোট-বড় সবাই ওঁকে নিয়ে লড়াই করে, 'লিয়র আমাদের, লিয়র আমাদের', যেন দড়ি টানাটানির লড়াই।[৯] এ মন্তব্য পরিমল রায়ের ওপরও প্রযোজ্য। সেই কবে ছেলেবেলায় আনন্দ দিয়েছিলেন, সত্তর বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর ওঁকে বুড়োদের দলে টেনে এনে নতুন অনুভূতি নিয়ে পড়ছি।

বুদ্ধদেব বসু পরিমলকাকার ওপর একটি পদ্য লিখেছিলেন,

পদ্য যদি লিখতে তুমি পরিমল
মুগ্ধ হতাম সকলে
হার মানাতে নামজাদা সব কবিদের
ছন্দ-মিলের দখলে।
কিন্তু তুমি নিজে কিছুই লিখলে না,
আমায় দিলে উৎসাহ,
তুমি আমায় করলে তোমার রাজকবি
আমি তোমায় বাদশাহ।[১০]

এই বাদশাহের বিভিন্ন ছড়া ও ব্যঙ্গচিত্র আমাদের মনোরঞ্জন করে, মনে রেখাপাত করে, সমাজের নানা পরিস্থিতির প্রতি সচেতন করে তোলে, আবার একটা আফসোস, দুঃখে ঠেলে দেয়। এত তাড়াতাড়ি কেন চলে গেলেন, আমরা বড় হয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে পদ্য পড়ব, সে সময়টুকু কেন রইলেন না? হাসিঠাট্টার ছড়ার প্রতীক, পরিমল রায়, তাঁর ওপর লেখা দুঃখ জানিয়ে শেষ করা অন্যায় হবে।

তাই পরিমল রায়ের রাজনীতি, সামাজিক ও নৈতিক মন্তব্য, আবার ছোটদের জন্য হাস্যরসে ভরা 'হনুমান যদি' দিয়ে ঐ পর্ব শেষ করি।

হনুমান যদি (১)

হনুমান যদি লঙ্কার থেকে জানকীরে ধরে আনতো,
যুদ্ধটা আর হোতো না তাহলে, সব হয়ে যেত শান্ত।
তা তো নয়, ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি, ফেলে চলে এলো সীতাকে
তাতেই রামের মুস্কিল হল, পড়ে গেল ঘোর বিপাকে
বাঁধো সমুদ্র, এসো নলনীল, সাজো সাজো রণসজ্জায়,
ওদিক আবার রাক্ষসগুলো হাঁকে ডাকে আর গর্জ্জায়।

কী ভীষণ রণ হল যে তখন, কত প্রাণ হল নষ্ট,
যত ভাবি তাহা, প্রাণে ভাই আহা, পাই অতিশয় কষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হনুমান যদি লঙ্কার থেকে ফিরিয়ে আনতো সীতাকে
আজো ধিকি ধিকি জ্বলতে হতো না রাবণ রাজার চিতাকে।

হনুমান যদি (২)

হনুমান যদি লঙ্কার থেকে জানকীরে ধরে আনতো
তাহলে তো সবে রাঘব রাজারে অতি ভীতু বলে জানতো।
সবাই বোলতো, দুয়ো দুয়ো দুয়ো, ভয় পেয়ে গেল যুদ্ধে,
তাই এগোলো না তীর ধনু নিয়ে রাবণ রাজার বিরুদ্ধে।

হবে দুর্নাম, তাই ভেবে রাম, কহিলেন: বাছা হনুমান,
জানকীরে শুধু দেখে ফিরে এসো এই হয় মোর অনুমান।
তা যদি না হতো, হোতো কি বিরত হনুমান হেন কার্যে
কভু কী সীতাকে আসিত সে ফেলে চেড়ী বেটিদের চার্য্যে?

এই কথাটুকু ধরতে পারো না? বুদ্ধিটি বলো ভোঁতা কার?
রামের নিন্দা করতে এসেছো ওরে বোকারাম কোথাকার?[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

* (১৯০৭-১৯৫১)। এ লেখার খানিকটা আমার লেখা 'স্মৃতি', চতুরঙ্গ, ৬৭, সংখ্যা ৩, শ্রাবণ-পৌষ, ১৪১৫ থেকে নেওয়া।

১। এটি আমার হাতের লেখায় একটি খাতাতে আছে। নিচে লেখকের নাম, 'পরিমল রায়', তারিখ নেই। মূল লিপি খুঁজে পাইনি — রায় পরিবারে কারো কাছে নেই।

২। পুত্র পৃথ্বীরাজের ছেলেবেলায়, ওর ডাকনাম 'তিলক' মনে রেখে 'তিলক তত্ত্ব' বলে এক ছড়ার গুচ্ছ কাকা লিখেছিলেন; 'ফোকলা দাঁত' তারই একটি। তিলক আমার ভাই পার্থ-র থেকে বছর তিনেকের বড়। 'তিলক তত্ত্ব' থেকে ছড়া দুটির জন্য সৌজন্য : মণিকুন্তলা ও শিশির সেনগুপ্ত, পরিমলকাকার কন্যা ও জামাতা।

৩। *রংমশাল*, একাদশ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫৩, পৃ. ২৫৮। *রংমশাল* ছাড়া বাকি ছড়া লেখিকা বা রায় পরিবারের সংগ্রহে।

৪। *রংমশাল*, দ্বাদশ বর্ষ, পৌষ, ১৩৫৪, পৃ. ৩৪২। তিনটি ছড়ার তৃতীয়।

৫। কথাটা কোনো জোয়ান পুরুষকে না বলে ইংরেজ ফৌজের বন্দুকধারী 'জোয়ান'কে হুমকি দেওয়া হতে পারে। যুদ্ধের সময় রেলগাড়ি ভরা থাকত বন্দুকধারী সৈন্যতে। এবং তাদের অধিকার ছিল সবার আগে।

৬। *রংমশাল*, একাদশ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৫৩ পৃ. ১৮২।

৭। *রংমশাল*, দ্বাদশ বর্ষ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৫৪, পৃ. ৪৩৮।

৮। *রংমশাল*, একাদশ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৫৩, পৃ. ১১৪। 'ইদানীং' নামে তিনটি কবিতার দুটি।

৯। *রংমশাল*, একাদশ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৫৩, পৃ. ৮৩।

১০। সৌজন্য পৃথ্বীরাজ রায়। বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের কবিতার বই *বারোমাসের ছড়া*-র উৎসর্গ পত্র থেকে কয়েক পঙ্ক্তি।

১১। সূত্র 'তিলক তত্ত্ব'।

মাত্র ৪২ বছর বয়সে পরিমল রায়ের মৃত্যু হয়। ঢাকার নামি, ছাত্রবৎসল অধ্যাপক, অর্থনীতির ওপর ওঁর তাত্ত্বিক লেখা অর্থনীতির আন্তর্জাতিক মহলে সমাদৃত। পদ্য? বুদ্ধদেব বসুর পর আর কিছু বলার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেণ্ডারিয়া

পাড়ার বাইরে বেড়াতে যাবার পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে বাবা-মায়ের কোনো বন্ধুর বাড়ি যাওয়া ছাড়া, বেড়ানো খুব মনে পড়ে না। একবার গিয়েছিলাম বলধার জমিদারের বাগান দেখতে; গাঢ় বেগুনি রঙের প্রায় কালো, ভেলভেটের মতো পুরু ও মসৃণ পাপড়ি — এই নাম-না-জানা ফুল ভুলতে পারিনি কোনোদিন; স্পর্শ যেন আজো আছে। সদরঘাট দেখিনি; বুড়িগঙ্গা, শুধু বাদামতলী থেকে স্টিমার নেওয়ার জন্য। মহিলাদের বাজার-হাট যাওয়ার প্রশ্ন উঠত না, খুব প্রয়োজন হলে ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় বা বাটার দোকান। ঘোরাঘুরি করতাম না বলে যে মনে দুঃখ ছিল তা নয় — হেসে-খেলেই তো থাকতাম।

শুনেছি ঢাকা খুব সুন্দর শহর ছিল। মাঠ, বাগান, বড় গাছ, কৃষ্ণচূড়া — যতটুকু দেখেছি, সত্যি সুন্দর ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এক লেখিকা ব্রতকথার আকারে তাঁর জীবনের নানা কথা, বিশেষ করে ভ্রমণের কথা লিখে গিয়েছেন। নাম উপেন্দ্রমোহিনী, স্বামীসহ ঢাকা এসেছিলেন বেড়াতে, এ শহর তাঁর ভালো লেগেছিল। ঢাকেশ্বরী মন্দির ও চার শিবের মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন; আমরা দ্বিতীয় মন্দিরটির কথা কখনো শুনিনি — হয়তো আজো আছে। লিখেছেন, দুই ধর্মের জমিদাররাই সুন্দর অট্টালিকা বা প্রাসাদে থাকেন। বিশেষ ভালো লাগা, ঢাকার 'চমৎকার' হিসেবে পদ্য :

গনিমিয়া বলি এক নবাব সেখানে।
বসাইয়াছেন কল তিনি সেই স্থানে ॥
সে কলের জল সবে করিতেছে পান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনিতেছি গ্যাস আলো করিবেক দান ॥
দেখিতে সুন্দর অতি তাঁদের বাগান।
পিতা-পুত্র দু'জনের দুইটি উদ্যান ॥

শাহবাগ ও বেগুনবাড়ির বাগান দুটির মধ্যে লেখিকার ছেলের পরিকল্পিত উদ্যানটি বেশি পছন্দ ছিল। কারণ এখানে বাগান ওপরে, নিচে ঝিল, তাতে নৌকো নিয়ে বেড়ানো যায়। এছাড়া

গোলকধাঁধা আছে সেই বাগান মাঝার।
বৈঠক সাজান হেরি অতি চমৎকার ॥[১]

বাগান দুটির নাম এ লেখাতেই প্রথম জানলাম — জানতাম না বা দেখিনি বলে আক্ষেপ নেই; বালিকা জীবন অন্য নানা আনন্দে ভরা থাকে।

মাঝে মাঝে যাওয়া হতো মামাবাড়ি গেণ্ডারিয়াতে দিন কাটাতে। খোলামেলা, ফুলে ভরা পুরানা পল্টন ছিল নতুন ঝকঝকে। বনেদিপাড়া, বনেদি বাসিন্দা সত্ত্বেও পুরনো শহর বলে উন্নাসিকরা খুব ওদিকে যেতে পছন্দ করতেন না। আমরা কিন্তু মামাবাড়ি যাওয়ার নাম শুনলেই এক নিছক আনন্দের দিনের স্বপ্ন দেখতাম। ঘোড়াগাড়ি করে দূরের পথে রং-বেরঙের ছবি, যেন আমরা অচিন দেশের পথিক। দোলাইর খাল (আমরা এখনকার মতো 'ধ' বলতাম না), দোলাইগঞ্জ ইস্টেশন, ধ্বনিতেই আস্বাদ। লোহারপুলের নামে ছিল রোমাঞ্চ, আলাদা আকর্ষণ। কেমন দুদিকে উঁচু স্তম্ভের মাঝে এক জোড়া লোহার শিকল রাস্তার সঙ্গে বেঁধে আছে। রাস্তার চড়াই-উতরাই মিলিয়ে ঘোড়াগাড়ি বা সাইকেলের গতি। নিচে খাল, তাতে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া নৌকো; খাল নাকি কিছু দূর গিয়ে বুড়িগঙ্গায় মিশে যায়। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য, যেমন রোডস দ্বীপের পিত্তল মূর্তি, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান, এই ফর্দ জানতাম। তাজমহলকে অষ্টম আশ্চর্য বলা উচিত কি না, এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চলত, ব্রিটিশ সরকার কেন এটা করছে না, দাদা সমীর সরকারের বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। আমি অতশত বুঝলাম না, মনে হতো লোহারপুলের মতো আর কি কিছু আছে? একে সবচেয়ে প্রধান, প্রথম আশ্চর্য করে দেওয়া উচিত। এসব ভাবনা নিয়ে নানা মনোরম মনভরানো দৃশ্যের পর 'কিল চড় নাই'র দেশ মামাবাড়ি গেণ্ডারিয়া পৌঁছে যেতাম।

গেণ্ডারিয়ার ইতিহাস ঢাকার অন্যান্য এলাকার থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। শহরের মহল্লা দোলাইগঞ্জ ও শরাফতগঞ্জে মোগল শাসনের আগে থেকেই মুসলমানদের বসতি ছিল। ধূপখোলার মাঠ ছিল বিরাট গোরস্তান। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে। মনে হয় এই দুই মহল্লার মধ্যে কোনো এক অঞ্চলের নাম ছিল গেণ্ডারিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে গেণ্ডারিয়া এলাকায় কিছু হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবার বসবাস শুরু করে। এটা কী করে সম্ভব হলো জানি না।

হৈমবতি সেন[২] তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে মুন্সীগঞ্জ থেকে নদীপথে বুড়িগঙ্গার কোনো ঘাটে তিনি ঢাকা পৌঁছে সোজা যান 'গেণ্ডারিয়া'। ওখানে গিয়ে ওঁর মনে হলো, 'একটি নতুন গ্রাম সৃষ্টি হচ্ছে। সারি সারি খড়ের বা টিনের চালের বাড়ি, একটু কাছাকাছি, প্রায় লাগোয়া। জায়গাটি মনোরম।' সময় ছিল ১৮৮৮ বা ১৮৮৯। এক শতাব্দী পর ১৯৮৮-তে অজিতকৃষ্ণ বসু লিখেছেন, 'ঢাকা শহর, বিশেষ করে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যবান গেণ্ডারিয়া অঞ্চল (সেখানে আমার তিন পুরুষের বসতবাড়ি) এবং শহরের পাশ দিয়ে চলা বুড়িগঙ্গা নদী ছিল আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।'[৩]

১৮৯৮-তে ইংরেজ সরকারের আদেশে দোলাইগঞ্জ ও শরাফতগঞ্জ একত্র করে নতুন বসতি হলো, পুরো এলাকার নাম গেণ্ডারিয়া। ঢাকা শহরের আইনজীবী ও কোর্টের কর্মচারীদের জন্য এই ব্যবস্থা, তবে ধীরে ধীরে কোর্টের বাইরের অনেকেও এখানে জমি পেয়ে গেলেন। পুরনো বাসিন্দাদের অন্যত্র যেতে হলো, যেমন আজো যেতে হয়। পাড়ার নাম বদলালে কী হবে, স্টেশনের নাম বহুকাল রয়ে গেল 'দোলাইগঞ্জ' আর পোস্ট অফিস কোনো কারণে 'ফরিদাবাদ'।

এ পাড়ায় পাকা দালান শুরু হয়েছে ১৯০১-এ আইনজীবী দীননাথ সেন ও রজনী চৌধুরীর বাড়ি দিয়ে। এরপর অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন চাকরিজীবীরা এখানে বাড়ি করলেন — হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবার মিলিয়ে হলো নতুন গেণ্ডারিয়ার যেদিকটা আমি জানি। হৈমবতি সেন লিখেছেন, ওঁর সময় হিন্দুরা ব্রাহ্মদের জল স্পর্শ করতেন না, কেউ করলে তাঁর হাতের জল স্পর্শ করতেন না।[৪] বিংশ শতাব্দীতে এই ভেদ ক্রমে ক্রমে কমে গেলেও হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে, সামাজিক সম্পর্ক দেখিনি বরং ব্রাহ্মদের নিয়ে পরিহাস শুনেছি। জল স্পর্শ না করলেও ব্রাহ্মদের উপস্থিতি গেণ্ডারিয়ার সমাজকে প্রভাবিত করেছিল, বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে। যতদূর জানি ইডেন ফিমেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, এ পাড়ায় থাকতেন। বিধবা বিবাহ যাতে স্বীকৃতি পায় আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ হয়, এই প্রচেষ্টায় তিনি ও অন্য ধর্মপ্রচারকরা বহু কাজ করেছেন।

সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী মুসলমান পরিবারদের বসতি, অবস্থাপন্ন বা সাধারণ, ছিল আলাদা; দোকান-বাজার, মিলেমিশে থাকত। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্পর্ক দেখিনি, তবে আমার আইনজীবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামার মুসলমান মক্কেলরা সহজেই বৈঠকখানা ঘরে আসতেন। চা-জলখাবার পাঠাতে বাধা ছিল না। সমাজে মেয়েরা যত চট করে অপবিত্র হয়ে যান, পুরুষ তা হন না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, সম্ভবত ১৯১৩ সালে আমার দাদামশায়, উপেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, গেণ্ডারিয়ার সতীশ সরকার রোডে, জালিওয়ালা মাজার লাগোয়া 'উমাকুটির' নামে বাড়ি করেছিলেন। উমা তাঁর মায়ের নাম ছিল। আদি বাস বিক্রমপুরে, মহেশ্বর্দীর কোনো গ্রামে, 'জাঙ্গালিয়া' হতে পারে, উনি কবে, কীভাবে ঢাকা এসেছিলেন জানা নেই। গেণ্ডারিয়া অঞ্চলের সম্মানিত ব্যক্তি বলে তাঁর কথা শুনেছি।

দাদামশায়, তখনকার দিনের নামকরা Jute Purchasing Company, Nehapith & Co-এর Head বা বড়বাবু ছিলেন। ওঁকে ডাকাই হতো বড়বাবু। Head হিসেবে উনি ছিলেন কোম্পানির chief purchaser. আমি তাঁকে দেখিনি বলা উচিত, কারণ আমার কুড়ি দিন বয়সে তিনি হঠাৎ করে মারা যান। প্রবীরদা[৫] লিখেছেন, 'উপেন্দ্রচন্দ্র খুব ভালো ইংরেজি লিখতেন, হাতের লেখাটিও ছিল মুক্তোর মতো। আর ছিল বই কেনা ও পড়ার নেশা।' বিস্তৃত কিছু না জানলেও বুঝতে পারি উনি উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন এবং শিক্ষার প্রতি সম্ভ্রম ছিল।

দিদিমা হেমেন্দুবালা ঢাকা জেলার মহেশ্বর্দী পরগনার 'বানিয়াদি' গ্রামে এক শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে ছিলেন। ছোটবেলায় পাঠশালায় পড়েছেন এবং তখনকার দিনে মেয়েদের পক্ষে যতটা লেখাপড়া করা সম্ভব ছিল তা তিনি করেছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ ছিল; পুত্রবধূ বই পড়া, আলোচনা করা, কিছুতেই বাধা পাননি, বরং উৎসাহ পেয়েছেন। শিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষা ও মেয়েদের আত্মনির্ভর হওয়ার প্রয়োজন — এই বিশ্বাস তিনি কোনোদিন হারাননি। জন্ম ১৮৮০-তে,[৬] বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে। শ্বশুরবাড়ি ঢাকায় এসে যৌথ সংসারের দায়িত্ব সেই বালিকা বয়সেই নিতে হয়।

দিদিমা তাঁর জীবনদর্শন পেয়েছিলেন বড় দাদা অখিলবন্ধু সেনগুপ্তের কাছ থেকে। বড় দাদার মতোই তাঁর ছিল 'মেদহীন সুঠাম দেহ, রং পরিষ্কার, তবে উচ্চতা সাধারণ।' সাল ১৯০০-তে তোলা একটি ফটো আছে দাদু-দিদিমার, তাঁদের দুই কন্যাসহ। দাদু ধুতি ও বন্ধগলা কোট পরিহিত, পায়ে জুতো, মোটাসোটা, গোঁফ-দাড়িযুক্ত ভালো মানুষ। মেয়ে দুটি, বয়স পাঁচ ও দুই, অবাক নয়নে সামনে তাকিয়ে আছে। রং বলতে পারি না, দিদিমা সম্বন্ধে বাকি বর্ণনা মিলে যায়। আধঘোমটা দিয়ে তেপেড়ে শাড়ি, চুল আঁট করে বাঁধা, চোখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপ। পায়ে চটি নেই। ফটোর উৎসর্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখযোগ্য : 'বাবু উপেন্দ্রচন্দ্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের উপহার। (ছবি তোলা মার্চ মাসের ৩ তারিখ, ১৯০০) ইতি... ।' এরপর স্টুডিওর নাম, যা বহুকষ্টেও পড়তে পারিনি। তখনকার দিনের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন পরিবারের বাসস্থানের মতো উমাকুটির ছিল খোলামেলা, ছড়ানো, গাছপালা, বাগান দিয়ে ঘেরা যৌথ সংসারের বাসের উপযুক্ত, বড় বাড়ি। আমার স্মৃতি পরের, প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন প্রবীর (দাশগুপ্ত), যিনি জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর (১৯১৮-১৯৪২) এ বাড়িতে কাটিয়েছেন।

"আমাদের গেণ্ডারিয়ার বাড়িটাকে একটু মনে করার চেষ্টা করি।

উপেন্দ্রচন্দ্র গেণ্ডারিয়ায় বাড়ি করার আগে থাকতেন ফরিদাবাদের ভাড়া বাড়িতে — গেণ্ডারিয়ার বাড়ি থেকে যার দূরত্ব ছিল মাইলখানেক। গেণ্ডারিয়ার বাড়িটার নাম ছিল 'উমাকুটির' — দাদামশাইয়ের মায়ের নামে। বাড়িটা ছিল একবিঘা জমির ওপর। সেখানে ছিল বড় বড় দুটো দালান। এছাড়া গেট দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে ছিল একটি বড় বৈঠকখানা। সেখানে পাটের ব্যাপারীরা এসে থাকত এবং পাটসংক্রান্ত আলোচনা হতো। গেটের বাঁদিকে ছিল বড় ফুলের বাগান, যার পরিচর্যা করত একজন মালি। ডানদিকে বৈঠকখানার পরেও ছিল একফালি বাগান। বাগান পেরোলেই প্রথম দালানবাড়ি, সেখানে ছিল চারটে বড় বড় ঘর, যার সামনে ও পেছনে ছিল দুটো বড় বারান্দা। তারপর ছিল খুব বড় উঠোন। উঠোন পেরিয়ে ছিল আরো একটি বড় দালান, যার ছাদ ছিল টিনের। বারান্দার সিঁড়ির নিচে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছিল ঝাউয়ের মতো বড় দুটি গাছ। আজো মনে পড়ে, ওই দুটো অনেকদিন পর্যন্ত ঝাউগাছ বলেই জানতাম। আমার ছোট মেসো প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. অমিয়কুমার দাশগুপ্ত প্রথম বুঝেছিলেন যে, ওই দুটো ঝাউগাছ নয় — চন্দন গাছ। উঠোনের বাঁদিকে ছিল নিরামিষ রান্নাঘর। আর আসল দালানবাড়ির ঠিক উলটোদিকে আরো একটি একতলা দালান ছিল, যার ওপরে ছিল টিন। সেখানে আমার বড়দা ও মেজদা (মুকুল ও বকুল) পড়াশোনা করতেন। এছাড়া পরিচারক ও পরিচারিকাদের ঘরও ছিল — ছিল একটি পাকা পাতকুয়া। একটি আলাদা বড় আমিষ রান্নাঘরও ছিল এই গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে। সেখানে আমরা খাওয়া-দাওয়া করতাম। এরপর ছিল সবজি বাগান ও ফলের বাগান। ছিল আমগাছ, করমচা গাছ, সজনে গাছ ইত্যাদি। নিরামিষ রান্নাঘর ও দালানবাড়ির মাঝে ছিল একটি তুলসীমঞ্চ।"

আমার বিশেষ করে মনে পড়ে সবুজ ক্যাকটাসবেষ্টিত দেয়াল (বা পাঁচিল), ক্যাকটাসের মাঝে টকটকে লাল ফুল। দেয়াল খুব উঁচু ছিল না, তার ওপর লাগানো ছিল রং-বেরঙের ভাঙা কাচ, যেন ক্যাকটাসের কাঁটার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। লোহার জালির গেটের ও পর লেখা 'উমাকুটির', দুদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগানের মাঝে লাল সুরকির রাস্তা। রাস্তা শেষে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠলে পাহারাদারের মতো দুটি গোলাকার থামকে আলিঙ্গন করা প্রশস্ত বারান্দা, যেখানে আরামকেদারা ইত্যাদি রাখা। দৃশ্যের মধ্যে আভিজাত্য ছিল।

আমার কাছে বারান্দার বৈশিষ্ট্য ছিল এর ছাদে ঝোলানো পেল্লায় বড় পাখা। কারো টানার অপেক্ষায়। টানার দড়ি পোক্ত, নানাভাবে সুতো জড়ানো, নিচে ঝুমকোর মতো ট্যাসল। আমরা ছোটরাই মাঝে মাঝে টানার চেষ্টা করেছি, কারণ আমাদের ছোট অবস্থায় দাদামশায় চলে যাওয়ার সঙ্গে পাখা টানার প্রথা উঠে গেল — হাতপাখা ব্যবহার হতো। কিছু দিন পর বসার ঘর হলো, বারান্দার প্রয়োজনও কম হয়ে গেল। আরামকেদারার পেছনে ছিল একটি বিরাট ঘড়ি — রাস্তা থেকে দেখা যায় এভাবে রাখা। বাড়ির সামনে দিয়ে যারা হেঁটে স্টেশনে যেতেন, বেশিরভাগ তো হেঁটেই চলাফেরা করতেন, তাদের সাহায্যের জন্য ঘড়ি। সময় দেখে কেউবা পদক্ষেপ একটু দ্রুত করবেন, কেউবা ধীরে, দাদামশায়ের মনে এই ছিল। গেটের কাছে বড় ঘড়া বা কলসিতে জল থাকত পথিকদের জন্য। এখন মনে হয়, যারা মাজারে আসতেন তাদের তৃষ্ণা কি এতে নিবারণ হতো? কে জানে।

এক কোণে নজরে আসত কোমর উঁচু তুলসীমঞ্চ, সান্ধ্যপ্রদীপের মঞ্চ। তুলসী পবিত্র, এর হাওয়া, আশীর্বাদে পরিবারের মঙ্গল হয় — এই ছিল বিশ্বাস। ২০০৩ সালে (১ আগস্ট) নানা স্মৃতির মাঝে ভাইজান মো. শামসুর রহমান আমাকে লিখেছিলেন, 'বারবার কানে বাজে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা আর শাঁখের শব্দ। চোখে এখনো ভাসে তুলসীমঞ্চের ছোট্ট গাছটি, যার প্রতি ঘরণীর যত্ন ঘরের শিশুটির চেয়ে কিছু কম নয়।'[৭]

উমাকুটিরের ঘরগুলো ছিল বড়, তার স্বচ্ছ, লাল-কালো মেঝেতে হাঁটতে খারাপ লাগত। পেছনে প্রশস্ত বারান্দা, খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজবের জন্য। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন, বাঁদিকে নিরামিষ ও আমিষ রান্নাঘর। সেখানে আমাদের যাতায়াত বেশি রকমের ছিল, উপাদেয় খাদ্য থাকত যে! এরপর সারি সারি ঘর; দু-একটিতে ভাঁড়ার ও ঘরগেরস্তির জিনিসপত্র, বাকি — যারা গ্রাম (মহেশ্বরদী, জাঙ্গালিয়া) থেকে শহরে চাকরি করতে আসতেন আর পরিবার আনতে পারতেন না, তাদের জন্য। এদের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল না ঠিকই, তবে গ্রামের সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন। পেছনের একটা ঘরে থাকতেন রেবতীদা। লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা, দাদু-দিদিমার অনুগত, সব কাজে সাহায্যরত, ইনি ছিলেন মায়েদের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য দাদা। কাজ থেকে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে, সন্ধ্যেবেলা পড়তেন *রামায়ণ*, *মহাভারত*। কানে বাজে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'*মহাভারতে*র কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান।' রেবতী মামার একটা কাজ ছিল, বাড়ির বা গ্রামের কোনো মেয়ের বিয়ে হলে অন্য গুরুজনদের সঙ্গে বর-কনেকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া। গহনাগাটি যতই থাকুক, রেবতীদা থাকলে চিন্তা নেই।

ওঁর সম্বন্ধে গল্প আছে, আমার এক মাসিমাকে যথারীতি তাঁর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেছেন। মাসিমা গৃহকর্মের থেকে গাছে চড়তে ভালোবাসেন — তাই তাঁর অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়া হলো। শ্বশুরবাড়িতে নববধূকে কোনো প্রবীণা জিজ্ঞেস করলেন, 'বৌমা, তুমি রাঁধতে জানো? কী রাঁধতে পারো?' বৌমা সত্যি কথাটা বলার আগেই তাঁর রেবতীদা বললেন, 'আরে কন কি, এক ভাতই তো পাঁচ রকমের রাঁধতে জানে।' শুনে মহিলারা খুশি বা স্তব্ধ হলেন। গেণ্ডারিয়া ফেরার পর সঙ্গের সবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'রেবতীদা, তুমি এইটা কী কইলা? যত বাজে কথা।' রেবতীদার উত্তর, 'ক্যান — পাঁচ ক্যান? বেশি জানে — পোড়া ভাত, গলা ভাত, শুকনা ভাত — অ্যার কি শ্যাষ আছে?'

'হেমেন্দুবালা এই উমাকুটিরে বিরাট পরিবার নিয়ে সংসার করতেন। তিনি পাঠশালায় পড়াশোনা করেছেন শুনেছি, তবে তা কতদূর আমি জানি না। কত বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, তাও আমার অজানা। আমার দিদিমার ছিল তিন মেয়ে দুই ছেলে, বড় আমার মা বিদ্যুৎপ্রভা, মেজ পারুলপ্রভা (যাঁকে আমরা অনেক সময় মেজদিমাসিমা বলে ডাকতাম), তারপর আমার মামা গোপেন্দ্র চন্দ্র, ছোট মাসি শান্তি ও সবশেষে ছোট মামা জীবনকৃষ্ণ। এছাড়া হেমেন্দুবালার পরিবারে ছিল উপেন্দ্রের মৃত ভাইয়ের এক ছেলে আর তিন মেয়ে, যাদের তিনি প্রতিপালন করতেন আর ছিল উপেন্দ্রের বিধবা ভ্রাতৃবধূ, যাকে আমার মামা-মাসিরা ডাকতেন 'খুড়িমা' বলে। দাদামশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র দাদামশায়ের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন। আমার দাদামশায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদেরও বিয়ে দেন। সুতরাং সবাইকে নিয়েই হেমেন্দুবালার ছিল বিরাট সংসার। এছাড়া ছিলেন রেবতীভূষণ, যিনি চাকরি করতেন দাদামশায়েরই কোম্পানিতে। পরে তিনি পরিবারের একজন হয়ে গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে বসবাস করতেন। দাদামশায়ের বোনের ছেলে খগেন্দ্রচন্দ্র তার মামা-মামির কাছে থেকে পড়াশোনা করতেন, বোধহয় ইঞ্জিনিয়ারিং।'

দিদিমার বিধি-ব্যবস্থায়, বিবেচিত নজরে ভালোমন্দ মিশিয়ে উমাকুটিরের বিরাট সংসার তার নিজের ছন্দে চলছিল। হঠাৎ এলো বজ্রাঘাত। সামান্য ঝাঁটার কাঠি আঙুলে ঢুকে ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যু হলো বড় মেয়ে বিদ্যুৎপ্রভার (সাল ১৯১৮)। পাঁচটি সন্তান রেখে তিনি চলে গেলেন, প্রবীরদা শিশু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মেয়ের মৃত্যুশোক এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল হেমেন্দুবালাকে যে, তিনি মনে করেছিলেন চিকিৎসার অবহেলা তাঁর মেয়ের মৃত্যুর কারণ। তাই তিনি পাঁচ নাতি-নাতনিকে নিজের কাছে এনে রাখলেন — ভরসা পেলেন না অন্যদের হাতে ছাড়তে। সেই থেকে আমরা চার ভাই, মুকুল, বকুল, মিহির, প্রবীর ও বোন বীণা মামাবাড়িতে মানুষ।[৮] চোখ মেলে তাঁকেই (হেমেন্দুবালাকে) প্রথম দেখি, মা বলে ডেকেছি।'

সংসার আরো বড় হলো, দাদু-দিদিমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। শোক মনের কোণে লুকিয়ে রেখে দিদিমা ছেলেমেয়েদের বড় করলেন, সংসার দক্ষতার সঙ্গে চালালেন, জীবনের গতি আবার ছন্দ নিলো, বাড়ি হলো সরগরম। মায়েরা যখন বড় হয়েছেন রোজ দুবেলা চল্লিশজনের রান্না হতো। নাতিদের বন্ধু-বান্ধব, পেছনের ঘরের সবাই, গ্রাম থেকে আসা অতিথি, চল্লিশজন সদস্য থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। স্কুল, কলেজ, অফিস, সবকিছু নিয়ে শ্বাস ফেলার সময় নেই, তার মাঝেই মায়েদের ছেলেবেলা আনন্দে কেটেছে।

বড় মেয়েকে হারানো দাদু-দিদিমার প্রথম আঘাত নয়। মেজ মেয়ে পারুলপ্রভা, কোঁকড়া চুল, ফর্সা, পাতলা ছোটখাটো, সাবলীল, চেহারায় মিষ্টত্ব ছিল। পড়াশোনায় তেমন মন ছিল না, তাই বিয়ে দেওয়া হলো বারো বছর বয়সে, কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন পরিবারে। এদের জমিজমা ছিল যথেষ্ট। পাত্র কলকাতায় ওকালতি পড়েন, ভাশুর 'জজ' হওয়ার পথে। ১৯১০-এ এদের বিয়ে হলো। ননদের সঙ্গে খেলা করে, লেখাপড়া, ঘরকন্নার কাজ শিখে হাসিখুশিতে চার বছর কাটল। হঠাৎ করে টাইফয়েডে ভুগে মাসিমার স্বামী মারা গেলেন, মাসিমার বয়স তখন ষোলো, সাল ১৯১৪। শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর মুছিয়ে, থান কাপড় পরিয়ে বালিকা পারুলপ্রভাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পিতৃগৃহে, ভাশুর তাকে রাখতে রাজি নন।

শোকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে হেমেন্দুবালা তখনকার দিনের গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা থেকে একাই কুমিল্লায় তার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখা করেন মাসোহারার বন্দোবস্ত করতে। তাঁরা মাত্র পঁচিশ টাকা মাসে দিতে রাজি হলেন, সেটাও ঠিকমতো আসত না। কয়েক বছর পর একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তবে পারুলপ্রভা শেষদিন পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গেছেন — কিছু পাওয়ার আশায় নয়।

ন্যায্য পাওনা ও স্ত্রীশিক্ষার ওপর ১৮২৪ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের লেখা 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন'[৯] উল্লেখযোগ্য।

'প্রশ্ন। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিল এ কেমন ধারা।

উত্তর। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এতকালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্রশ্ন। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমাদের ভালোমন্দ কী।

উত্তর। শুন লো। ইহাতে আমাদের ভাগ্য বড় ভালো বোধ হইতেছে। কেননা এ দেশের স্ত্রীলোকরা লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মতো অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর-দ্বারের কাজ-কর্ম্ম করিয়া কাটায়।

প্রশ্ন। ভালো। লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কাজ-কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর-দ্বারের কাজ, রাঁধা-বাড়া, ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উত্তর। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতো দুই দণ্ড লেখাপড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া-পড়িয়া নিতে পারে।'

গণ্ডা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল মাসিমা-দিদিমার; লাভ হয়নি। মাসিমার ঘরসংসার হলো না, নিজের বলে কিছু পেলেন না, কখনো অনুকম্পা, কখনো বিরক্তি বা তাচ্ছিল্য, আবার কোনো সময় ভালোবাসা পেয়ে, পরনির্ভর হয়ে বৈধব্যের বেশে কাটিয়ে দিলেন ছেষট্টি বছর। জন্ম ১৮৯৮, মৃত্যু ১৯৮০।

আমি দিদিমাকে দেখেছি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। ওঁর ব্যক্তিত্বের ও কর্মজীবনের ছবি পাই প্রবীরদার স্মৃতিতে।

'এত কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও হেমেন্দুবালা ঘরকন্নার কাজ ছাড়াও নিজেকে বিভিন্ন দিকে নিযুক্ত রাখতেন। রাঁধতেন বড় সুন্দর। ধার্মিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কখনই কর্তব্য বাদ দিয়ে ঠাকুরঘরে পড়ে থাকতেন না। শোবার ঘরের মধ্যেই ঠাকুরের জন্য জায়গা করে আসন পেতেছিলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় যেটা ছিল তাহলো, তাঁর বই পড়ার নেশা। তখনকার দিনে আমাদের বাড়িতে *বঙ্গদর্শন*, *ভারতবর্ষ*, *মাসিক বসুমতী*, *প্রবাসী*, *মানসী*, *মর্মবাণী* পত্র-পত্রিকা আসত। সেগুলো ঘরকন্নার নানা কাজের মাঝেও হেমেন্দুবালা মন দিয়ে নিয়মিত পড়তেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত পত্র-পত্রিকা তিনি বাঁধিয়ে আলমারিতে রাখতেন। আলমারি ভর্তি বই ছিল তাঁর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত ছিলেন খুব। রামকৃষ্ণ দেবের *কথামৃত* পড়তেন বারবার। *উদ্বোধনী* পত্রিকাটি (রামকৃষ্ণ মিশনের) নিয়মিত আসত আমাদের বাড়িতে। পাড়ার বয়স্ক মহিলারা, যারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ তেমনভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাননি, তাদের ডেকে শরৎবাবুর বই, নানা পত্র-পত্রিকা থেকে প্রবন্ধ, গল্প, *রামায়ণ*, *মহাভারত* পড়ে শোনাতেন, এমনকি রামকৃষ্ণ দেবের *কথামৃত*ও। আজ অনেক জায়গায়ই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সরকারও বয়স্ক শিক্ষায় যথেষ্ট সচেষ্ট। তখনকার দিনে হেমেন্দুবালাও কিন্তু নিজের বাড়িতে ডেকে এনে বই পড়ে শোনাতেন, কাউকে কাউকে অক্ষরও চেনাতেন, বাইরের খবরাখবরও বলতেন। বয়স্ক শিক্ষা প্রবর্তন বা চালু করা তাঁর চিন্তায় স্থান পেলেও তা কোনো অনুষ্ঠানের রূপে কার্যকর করতে পারেননি, তা হয়তো তাঁর বিরাট দায়িত্বের ও নানা মানসিক টানাপড়েনের জন্য। যতটা করতে পেরেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল তিনি একজন প্রতিভাবান সচ্ছল মানুষের গৃহিণী বলে — ওঁর কাজে দাদামশায়ের পূর্ণ সহায়তা ছিল।'

শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মেয়েদের আত্মনির্ভর হওয়ার প্রয়োজন, এ বিশ্বাস দিদিমা কোনোদিন হারাননি। সাল ১৯৫২, নাতি প্রবীরের বিয়ের কথা চলছে, দিদিমা কলকাতায় নাতিদের কাছে। পরিবারের জ্যেষ্ঠ, দাদাদের ভগ্নিপতি, পাত্রী দেখে এলেন। পাত্রী অপছন্দ হয়েছে – তিনি সুন্দরী নন, রং ময়লা, চেহারা তন্বীর বিপরীত। দাদা সুপুরুষ, এই মেয়ে বেমানান। কোনো মেয়েকে দেখে এসে 'না' বলা, প্রবীরদার রুচিতে বাধল। তিনি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাত্রী সুন্দর না, তারা তো না কয়, তুমি কী কও?' দিদিমা তখন ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন, তাও দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, 'BABT পাশ, চাকরি করে, হুন্দর দিয়া করুম কী?'

বিয়ে হলো। নববধূ নিয়ে প্রবীরদা কলকাতা নিজেদের বাড়িতে এলেন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, নতুন বৌ কতটা বেমানান প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না। নতুন বৌমার মনের অবস্থা কীরকম হতে পারে সেটা চিন্তা করার সময় কারো ছিল না। বেরিয়ে এলেন দিদিমা — তাঁর রুগ্ণ, সরু হাত দিয়ে বৌকে জড়িয়ে, 'এই আমাগো লক্ষ্মী' বলে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের লক্ষ্মী তিনি হয়েছিলেন।[১০]

'সংগীত, নাটক, আবৃত্তির ওপরও তাঁর (হেমেন্দুবালার) গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর বড় ছেলে গোপেন্দ্র চন্দ্র (আমার বড় মামা) বিএল পাশ করলেও ছিলেন জন্মগত সুরের অধিকারী। হেমেন্দুবালা ছেলেকে গান-বাজনায় উৎসাহ জোগাতেন। গোপেন্দ্র চন্দ্র তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের গানগুলো একবার শুনেই তুলে নিতে পারতেন। এই প্রতিভা দেখে তার মা তাকে একটি organ কিনে দেন। তখনকার দিনে 'ডোয়ারকিনের' organ ঢাকা শহরে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের বাড়িতে ছিল। শুনেছি আমার দিদিমা organ-এর ওপর কম্বল ফেলে মামাকে বাজাতে বলতেন, organ-এর প্রতিটি পর্দা না দেখেও যাতে তার নখদর্পণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে, তাই এ ব্যবস্থা। নিজে গান-বাজনা না করলেও কীভাবে চালনা করলে একজনের উন্নতি হয়, সে ব্যাপারে বুদ্ধি রাখতেন যথেষ্ট।

নাটক ছিল হেমেন্দুবালার খুব প্রিয়। ঢাকা থেকে যখনই কলকাতায় আসতেন, নাটক না দেখে যেতেন না। আজ জীবনসায়াহ্নে এসে মনে পড়ছে তাঁর কোলে বসে *কর্ণার্জুন* নাটক আমি দেখেছি।

অনেক বড় মাপেরও মানুষ ছিলেন আমার দিদিমা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। এতটুকু দ্বিধা করতেন না। যেখানে যখন অন্যায় দেখেছেন দ্বিধাহীনভাবে তার প্রতিবাদ করেছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে বলে রাখি, তখন ভাওয়াল সন্ন্যাসীর ঘটনার হাওয়া ঢাকা শহরকে তোলপাড় করে চলেছে। দিদিমা নানা পত্র-পত্রিকায় ভাওয়াল সন্ন্যাসী সংক্রান্ত সমস্ত লেখা বা ঘটনা পড়তেন। মনে পড়ে আমার মেজ মাসিমা পারুলপ্রভার ভাশুর রমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত একবার ঢাকায় এসেছিলেন সরকারের প্রতিনিধি হয়ে 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার' সাক্ষ্য দিতে। আমার দিদিমার ছিল এক আলাদা রকম ব্যক্তিত্ব। হেমেন্দুবালা ছিলেন ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পক্ষে আর রমেশচন্দ্র এসেছিলেন বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে। রমেশচন্দ্র অতিথি, তাই তাকে যত্নের কোনো ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু সন্ন্যাসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসা রমেশচন্দ্রকে কটুকথা বলতেও কসুর করেননি। সামান্য গৃহবধূর তখনকার দিনে এতটা ন্যায়নীতি বোধ এবং সেই 'নীতিবোধ'কে আঁকড়ে ধরে স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করা খুব কমই দেখা যেত। 'কুটুম্ব' রমেশচন্দ্র যতটা যত্ন পেয়েছেন, খাতির করা হয়েছে আত্মীয় এবং অতিথি হিসেবে — ততটাই কটুকথা শুনেছেন সন্ন্যাসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসার জন্য। সময়টা আমার মনে নেই, তবে আমার ছোট মাসিমার তখনো বিয়ে হয়নি।

যুক্তি-তর্ক-আলোচনা দিদিমার চিন্তাধারার অংশ ছিল; ওঁর যুক্তি দিয়ে বিচারের একটি উদাহরণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা। সাল ১৯৫৩ — আমি আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে তিন বছর মা-বাবার সঙ্গে থেকে স্কুল পাশ করে দেশে এসে সোজা কাশীতে গিয়েছি কলেজে পড়ব বলে। দিদিমা-মাসিমার কাছে প্রথম উঠেছি। আমার ষোলো বছর পূর্ণ হয়নি, ছোট মেয়ে একা এতদূর থেকে এসেছি — মাসিমা মানত রেখেছিলেন আমি ঠিকমতো বাড়ি পৌঁছলে সোনার বেলপাতা দিয়ে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দেবেন। মন্দিরে নিয়ে গেলেন আমাকে, সবাই তাঁর পরিচিত ও সোনার বেলপাতার কথা জানেন, আমাদের ভিড় এড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢোকানো হলো, মাসিমার মনমতো পুজো হলো। সদ্য আমেরিকাফেরত আমি, অত ঘি ও দুধের অপচয় দেখে ক্ষুণ্ণ হলাম।

বাড়ি এসে একসময় মাসিমা বললেন যেন কাউকে উদ্দেশ করে নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনিই, 'ওরা কয়'। জিজ্ঞেস করলাম, 'কারা কয়, কী কয়?' উত্তর এলো, 'এই আর কি — পাণ্ডারা কইতে আছিলো প্রায়শ্চিত্ত করনের কথা।' আমি কালাপানি পার করে এসেছি, অনুষ্ঠান করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি প্রতিবাদ করার আগে আমার সত্তর বছরের ওপর বয়সের দিদিমা, তেজস্বরে অসন্তুষ্ট হয়ে জবাব দিলেন, 'প্রায়শ্চিত্ত, কিসের প্রায়শ্চিত্ত? কোন পাপ সে করেছে? মা-বাবার সঙ্গে বিদেশ গিয়ে একটা ভিন্ন জগৎ, বৃহত্তর পৃথিবী দেখে, পড়াশোনা করে দেশে ফিরেছে। প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? আমি এসবে বিশ্বাসও করি না। তুমি থামো।' অবাক লাগে ভেবে যে, ১৯৫৩-তে প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠতে পারে, আর দিদিমার মতো ধার্মিক মানুষ অনায়াসে পুরোহিত-পাণ্ডাদের বিধান খণ্ড করতে পারেন। উনি ধার্মিক ছিলেন, ধর্মভীরু ছিলেন না।

এই যুক্তি-তর্কে বিশ্বাসী মানুষটিকে একবার 'যুক্তিস্খালন' করতে দেখেছিলাম। উনি *মহাভারত* কাব্যের ভক্ত ছিলেন, গভীরভাবে এর পড়াশোনা করেছিলেন। নাতিরা যখন ১৯৪৪-এ ওঁকে তীর্থযাত্রায় পাঠালেন, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা ইত্যাদি ঘুরে উনি সর্বশেষে গেলেন কুরুক্ষেত্র, ঐতিহাসিক রণক্ষেত্র নিজের চোখে দেখতে। ফিরে এসে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'দেইখা আসলাম কুরুক্ষেত্র, *মহাভারতের* যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র — কি কালা, কি কালা, সব কালা!!' দাদা যতই বোঝান *মহাভারত* নেহাতই কাব্য, এ ঘটনার সত্যতার প্রমাণ নেই। তাছাড়া তীর-ধনুকের যুদ্ধে, যুদ্ধের প্রাঙ্গণে ফুটো থাকতে পারে, কালো কেন হবে? তাও এত বছর পরে? দিদিমা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, 'অগ্নিঅস্ত্রে সব পুইড়া কালা হইয়া গেছে।' কাহিনিতে এত ডুবে গিয়েছিলেন যে, বোধহয় তাঁর কল্পনাশক্তি রণপ্রাঙ্গণকে কালো করে দিয়েছিল। আবার মনে হয়, কে জানে, তীর্থযাত্রীদের সন্তুষ্ট করার জন্য হয়তো কোনো বিশাল মাঠ 'কালা' করে রাখা হয়েছিল। কখনো ভাবি হয়তোবা যুগ যুগ ধরে এ মাঠ স্বাভাবিকভাবেই কালো।

দাদামশায় কাজে ব্যস্ত থাকতেন, দিদিমার উৎসাহ ও প্রেরণায় মামাবাড়ির পরিবেশ হয়ে উঠেছিল পড়াশোনা, খেলাধুলা, সংগীত, রাজনীতি নিয়ে, বইপত্র নিয়ে, তর্ক-আলোচনা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুত্ব, ভালোবাসার। শিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার ওপর জোর ছিল, তাই বাড়ির মেয়েদের বাসে করে ইডেন স্কুলে পাঠাতে দ্বিধা করেননি দাদু-দিদিমা। উঁচু স্থান ছিল সংগীতের — বড় মামা ও মা দুজনেই স্পিনেট[১১] বাজিয়ে গান করতেন। মা রবীন্দ্রসংগীত,[১২] মামা ঠুমরি ও অতুলপ্রসাদের গান। অতুলপ্রসাদ সেনের মাসি কাছে থাকতেন। উনি মাসিবাড়ি এলে বড় মামা পৌঁছে যেতেন গান শিখতে, গান নিয়ে আলোচনা করতে। মামার কণ্ঠে দরদভরা 'ওগো নিঠুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরদি' যেন আর শুনিনি। আর মনে পড়ে, 'বাগিচায় বুলবুলি তোর ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।' ভগবানদত্ত সুরেলা গলা ছিল ওঁর।

ঠুমরি গায়ক হিসেবে মামার সুনাম ছিল। একবার লখ্‌নৌ গিয়েছেন কোনো সংগীত সম্মেলনে গাইতে। গায়ক-তবলাবাদকের লড়াই চিরাচরিত। মামা গ্রিনরুমে রেয়াজ করছেন, তবলাবাদক বললেন, 'আমি আজ এক বড় ওস্তাদের সঙ্গে বাজাচ্ছি। দেখো আমার তবলার কেরামতিতে তাকে কীভাবে পরাজিত করি।' মামা ঘাবড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে আপনি আমার সঙ্গে কী করবেন?' জবাব এলো, 'তুমি তো ছেলে মানুষ — আমার তবলার বোল দিয়ে তোমার গান উঁচু করে তুলে ধরব।' আঙুল নাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন কী করে সেটা সম্ভব হবে। সে যাত্রা মামা প্রশংসা অর্জন করে ফিরেছিলেন, তবলাবাদকের সঙ্গত গানকে সমৃদ্ধ করেছিল। সঙ্গতকারের যোগ্য সমাদর সবসময় হয় না। একটা সময় ছিল যখন তবলাবাদককে শুধুই সঙ্গতকার হিসেবে দেখা হতো, উচিত সম্মান দেওয়া হতো না। অপমানিত বোধ করে এঁরা জয়-পরাজয়ের কথা বলতেন। তরুণ কলাকারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঠত না।

শুধু গায়ক হিসেবে নয়, কলেজজীবনে হারমোনিয়াম বাদক হিসেবেও মামার খ্যাতি ছিল। একবার দিলীপ রায় এলেন ইউনিভার্সিটিতে গাইতে। মামা সঙ্গত করবেন শুনে প্রসন্ন হলেন না। এই ছেলেমানুষ, সে কী বাজাবে? পরীক্ষা নিলেন, দেখলেন ছেলেটি কর্ড ইত্যাদি দিতে পারদর্শী, বাজানোর হাত পরিষ্কার — রাজি হলেন, মামা বাজালেন তাঁর সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতমঞ্চে বহু অতিথি কলাকারের হারমোনিয়াম সঙ্গত করেছেন মামা। খাঁটি ঢাকার ছেলে; ঢাকা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা পরিবেশ থেকে দূরে যেতে কষ্ট হতো। বিকম পড়তে মামাকে বোম্বাই পাঠানো হলো, এক মাসের মধ্যে ফিরে এলেন — হোস্টেলে ধুঁধুল বা তেলাকুচ[১৩] রান্না হয়েছিল। খাদ্যরসিক, শহরের অলিগলির পোলাও-বিরিয়ানি, চপ-কাটলেট, উমাকুটিরের আমিষ-মিরামিষ রান্না — এ ছেড়ে কতদিনই বা থাকা যায়।

গান-পাগল, থিয়েটার-পাগল মানুষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পরও ওখানকার সংগীত ও থিয়েটার মহলের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। 'সংগীত সাহিত্য আড্ডা' পরিচ্ছেদে যে সংগীতপ্রেমীদের কথা লিখেছি, যাঁরা শাস্ত্রীয় সংগীতের খবর পেয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি, এমন্দির-ওমন্দির ঘোরাঘুরি করতেন, তার মধ্যে মামা ছিলেন একজন। গান নিয়ে এত মেতে থাকতেন যে, ওকালতি পাশ করেছিলেন কিন্তু উপার্জনের দিকে গেলেন না বহু বছর। পরিবারের পক্ষে সেটা ছিল ক্ষতিকারক, তাঁকে কাজে টেনে আনতে বহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর লেগেছে। যখন শুরু করলেন, প্রচুর সফলতার সঙ্গে করলেন — উমাকুটির ধনী গৃহে পরিণত হলো।

পরিবারের সবাই ১৯৪৮-৪৯-এ কলকাতা চলে এলেও মামা ঢাকা ছেড়ে আসেননি। শহরে তাঁর মক্কেল ভরা, আর এ তো চিরপরিচিত ঢাকা শহর। নবাবপুরে দুটি ঘর নিয়ে রইলেন, ভিসার প্রয়োজন নেই, কলকাতা যাতায়াত করায় অসুবিধা ছিল না। ভালো ছিলেন। ১৯৫০ কি '৫১ সালে, মাসিমার ভাষায়, 'শহরে দাঙ্গা। ঘরের সামনের দরজায় শিকল লাগাইয়া বাইর হইয়া গ্যাল যেন কাছেই কোথাও গ্যাছে, কেমনে যেন পলাইয়া কলকাতা আইল। আইর ফিরনের পথ রইল না।' 'ফিরনের পথ রইল না' সেটা চিরাচরিত দুঃখ-ট্র্যাজেডি। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে নতুন করে কিছু করতে মন বসত না — করতেন, কাজ করা উচিত তাই। অর্থকষ্ট ছিল না, বাড়ি ছিল, শুধু মন বসত না। কোথায় গেল গেণ্ডারিয়া, কোথায় গেল নবাবপুর, সুবোধমামার দোকানের আড্ডা, কোথায় সেই সুরের রেশ, ঘোড়ার পদধ্বনি, কোলাহল, যারা তাঁকে এত বছর নিবিড় বন্ধনে আবেষ্টিত করে রেখেছিল, আত্মীয়-পরিজন সমাজের মাঝে থেকেও মনের অন্তরালে উনি রয়ে গেলেন গৃহহারা বিদেশি।

গান ভালো গাইলেও মা কখনো কোনো সংগীতসভা বা অনুষ্ঠানে গান করেননি। ঘরের বাইরে গাইবার প্রয়াস ছিল বলেও শুনিনি। শান্ত, ধীর-স্থির, কিন্তু লাজুক, নিজেকে সবার সামনে জাহির করার শখ ছিল বলে মনে হয় না। নিরিবিলি পছন্দ করতেন, আবার কাছের মানুষদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জমিয়ে আড্ডা দিতেও ভালোবাসতেন। স্কুল-কলেজের কিছু বন্ধু, মামাবাড়ি, মাসিবাড়ির দিদিরা, বাড়িতে বোনপোরা — এদের সঙ্গে থাকলে এই চাপা মানুষটি প্রাণ খুলে হাসতেন, প্রাণ খুলে গল্প করতেন, মনের গভীর থেকে ভালোবাসা দিতেন। মেকি বন্ধুত্বে বিশ্বাস করতেন না।

মা ছিলেন তাঁর বাবা-মার আদরের মেয়ে, বড় মামার প্রিয় বোন। মাসিমা বলতেন, "মায়ে কোনোদিন বুচুর (মায়ের ডাকনাম) লগে গলা উচা কইরা কথা কয় নাই। সকালে দেরি কইরা ঘুমাইলেও না। সবার লাইগা কড়া হুকুম, উঠ, উঠ, বুচির বেলায়, 'বুচি উঠো'। কি হাসি হাসতাম। বাবার তো সব কাজে বুচি, সে বিছানা কইরা দেবে তবেই পছন্দ — আমরা যেন জানি না চাদর পাততে। আর তর মামা? বুচির বিয়ায় মাছ-মাংস কী হইব সব ঠিক হইল, তরকারি কী কী হইব? আলাদা কিছু তো করন লাগে। বিয়া তো শ্রাবণ মাসে, ফুলকপি কোথায় পাই, সেই কোন দার্জিলিং থিকা অর্ডার দিয়া ফুলকপি আনাইল গোপেন। আবার কয় কি জানস? 'মেজদি দ্যাখবা, কপি যেন বড় কইরা কাটে, ভালো বানায়। এক বাড়িতে খাইতে দিছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবলাম — কপি না তার প্রেতাত্মা?' লক্ষ্মী মাইয়া আছিল তর মা, খুব বুঝের। মনটা আমাগো মায়ের মতো — বি-রা-ট।"

বই পড়ার শখ ছিল চিরজীবন আর পছন্দের ছিল ভাষা নিয়ে চিন্তা করা, ইংরেজি ও বাংলা। শেষজীবনেও এ নিয়ে আলোচনা, মন্তব্য করতেন। প্রাক-বিবাহিত জীবনে সাজগোজের ঝোঁক ছিল। বাড়িতে সমবয়সী বেশ কয়েকটি মেয়ে, মায়ের জন্য আলাদা করে কিছু করা রুচিসম্মত নয়; মায়ের ভাষায়, "ওই একটু পরিপাটি করে শাড়ি পরা, দুয়েকটি নকশা করা ব্লাউজ, একটু পাউডার, টিপ, আলতো করে খোঁপা আর 'রিমলেস' চশমা।" উমাকুটিরের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতেন না। হয়তো কোথাও তার ছিঁড়ে গিয়েছিল বা সংসারের নানা ঢেউয়ের খেলায় মনের কোণে ব্যথা ছিল। জানি না, তবে এ বাড়ির মাটি ছিল তাঁর জীবনের বাঁধন, শেষ বয়সে ঘুরেফিরে উমাকুটির, মা, বাবা, খুড়িমার কথাই বলতেন।

মায়ের গেণ্ডারিয়ার জীবনের একটি ছবি আমি কল্পনা করি। নিছক কল্পনা নয়, অন্যদের কাছ থেকে শুনে ছবিটি এঁকেছি। বসার ঘরে ছোট পিয়ানোতে বসা পাতলা, লম্বা, সুন্দরী মা, নিজের মনে নিরিবিলিতে গাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি ইচ্ছে মনে জাগে, নেহাতই অসম্ভব, অর্বাচীন ভাবনা   আহা, আমি যদি তখন মায়ের পাশে থাকতে পারতাম!

হৈচৈ করে মাতিয়ে দেওয়া মানুষ ছিলেন দাদু-দিদিমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, পুত্র জীবন কৃষ্ণ, আমাদের ছোট মামা। বুদ্ধিমান, সুদর্শন, চিন্তাশীল, বিশ্লেষণশীল, জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁর নেশা ছিল বই পড়া, সিনেমা দেখা, সিনেমা ও আধুনিক গান শোনা এবং তা গুনগুন করা। ইংরেজ সরকারের তীব্র বিদ্বেষী, মিতভাষী হয়ে পরিপাটি বেশে রাজনীতি নিয়ে যে উদ্যমে সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন, ঠিক সেই উদ্যমে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরিহিত ছোট মামা মাছের বাজারে উচ্চৈঃস্বরে দরদস্তুর করতেন। সবকিছুতেই তাঁর উৎসাহ। বাড়িতে ঢুকে প্রথম কথাই নাকি ছিল, 'মেজদি, আইজ যা দেইখ্যা আইলাম।' সবাই তা শুনতে ব্যস্ত, বাজার থেকে বা সিনেমা দেখে দেরি করে কেন ফিরলেন সে প্রশ্ন করার কথা মনে পড়ত না।

ঠিক 'সবকিছুতে উৎসাহ' বলা উচিত নয়, বিতৃষ্ণা ছিল স্কুল, কলেজ, পরীক্ষায়। গল্প আছে, স্কুলে পুরো বই মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতেন। ক্লাস সিক্সে ইতিহাস পরীক্ষা; প্রশ্নপত্রে গৌতম বুদ্ধের ওপর কিছু লিখতে বলা হলো। ছোট মামা লিখলেন, 'ওপরে যে ছবিটি দেখিতেছ উহা গৌতম বুদ্ধের।' অক্ষরে অক্ষরে বইয়ের পাতা, এটা যে পরীক্ষা সে হুঁশ নেই। দুরন্ত, উদ্ধত, আড্ডাবাজ ছেলে নন — শুধু গতানুগতিক শিক্ষার বিরোধী। কলেজ শুরু করে ছেড়ে দিলেন; বই পড়ে, সিনেমা দেখে, যুক্তি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা করে আনন্দে দিন কাটালেন। পরনির্ভর — দাদু-দিদিমার দুশ্চিন্তা গেল না, সময়ে ওঁর দাদা-বৌদি এ দায়িত্ব মেনে নিলেন। বড় মামার মৃত্যুর পর মায়ের কাছে মামিমার চিঠি : 'জীবনের জন্য তুমি চিন্তা করো না। ওর দাদা নেই বলে কোনো অযত্ন হবে না, ওর পুরো দায়িত্ব এখন আমার।'

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি বদলে গেলেন, প্রাণবন্ত ছোট মামা হয়ে গেলেন নির্জীব-নির্বাক। হয়তো বেকার, নিষ্ফল, নিঃসঙ্গ জীবন সম্মুখীন করে অনুশোচনায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছিলেন। নিজের মনে বই পড়ে, সবার কাছ থেকে সরে গিয়ে, দাদা-বৌদির সেবাযত্ন করে কাটিয়ে দিলেন জীবনের শেষ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর।

দাদু-দিদিমার ছায়ায়, তাঁদের মূল্যবোধের আধারে, মামা-মাসিরা, মা, দাদা, দিদিরা যে যার মতো বড় হচ্ছেন, মেজ মাসিমার নজর সবার ওপর। বড় সংসারে যা হয়, সবাই এক ধাঁচের নন, এক জীবনধারার নন। বিভিন্ন ধারার হলেও একটি ব্যাপারে উমাকুটিরের সবাই একমত, তাঁরা কেউ গান্ধিবাদী নন, তারা মাস্টারদা সূর্য সেনকে মেনে চলেন, কেউ সক্রিয়ভাবে, কেউ অনুমোদনে। ১৯৩০-৪০-এর ঢাকা সম্বন্ধে কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন,

... সবাই যেন একটি সম্মিলিত আয়োজন-উদ্যোগের শরিক, সব মিলিয়েই যেন একটি সমগ্রতা যা স্বচ্ছ নদীর ফল্গুধারার মতো সমাজজীবনে প্রবাহিত। স্বদেশ প্রেমিক বাঙালি এই সময়েই প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে সম্ভব হয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো অকল্পনীয় ঘটনা: মাস্টারদার মন্ত্র তখনই আমাদের মতো অনেক কিশোরের কানে এসে পৌঁছেছে।'[১৪]

গেণ্ডারিয়ায় পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে উমাকুটিরের দাদারা, মাসিরা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তখন এদের টেররিস্ট বা সন্ত্রাসবাদী বলা হতো; এরা ছিলেন বিপ্লবী, ক্রান্তিকারী ব্রিটিশরাজের বিরোধী, বিদ্রোহী, স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, "আমাদের ছেলেবেলায় রাজনীতি বলতে বোঝাত 'স্বদেশি করা' সর্বক্ষণের আটপৌরে কর্মীরা সবাই ছিল ছাপোষা মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। বাড়ির কেউ যদি স্বদেশি করে তা হলে সেকালে যৌথ পরিবারের বাকি সবাই তার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিত। স্বধর্মে এদের স্বনির্ভর হওয়া সে সময়ে সম্ভব হতো না।"[১৫] স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের প্রতি সম্ভ্রম ছিল, পরিবারে গর্বের বিষয় ছিল।

প্রবীরদা যখন ছোট (অর্থাৎ ১৯২০ দশকের শেষের দিকে) অনিল রায় ও লীলা রায়ের নেতৃত্বে শ্রীসংঘ নামে এক বিপ্লবী গোষ্ঠী ছিল। আমার দাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুল ওই দলে ছিলেন। সেই সূত্রে ১০-১২ বছর বয়সের প্রবীরদাও ওখানে যাতায়াত শুরু করলেন।

উনি লিখেছেন, "আমরা ওখানে নিয়মিত শরীরচর্চা করতাম। আমি বিপ্লবীদের রিভলবার আনা-নেয়ার কাজ করতাম, জগন্নাথ হলে 'Senior Leader'-এর কাছে। একদিন ঢাকায় কায়েতটুলি দিয়ে সাইকেল চড়ে আসার সময় হঠাৎ এক মুসলমান ছেলে আমার সাইকেলের তলায় পড়ে। অমনি পুলিশ হাজির — আমাকে হাজতে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু যে ছেলেটি আঘাত পেয়েছিল, সেই আমাকে বাঁচাল, নিজের দোষ কবুল করে। সেদিন সার্চ করলে আমি গেছিলাম, জামার ভেতর রিভলবার আছিল। Grasbi সাহেবের (Intelligence Chief) উপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিল আমার। কারণ তার ওপর attempt নেওয়া হয়েছিল।" হাফপ্যান্ট পরা ছোট ছেলেরা সন্দেহ এড়াতে পারবে বলে ডাকহরকরার কাজ করতেন, তা চিঠি হোক বা রিভলবার।

বড় মামা একদিন কোনো অল্পবয়সী পুরুষ মানুষকে নবাবপুরের রাস্তা পার হতে দেখলেন। 'মনে হয় চেনামুখ, খুবই চেনামুখ — ঠিক ধরতে পারছি না' ভেবে চেয়ে রইলেন। চেনামুখ কে হতে পারে ভেবে পেছনে কিছুদূর গেলেন। মনে যেন শঙ্কা বা আশঙ্কা। হঠাৎ বুঝলেন ওঁর ছোট বোন (খুড়তুতো) কমলা, পুরুষের বেশে। এক বাড়িতে থাকেন, একসঙ্গে ওঠাবসা, বাড়ির কেউ জানতেন না কমলা বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি শ্রীসংঘের সভ্য হন, চিঠি ও রিভলবার ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া ছিল ওঁর কাজ, কখনো ছদ্মবেশে, কখন সাধারণ 'কমলা' হয়ে।

বকুলদা, হেমেন্দুবালার দ্বিতীয় নাতি, কলেজ ছেড়ে শ্রীসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে 'বিদ্রোহী' বা 'রাজদ্রোহী' আখ্যা পেলেন। ১৯৩১ সালে পুলিশ শ্রীসংঘকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় প্রচুর ধরপাকড় করল। মনে পড়ে ১৯৩১-এর এক রাতে, রাত এগারোটার সময় পুলিশ আসে দাদাকে গ্রেপ্তার করতে। এই একবার দেখেছি হেমেন্দুবালাকে সংযম হারাতে — গ্রেপ্তারের সময় S.P-র কাছে হেমেন্দুবালার সেই কাতর আবেদন আজো আমার চোখে ভাসে — 'মা মরা ছেলে, তাকে যেন মানবিকতার খাতিরে ছেড়ে দেওয়া হয়।' তা হয় না, বকুলদা জেলে গেলেন, বিচারে সাজা হলো সাত বছর detenue হয়ে থাকতে হবে। প্রথমে হিজলি বন্দিশিবিরে, তারপর ঝোপজঙ্গলে সাপখোপের মাঝে ছোট একটি কুটিরে তাঁর বাস ছিল। মাঝেমধ্যে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হতো। এক দেহরক্ষী ছাড়া সাত বছর একা থেকেছেন। রান্নার জিনিসপত্র দিয়ে যাওয়া হতো আর কিছু censor করা বই। বকুলদা মায়ের সমবয়সী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু মাসি বোনপো নন, নিকট বন্ধু। মায়ের বিয়ের সময় দাদা হিজলি শিবিরে, শুভকামনা জানিয়ে তাঁর চিঠিটি ঐতিহাসিক।[১৬] মনে হয় প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর অবস্থা জানানোর চেষ্টা করেছেন। চিঠি censor করার পর পাঠানো, খড়্গপুর পোস্ট অফিস থেকে। ১৯৩৭-এ দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁকে একদিনের জন্য আসতে দেওয়া হয়েছিল — আবার সেই ঝোপজঙ্গল, একলা জীবন।

এই দাদা ছাড়া পেয়ে কানপুরে কোনো ব্যাংকে সারাজীবন চাকরি করেন। ওঁর সেই সাত বছরের নানা গল্প শুনেছি, কোনো ক্ষোভ বা বিদ্বেষ দেখিনি। সদা হাসিখুশি এই মানুষটিকে আমরা সবাই ভালোবাসতাম। কোনোদিন রিভলবার হাতে সন্ত্রাসবাদ করেছেন বিশ্বাস করা কঠিন হতো। ওঁর নিঃসঙ্গ জীবনের নানা গল্প শুনেছি, বেশিরভাগ জঙ্গলের কাহিনি, দেহরক্ষীদের সঙ্গে কথাবার্তা, তাদের মতামত। তখনো ইতিহাসে কৌতূহল জাগেনি, কিছু লিখে রাখিনি। কেন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাও জানতে চাইনি। উনি হয়তো ছিলেন শ্রীসংঘ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টার এক শিকার; আবার কোনো বিশেষ কারণ — লুটতরাজ, বোমা, গুলির জন্যও হতে পারে।

শ্রীসংঘের সঙ্গে দিদিমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও মানসিক সমর্থন ছিল এবং বাড়ির ছেলেমেয়েরা যে এ কাজে লিপ্ত তাতে অনুমোদন ছিল। ঘরছাড়া ছেলেমেয়েদের ক্ষণিকের জন্য হলেও মায়ের স্নেহ দিয়ে যত্ন নিতেন, লুকিয়ে থাকতে বা পালাতে সাহায্য করতেন। দিদিমার সাহায্যে অবাক হই না — তিনি রাজনীতি নিয়ে সচেতন ছিলেন; অবিশ্বাস্য মেজদি-মাসিমার সক্রিয় সাহায্য। যে মধ্যবয়সী মাসিমাকে আমি দেখেছি তিনি এমন জমিয়ে গল্প করতেন যে কোনো কথা গোপন করতে পারেন কল্পনা করতে পারিনি। শ্রীসংঘের যুগে এই মাসিমার কাছে 'আমার দাদা ও তাদের সংগঠনের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র রাখতেন।' গুপ্ত কথা; এত গল্প, বিশেষ করে ঢাকার কথা, করেছেন আমাদের সঙ্গে, এ কথা কখনো বলেননি। কল্পনা করি কোথায় লুকোনো হতো — পেছনে সারি সারি লম্বা গাছের শুকনো পাতার জঙ্গলে, নাকি নিরামিষ ঘরের পরিত্যক্ত উনুনের গুল ঘুটের মাঝে। বকুলদাকে ধরে নিয়ে গেল; কিন্তু পুলিশ কোনোদিন জানতে পেল না উমাকুটিরে অস্ত্রশস্ত্রর কথা।

বকুলদা, বঙ্গেশ্বরদা, নেপালদা ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। বাড়ির ছেলের মতো উমাকুটিরে আনাগোনা। সবাই শ্রীসংঘের সভ্য। 'নেপালদা (নাগ), বঙ্গেশ্বরদা (রায়), তারুদা — (পুরো নাম জানি না) এঁরা ছোটখাটো ডাকাতি করতেন পয়সার জন্য। বঙ্গেশ্বরদা ও বিনয় বোস (শঙ্করটোলার) 1931-এ Postal Robbery Case-এ ধরা পড়ে। ৩২ হাজার টাকা দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলা লুট করেছিলেন তারা। সেই GPO ছিল বাংলাবাজারে। টাকার ব্যাগ নিয়ে যখন বঙ্গেশ্বরদাদারা দৌড়াচ্ছিল, শহরের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি, ওই সময় মোটরসাইকেল করে যাচ্ছিলেন। He was the witness of the case. উনি পেশায় ছিলেন Income tax Inspector, ওঁনারা ধরা পড়েন ওয়াইজঘাটে। সেই গণ্যমান্য ব্যক্তি এ ঘটনায় সরকারের হয়ে যা প্রত্যক্ষ করেন, তা-ই কবুল করেছিলেন। ফলে বঙ্গেশ্বর রায় ও বিনয় বোস ধরা পড়ে।' সরকারি চাকুরে হিসেবে হয়তো উনি রাজধর্ম পালন করেছিলেন। কিন্তু শহরে ওঁর মান অনেক নিচে নেমে এলো। শ্রীসংঘের অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়; দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই এঁরা কারামুক্ত হন।

১০ মে ১৯৭১ মায়ের ডায়েরিতে লেখা — 'সন্ধ্যেয় বকুল এলো তার আটজন বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে। সবাই একত্রে চা খেলাম।' ১৯৬৭, ১৬ মার্চে লেখা মেজদি-মাসিমার চিঠি মায়ের কাছে 'কাল বড় আনন্দে দিন কাটিল। প্রতিবছর বকুল, বঙ্গেশ্বর ইত্যাদি বিপ্লবী বন্ধুরা কলকাতার উপকণ্ঠে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া করিয়া সপরিবারে পুরো দিনটা একসঙ্গে কাটায়। খুব খাওয়া-দাওয়া, গল্প হয়। আমাকে ডাকে, দূর বলিয়া যাইতে পারি নাই। এ বছর বোনপো-বৌরা জোর করিয়া গাড়িতে নিয়া গেল। গেণ্ডারিয়ার কতজনের সঙ্গে যে দেখা হইল, সরকার বাড়ির সবাই, বঙ্গেশ্বর, নেপাল, পুরনো দিনের কথা, আজ কে কী করিতেছে সেই সব কথা। উহাদের তো ছোট দেখিয়াছি, এখন সবার ছেলেপুলা, নাতি-নাতনি কত যে আনন্দ হইল। আমাকে সবাই বেশি রকম যত্ন করিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিলাম।'

শ্রীসংঘের পালা শেষ হয়েছে বহু যুগ আগে। এঁদের জীবন কেটেছে বিভিন্ন কারাগারে, বিভিন্ন কর্মস্থলে। বিভক্ত ভারত এঁদের স্বপ্নের স্বাধীনতা ছিল না; ভারতের রাজনীতি এদের নিরাশ করেছিল। কিন্তু বিপ্লবী জীবন বৃথা গেল সে-কথা কখনো শুনিনি। বরং অতীতের স্বপ্নের বন্ধনে এঁরা বর্তমানকে উপভোগ করেছেন।

বছর আসে, বছর যায়। স্নেহ-ভালোবাসা, খুনসুটি, মনোমালিন্য, খেলাধুলা, পড়াশোনা, তর্ক-বিতর্ক, গান-বাজনা, স্বদেশি আন্দোলন, আশা-নিরাশা, অতিথি সমাগম, রান্নাবান্না, বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ের চিন্তা, পড়া শেষ করা ছেলেদের চাকরির চিন্তা এরই মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার কাজ — দাদু-দিদিমার সংসার এক নিজস্ব দোলায় চলছিল। যেমন যে-কোনো সংসার চলে। হঠাৎ করে এলো দুর্যোগ, ভয়ানক দুর্যোগ, ১৯২৯-এর বিশ্বভরা 'মন্দা'; সারা পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যে রোধ এলো। পাটের ব্যবসা আন্তর্জাতিক, এক কোণে পূর্ববঙ্গে সে ব্যবসার পোক্ত ভিত সুচ লাগানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলুনের মতো চুপসে গেল। পাটের ব্যবস্থায় ডিপ্রেশন, দাদামশায়ের কোম্পানির অবস্থা খারাপ, বৈঠকখানা ঘরে ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বন্ধ, ধীরে ধীরে কোম্পানি বন্ধ, দাদামশায়ের আয়ও বন্ধ। অবস্থাপন্ন সংসারে শুরু হলো অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ। 'এত বড় সংসার টানা দাদামশায়ের ক্ষমতায় কুলাত না। তাছাড়া এই সংসারের ভবিষ্যৎ কী, বিশেষ করে তার পাঁচটি নাতি-নাতনির — সেটাও তার চিন্তার বিষয় ছিল। তখনো গোপেন মামা বিশেষ কিছু করতেন না; আমরাও বড় হয়েছি ঠিকই; কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা বা বয়স হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে দাদামশায়ের পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিল না। পিতৃহারা যে ভাইপো-ভাইঝিদের এঁরা মানুষ করেছিলেন, ভাইপোকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছেন, ভাইঝিদের বিয়ে দিয়েছেন, তারা ঠিক এই সময় সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করলেন। দাদামশায় বিরাট চিন্তা, দুঃখ, নৈরাশ্যের বোঝা বহন করে কেমন যেন মৌন হয়ে গেলেন।'

পরিবর্তিত অবস্থাতেও দিদিমা তাঁর স্বভাবসুলভ শান্তিপ্রিয়তা নিয়ে সংসার চালিয়েছেন, কী করে আমরা কেউ জানি না। ১৯৩৪-এ ছোট মেয়ে শান্তির বিয়ে ঠিক হলো। খরচ কোথা থেকে আসবে তা কেউ জানে না। বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচের ব্যবস্থা দিদিমা কোনোভাবে করে নিলেন, বললেন 'ওদের (অর্থাৎ পাত্রপক্ষের) কোনো চাহিদা নেই, পাত্র এত ভালো, একটু গয়নাগাটি তো দিতে হয়। সে ব্যবস্থা করি কোথা থেকে?' নিজের যা ছিল, দেওরের তিন মেয়ের বিয়েতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ওপর পাঁচ বছর ধরে টানাটানির সংসার। মায়ের দুশ্চিন্তা মেজদি-মাসিমা বুঝতে পারলেন, তাঁরা মাকে নিভৃতে বললেন, 'চিন্তা করবা না। বিয়া ঠ্যাকব না। আমারে যে এক গা গয়না দিছিলা, সেগুলা দিয়া করুম কী? সেই গয়না দিয়া বুচির বিয়া হইব। কারুরে কওনের দরকার নাই।' রাজি হওয়া ছাড়া দিদিমার উপায় ছিল না। নিজের জন্য গলার একটি সরু চেন রেখে বাকি সব গয়না ভেঙে ছোট বোনকে 'সালঙ্কারা' বেশে বিয়ের পিঁড়িতে বসালেন। বহু বছর পর মাসিমা আমাকে বলেছিলেন এই গুপ্ত কথা — মাকে কখনো বলা হয়নি। জানতেন নিশ্চয়ই, তবে বাপের বাড়ির ব্যাপারে মা অত্যন্ত চাপা ছিলেন।

একসময় বাড়ির অবস্থা এত খারাপ হলো যে, প্রবীরদা সলিমুল্লা Imperial Seminary School-এ হাফ ফিতে পড়েন আর মুকুলদা, এদের বড় ভাই, টিউশনি করে অল্প টাকা রোজগার করেন। এই পরিস্থিতিতেও দিদিমার উদারতার উদাহরণ আছে। 'আমার বড় দাদা মুকুল আমাদের এক প্রতিবেশিনীর বাড়িতে টিউশনি করতেন, তখন সংসারের এতই দুরবস্থা। প্রতিবেশিনী ছিলেন বিধবা। তার সঙ্গে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোনের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যাদের দাদা পড়াতেন। তখনকার দিনের বিধবা মহিলারা আমিষ স্পর্শ করতেন না। শিশুদুটির মাছ খাওয়া যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, এত অভাবের মধ্যেও হেমেন্দুবালা শিশুদুটিকে বারো মাস তিরিশ দিন মাছ রান্না করে খাওয়াতেন। বলাবাহুল্য, নিজের ভাগ থেকেই পাঠাতে হতো। কোমল হৃদয়, নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য চিন্তা করা — এমন মানুষ বিশেষ চোখে পড়ে না।

হেমেন্দুবালার প্রতিভা ছিল অসাধারণ; কিন্তু তা প্রকাশের সুযোগ তখনকার দিনে তেমন ছিল না। শুনেছি তাঁর বড় ভাই অখিলবন্ধু ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্ম ধর্মগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরিবারের বাধায় তা হয়ে ওঠেনি। তবুও ব্রহ্মসংগীত সবসময়ই তার মুখে থাকত। আর দিদিমা হেমেন্দুবালা বিয়ের আগে যেখানে থাকতেন তার নিকটবর্তী গ্রামগুলো ছিল ব্রাহ্মপ্রধান। ইতিহাস বলে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেক বৈদ্য পরিবারের সদস্যই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেনের পূর্বপুরুষ ও সত্যজিৎ রায়ের মামাবাড়ি উল্লেখ্য। যেহেতু বৈদ্য জাতি তখনকার দিনে অনেক বেশি উন্নত চিন্তাধারা, মানসিকতা ও কৃষ্টির অধিকারী ছিল, অখিলবন্ধুর ওপরেও এই ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছিল হেমেন্দুবালার ওপর। আজ এই ৮৪ বছর বয়সে পা দিয়ে অতীতকেই একমাত্র অবলম্বন করে যে বিশ্লেষণ করেছি তাতে মনে হয় হেমেন্দুবালার উন্নত মানসিক চিন্তাধারা, উদার হৃদয়, পড়াশোনায় আগ্রহ ও মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলার অদম্য ইচ্ছা, যা তিনি সংসারের মধ্যে থেকে করতে চেয়েছিলেন সবই এই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের ভিত্তিতেই।'

আমাদের দিদিমা, আমরা তো তাঁকে অসাধারণ নিশ্চয়ই মনে করব। ওঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে বিরাট সংসারের কর্ত্রী হওয়ার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা, কন্যাসন্তানের মঙ্গল, বিধবাদের সম্মানিত স্থান দেওয়ার জন্য কাজ করেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। দিদিমার মতো মাতৃস্থানীয় মহিলাদের সাহায্য না পেলে বাংলার আরো অনেক বেশি ছেলেমেয়েকে জেলের অমানুষিক জীবন সহ্য করতে হতো বা আরো দীর্ঘদিন এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো।

পরিবার থেকে নিজেকে একটু দূরে রেখে চিন্তা করলে দেখি গেণ্ডারিয়ায় অসাধারণ মহিলা আরো ছিলেন, যাঁরা নিজেদের পুরো জীবন স্বাধীনতা সংগ্রামে ও সমাজসেবায় উৎসর্গ করেছেন। প্রথমেই মনে পড়ে মায়েদের 'আশাদি'র কথা, আশালতা সেন, বাবাদের ছাত্র — কৃতী অর্থনীতিবিদ সমর রঞ্জন সেনের মা। মামাবাড়ি সতীশ মুখার্জি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোড ছুঁয়ে যাওয়া দীননাথ সেন রোডে ছিল ওঁর শ্বশুরবাড়ি ও কর্মক্ষেত্র। আমার মাসি-দাদাদের রাজনীতি থেকে একেবারে বিপরীত, ইনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে গান্ধিবাদী।

বিক্রমপুর 'বিদগা' গ্রামের মেয়ে, বড় হয়েছিলেন নোয়াখালীতে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী পরিবার ও পরিবেশে। অল্পবয়স থেকেই রাজনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা করতেন; বিয়ের পর স্বামীর কর্মস্থল শিলংয়ে গিয়ে সংসারধর্ম পালন করার দিনগুলোতেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার ভাবনা ছাড়েননি। দুর্ভাগ্যবশত সাংসারিক দিন হলো ক্ষণস্থায়ী, মাত্র ২২ বছর বয়সে (১৯১৬) স্বামীহারা হয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন গেণ্ডারিয়ায় শ্বশুরবাড়িতে; প্রায় অর্ধশতাব্দী এ বাড়িকে কেন্দ্র করে দেশসেবা, সমাজসেবা করলেন। দেশবিভাগে তিনি ঢাকা ছাড়েননি।[১৭]

ছেলে একটু বড় হওয়ার পর রাজনীতির দিকে 'দৃষ্টি' ফেরালেন। না ফিরিয়ে উপায় ছিল না, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর শান্ত থাকতে পারেননি অনেকেই। আশালতা সেনের প্রেরণা এলো গান্ধিজির বাণীতে; উনি যখন গঠনমূলক কাজ করার নির্দেশ দিলেন, 'আশাদি' ফরিদপুর গিয়ে 'খদ্দরের কাজ' শিখলেন। এরপর শুরু হলো নানা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সংগঠনের কাজ; শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, দেশ ও সমাজসেবা; এর মাধ্যমে 'অহিংসা আন্দোলন' ছড়িয়ে দেওয়া। ওঁর কাজের ফর্দ দেওয়া সম্ভব নয়, তবু কিছুটা লেখার চেষ্টা করছি কারণ একটি মহিলার কর্মনিষ্ঠা, কর্মক্ষমতা এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা, শুধু ইতিহাস নয়, পরের প্রজন্মের জন্য প্রেরণা এবং শিক্ষা।

প্রথম প্রতিষ্ঠান নিজের বাড়িতে 'শিল্পাশ্রম', যেখানে স্থানীয় মেয়েরা খদ্দরের কাজ শিখতে পারেন। 'মেয়েরা যখন শিল্পাশ্রমে ঘড়ঘড় করে চরকা আর খটখট করে তাঁত চালাতেন, [মনে হতো] গান্ধিজীর বাণী যেন তার ভেতর দিয়েই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।'[১৮] এরপর পাড়ার এবং দূরের মহিলাদের সাহায্যে শুরু করলেন 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি', বাড়িতেই। সমিতিতে বোনা খদ্দরের কাপড়ের বস্তা নিয়ে সদস্যরা চলে যেতেন দূরদূরান্তর। সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিবছর একটি শিল্পমেলা হতো। শিল্প প্রদর্শনী ছাড়াও আমার কাছে এর একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। পাড়ার যুবকরা, যেমন বঙ্গেশ্বর রায়, নেপাল নাগ, বকুল দাশগুপ্ত সবাই মিলে মেলার কাজে প্রচুর সাহায্য করতেন। এঁরা কিন্তু গান্ধিমতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, সবাই 'শ্রীসংঘ' নামে বিপ্লবী দলের সক্রিয় সভ্য, তবু সাহায্য করতেন। শুধু প্রতিবেশী বলে নয়। আশাদি ও তাঁর কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাই। মতের অনৈক্য নিয়ে আলোচনা, তর্ক হতো তবে নিজের নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস কেউ ছাড়েননি। বিপ্লবীরা সবাই পরে রাজবন্দি হয়ে বহু বছর কারাবাস করেছেন — প্রথম দুজন, যতদূর জানি, স্বাধীনতার পর আন্দামান থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

'আশাদি' তাঁর কাজে বাধা পাননি তা নয়, ব্রিটিশরাজ কেন, পাড়ার সমাজকল্যাণে নিবৃত্ত প্রতিবেশীরাও বিরোধ করেছেন। 'আমার সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফল স্থানীয় মেয়েদের অবাধ্য করতে পারে এই নালিশ (নিয়ে) কয়েকজন বৃদ্ধ শ্বশুরমশায়ের কাছে প্রতিবাদ করেছিলেন।'[১৯] শ্বশুরমশাই ছিলেন প্রগতিশীল মনের, প্রতিবাদে আমল তো দিলেনই না, বরং পুত্রবধূকে আরো উৎসাহ দিলেন। বৃদ্ধদের ভয় ছিল যথাযথ। দূর দূর থেকে মেয়ে-বৌরা, হিন্দু রক্ষণশীল ঘরের বৌরা, বিধবা মেয়েরা, সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করে খদ্দরের কাজে লিপ্ত হতেন, কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতেন।

আরো প্রতিষ্ঠান আশালতা সেন শুরু করেছিলেন যেমন — গান্ধিপন্থী আন্দোলনের জন্য মহিলা কর্মী তৈরি করতে, 'কল্যাণ কুটির' (১৯২৭), হরিজনদের জন্য 'জুড়ান' নামক বিদ্যালয় (১৯২৯), বিক্রমপুর মহিলা সঙ্ঘ (১৯৩১); তালিকা আর বাড়াব না। বারকয়েক কারাবরণ করেছেন, বারকয়েক ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠানে, বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই তালা লাগিয়েছে; আশামাসিমা নির্ভয়ে কাজ করে গেছেন। ওঁর বিবিধ অভিজ্ঞতার অল্প কিছু উল্লেখ করি।

১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারে গ্রামে গ্রামে প্রচুর হেঁটে যেতে হতো। 'রাত্রে পথের কাছে কোনো গৃহস্থের বাড়িতে থাকতাম। ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। একটি দুঃখের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করি। সারাদিন সভা করে রাতে এক মুসলমান তাঁতির বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। বাড়ির বয়স্ক ছেলে মাত্র এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে, তার অল্পবয়স্কা অন্তঃসত্ত্বা বিধবা তখনো তাঁতে কাজ করছে। তরুণী বিধবা আমাকে দেখে কাজ বন্ধ করে চোখের জল ফেলতে লাগল একটু পরই তাকে আবার কাজ শুরু করতে হলো। সংসারের খোরাকের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের মেয়েরা যে কত অসহায়, দারিদ্র্যের চাপ যে কত বেশি হতে পারে এই অভিজ্ঞতায় আমি বিশেষ করে বুঝতে পারলাম।'[২০]

আরেকটি কাহিনি না লিখে পারছি না, কারণ সরকারি সাধারণ কর্মচারীরাও কতসময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করতেন এতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে 'আশাদি' প্রত্যেক দিন অন্তত চার/পাঁচটা গ্রামে বক্তৃতা দিতেন। 'গ্রামের চৌকিদাররা মন দিয়ে আমার [স্বদেশি আন্দোলনের ওপর] বক্তৃতা শুনত। তারপর এত ধীরে ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে থানায় খবর দিত যে দারোগা আসতে আসতে আমি অনেক দূরে অন্য গ্রামে চলে গেছি। এই চৌকিদারদের অনেকেই মুসলমান ছিল। তাদের সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘোরা সম্ভব হতো না।'[২১]

ওঁর কর্মজীবনে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির নানা উদাহরণ উনি দিয়েছেন। গান্ধিজীর সঙ্গে নোয়াখালীতে ছিলেন, ঢাকা ফিরে এলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজ করতে। 'ফিরে দেখি পাড়ার প্রায় সব হিন্দুরা চলে যাচ্ছেন ভারতে, ভারত থেকে মুসলমান পরিবাররা চলে আসছেন পরিত্যক্ত বা বিক্রীত বাড়িতে।' গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি ভাঙার মুখে। আশাদির অনুরোধে নবাগতারা যোগ দিলেন মহিলা সমিতিতে। 'বদরুন্নেসা আহম্মদ, শাহজাদ বেগম [ও আরো অনেকের] নেতৃত্বে মহিলা সমিতি আগের চেয়েও বেশি সুসংগঠিত আর শক্তিশালী হয়ে উঠল।'[২২]

এক কাকতালীয় কারণে ওঁর ঢাকা ছাড়তে হলো। ১৯৬৫ সালে অসুস্থতার কারণে দিল্লি এলেন ছেলের কাছে চিকিৎসার জন্য। সুস্থ হয়ে কলকাতা গেলেন — পরদিন ঢাকা যাওয়ার প্লেন। শুরু হলো ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ ১৯৬৫, আর ঢাকা যাওয়া হলো না। লিখছেন, 'হতাশ মনে দিল্লিতে ছেলের কাছে ফিরে গেলাম।' 'হতাশ' শব্দটি লক্ষণীয়। বয়স তখন ৭২ বছর — ১৯২০-১৯৬৫, দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর দেশসেবার পর ঢাকা, গেণ্ডারিয়া, গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি ছেড়ে অবসর নেওয়ার কথা কল্পনাও করেননি। দেশবিভাগে বিচলিত, নিরাশ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এতে ওঁর কর্মজীবনে বদল আসেনি। সমিতির কাজ খুবই ভালোভাবে চলছিল।[২৩]

আশালতা সেনের জীবনস্মৃতিতে একটি যুগের ছবি পাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের পরিধি বেড়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্র চিরকাল ছিল গেণ্ডারিয়া, গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি। আমি চিন্তা করি অন্যদিক দিয়ে — এ পাড়ার ইতিহাস যেটুকু লিখেছি তা একশ বছরেরও হয়। কিন্তু কত ইতিহাস তৈরি হলো এর মধ্যে। নম্র-বিত্তহীন ব্রাহ্মদের টিনের চালের কুটির, তাদের ধর্মপ্রচার, বিজয় গোস্বামীর মঠ থেকে শুরু হয়ে বিত্তশালী মানুষের পাকা দালান, গান-বাজনা, থিয়েটার, গৃহস্থালি — সবই হলো; এর মধ্যে জেগে উঠল গান্ধিজীর অহিংসার বাণী আর মাস্টারদা সূর্য সেনের বোমা, হাতিয়ার, সশস্ত্র বিপ্লবের ধ্বনি।

* * *

উমাকুটিরে ফিরে যাই। 'মন্দার' দুরবস্থার পর কয়েক বছর কেটে গিয়েছে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে তাও কবছর। ১৯৪৪ — প্রবীরদা কলকাতায়, গেণ্ডারিয়ার কথা এখন আমার নিজস্ব স্মৃতি।

এতদিনে বাড়ির সদস্যের সংখ্যা কমে গিয়েছে। তাতে কি — বাড়ি গানে-গল্পে ভরপুর। কোনো সময় ছোট মামা সিনেমার গান শোনাচ্ছেন বা বিলেত না গিয়েও বাবার সঙ্গে লন্ডনের রাস্তাঘাট নিয়ে আলোচনা করছেন, (বাবা বলতেন লন্ডন সম্বন্ধে উনি কখনো ভুল বলতেন না), বা বড়মামা, 'বুঝলা অমিয়', বলে বাবার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন, মা দিদিমার সঙ্গে গল্প করছেন বা মামিমার সঙ্গে রান্নাঘরে সাহায্য করছেন। চিরব্যস্ত, চিন্তিত, উদগ্রীব ও চঞ্চল বালবিধবা মাসিমা এঘর-ওঘর করছেন, সবকিছু ঠিক আছে কিনা; বিশেষ করে জামাই-আদর তদারক করছেন আর আমরা উঠোনে হৈ-হুল্লোড় চেঁচামেচি করছি। সপ্তাহের কাজকর্মের পর 'যা ইচ্ছা করো'র দিন।

মামাবাড়ির অভিযান যে প্রতিবার আনন্দদায়ক ছিল তা নয় — একবার ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল। আরো আগের কথা, ধুধু মনে পড়ে। মায়ের সঙ্গে যথারীতি সাইনবোর্ডের আশ্চর্য হরফ পড়তে পড়তে যাচ্ছি, বাবা সঙ্গে নেই। ঘোড়াগাড়ির জানালা খোলা ছিল। হঠাৎ গাড়ির পাদানিতে পা রেখে হুট করে কেউ মায়ের গলার সোনার চেন ছিনিয়ে নিতে গেল। মা শক্ত করে দুই মুঠি দিয়ে চেন ধরে রাখলেন — চেন ছিঁড়ে কিছুটা চোরের হাতে গেল, কিছুটা মায়ের হাতে।[২৪] এ-ও ছিল ঢাকার অঙ্গ। সেই চোর ধরা পড়েছিল। কোর্টে কেস, মাকে ডাকা হয়েছে সাক্ষ্য দিতে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে-বৌদের তখন কোর্টে যাওয়া অসম্ভব ছিল। পর্দানশিন নন, কিন্তু মা সামাজিক রীতি-রেওয়াজ মেনে চলতেন। জজ সাহেব তখন রায় দিলেন যে বন্ধ কোর্টে কেস শুনবেন যাতে মা সাক্ষ্য দিতে পারেন; দিয়েছিলেন। চোরকে জেলেও দেওয়া হয়েছিল। তবে সোনার চেনের টুকরো উদ্ধার করা যায়নি।

গেণ্ডারিয়া বাড়ির একটি বিরাট প্রলোভন দিদিমার হাতের নিরামিষ ও মামিমার হাতের আমিষ রান্না। শুনেছি দিদিমা যখন মাছ ছুঁতেন তখন কই মাছ একদিকে টক ও অন্যদিকে শর্ষে বা ঝাল দিয়ে রাঁধতেন। এ জ্ঞান আমাদের পরিবারে আজ আর নেই। একবার চেষ্টা করেছিলাম, তা সে টক-ঝাল অম্বলে পরিণত হলো। উমাকুটিরে দাদুর আমল থেকেই সবাই খাদ্যরসিক। কী রান্না হবে, কেমন রান্না হলো, বাজার ঠিকমতো হলো কি না, যে মাছটা চাই তা পাওয়া গেল কি না, এ ছিল প্রতি সকালের চিন্তার কেন্দ্র। রোজকার এ প্রশ্নে বড়মামা ছিলেন সবার সেরা। 'আজ যা চিথল পাইছি, বুচি।' নয়তো 'দ্যাখ, কই মাছের size-টা দ্যাখ, তুই তো কইমাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসস।' আমাদের আগমনের আনন্দ এভাবে ব্যক্ত হতো। রান্নার ধরন ছিল অভিজাত ঢাকাই; ঘি, তেল, পেঁয়াজ, মসলার ব্যবহার বেশি, তা বোঝার অবিশ্যি জো ছিল না, সবকিছু মিলিয়ে এমন মসৃণ স্বাদ আনত। মামিমার রান্নার হাত ছিল অপূর্ব, কালিয়া-কোর্মা, তেলকই বা পাকা রুইয়ের ঝোল তো শখের খাবার, অতি সাধারণ কেচকি মাছ ভাজার স্বাদ আজো ভুলিনি। বছর দশেক পর বুদ্ধদেব বসুর *তিথিডোর* উপন্যাসে বড় জামাইয়ের একটি আস্ত কচ্ছপ বাড়িতে আনার কথা পড়ে মনে হয়েছিল এ যেন বড়মামাকে ঘিরে লেখা।

স্বাদে ভরপুর ছিল নিরামিষ ঘরের রান্না — দিদিমা-মাসিমা মিলে রাঁধতেন। কাঁকুড়ের নিরামিষ পুর, ঢাকাই পরোটা, রকমারি তরকারি, ডাল বড়া, সব কিছু খাবার জন্য উদগ্রীব আমরা। কেচকি মাছের মতো নিরামিষ ঘরেও শর্ষের তেলের সঙ্গে অতি সাধারণ বেগুন পোড়াতে ছিল বিশিষ্ট স্বাদ। বুঝতাম, মায়ের হাতের রান্নার উৎস উমাকুটিরে টিনের ছাদের দুটি রান্নাঘর। 'রন্ধনশিল্প' — একটি কলা; শান্ত মনে, ধৈর্য ধরে শিখে ধৈর্য ধরে রাঁধতে হয়। অনেকটা সংগীতের মতো, গুরুর কাছে ধীরে ধীরে শিখে, নিজের আলাদা ছোঁয়া দিয়ে পরিবেশন করা। আগেকার দিনে একে বলা হতো 'সিনা পসিনা' শিক্ষা। সবার হয় না।[২৫]

'ইচ্ছে' কেউ কেড়ে নিতে পারে না, দেশবিভাগও নয়, তাই মা-মাসিদের আপ্যায়নের ইচ্ছে চিরকাল থেকে গিয়েছে। ষাটের দশকে মেজদি-মাসিমা দীর্ঘদিন আমাদের কাছে দিল্লিতে থাকতেন। ছুটির দিনে শখ হতো তিনি জামাইয়ের জন্য দুপুরের রান্না রাঁধবেন। এলাহি ব্যাপার, খুশি হয়ে একদিন বললেন, 'বিবি, তোর সংসারে রেঁধে আনন্দ আছে — সব মসলা পাই। তোর মায়ের রান্না তো তেল-মসলা ছাড়া, সব কিছু থাকে না।' এই বলে খাটো মোড়া বা পিঁড়িতে বসে কেরোসিনের স্টোভে রাঁধতে বসতেন। রান্নার তালিকা দেওয়া মুশকিল, এতকিছু থাকত। একদিন মৃদু স্বরে বললাম, 'এত রকম রান্না কেন করো, তোমার জামাই তো এতটা খেয়ে উঠতে পারে না।' চটজলদি জবাব, 'খাউক না খাউক, দেখন্তি তো আছে।' শুধু পাকপ্রণালি নয়। ঢাকা শহরের অটুট ঐতিহ্য 'দাওয়াত'। সত্তরের কাছাকাছি বয়সেও মাসিমা সে ঐতিহ্য থেকে দূরে আসতে পারেননি; দাওয়াতের ইচ্ছে শক্ত মুঠিতে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন এপারে।

দিদিমার ঘরটি ছিল পরম আরামের। তক্তপোশে শুয়ে ভাইবোনদের আড্ডা, বড়দের গল্প শোনা, অলসবেলার আদর-আবদার কত কি। আসবাবপত্র প্রায় কিছুই ছিল না — একটি বড় তক্তপোশ, যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল, একটি ছোট বেঁটে আলমারি, দুয়েকটি পিঁড়ি আর মোড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিকে দেয়ালঘেঁষে পুজোর আসন। ছোট ছোট মূর্তি, পাথরের ও তামার থালা, ঘটি, বাটি, চন্দন ঘষার সরঞ্জাম, শাঁখ, প্রদীপ, ধূপদানি। এলাহি কিছু নয়। দেয়ালে উঁচুতে রামকৃষ্ণদেবের ছবি, অন্য দেয়ালে উঁচুতে দাদামশায়ের। পুজো করার জন্য দু-তিনটে চটের আসন, মিলের শাড়ির সুতো দিয়ে কারুকার্য করা। দিদিমার শান্ত চেহারার মতো পুজোর আসনও ছিল শান্ত, শান্তিপূর্ণ। দিনে ফুল, বাতাসা দিয়ে পুজো, সাঁঝবেলায় ধূপ, ধুনো, শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সন্ধ্যা রাতের আবাহন।

বিশেষ করে মনে পড়ে ব্রতকথা, পরস্তাব। নির্দিষ্ট দিনে দিদিমা বলতেন 'নিরাকুলি'র পরস্তাব, দূর্বা[২৬] হাতে নিয়ে বসে আমরা শুনতাম। বন্ধ্যা নারীর দুঃখ, নিরাকুলি মায়ের আশীর্বাদে পুত্রসন্তান লাভ — সব নিজের চোখে দেখতে বসতাম, অনুভব করতাম, দিদিমা এত সুন্দর করে বলতেন। আজ এই ব্রত মামাবাড়ির কোনো শাখা-প্রশাখায় নেই। খুঁজলে হয়তো ব্রতকথাটা পেয়ে যাব। কিন্তু পরস্তাব বলবার মন ভরানো ধরনটি ফিরে আসবে না। *তিতাস একটি নদীর নাম* নাটকের পর, তা অন্তত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর হলো, পরস্তাব কথাটি শুনিনি, আজকালকার শব্দকোষে আছে কিনা জানি না।

মামাবাড়ির কিছু কথা বা শব্দ অন্যরকম ছিল। পুরানা পল্টনে ঢাকাই কথা শুনেছি কিন্তু এগুলোর বৈশিষ্ট্য অন্যরকম ছিল। জানি না এর উৎস কোথায়। 'ও'কে বলতেন 'তাই' — যথা — 'তাই যে একটা চেহারা করছে', বিরক্তির জায়গায় 'ত্যক্ত'। আজেবাজে বকবক করলে বলতেন, 'আ প্যাচাইলা প্যাচাল পারিস না' বা 'ফ্যালাইনা কথা থো ফ্যালাইয়া।' আরেকটা ছিল 'ওইদিক থাক' — এটা ছিল তুলনামূলক যেমন, 'বৌদি যা মাংস রাঁধে, দিদিরে কয় ওইদিক থাক।' মা, মাসিমা, মামিমা যাওয়ার পর আর এসব শুনিনি। বাড়িতে ঢাকাই টানে উচ্চারণে কথা বলা হতো, মিষ্টত্ব ছিল তাতে। 'হ্যারে কইসি'তে আপন আপন ভাব আছে। হারিয়ে গেছে, হয়তো তাই।

গেণ্ডারিয়ায় অনেক বছর লণ্ঠনের ব্যবহার দেখেছি। হঠাৎ করে বিজলি এলো — হাতপাখা ছেড়ে ঘূর্ণির মতো বিজলির পাখা এলো। বাড়িতে উৎসব। স্নানের পর হলুদমাখা রান্নার শাড়ি ছেড়ে, পরিপাটি করে সেজে মামিমা পাখার সুইচ টিপে বলতেন, 'বুঝলা বুচিদি, এই যে স্নানের পর দুমিনিট পাখার হাওয়া, ব্যস এটুকুই — কী যে আরাম।' পাউডারের সুগন্ধ ভরা, মুখে চাপা হাসি, সুন্দরী মামিমাকে দেখতে ভালো লাগত। মাঝের বড় ঘরের ডবল জোড়া খাট, তার ওপর বিজলি পাখার তিনটি ডানা দানবের মতো, হাতপাখার কাছে দানবই তো, অক্লান্তে ঘুরছে, মামিমা দাঁড়িয়ে, মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃপ্তি, এই ছবিটি মনে গেঁথে গিয়েছে।

অল্পদিনের মধ্যে, হঠাৎ করেই এ বাড়িতে নানা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তক্তপোশের জায়গায় স্প্রিংয়ের খাট, আসল বাড়ির সঙ্গে জোড়া রান্নাঘর, খাবারঘর, খাবার টেবিল, চেয়ার। আমাদের আলস্যের ও আনন্দের ধাপ অনেক উঁচু হয়ে গেল — কিন্তু পেছনের বারান্দায় পিঁড়িতে বসে নরকগুলজার করে ভাইবোনদের খাওয়াটা কেমন আলুনি হয়ে গেল — নিরাশ হলাম। কেচকি মাছ ভাজার স্বাদ ভাগিস্য একই রইল।

ভালো লাগত মামা-মামির কাছে বসতে। একে তো মধুর গান, আপন করে নেওয়া কথা। বহু বছর পর কলকাতায় দাদা সমীরকে বড়মামা বলেছিলেন, 'আসিস মাঝে মাঝে, তা নয়তো সম্পর্ক যে থাকে না।' এছাড়া দুজনেই আমার গান, পড়াশোনা নিয়ে প্রশ্ন করতেন, আমার 'আমিত্ব' গুরুত্ব পেত। আমি মা-দিদিমার মতো নই যে, 'আমিত্ব' ছেড়ে ফেলে দেব। তবে সত্যি কথা বলতে, ও বাড়ির আসল টান ছিল দিদিমার স্নেহের স্নিগ্ধ পরশ।

গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে নরকগুলজার করে খাওয়া-দাওয়া, উঠোনে দৌড়োদৌড়ি, খেলা — সবটাই ছিল দাদা সমীরের উৎসাহে। তিনজনকে নিয়ে তিনি ক্রিকেটের বিরাট টিম বানাতেন, আমার হাতের ব্যাটে বল লেগে নিরামিষ ঘরের দেয়ালে বা রেবতী মামার বারান্দায় পড়ল তাতে কী? বারান্দায় খেতে বসে দাদা কিছু আজগুবি, কিছু রহস্য, কিছু বই থেকে শেখা গল্প বলতেন। হাসাহাসি থেকে চেঁচামেচি, আমরাও নিজেদের রহস্য বলার জন্য ব্যস্ত। মাসিমা বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'পোলাপানগুলা নিজেরাও খায় না, আর কাউরে শান্তিতে খাইতেও দেয় না।' কান দিতাম না, বর্ধমানের বাড়ির নারকেলগাছে (আমি বর্ধমান থেকে সদ্য ফিরেছি) ভূত আছে কি না তা নিয়ে তুমুল ঝগড়া। এভাবে খাওয়া-দাওয়া করে দিদিমার ঘরে ঘুম, উঠে চা-জলখাবার, তারপর পুরানা পল্টন ফেরা। দিন কোথা দিয়ে কেটে যেত জানি না।

মামার ওকালতি প্র্যাকটিস রমরমা। শুধু বাড়ির সংস্কার নয়, বদল এলো মামিমার বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদে। শৌখিন মামিমা বাহারের ডিজাইনের শাড়ির সঙ্গে গড়িয়ে নিলেন নয় ভরি সোনার ডবল বিছের হার। হাতে গড়া গহনা, মামিমার মৃসণ গলাকে ঘিরে থাকত এত সুন্দর করে, যেন একে অপরের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। বড় সুন্দর দেখাত মামিমাকে। কত সময় আবদার করেছি, 'মামিমা, ওই হারটা পরো না।' কপট রাগে উনি উত্তর দিয়েছেন, 'দূর মাইয়া, এই ভর দুপুরবেলা কয় হার পরো!' ভালো লাগত ঠিকই আবার মনের কোণে জাগত, 'আহা, আমার মায়ের যদি এমন একটি থাকত; ওঁর তো সেই একটি লিকলিকে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছার হার, তাও কত পুরনো — অথচ আমার মাও তো সুন্দরী।'[২৭] মনের কথা মনে রাখতাম, মাকে বললে আমাকে নিয়ে নিরাশ হতেন। মা তো এসব ব্যাপারে উদাসীন, ওই যে নবনীতা লিখেছে[২৮], তার কাছের মানুষরা সে বিবি হোক বা নবনীতা, কেমন আছে, কী খেল, সেটাই চিন্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসত তাদের মঙ্গল থেকে।

মামিমা বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর বিদ্যার জন্য। কিন্তু উমাকুটিরের যে সময়টা আমি জানি আর্থিক ঐশ্বর্য তাঁর কাছে বেশি মহত্ত্বপূর্ণ ছিল। মায়ের গুনে-গেঁথে খরচ নিয়ে ব্যঙ্গ করতে শুনেছি; মায়ের চোখে অপমানের জল দেখেছি, ব্যবহারে পরিবর্তন দেখিনি। তিক্ত অভিজ্ঞতা এতে শেষ হয়নি। ১৯৪৬ সালে বাবা দিল্লি থেকে অপূর্ব কাজ করা হাতির দাঁতের মালা এনে দিলেন আমাকে — আমরা তখন ঢাকা ছাড়ছি, গেণ্ডারিয়ার বাড়ি থেকে ট্রেন ধরব। উমাকুটিরে গিয়ে মা বললেন, 'এ বাড়িতে দেওয়ার মতো তো কিছু নেই আমাদের কাছে, দাঙ্গার মধ্যে বাজারে যাওয়া সম্ভব নয় — তোমার নতুন মালাটা তোমার বোনকে (মামাত বোনকে) দিয়ে দাও, দিল্লি গিয়ে আরেকটা কিনে দেব।'[২৯] আমি বাধ্য মেয়ে, প্রতিবাদ না করে দিয়ে দিলাম। বলাবাহুল্য, এসব জিনিস একটি করে হাতে বানানো, আর পাওয়া গেল না। আমিও ভুলে গেলাম।

বছর দুই কেটে গেছে, ১৯৪৮-এ আমরা কাশীতে। যতিনদা দাদা সমীরকে ঢাকা নিয়ে গেলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়াতে — মামাবাড়িতে ছিলেন। ফিরে এসে যতিনদা মাকে একটা পুরনো কৌটো দিয়ে বললেন, 'মা গো, দিদিমায় দিছে। তারা ফ্যালাইয়া দিছিল, দিদিমা কুড়াইয়া রাইখা দিছিলেন, আপনারে দিতে কইলেন।' কইলেন, 'তারা তো জিনিসের মূল্য বোঝে না, আমারই দুর্ভাগ্য।' কৌটোর ভেতরে সেই মালা। অপমানে ক্ষুব্ধ, লাল হয়ে মা কোথাও রেখে দিলেন না ফেলে দিলেন, জানি না। কখনো দেখিনি, আমার নিজের লোভ হয়েছিল — অপমান বুঝবার বয়স বা বুদ্ধি হয়নি।

অর্থের অহংকার বোধহয় একটা সময়ের পর একঘেয়ে হয়ে যায়। মায়ের মিলের শাড়ি বা টানাটানির সংসার নিয়ে তির্যক-বাক ধীরে ধীরে কমে গেল। আমাদের যোগাযোগও কম হয়ে গেল। উমাকুটির পরিবারের কাছ থেকে হাতছাড়া হওয়ার আগেই মানসিকভাবে আমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। দাদু-দিদিমার উমাকুটির শুধু বাসস্থান নয়, ছিল একটা জীবনধারা। সেটা চলে এলো কলকাতায় সত্তর নং সার্পেনটাইন লেনে, মুকুলদা ও আমার অসাধারণ বৌদি[৩০], যাকে আমি 'বৌমা' বলে ডাকতাম, আজো নাম জানি না, তাঁদের বাড়িতে। কয়েক বছর পর তার সঙ্গে যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো ৩০নং ব্রাইট স্ট্রিট, কলকাতা — প্রবীরদা ও ঘরের 'লক্ষ্মী' বৌদি প্রতিভার বাড়ি।[৩১]

আজ সাত দশক পর বুঝতে পারছি মামাবাড়িতে নির্ভেজাল আনন্দ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সমবয়সী মামাত বোন, বছর দুই ছোট মামাত ভাই — এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা বন্ধন কখনো হয়নি। দুদিক থেকেই অনিচ্ছা ছিল, স্বীকার করতে হয় আমরা একে অপরকে অপছন্দ করতাম। দেশবিভাগের পর দেখা হয়েছে, সময় কাটিয়েছি একসঙ্গে — অচেনা থেকে চেনা-পরিচিতি হয়নি। অথচ এ বাড়িরই দাদারা — বকুলদা, প্রবীরদা, মুকুলদা, মিহিরদা, বীণাদি যাদের কথা লিখেছি, তাদের সঙ্গে, তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধার সম্পর্ক চিরকাল রয়েছে। বছরের পর বছর দেখা হয়নি, সম্পর্কে বাধা আসেনি। ছোট ছিলাম, বীণাদি কলকাতার রাস্তায় দোকান বাজারে নিয়ে যেতেন, স্বপ্নপুরী মনে হতো; তাছাড়া সেই ঢাকার ঐতিহ্য — দাদাদের প্রশ্ন, 'কী খাইবা?' বা 'তুমি আসবা শুইনাই বকুলদা বাজার গেছেন।' প্রাণের টান ছিল।

উমাকুটিরের স্মৃতি টুকরো টুকরো বিভিন্ন মুহূর্তে থেমে আছে, তার গতি নেই। একটি ছবি গতিমান, কখনো দাঁড়িয়ে শ্বাস নেয়নি। সামনের বারান্দা থেকে দেখতে পেতাম পাঁচিলের ওপারে পাশের সরু গলি। গলি দিয়ে গেঞ্জি পরিহিত নানাজন, কখনো উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে বলতে, কখনো মৌন হয়ে, কেউ হাসিমুখে, কেউ গম্ভীর বদনে দ্রুতবেগে, মন্থরবেগে হেঁটে বাড়ির পেছনের রাস্তায় যাচ্ছেন। গলিতে কখনো হাঁটিনি, পেছনে কী ছিল আমার অজানা, চলচ্চিত্রের মতো মলিন, ময়লা, ধবধবে সাদা গেঞ্জি পরিহিত বিভিন্ন চেহারা আমার মনের চোখে আজো হাঁটছেন।

* * *

গেণ্ডারিয়ায় বেশ কয়েকজন 'দিদিমা'কে দেখেছি, বেশিরভাগই থান পরা। দুজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। 'সইদিদিমা' ছিলেন আমার দিদিমার ছেলেবেলার সই পাতানো সই। সেই কবে বানিয়াদি গ্রামে অনুষ্ঠান করে সই পাতানো হয়েছিল, আজীবনের সখী হয়ে রইলেন। নাম জানি না, কোথায় থাকতেন জানি না, জানার প্রয়োজনও বোধ করিনি। নামের কথায় বলতে হয়, একটু বয়স হলে বাসনের পেছনে ছাড়া আর বইয়ের প্রথম পাতায় ছাড়া[৩২] সেকালে নামের বিশেষ প্রয়োজন হতো না — মায়েদের পরিচিতি তাঁদের স্বামী বা কারো মা হিসেবে, সেই নাম কোনো সন্তানের নাইবা হলো। দিদিমাকে ডাকা হতো 'নন্দার মা' বলে, কিন্তু নন্দা নামে বাড়িতে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন না, মা-মাসিদের মধ্যে তো নয়ই। সই, সইমা, সইদিদিমা, নাম একেবারেই অবান্তর।

দিদিমার মতো ছোটখাটো, শান্ত, ধীরস্থির মহিলা 'সইমার' স্থান মায়ের মতোই ছিল। পুজোআর্চায় সাহায্য করা, গল্প করা, গল্প বলা, নিরামিষ ঘরে কুটনো কাটা, রোজকার সদস্যের মতো থাকতেন, তবে সবকিছু দিদিমার ঘর — নিরামিষ ঘরের পরিধির মধ্যে, যেটুকু ছিল দিদিমার এখতিয়ারে। কুলীন ব্রাহ্মণ, সই পাতানোর জন্য বোধহয় জাত বিচার হতো না, অন্তত 'বানিয়াদি' গ্রামে হতো না।

সইদিদিমার মেয়ে, আমাদের মনোরমা মাসি থাকতেন কাশীতে — গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে লাগোয়া লাল একটি বাড়িতে, তেতলায়। কাশীর গঙ্গার ঘাটের ছবিতে যেসব সুন্দর বাড়ি দেখি, তারই একটি ছিল এঁদের। মাসি এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মেসো দুজনেই অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, আমরা কাশীতে থাকতে (১৯৪৭ থেকে) যেতাম, খুব ভালো লাগত। জানালা মেঝে অবধি নিচু, সেখানে দাঁড়িয়ে সাধারণ নৌকো, সুসজ্জিত বজরা, এদের আসা-যাওয়া দেখা নেশার মতো। আরো কৌতূহল ছিল শুশুকদের ঝাঁপ দেখার। নদীর ওপারে ছোট ছোট আলোর রামনগর, গঙ্গার দৃশ্য মনোরম।

মনোরমামাসির একটি বিশেষ গুণ ছিল বিবাহযোগ্যা মেয়ের চেহারা, হাত দেখে নয়টি (দশও হতে পারে, সঠিক জানি না) সু-লক্ষণের মধ্যে কটি তার মধ্যে আছে বলতে পারতেন। পাত্রী দেখতে আসা অনেক মহিলা ওঁর সাহায্য নিতেন, পঞ্চাশের দশকে বহুবার তা দেখেছি। গুণ দেখে পাত্রী পছন্দ করা বিবাহ চিরসুখের কি না জানি না, তবে মাসির মধ্যে এমন লক্ষ্মীশ্রী ছিল যে, আমার বিশ্বাস সুলক্ষণের প্রতিটি লক্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল।

এ বাড়ির বৈঠকখানা ঘরের পাশে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন দুই মহিলা — মাসির দুই ননদ। কথা বলতেন না, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়ি, এঁদের বিয়ে হয়েছিল একই ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে। প্রথা অনুসারে এঁরা শ্বশুরবাড়ি যেতেন না, দাদার কাছে থাকতেন। একবার গিয়ে দেখলাম এঁরা সেরকমই দোরগোড়ায় দাঁড়ানো, চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে সাদা ধুতি। স্বামী মারা গিয়েছেন, দুজনে একসঙ্গে বিধবা হলেন। পরের প্রজন্মে কৌলীনত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা মনে হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল — দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ চলে গেল সমাজের অন্যদিকে। ঝড় তুলে দিয়েছিলেন দিল্লির সমাজকে কটাক্ষ করে *দৃষ্টিপাত* বইটি লিখে, মনোরমামাসির একমাত্র সন্তান, 'যাযাবর', বিনয় মুখোপাধ্যায়।

গেণ্ডারিয়ার আরেক দিদিমার কথা মনে পড়ে 'দুধাদার মা' দিদিমা। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে খুব ফর্সা, প্রায় দুধের মতো, তাই সবাই তাঁকে ডাকত 'দুধা', সেই থেকে দুধার মা, দুধাদার মা, দুধাদার মা দিদিমা।

তিনিও ছিলেন খুব ফর্সা, মুখে কালো বড় তিল, রোগা; তাঁকে আমি কখনো সোজা দাঁড়াতে দেখিনি, যেন নুয়ে আছেন সবসময়। দুঃখী মানুষ, স্বামী হারিয়েছিলেন অল্পবয়সে, তাঁর ছোট্ট ছেলে ছিল একমাত্র সম্বল। ছেলে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তাকে নিয়ে মা কত স্বপ্ন দেখেন, কলেজ পাশ করেছেন বা অল্পই বাকি, হঠাৎ এই দিদিমা ছেলেকেও হারালেন। দুঃখী ছাড়া আর কী বলা যায়।

গেণ্ডারিয়ায় ছোট একটি বাড়ি ছিল, সেখানে থাকতেন। সবকিছু হারিয়ে তিনি যেন থমকে গিয়েছিলেন, দ্রুতগতিতে কিছু করতে পারতেন না। এ ছাড়া পাড়ায় অনেকেই এঁকে অপয়া মনে করে দূরে দূরে রাখতেন। 'উমাকুটির' ছিল তাঁর সহায়, দিদিমা তাঁকে সম্মানের সঙ্গে ডাকতেন, যদিও বাড়িতে অন্যদের দেখেছি ওঁকে তাচ্ছিল্য করতে, যেন একটি আগাছা। উনিও সবসময় কুণ্ঠা নিয়ে থাকতেন, শুধু অবজ্ঞা নয়, হয়তো ভাবতেন, 'সত্যি যদি অপয়া হই?' দেশবিভাগে তাঁর বাড়িটি হাতছাড়া হলো — কোনো সময় ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কোথায় গেলেন, কবে গেলেন, কেউ জানতেন না; কে কোথায় তা চিন্তা করার অবকাশ কারো ছিল না।

গেণ্ডারিয়ার বাড়ির এক বিশেষ সদস্য ছিলেন বালবিধবা মেজদিমাসিমা, পারুলপ্রভা দত্তগুপ্তা। দুর্ভাগ্য, অসহায়, পরনির্ভর; পিতার মৃত্যুর পর অসম্মান-অবমাননার জীবন, তবু বেঁচে থাকার উৎসাহ, প্রাণশক্তির জন্য তিনি ছিলেন 'বিশেষ'। মানে-অপমানে, সুখে-দুঃখে, কখনো বাঞ্ছিত হয়ে, কখনো লাঞ্ছিত হয়ে সধবা জীবনের চার বছর ছাড়া জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিলেন উমাকুটিরে। পরিবেশ যা-ই হোক, প্রতিটি দিনকে তিনি তুলসীপাতার মৃদু ঘ্রাণের মতো উপভোগ করতেন। মাসিমার বালিকা জীবন বা কৈশোরে তাঁকে দেখিনি, জানি না অত অল্প বয়সে বৈধব্যের সম্মুখীন কীভাবে হয়েছিলেন। মা-বাবার স্নেহের ছায়ায় থাকলেও 'যা হারিয়ে যায়' তা চিরকালের মতো, সে ব্যথা কীভাবে ব্যক্ত করতেন কে জানে। মায়ের কাছে শুনেছি প্রতিদিন নিভৃতে, গোপনে, সবার চোখের আড়ালে তাঁর কাপড়চোপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখা স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া কখানি চিঠি বারবার পড়তেন। তার মনের অবস্থা বোঝার জন্য এর বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই।

আমি মাসিমাকে দেখেছি চল্লিশের দশকে যখন তিনি মধ্যবয়স্ক। থাকেন যথারীতি উমাকুটিরে, মাঝেমধ্যে শ্বশুরবাড়ির কোনো অনুষ্ঠানে বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীর্থযাত্রায় বাইরে যান। উনি না থাকলে দিদিমাকে দেখাশোনা করার কেউ থাকেন না। বাপের বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি সম্মানের বা সুখপ্রদ ছিল না। 'বিধবা বোন পারুলপ্রভার স্থান ভাইয়ের সংসারে ছিল না বললেই চলে। অবাঞ্ছিত পারুলপ্রভা কিন্তু চিরকালই ভাইবৌ, ভাইপো, ভাইঝির প্রতি ছিলেন স্নেহে অন্ধ; তাঁরা কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে অসন্তুষ্টই হতেন। ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত।' এরকম অবাঞ্ছিত হিন্দু বিধবা বাঙালি সমাজে বিরল ছিলেন না। মলিন অভিজ্ঞতা মন থেকে মুছে ফেলতে জানতেন মাসিমা — হয়তো বলতেন, 'থো ফ্যালাইয়া।'

মাসিমার যেটা সবচেয়ে বড় গুণ নজরে আসত তা হচ্ছে আনন্দে থাকার ক্ষমতা। পরিবারে সব শুভ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রয়োজন হতো, এত সুন্দর আলো তিনি চতুর্দিকে ছড়াতে পারতেন। স্বভাবত চঞ্চল, সদা উৎফুল্ল, ওঁর উপস্থিতিতে প্রাণ ছিল, আত্মীয়-পরিজন সবাই ওঁকে কাছে পেতে চাইতেন। শ্বশুরবাড়ি, বাপেরবাড়ি, নিকট-দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, সুবিধে হলে দেখা করতেন — ফিরে এসে দীর্ঘ চিঠি মাকে-আমাকে সবার খবর দিয়ে। প্রতি চিঠিতে থাকত, 'আমাকে তারা কত যত্ন করিল, কত গল্প করিল, বড় আনন্দ করিয়া আসলাম।' একাধিকবার লিখেছেন, 'সবাই আমারে চায়।' যার আনন্দ ও সহানুভূতি দুটিই দেওয়ার ক্ষমতা প্রচুর, সবাই তাকে চাইবে না কেন? এমন নিঃস্বার্থ স্নেহ সহজে কাছে আসে না।

চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন। চিঠি লেখা যে একটি কলা তা ওঁর চিঠি থেকে বুঝেছি, আয়ত্ত করতে পারিনি। বাড়িতে বিয়ে, কে কী দিচ্ছে, কন্যাপক্ষ থেকে কতটা, পাত্রপক্ষ থেকে কতটা সোনা সবকিছু লেখা। বিস্তৃত বিরবণ; কত ভরি সোনার হার, তা সীতাহার না সাতনরি, ফারফোর বালা না দুই তারের বালা, হাতিমুখ কি অন্য কিছু; কানের কত গহনা — কানবালা, ঝুমকো না পুরো কান। 'আজকাল সবাই বাউটি দিতেয়াছে, সোনা বাঁধানো পলা সব বিয়াতে।' গহনার ফ্যাশন কতটা বদলাচ্ছে ওঁর চিঠিতে বুঝতে পারি।

মন্তব্য থাকে, 'ছোট বৌ দেখিতে ভালো তবে বড়র কাছে খাটো। 'খাটো' উচ্চতাতে নয়, রূপে। এক বিয়েবাড়ি থেকে এসে লিখলেন, 'বিবাহ বড় সুন্দর করিয়া হইয়াছিল শুনিয়াছি, বৌভাতে গিয়াছিলাম। সবই ভালো, মেয়েটি ভালো, তবে তাহাকে দেখিয়া মনে হইল কেহ দুই গালে দুই থাপ্পড় মারিয়াছে।' অর্থাৎ গাল দুটো চুপসে। নবজাত শিশুদের দেখে এসে তাদের নাক, চোখ, চুল, রং সবকিছু নিয়ে লিখতেন। বেশিরভাগ থাকত অতি চমৎকার। একবার জানালেন, 'বাচ্চার রং ফর্সা, সুন্দর কালো চুল, টিকোলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাক, তবে চক্ষু বড়ই কোটরগত।' মন্তব্য বিদ্বেষ থেকে নয়, খারাপ মনে করে নয় — যেমন দেখেছেন গড়গড় করে লিখে দিতেন। আমি একে বলি 'জাগ্রত বিবরণ'। সবসময় থাকত, 'আমার অনেক যত্ন নিল, দেখিয়া খুশি হইল — বড় আনন্দ করিলাম।'

আনন্দ জানাতে সদাপ্রস্তুত। ১৯৭৪-এ শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে লিখছেন, 'নীলিমার (গায়িকা নীলিমা সেন, সম্পর্কে নাতবৌ) কাছে দশদিন থাকিয়া আসিলাম — কত যে যত্ন করিল। নানা জায়গায় বেড়াইতে নিয়া গেল, অনেকের সঙ্গে দেখা করাইল। আমিতা (সেন) আসিয়া দেখা করিয়া গেল — বড় ভালো লাগিল।'

শুধু ভালো লাগা নিয়ে জীবন কাটে না। শান্তিনিকেতনে থাকতে অত্যন্ত স্নেহের মামাত ভাই বিশুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমাকে লিখছেন, 'পূজার আগে কি ভয়ানক সংবাদ আসিল, বিশু নাই। চিকিৎসার জন্য দিল্লি হইতে কলিকাতা আসিয়াছিল, হঠাৎ কী হইয়া গেল। বৌটির দিকে তাকানো যায় না — মেয়েদের কাহারো বিবাহ হয় নাই। কি যে করিবে জানি না — বড় চিন্তা হয়; (চিন্তা হওয়াটা মনের থেকে, কৃত্রিমতা নেই)। আমি দশদিন থাকিয়া আসিয়াছি, আবার যাইব। বিশু আমার জন্য অনেক করিয়াছে, যখনই তোমার কাছে দিল্লি গিয়াছি, দিদির সম্মানে রাখিয়াছে। তোমারেও বড় ভালোবাসিত, তোমার কষ্ট হইবে। মিনু (মামাত বোন, নিকটবন্ধু) এই আঘাত নিতে পারিতেছে না, সে-ই তো বিশুকে মানুষ করিয়াছে নিজের ছেলের মতো। আমি আবার যাইব — মিনুর হাত ধরিবার কেউ নাই।'

নাতি-নাতনিদের পড়াশোনার বিস্তারিত খবর থাকত। কে সেন্ট পলসে, কে 'সাকোয়া'তে ভর্তি হয়েছে,[৩৩] কে প্রথম হলো, পরীক্ষার ফল ভালো না হলে, 'আজকাল চতুর্দিকে অবিচার — চিরকাল ফার্স্ট হইল, সে কি না তৃতীয় বর্গে? আমি বলিয়াছি, কর্তৃপক্ষকে জানাইতে।' নাতনির বান্ধবীর কথা লিখছেন — 'তার ফল খারাপ হইয়াছে, কত নামকরা মাস্টারের নাতনি, বাপ ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, সেই মেয়েও তৃতীয় বর্গে। তাহাদেরও কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়া উচিত।' উক্তিগুলো, বিশেষ করে শেষোক্ত, যে ঠিক যুক্তিযুক্ত নয় তাঁকে বোঝানোর ক্ষমতা কারো ছিল না।

'ফল ভালো হয় নাই' একথা একবারই ছিল। চিঠিতে থাকত, 'ফার্স্ট হইয়াছে ও বড় ভালো হইয়াছে।' আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। 'সবাই যদি ফার্স্ট হয়, তবে দ্বিতীয় কে হয়? সবাই কী করে ভালো হয়, ভালো নয়, এমনও তো আছে।' উত্তর : আছে, তবে তাগো কথা লিখনের কী প্রয়োজন?

গহনার ফ্যাশনের কথা লিখেছি, শুধু তাই নয়, বৈধব্যবেশের বৈচিত্র্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর চিঠিতে থাকত। প্রথমে ছিল শুধু সাদা; একসময় লিখলেন, 'এইবার পূজায় দশখানি কাপড় পাইয়াছি। প্রায় সবকটিতে পাড়ে সাদা চওড়া কোল', অর্থাৎ পাড়ের দিকে ইঞ্চি দুয়েক সাদা ডুরে; ডুরে চওড়া থেকে সরু হচ্ছে না সবই এক মাপের তাও লেখা থাকত। এরপর এলো, 'আজকাল আমাদের কাপড়েও পাড় হইয়াছে, পূজার কাপড়ে খয়েরি রং ও মুগার সরু ডুরে পাড়। দেখিতে চমৎকার।' মুগা একসময় জরিতে পরিণত হলো — থানে আরো একটু রং-চমক এলো, তাও জানালেন।

সারা কলকাতা ঘুরতেন, কেউ না কেউ গাড়ি বা চলনদার পাঠাতেন। বড় বোনপো মুকুলের বাড়ি সার্পেন্টাইন লেন থেকে বড় ভাগ্নে যোধপুর পার্ক পর্যন্ত কুমিল্লার দত্তগুপ্ত বাড়ি ও বিক্রমপুরের দাশগুপ্ত পরিবারের শাখা-প্রশাখার খবর পেয়ে যেতাম। পরচর্চা ভেবে করতেন না — খবর দিতেন। কারো ছেলে 'বিধবা লইয়া ঘরে আইছে', কেউ 'কায়স্থরে বিয়া করছে', এগুলো খবর। উচিত-অনুচিত মন্তব্য থাকত না। প্রগতিশীল মনোভাব না থাকলেও স্নেহের জয় হতো — দুটি ইংরেজ বধূমাতা ও গুজরাটি জামাইকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

নানা খবরের মধ্যে মাসিমা একবার শরীর হিম হয়ে যায় এমন একটি দুঃখের খবর দিলেন। মনে হলো ওঁর নিজের শুষ্ক জীবন এবং তখনকার নারীর অসহায়, নিরুপায় জীবনের ইতিহাস এতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ১৩৬০-এর দশক — এক আত্মীয়ার মৃত্যু হয়েছে, মাসিমা যথারীতি শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে এসেছেন। পরে আমাদের বললেন, 'তিনি তো গ্যালেন। বেচারি কত বছর ধইরা একাদশীর উপাস করল স্বামীর মৃত্যু কামনা কইরা, মানুষটা (অর্থাৎ স্বামী) এত খারাপ আছিল। ছেলেপুলা বড় হইল, নাতি-পুতি বড় হইল, মানুষটা বদলায় না, এত একাদশীতেও সে যায় না। শ্যাষে কি হইল সকালে স্বামী মারা গ্যালো, বিকালে কাকি শুইয়া, হঠাৎ কইল শরীরটা খারাপ, আমারও বুঝি সময় আইসা গ্যাল, পাশ ফিরল আর চক্ষু বুজল, যেন সহমরণ।' অন্তত ষাট বছরের বিবাহিত জীবনে কত না যন্ত্রণা পেয়েছিলেন মহিলা, মুক্তির রাস্তা ছিল একটি, সধবা হয়ে একাদশী করে স্বামীর অমঙ্গল প্রার্থনা।

মেজদি মাসিমার ছিল নীতিকথার অফুরন্ত ভাণ্ডার। একসময় আমার ভাই ও আমি বিদেশে, মা-বাবার বয়স হচ্ছে, দিল্লিতে একা। হঠাৎ একদিন মাসিমা বললেন, "বুঝলি, আমাগো কালে অনেক কয়টা ছেলেপুলা হইত, একটা 'বোকা ছেলে' থাকত। বোকা এমন না যে কিছু করতে পারে না, লেখাপড়া অল্প আছে, চাকরি করার ক্ষমতা নেই। সেই বোকা ছেলে বাড়িতে থাইকা বাপ-মায়ের দেখাশোনা, বাজার-হাট করত। এখন তগো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন-দুইজন, বাপ-মা একা।" এমন ছেলে জীবনে যে কিছু পেল না, হয়তো মা-বাপ চলে যাবার পর ধিক্কার পেল, তাঁর ছোট ভাইকেও যে এর মধ্যে গোনা যায়, এসব বিচার মাসিমার মধ্যে ছিল না। উনি বর্তমান নিয়ে বাঁচতেন; ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে অন্ধকার দেখার সম্ভাবনা ছিল।

আপনজন হলে তাদের খুশিতেই তিনি খুশি একথা ঠিক; অন্যদিকটাও ছিল। পরের প্রজন্মের অর্থাৎ আমাদের জীবনধারা যে বদলে গেছে সেটা বুঝতে পারতেন না। আমার কন্যার জন্মের পর প্রায়ই শুনতে হতো 'সবই ভালো — তুমি কাজে যাও, কিন্তু এমন সুন্দর মাইয়া, মায়েরে তো পায় না।' রাত্রে গান শুনতে বা গাইতে যেতাম, বলতেন, 'আমাগো কালে এইসব আছিল না, এত রাত কইরা বাইরে থাকন। জামাই বেশি ভালো, কিছু কয় না।' অসন্তুষ্ট হয়েছি, কোনো সময় কটু কথা বলেছি। এখন মনে হয় আমরা সবাই তো কোনো না কোনো পিঞ্জরে বাঁধা থাকি।

১৯৫৪-র ডিসেম্বরে দিদিমার মৃত্যুর পর মাসিমার জীবনে হঠাৎ করে নতুন মোড় এলো। ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে কাশীতে বোন বুচি ও কলকাতায় বোনপোদের কাছে মিলিয়ে-মিশিয়ে উনি থাকবেন। এসব ঠিক করার আগেই মাসিমার শ্বশুরবাড়ির দিকের নিকটাত্মীয়া, ধনীগৃহের কর্ত্রী এসে বললেন, 'ছেলেবেলায় কবছর আমরা বন্ধুর মতো থেকেছি, খেলা করেছি, এখন দুজনেরই বয়স হয়েছে, মায়ের দায়িত্ব তো আর নেই, আমাদের কাছে এসে থাকো। আমি অসুস্থ, বেশিদিন নাই, তোমাকে কাছে পাইলে শান্তি পাইব।' ভদ্রমহিলা কথাগুলো ভালোবাসা থেকে বলেছিলেন। ওঁর স্বামী সুবিবেচক, নীতিবান মানুষ, শ্বশুরবাড়ির অন্যায় বুঝতে পেরেছেন — সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁদের বৃহৎ অট্টালিকায়। জীবনে প্রথম মাসিমা নিজের ঘর পেলেন, ঠাণ্ডা মেশিনের জল সারাদিনের পানীয় হিসেবে পেলেন, যত্নে-আরামে কাটালেন। বছরখানেক পর আত্মীয়ার মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী শিল্পপতি গৃহকর্তা ছেলে বৌদের ডেকে বললেন, 'ইনি তোমাদের মাতৃস্থানীয়া, এঁর যেন কোনো কষ্ট না হয়। আমৃত্যু এখানে থাকবেন, তোমরা গুরুজনের সম্মান দিয়ে রাখবে।'[৩৫] গৃহস্বামীর মৃত্যুর পরও মাসিমা সেখানে বছর দশ-বারো রইলেন। তবে সম্বলহীন, ঠাঁইহীন বিধবা — তাকে মিষ্টস্বরে ডাকলেই মনে করেন 'সবাই আমারে চায়', আবার 'এখানে আর আপনার জায়গা হবে না, অন্যত্র যান', বললে চলে যেতে বাধ্য হন — সেই পরিস্থিতিতে বদল এলো না। বাইশ বছর সেখানে থাকার পর হঠাৎ গৃহস্বামী, সেই ছেলে যাকে তার বাবা, মাসিমা মাতৃস্থানীয়া বলেছিলেন, দিল্লিতে এসে বাবাকে বললেন, 'ওনাকে আর রাখতে পারব না, আপনারা অন্য ব্যবস্থা করেন।' ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার আগেই মাসিমার হৃদয়বিদারক চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলো মায়ের কাছে, 'হঠাৎ করিয়া 'বৌ'[৩৪] কিছু না বলিয়া আমার বাক্সটিসহ প্রবীরের কাছে কেন পাঠাইয়া দিল, কিছুই বুঝিলাম না। এখন নাকি এখানেই থাকতে হইবে। ঝগড়া-বিবাদ তো কিছু হয় নাই, কেন এমন হইল? এ বাড়িতে জায়গার বড়ই অসংকুলান — ছেলেমেয়ে বড় হইয়াছে, সবারই বড় অসুবিধা। ওদের কাছে বোঝা হইয়া থাকিতে চাই না। শুনিয়াছি কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনে আমার মতো বৃদ্ধাদের জন্য আশ্রম আছে, খোঁজ করিয়া সেইখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।' বয়স ৭৯ বছর, জীবনে প্রথম তিনি কত অসহায় তার মুখোমুখি হলেন, হতাশার ইঙ্গিত পেলাম।

আমার মেজাজ কিঞ্চিৎ কড়া। আত্মীয় ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এই যদি করলেন তো যেচে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন? আমরা তো আপনাদের অনুরোধ করিনি। আপনার গৃহের আলাদা ঘর, ঠাণ্ডা জল-বাতাস না হলেও চলত, আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে ভাগ-বাটোয়ারা করে তাঁকে সসম্মানে রাখতাম, তিনি খুশিতেই থাকতেন। এই চরম অসম্মানটা তো হতো না।' জবাব পাইনি; তবু বলব এত বছর মাসিমাকে আরামে রাখার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। শুধু চলে যেতে বলাটা ভদ্রভাবে করতে পারতেন। নিঃস্ব বিধবার সঙ্গে ভদ্রতা-অভদ্রতার চিন্তা কজন করেন? যাই হোক, কাশীতে পাঠানোর প্রশ্ন উঠল না। দিল্লি (মা-বাবার কাছে), বোম্বাই (আমাদের কাছে) বড্ড দূর, আসা সম্ভব নয়। কলকাতায় বকুলদা, প্রবীরদার কাছে যত্নে রইলেন; আমাতে-ভাইতে দূর থেকে যতটা সাহায্য করা সম্ভব করেছি। আর্থিক সাহায্য করা সহজ, সামনে থেকে যত্ন নেওয়া কঠিন কাজ, তা নিপুণভাবে করেছিলেন আমার দাদা-বৌদিরা। ১৯৮০-র জুলাই মাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বকুলদার বাড়িতে।

আশ্চর্য মহিলা, চিরজীবন ব্যাডমিন্টনের শাটল কর্কের মতো এদিক-ওদিক ওঁকে ছোড়া হয়েছে, অবস্থাপন্ন শ্বশুরবাড়ি হলেও কপর্দকহীন, অসম্মান করতে আত্মীয়-পরিজন দ্বিধা করেননি: কিন্তু তাঁর মুখে অভিমান-অভিযোগ-অনুতাপ কখনো শুনিনি।

সদা মুখে হাসি নিয়ে বটবৃক্ষের মতো আমাদের আগলে রাখলেন অথচ আমরা যাঁরা ওঁর এত কাছের, এত স্নেহের কখনো সেরকমভাবে ওঁর কথা ভাবিনি। ওঁর বিশ্বাস বা মনের কথা জানতে চাইনি। সামাজিক আচার-বিচারে তাঁর বিশ্বাস ছিল না সেটা বুঝলাম যখন আমার স্বামী মিষ্টস্বরে ভাঙা বাংলায় মাসিমাকে বললেন, 'আমরা টেবিলে বসে খাই, তুমি নিচে পিঁড়িতে, আমার ভালো লাগে না, আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসো।' তৎক্ষণাৎ রাজি। এরপর এলো রাতে ভাত খাওয়া, মসুরির ডাল খাওয়া। বিনা প্রতিবাদে জামাইকে খুশি করলেন। প্রথমদিকে বাইরের কেউ রাতে খাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের পাশে এলে বলতেন, 'অ বিবি, দেইখা লইল তো রাইতে ভাত খাইতেয়াছি।' কেউ যে নজর করে না সেটা বোঝাতে সময় লাগেনি। অমঙ্গলের ভয় ছিল না, ছিল লোকভয়।

মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে খাওয়া, অর্থাৎ ভাত খাওয়া। দুবেলা ভাত খাওয়া থেকে প্রায় পুরো জীবন বঞ্চিত হয়ে মাসিমার মনের অবস্থা বৃদ্ধ বয়সের একটি প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারা যায়। পরিচিত-অপরিচিত কেউ বাড়িতে এলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'আইজ কী দিয়া ভাত খাইলা?' ধান, চাল গৃহস্থের মঙ্গলচিহ্ন; ভাঁড়ারে চাল ফুরিয়ে গেলে বলা হতো, 'চাল বাড়ন্ত'। 'নেই' বলা অশুভ।

ওঁর বয়স তখন প্রায় সত্তর — ডাক্তার বললেন, স্বাস্থ্যের জন্য মাছ-মাংস খাওয়া দরকার। বিনাদ্বিধায় সবকিছু খেতে লাগলেন, সমাজে নিন্দে হলো, তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে বহু বছরের ঘাটতি মিটিয়ে নিতে লাগলেন। সমাজের বিধানে বিশ্বাস ছিল না বুঝতে পারলাম।

এ রকম সময়েই কোনো বিয়েবাড়িতে দুপুরে বিধবাদের ভোজ হচ্ছে। সবার পরিচিত কোনো অল্পবয়সী স্বামীহারা মেয়ের পুনর্বিবাহ হচ্ছে এই কথাবার্তা চলছিল। সধবা-বিধবা সবাই বলতে লাগলেন, 'নিশ্চয়ই, ২১-২২ বছরের মেয়ে, আবার বিয়ে দেওয়া তো উচিতই, সারাজীবন সে একা কেন থাকবে? তাও দুটি বাচ্চার ভার নিয়ে। খুব ভালো কথা — বিয়ে করছে।' মাসিমা নিঃশব্দে শুনলেন, তারপর মৃদু হেসে, একটু বিরক্তির সঙ্গে বলেন, 'সব বুঝলাম, ঠিকই বলছেন। তবে আমার যখন এমন হইছিল, আপনারা কোথায় আছিলেন?' হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতা, সারাজীবনের নিঃসঙ্গতা, বেদনা, ব্যর্থতা ফুটে উঠল।

সমাজের নিষ্ঠুরতা নানা বিধি-ব্যবস্থায় প্রকাশ পায়। ১৯৩৭-এ দাদামশায় মারা গেলেন। দিদিমার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাড়ি, সম্পদ, সংসার, পুত্র, পুত্রবধূর হাতে চলে গেল, তিলে তিলে গড়া সংসারে তাঁর কোনো অধিকার রইল না। এখন সবকিছু অনুগ্রহের। আরো দুঃখের, দিদিমার নিজের কোনো ঠাঁই রইল না; হঠাৎ করে যেন তোলপাড় করা এক ঝড় বয়ে গেল। ধীরে ধীরে নাতিরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, কেউ অন্যত্র চাকরি নিয়ে, কেউ চাকরির খোঁজে। বেশিরভাগ কলকাতায় — ঢাকায় থাকা সম্ভব ছিল না। পেছনের ঘরগুলো খালি, রেবতী মামা ছাড়া সবাই চলে গেলেন। আত্মীয়-পরিজন যারা উমাকুটিরে থেকে পড়াশোনা করতেন, তারাও নিজেদের অবাঞ্ছিত দেখে অন্যত্র গেলেন। দিদিমার তখন বয়স ষাটের কাছাকাছি, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ওঁর সমবয়সী, তাঁদেরও বয়স হচ্ছিল, এমনিতেই আসা-যাওয়া মুস্কিল ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে আবহাওয়া বদলে যাওয়ায়, তাঁরা আসা প্রায় বন্ধ করে দিলেন। প্রবীরদা লিখছেন, 'দাদামশায়ের মৃত্যুর পর উমাকুটিরে থাকা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে; নিজেদের খানিকটা রবাহূত মনে হয়েছে। পড়াশোনায় ভালোই ছিলাম, তাও ১৯৪০-এ বিকম পাশ করে চাকরির চেষ্টা করি — বুঝেছিলাম আর পড়া হবে না। দিদিমাকে ছেড়ে কোথাও যাব কখনো ভাবিনি। উপায় ছিল না। ১৯৪২-এ দিদিমা, ঢাকা শহর, আমার জন্মাবধি সহায় ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি চাকরির আশায়। যুদ্ধের বাজার, চতুর্দিকে হাহাকার।' দিদিমার অবারিত দ্বার, সোনার সংসার নিমেষে হারিয়ে গেল।

মাসিমার অবস্থা আরো শোচনীয়, না শ্বশুরবাড়ি, না ভাইয়ের বাড়িতে তিনি স্বাগত। শ্বশুরবাড়িতে স্বাগত না হলেও অপমানিত হতেন না, বরং ভাশুরপো, ভাশুরঝিদের কাছে সম্মান পেতেন। তখন তো তাঁর চাইবার কিছু ছিল না। ভাইয়ের বাড়ির পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন — অপমান, তিরস্কার রোজকার বোঝা হয়ে দাঁড়াত। মাসিমার অপরাধ ছিল, স্পষ্ট কথার মানুষ, এক-আধ সময় জবাব দিতেন বা প্রতিবাদ করতেন। যেখানে পরনির্ভর, ছোট ভাই বা অন্য কারো উপার্জনের ওপর, সেখানে জবাব দেওয়া সংগত নয়। ভাইপো-ভাইঝি সম্বন্ধে 'স্নেহে অন্ধ' নিঃসন্তান বিধবা, মাসিমা তাদের কাছে যেতে চাইতেন, সেটা হতো অনধিকার প্রবেশ। সম্পর্কের গোড়ায় সংবেদনা না থাকলে কলহের কারণ নানা দিক থেকে উদয় হয়। দিদিমা শান্তিপ্রিয় মানুষ, নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন।

যে ঝগড়া, কলহর কথা প্রবীরদা লিখেছেন তা দিন দিন বাড়তে লাগল। কারণ জানি না, জানার প্রয়োজন বোধ করিনি, তবে দিদিমার মতো মানুষ কষ্টে, অবহেলায় বছরের পর বছর কাটিয়েছেন সে দুঃখ নাতি-নাতনি আমরা কখনো ভুলতে পারিনি।

চিঠির বাক্সে মাকে লেখা দিদিমার সাতটি চিঠি পেয়েছি। শেষের দুটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাবার সেখানে ফেরার সম্বন্ধে, তাই অন্য অধ্যায়ে। প্রথম দুটি ১৯৩৪ ও ১৯৩৬ — আনন্দ-উৎসাহে ভরা। ১৯৩৪-এর অক্টোবরে বাবা কলকাতা থেকে লন্ডনের পথে রওনা হচ্ছেন তার ঠিক আগে লেখা। গর্বিত, তবে উদ্বিগ্ন — এত লম্বা পথের সফর, মঙ্গলকামনা, আশীর্বাদ ভরা এই চিঠি। ১৯৩৬-এ ঠিক দুবছর পর বাবা Ph.D.তে সফল হয়েছেন, গর্বে-আনন্দে আশীর্বাদী চিঠি মা ও জেঠিমাকে বরিশালে। কবে বাবা ফিরবেন, মাকে নিয়ে ঢাকা আসবেন — সে আশায় বসে। তখনকার মধ্যবিত্ত পরিবারে বিদেশ গিয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়া সহজ ছিল না; এর গুরুত্ব দিদিমা বুঝতেন — তাই উৎফুল্ল; 'এমন জামাই'।

১৯৩৭-এর শেষ থেকে রং বদলে যায়, মন কুয়াশাচ্ছন্ন। আছে নৈরাশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও একাকিত্ব। একাকিত্ব কিছু পরিস্থিতি, কিছু বৃদ্ধ বয়সের মাসুল; নৈরাশ্য, কারণ ভবিষ্যতের পথ চেয়ে থাকার মতো কোনো সম্বল তাঁর ছিল না।

১৯৩৯-এ দীর্ঘ চিঠি খামে (তারিখ পড়তে পারছি না)। খামের ওপর ঠিকানা উল্লেখযোগ্য 'চিরকল্যানিয়া শান্তি দাসগুপ্তা, শ্রীমান অমিয় দাশগুপ্তের বাড়ি, সেগুনবাগান, ঢাকা।' ও-পাড়ায় তখন বোধহয় গুনে গেঁথে বাড়ি ছিল। দিদিমা-মাসিমা জেঠিমায়ের চিঠিতে আরেকটি জিনিস লক্ষ করি — কেউ তারিখ লেখেন না। ওপরে থাকে 'গেণ্ডারিয়া, বুধবার' বা 'বরিশাল, শুক্রবার'; খুব বেশি হলে যেমন ১০ই শ্রাবণ, বছর নেই। সিলমোহর দেখে সন-তারিখ বুঝতে হয়, সেটা সবসময় সম্ভব হয় না; সত্তর-আশি বছর পর যেটুকু উদ্ধার করতে পারি সেটাই বিশেষ মনে হয়, তারিফ করতে হয় ইংরেজ সরকারের স্ট্যাম্পের কালির।

এ চিঠি হৃদয়বিদারক। নানা কিছু সহ্য করার পর মাকে মনের কথা জানাচ্ছেন। দু-একটি উদাহরণে বাড়ির পরিস্থিতি বোঝা যায়।

১৯৩৯-এ দিদিমা গেণ্ডারিয়াতে, মা সেগুনবাগানে, একই শহরে; মাকে তাঁর মা লিখছেন, 'এত কাছে তবু (তোমাদের) দেখিতে পারি না। এক বৎসর হইল এখানে আস না, এ-দুঃখ রাখিবার জায়গা নাই।' আরো লিখছেন, 'মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম, দুটি ভাত ফুটিয়ে দিবার কেউ নাই।... ওদিকের কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে কাজের লোকটিও অপমান করে আমাকে। সে সবই দেখে, শোনে, কিছু কহে না, দুর্ভাগ্য আমার।'

ক্ষীণ আলোর রেখা খুশি করে দিদিমাকে। 'এইবারে উপাসে ভগবানের দয়ায় খুব ভালো ছিলাম। কোনো কষ্ট হয় নাই। দুই দিনই শৈবলিনীর বাসায় খাইয়াছি।' শৈবলিনী ঠিক কে ছিলেন জানি না, ধু-ধু মনে পড়ে মায়েদের শৈবলিনী মাসিমার কথা। শাড়ি-গহনায় চিরকালের শৌখিন আমি, মায়ের একটা গাঢ় বেগুনি রঙের শাড়ি ছিল, তাতে সোনালি 'খাড়ি' ছাপ; সঙ্গে জরির কারুকার্য করা একই রঙের ব্লাউজ। এই মাসি বরোদা থেকে আনিয়ে মাকে বিয়েতে দিয়েছিলেন। এত সুন্দর শাড়ি, এই মাসি আমার কাছে 'ভালো' মাসি ছিলেন, তবে কী করে মাসি, কেমন দেখতে, বিস্মৃতির জগতে চলে গিয়েছে। আজ প্রায় ৮০ বছর পর আমার দিদিমাকে উনি যত্ন করেছিলেন ভেবে 'ভালোর' সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জুড়েছে।[৩৫]

এর পরের চিঠি ১৯৪২-এ ফরিদাবাদ পোস্ট অফিস থেকে লেখা পুরানা পল্টনে। একাকিত্বের থেকে অভিমান হয় মাঝে মাঝে। 'কলিকাতার (অর্থাৎ নাতি-নাতনিদের) একখানা পত্রও পাই না। আমার এমন অদৃষ্ট — সবই এক রকম। একখানা পত্র দিয়াও আমাকে নিশ্চিন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা কর্তব্য মনে করে না।... চিরজীবন কেবল চিন্তাই করিলাম। চিন্তার জন্যই আমার সংসারে আসা।' কত একা হলে দিদিমার মতো শক্ত মানুষ এমন ব্যথা ব্যক্ত করেন। ১৯৪২-এ, (সম্ভবত মার্চ মাসে) লেখা আরেকটি চিঠি 'দেশের অবস্থায় মন খুব খারাপ, আবার ভাবি সবাইর যা হয় আমাদেরও তাহাই হইবে। জানি না ভগবান কী করিবেন। যেভাবেই থাকি তবু মনে বল, নিজের বাড়িতে আছি। যদি ইহা যায় তবে কোথায় যাইব জানি না।' বাড়ি হাতছাড়া হওয়ার কথা কেন এলো জানি না; অধিগ্রহণ গেণ্ডারিয়া অবধি পৌঁছেছিল বলে শুনিনি। একি ভবিষ্যদ্বাণী? উনি কি টের পেয়েছিলেন ওই বাড়ি চলে গেলে ওঁর কী হবে?

১৯৪২-এর শেষে ভাইয়ের জন্মের সময় বাড়ির আবহাওয়া একটু বদলেছে মনে হয়। দিদিমা-মাসিমা আমাদের বাড়িতে আসতে শুরু করলেন। ১৯৪৪-এ যখন ওয়ারীতে তখন আসা-যাওয়া বেড়ে গেল। এরই মধ্যে এঁরা তীর্থযাত্রা করে এলেন মথুরা-বৃন্দাবন ইত্যাদি হয়ে। দিদিমার চেহারা শান্ত, দুশ্চিন্তার রেখা কম, বয়সের রেখা প্রচুর। আমরা গেণ্ডারিয়া যাওয়া শুরু করলাম। আমার স্মৃতিতে আছে মামাবাড়ির আনন্দ, আদর-আপ্যায়ন, স্নেহ, আড্ডা, গান-বাজনা আর অসাধারণ রান্না। তবে এ-ও মনে পড়ে দিদিমার কোনো সম্বল ছিল না। তাঁর ঘরে ছোট আলমারিতে ছিল গোটাচারেক ধুতি, সেমিজ আর গামছা। কিছু রাখতেও পারতেন না। ১৯৩৯-এর চিঠিতে আছে, 'মুকুল (বড় নাতি) আমাকে একটি বিছানার চাদর ও গামছা দিয়া গিয়াছিল, চাদরটি গেছে।'

আলমারির এক কোণে একটি কৌটাতে রুমালে মোড়া থাকত অমূল্য সম্পদ, ওঁর ও দাদুর আলাদা করে দুটি ফটো নকশা করা সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। ভিক্টোরিয়ার যুগে এর চল ছিল। নানা দুঃখ-কষ্টেও এ ছবিটি তিনি হাতছাড়া করেননি। পরে মাকে দিয়েছিলেন ছবি দুটি। মাসিমা ভুল বোঝায় অন্য শাখায় চলে গিয়েছে। আছে, সেটাই বড় কথা। আমার মনে পড়ে প্রথম যেদিন ওই আলমারি খুলে দিদিমা ফটো দুটি দেখিয়েছিলেন। চোখে ক্ষণিকের জন্য দীপ্তি এসেছিল, সেই কত কাল আগে, কত যুগ আগে।

দিদিমার শেষের কবছর আরো দুঃখে-কষ্টে কেটেছে — এ-ও সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের এক রূপ। অন্য রূপও আছে, যেমন মায়ের মামাবাড়ি লক্ষ্মীবাজারে ছিল, কিন্তু তা তো আমি অত কাছে থেকে দেখিনি। দেশবিভাগের পর প্রায় বছর দুই দিদিমা-মাসিমা-বড় মামা ঢাকায় ছিলেন। (অন্যদের কথা জানি না)। তারপর উমাকুটির ছেড়ে কলকাতা চলে আসতে হলো। দিদিমার মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারি, এ বাড়ির প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে আত্মিক যোগ — টিনের চালের রান্নাঘর, চন্দন গাছ, তুলসীমঞ্চ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেহাতই আপন নিজের ঘর, পুজোর আসন, সর্বোপরি বহু বছরের স্মৃতি, সব ছেড়ে চলে আসতে হলো। মামা কলকাতায় ম্যাকলিওড স্ট্রিটে এক বাংলো বাড়ির ওপরতলায় বিশাল ফ্ল্যাট নিলেন — শুনেছি উমাকুটিরের বদলে এই ফ্ল্যাট পাওয়া। দিদিমা-মাসিমার সেখানে ঠাঁই হলো না, নিজস্ব ঠাঁই আর কোনোদিনই হলো না; পাঠিয়ে দেওয়া হলো কাশীতে একটি আলোহীন, বাতাসহীন ঘরে — যা মাসোহারা আসত তাতে এর থেকে ভালো কিছু নেওয়া সম্ভব ছিল না।

বাঙালিটোলার সরু গলিতে, ভাঙা ইটের উঁচু দেয়াল, রংচটা কাঠের গেট, ভেতরে আগাছা ভরা উঠোন, এক পাশে দাঁত-দেখানো ছোট ইটের চকমেলানো দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় এক কোণে কুঠুরির মতো একটি ঘরে দিদিমা-মাসিমার বাসস্থান। আগাছার মাঝে শৌচালয়, সেও কুঠুরি; তবে ছাদ এতই ভাঙা যে আলো, রোদ, বৃষ্টির জল, শ্যাওলা কিছুরই অভাব হয় না। বাড়ির মালিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত — পৌরোহিত্য করে জীবন চালান। উনি ও তাঁর পরিবারের সবাই অত্যন্ত সজ্জন, দিদিমাকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর কষ্ট লঘু করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁরাও ছিলেন অত্যন্ত গরিব। আর্থিক অনটন ওঁদের ঘায়েল করেনি; মেয়েরা তিনজন সর্বদা হাসিমুখে দেখা করতে আসতেন, দুই বৃদ্ধার খেয়াল রাখতেন। এঁদের মা ছিলেন রূপসী, মস্তবড় সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, সাধারণ করে খুবই সাধারণ শাড়ি পরে আসতেন, মনে হতো লক্ষ্মীপ্রতিমা।

ওপরে পুজোর ঘরে বিরাট দেবীমূর্তি, সম্ভবত মা দুর্গার, বংশপরম্পরা থেকে এখানে বিরাজিত। কাশীতে এটাই আশ্চর্যের, কোন কোণে যে বহু পুরনো ঐতিহ্যের কিছু দেখা পাওয়া যাবে বলা যায় না। নিষ্ঠার সঙ্গে এ বাড়িতে দেবীর পুজো রোজ হতো: পুজোর আয়োজন করে তিন মেয়েকে স্কুলে পড়িয়ে তাঁদের দুবেলা অন্নের সংস্থান ছিল না বললেই চলে। তাও এঁরা ছিলেন সুখী, একটি সুখী পরিবারের ছবি যেমন মনে আঁকি ওঁরা ছিলেন সে-রকম।

'এইখানে হেমেন্দুবালার উদারতার আরো একটি দৃষ্টান্ত মেলে। কাশীতে তাঁরা ভাড়া থাকতেন বাঙালিটোলার এক গরিব 'ভট্টাচার্য' ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাড়িতে। তাঁর তিনটি কন্যা। এক কন্যা, নীলিমা ভট্টাচার্য পরে আমার পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এসেছেন। আমার স্ত্রীকে খুবই সম্মান করতেন। নীলিমা পড়াশোনা করতেন বেনারস ইউনিভার্সিটিতে। পয়সার অভাবে তার পড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। খাওয়াও ঠিকমতো জুটত না। পড়াশোনায় তিনি ভালোই ছিলেন। হেমেন্দুবালা নিজে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তার জন্য সুপারিশ করে খুব সামান্য অর্থের বিনিময়ে তার পড়ার সুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দিয়েছিলেন (concession)। নীলিমাদের খাওয়া চলত প্রায় একবেলা। সামান্য টাকা ছেলের কাছ থেকে যা পেতেন তা দিয়ে যেটুকু দুধ কিনতেন (মা-মেয়ের) তা প্রায় সবটুকুই দিদিমা তাদের (মেয়েদের) দিয়ে দিতেন। নীলিমা বেঁচে থাকাকালে যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে দিদিমার নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন। পড়াশোনা নিজে বেশিদূর না করলেও পড়াশোনার অনুরাগীদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা যেন ঝরে পড়ত।'

নীলিমাদি কলকাতায় এক করপোরেশন স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হয়েছিলেন, পরিবারের সবাইকে কলকাতা এনে তাদের দেখাশোনা করেছিলেন। নিজে বিয়ে করেননি, যতদূর জানি বোনেদের বিয়ে দিয়েছিলেন। উনি সবসময় বলতেন, দিদিমা না থাকলে এসব কিছুই হতো না।

'মা-মেয়ের অনেক কষ্টে চলত বেনারসের জীবনযাত্রা, তবে তৃপ্তি পেতেন বিশ্বনাথের চরণে বসে।' প্রথমদিকে দিদিমা বিশ্বনাথ বা অন্নপূর্ণা দর্শনে যেতেন, গঙ্গার ঘাটে বসে জপ করতেন, ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে গেল। বয়সে, উমাকুটির হারিয়ে তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছে, মন্দির বা গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার শক্তি নেই। ঘরেই থাকতেন, উদ্বোধন বা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে। কখনো ভালো ভ্রমণকাহিনি পেলে তা নিয়ে বসতেন। কোথায় উমাকুটিরের ঝলমলে সংসার, কোথায় কাশীর সরু গলিতে ভাঙা ইটের বাড়ির আলো-বাতাসহীন ঘর। দেশবিভাগ না হলে এ অবস্থা হতো না। প্রবীরদা লিখছেন, 'দেশবিভাগ সবাইকেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। দেশভাগের দুঃখ-যন্ত্রণার ভাগীদার ছিল সব এপার-ওপার বাংলার মানুষই।'

দিদিমার বিষাদের কথা ভেবে বহুকাল একটা ব্যথা অনুভব করেছি। আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে, কাশীতে ওঁর চোখে-মুখে ছিল প্রগাঢ় শান্তি — তা খোলা আকাশের নিচে গঙ্গাতীরেই হোক বা ঘরের রুদ্ধ অবস্থাতে। বহু বছর পর যেন মুক্তি পেয়েছেন। আমরা যাঁরা ওঁর একান্ত আপন এর থেকে বেশি কি চাইতে পারি?

কাশীর জীবনে মাসিমা, যাঁর 'আনন্দ সর্বকাজে', নানা মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বনাথ মন্দিরের গলি, বিকেলে 'গোপালে'র কীর্তন শুনে, রান্নাবাড়ি, বাজার করে ভালো ছিলেন। গলি গলিতে বড়-ছোট মন্দির, বিশেষ নাম শুনতাম কেদারেশ্বর, দুর্গাবাড়ি, অন্নপূর্ণা মন্দির যেখানে অন্নকুট হতো। আরো কত নাম বলতেন। আমাদের পড়ুয়াদের সুবিধে ছিল, শুধু একটি মন্দিরে যেতে হতো — সংকট মোচন হনুমান মন্দির। পরীক্ষার আগে গেলে পরীক্ষার সংকট কেটে যায়, ফল ভালো হয়! বাৎসরিক পরীক্ষার মতো এখানেও বছরে একবার যাওয়া, পরীক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক আগে তখন ছাত্রছাত্রীর ভিড়। পরীক্ষা শেষে নীরব-নির্জন। পেছনে ছোট্ট মন্দিরে ছিল পুরো সিঁদুরে লেপা ছোট্ট হনুমান মূর্তি। বলা হতো সন্ত তুলসীদাস *রামায়ণ* লেখার সময় এই মূর্তিকে পুজো করতেন। তখনো তুলসীদাসের *রামায়ণে*র সমালোচনা করার জ্ঞান হয়নি, নারীর অধিকারের বা নারী জাগরণের কথাও ভাবিনি, 'রাবণ-রামের গৃহ কারাগারে কাঁদে বন্দিনি সীতা',[৩৬] জসীমউদ্‌দীনের এই মর্মভেদী পঙ্‌ক্তি কানে ঝঙ্কার দেয়নি, ভক্তিভরে মূর্তি-দর্শনে যেতাম। শহর থেকে দূরে বলে মাসিমা এখানে আসতেন না, আমরা মাঝেমধ্যে নিয়ে যেতাম।

মাসিমার দিন শুরু হতো পুজোআর্চার সঙ্গে। ভোরে উঠে পুজোর সামগ্রী নিয়ে চলে যেতেন গঙ্গাস্নানে, তারপর কোনো মন্দিরে পুজো দিয়ে ফুল-বেলপাতা নিয়ে পথে চেনা পরিচিতদের সঙ্গে গল্প করে একগাল হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। প্রাণ দিয়ে দিদিমার যত্ন নিতেন, পুজোর ফুল-বেলপাতা ছিল যত্নের বড় অঙ্গ, দিদিমা যেতে পারতেন না, আশীর্বাদের ফুল কাছে রাখতেন। উনি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি, কথা বলতে পারেন না, আশীর্বাদী ফুল-বেলপাতা দিলে নিজেই বালিশের নিচে রেখে দিতেন। কেউ দেখা করতে গেলে তার কপালে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ দিতেন।

বিকেলে মাসিমা যেতেন কীর্তন শুনতে, সম্ভব হলে দিদিমাকে নিয়ে। দশাশ্বমেধ ঘাট যাওয়ার বড় রাস্তার বাঁদিকে খুব উঁচু দেয়াল ও লোহার কারুকার্য করা গেটের ভেতর ছিল বৃহৎ অট্টালিকা, সামনে প্রাঙ্গণ। রোজ বিকেলে প্রাঙ্গণ ভরা শ্রোতার সামনে হতো গোপালের[৩৭] কীর্তন। লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন, সাদা ধুতি একটু উঁচু করে পরে — গোপালজি দরাজ গলায় গাইতেন শ্রুতিমধুর আবেগপূর্ণ কীর্তন। আমি শুনেছি — 'নিমাই-সন্ন্যাস' বা 'পালা' যাই হোক, এ গানে আর্দ্রচোখ রাখা সম্ভব হতো না, নিরাকার অসীমকে স্মরণ করিয়ে বুঝিয়ে দিত 'আমার ভিতর অ বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে।'[৩৮]

সন্ধ্যায় আবার নদীদর্শন, সন্ধ্যারতি দেখা, ঘরে ফেরা। মাসিমার দিন ভরা ছিল। হোক না স্বল্প মাসোহারা, স্বাধীনচেতা মানুষটি এই প্রথম দৈনন্দিন জীবনে স্বাধীন হলেন। যতই কষ্টকর হোক অর্থের দিক থেকে, কাশীধামে থাকা দুজনের পক্ষেই বোধহয় ভালো হয়েছিল। আর কুঠুরি? কোনো খিটখিটে মেজাজের বাড়িওয়ালার আলো-বাতাস ভরা বড় ঘর থেকে অনেক শান্তির ছিল একটি সৎপরিবারের সঙ্গ, যেখানে সম্পর্ক এক প্রজন্মে থেমে থাকেনি। তবে ঠাঁইহীন, গৃহহারা হওয়া উচিত ছিল না।

প্রশ্ন জাগে, প্রায় সারাজীবন একসঙ্গে থেকে মা-মেয়ের সম্পর্ক কেমন ছিল? স্বভাবে একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন তা প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই বোঝা যায়। তর্ক-বিতর্ক কি হতো না? অশোক মিত্র একটি মজার গল্প বলেন। আমরা যখন ১৯৫০ থেকে বছরতিনেক আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে, উনি মাঝেমধ্যে কাশী যেতেন মাসিমা-দিদিমাকে দেখতে। খুব হাসতে হাসতে ওঁর বিশিষ্ট আড্ডার ভঙ্গিতে কিছুদিন আগে বললেন, 'আরে শোনো শোনো একবারের কথা। দেখা করতে গিয়েছি, শুনি মা-মেয়েতে তুমুল ঝগড়া। আমি একটু ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম, ঝগড়া বন্ধ হয় না, আমি মাঝে কথাই বলতে পারি না। বিষয়টা কি জানো? কাশী থেকে লন্ডন বেশি দূর না আমেরিকা বেশি দূর!' একজন যদি বলেন, 'আরে না আমেরিকা বেশি দূর, অন্যজন জবাব দেন, কী যে কও, কাশী থিকা লন্ডন অনেক বেশি দূর।' বলাবাহুল্য, দিদিমার ভূগোলজ্ঞান বেশি ছিল। অশোকদা সেদিন ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন, বাগ্‌বিতণ্ডা এর থেকে বেশি গুরুতর হয়েছে মনে হয় না।

কাকি-জেঠিরা পড়াশোনা করলেও ভারতের মানচিত্র জ্ঞান সবসময় থাকত না। বলা হতো, হাওড়া ব্রিজের ওদিকে কী আছে তা ওঁরা জানতে চান না। একটি উদাহরণ দিই ১৯৪৬, আমরা দিল্লিতে, পিসতুতো দিদি বহুদূরে মহারাষ্ট্রে পাঁচগিনি গিয়েছেন, স্যানেটোরিয়ামে আছেন। এক জেঠিমার চিঠি এলো, 'তোমরা দিল্লিতে, ভাগ্নির সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘন ঘন দেখা হবে।' লেখাপড়া ভালোই জানতেন।

অনেকবার ভেবেছি ওঁরা কাশীতে আমাদের কাছে কেন রইলেন না — ওঁদের আসার পর কিছুদিন আমরা কাশীতে ছিলাম, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট বাড়িতে। কারণ বোধহয় দুটো। দিদিমা যতই মুক্তমনা হোন, মেয়ের বাড়িতে বোঝা হয়ে থাকাটা পছন্দ করতেন না। হয়তো বুঝিয়ে রাজি করানো যেত, কিন্তু মন্দির, গঙ্গার ঘাট? বিশ্ববিদ্যালয় তখন এমন একটি জায়গা, সবকিছু থেকে এত দূরে যে, একটি রিকশা পাওয়া যায় না। পরিচিত কেউ নেই কাছে, সেখানে তাঁদের থাকা মানে বন্দি অবস্থা।

কাশী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটু লিখি। সময় ১৯৪৮-৫৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য যতই হোক না কেন বাস করার সুবিধে ছিল না। যানবাহনের অবস্থা কল্পনা করা মুশকিল। ট্যাক্সির প্রশ্ন ওঠে না, এমনও হয়েছে যে বাবা কনফারেন্সে যাওয়ার ট্রেন ধরতে পারেননি কারণ বাঁধা রিকশা আসেনি, চলতি রিকশা পাওয়া যায়নি। দোকান ছিল একটি, 'চাচাজি'র দোকান, মিলের শাড়ি থেকে ঘিয়ের টিন সেখানে পাওয়া যেত। এই দোকানের পাঁচ টাকার মিলের শাড়ি পরে কলেজে গিয়েছি। ক্যাম্পাসে মাত্র দুটি গাড়ি ছিল, উপাচার্যের ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের। অফিস ছাড়া ফোন ছিল পোস্ট অফিসে — সুসংবাদ-দুঃসংবাদ ওখানে আসত। কেউ খবর নিয়ে এলে বাবা-কাকারা গিয়ে পাল্টা ফোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন। এসবের জন্য টেলিগ্রামের ব্যবহার বেশি ছিল। মনে পড়ে ভর্তির সুপারিশের ফোন আসত রাতে দেরি করে মনোরঞ্জন কাকার কাছে, দিল্লি থেকে সরকারি উচ্চপদস্থ কারো কাছ থেকে। খেপে গিয়ে ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে এসে 'দাদা' বলে তাঁর অনবদ্য বরিশালি ভাষায় কাহিনিটি বলতেন। ওঁর দেশ ছিল মাহিলাড়া।

ছেলেরা সাইকেলে করে ঘুরে বেড়াত, আমরা প্রচুর হাঁটতাম, মাকে নিয়ে বেরোলে পথে রিকশা নিয়ে নিতাম। রোজদিন শহরে যাওয়া হয় না, প্রায়ই যেতাম ইউনিভার্সিটির গেটের ঠিক বাইরে, 'লঙ্কা'তে। এখনকার ভাষায় একে বলতে হয়, 'The happening place'. কয়েকটা খাবার স্টল, মনিহারি দোকান, দু-চার টাকার শখের জিনিসের দোকান একটি, সেখান থেকে ছুঁচ-সুতো রাখার জন্য নীল রঙের প্লাস্টিকের পুতুলের আকারের বাক্স কিনে ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। সর্বোপরি ভালো বইয়ের দোকান। সিনেমা হল ছিল কাছাকাছি, সেখানে আমি যেতে পারতাম না। বড় হওয়ার পর ভাই আমাকে খেপিয়ে বলত 'ইস, দিদি — তোর বালিকা বয়স কীভাবে যে কাটল। বিকেলে সাজুগুজু করে কী করা? মনোরঞ্জন কাকার বাড়ি যাওয়া বা মায়ের সঙ্গে 'লঙ্কা' যাওয়া। বেচারি তুই।'

ওর কি, ও তো সিনেমা দেখতে চলে যেত।

লঙ্কা থেকে সোজা রাস্তা হলেও শহর অনেক দূরে। কাশী শহরে ছিল জাঁকজমক, রাস্তার দুদিকে দোকান — শাড়ি, শার্ট, প্যান্ট ঝোলানো, বাহারের জুতো সাজানো, বিজলির পাখা, আসবাবপত্র, রান্নার জিনিস — প্রয়োজনীয় সব কিছুর দোকান। দুদিকে আলো, নবাবপুরের রাস্তা থেকে আরো যেন ঝলমলে। চওড়া চার রাস্তার মোড়ে ডানদিকে গেলে দশাশ্বমেধ ঘাট। পথে কিছু ধনীগৃহ, ডানদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেটা পুরো খোলা,[৩৯] গহনার দোকান — পাশাপাশি দুটি। এদের কাজ কত সাচ্চা ও সূক্ষ্ম ছিল আজ আটান্ন বছর পর আমার বিয়ের গহনা দেখে বুঝি। ছিল অনেক খাবার দোকান, ক্ষীর কদম্বের লোভে দাঁড়িয়ে পড়তাম মিষ্টির দোকানের সামনে। ঘাটে যাওয়ার পথে বাঁদিকে দুটি লস্‌সির দোকান। বাদাম-পেস্তা ভরা খাঁটি মালাইযুক্ত দুধের দই থেকে লস্‌সি, এমন আর খাইনি। দুই দোকানের প্রতিযোগিতা ছিল ভয়ংকর — একটির সামনে বছর চল্লিশের ছোটখাটো গোলগাল এক ভদ্রলোক বলেই চলতেন, 'মা, মা, দিদি, আসুন না, আসুন, ভেতরে আসুন — একটু পরখ করে যান। এমনটি কোথাও পাবেন না, আপনার জন্যই বানানো। একেবারে তাজা এখনই তৈরি। আসুন আসুন মা।'

এ দোকানের লস্‌সির তুলনা ছিল না। কোন দোকানেরটা বেশি ভালো এ নিয়ে দাদা সমীর আর আমাতে বিবাদ লেগেই থাকত। প্রথমটিতে এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাতরস্বরে ডাকতেন, যেদিন যেতে পারতাম না, নিজেকে দোষী মনে হতো।

সোজা চলে গেলে দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বাসী মানুষ ফুল, বেলপাতা, মালা দিয়ে মা-গঙ্গার পুজো করছেন, কতজন সাঁতার কাটছেন। কেউ এক ডুব দিয়ে পবিত্র জলে স্নান করছেন — বজরা, নৌকা ভরা নদী। সাধু-সন্ন্যাসীরা বসে আধ্যাত্মিক কথা শোনাচ্ছেন, কেউ তাতে শক্তি পাচ্ছেন, আবার দিদিমার মতো মানুষ একমনে একান্তে জপ করছেন। লোকের ভিড় সিঁড়িতে, ওঠানামা, একটু বসা — কারো গলায় চওড়া কণ্ঠি, কারো হাতে ঘটি, কমণ্ডলু, জলে প্রদীপ, কারো হাতে প্রদীপ। ভিড়, কোলাহল, মানুষ ও পাখির কলধ্বনি, তারই মধ্যে সংস্কৃতের শ্লোক, কীর্তনের রেশ, এ দৃশ্যতে আদি-অনন্তকালের ছায়া ছিল, যেন শত শত বছর ধরে চলে আসছে ও চলতে থাকবে।

এ রাস্তায় এক জায়গায় বাঁদিকে মোড় নিলে বিশ্বনাথ মন্দিরের গলি — দুদিকে শাড়ির দোকান আর অল্পসংখ্যক দোকান তামা, পিতলের দেব-দেবীর মূর্তি ও পুজোর বাসনের। শাড়িই এ গলির বিশেষত্ব। এত সরু গলির দুধারে এত সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য, চোখ ঝলসে যেত। এখানে এক দোকানে ঝোলানো লাল মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি বাবার পছন্দ হয়েছিল, আমার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪৯ — আমার প্রথম শাড়ি আজো আছে।

তখন ছিল বিশ্বাসের দিন — ভাই ছোট, গলির ভিড়ে বা মন্দিরে পিচ্ছিল পাথরে ওকে নিয়ে হাঁটা মুশকিল। মা মন্দিরে গেলে ভাইকে একটি পরিচিত দোকানে বসিয়ে চলে যেতেন। ও খেলা করত, মা ফেরার সময় ওকে তুলে নিতেন। কখনো মায়ের দেরি হয়েছে, দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এলো, মা না ফেরা পর্যন্ত দোকান ওঁরা খোলা রেখেছেন, কোনোদিন অনুযোগ করেননি।[৪০]

অনেক রাতে ইউনিভার্সিটিপাড়ার মতো শহরও শান্ত, পথিকহীন, আলোবিহীন। ট্রেন ধরার জন্য ঘুটঘুটে অন্ধকারে যেতাম গোধূলিয়ার মোড়, চৌরাস্তা পার হলেই গরু-বাছুরের রাতের বিশ্রামের স্থান। শোয়া, আধশোয়া, গভীর অন্ধকারে এদের নীল চোখের আলো আমাদের পথ দেখাত। রোমাঞ্চকর, ভয়াবহ। জীবনে সারা পৃথিবীতে অনেক ঘুরেছি, কাশী থেকে সমৃদ্ধ, পুরনো ঐতিহ্যের শহর দেখেছি; নীল চোখ, ঘাটের সিঁড়ি — কোলাহল দিত আমাকে মাটির টান, যা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের যে কটা দেখেছি তা দেয়নি, দেবার কথাও নয়।

'ধান ভানতে শিবের গীত' গাইবার কারণ আছে। বলতে চাইছি যে এই লোকাহল, জনমানব ছেড়ে মাসিমা-দিদিমাকে আমাদের কাছে এনে রাখাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যায় হতো। দোকান-পসার-আলো, ফুল-মন্দির-গঙ্গা নদী ছাড়াও এখানে ওঁদের একটি সমাজ ছিল। কেউ পূর্বপরিচিত, কেউ দূরের আত্মীয়, কেউ পুজো-আর্চার মাঝে পথে-ঘাটে আলাপ, দিদিমার ঘরে এঁদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। এই ঘরের দোরগোড়ায় বসে মনোরমামাসি পাত্রীর 'গুণাবলি' বা 'গুণনামচা' পাত্রপক্ষকে দিতেন। এভাবেই একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল।

দিন যায়, বছর ঘোরে। হঠাৎ এক দুপুরে মাসিমা একা আমাদের বাড়িতে এলেন। গেট থেকে শুরু করলেন "ওরে বুচি লো, আয় লো, শোন কী হইসে। শোন, শোন। কাল গঙ্গার ঘাট থিকা ফিরতেয়াছি, ও মা — দেখি কী লো — ঘাটে, গাছের নিচে শুইয়া, কে — বিশ্বাস হইব না, দুধার মা। হ, আমাগো গেণ্ডারিয়ায় দুধার মা। চেহারা কী খারাপ, কী খারাপ! দ্যাশ থিকা পলাইয়া আইল, সবই তো হারাইছে, কলিকাতায় আত্মীয় কারো কাছে গেছিল, কেউ তো রাখে না, কাশীতে পাঠাইয়া দিলো। কে যেন পাঁচ টাকা কইরা দেয়, তাই দিয়া চালায়। থাকনের জায়গা নাই, পাঁচ টাকায় খাওনের পর ঘর ভাড়া দ্যায় কী কইরা? মন্দিরের বারান্দায় রাত কাটায়। মায়েরে দ্যাখতে চাইল, লইয়া গ্যালাম। মায়ে কইল, 'তুমি আমাগো লগে এইখানে থাকবা।' রইয়া গ্যাল, কিছুই তো নাই, একখান পুঁটলি। বড় কষ্ট হয় লো, বড় কষ্ট হয়।"

দেশবিভাগের পর বেশ কয়েক বছর কাশীতে মন্দিরে বা গঙ্গার ঘাটে, ঘাটের পথে উদ্বাস্তুদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হতো, বিশেষ করে যাঁরা বিধবা ছিলেন। এভাবেই নদীর এক ঘাটে 'দুধাদার মা দিদিমা'কে মাসিমা পেয়েছিলেন। দিদিমার কথায় ওঁর মাথা গোঁজার জায়গা হলো। সেই একটি ঘরে তিনজনের থাকা, শোয়া, তোলা উনুনে রান্না।

নির্জীব আলোতে, অর্থসংকটে দুবেলা রান্না সম্ভব হতো না — তিনজনেই চিড়ে-মুড়ি দিয়ে চালিয়ে নিতেন সন্ধ্যেবেলা। ঘরের এক কোণে তোশক পেতে শুয়ে থাকতেন হারিয়ে যাওয়া, ফিরে পাওয়া এই দিদিমা। এখানে তিনি বহুদিন অসুস্থ ছিলেন, এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মাসিমা সৎকার ভালোভাবে করিয়েছিলেন, শেষযাত্রায় নামগোত্রহীন হয়ে যেতে হয়নি। জীর্ণশীর্ণ মানুষ, সুখ তাঁর কাছে ছিল বহু অতীতের, এক প্রাচীন অনুভূতি। সুখ কী জিনিস তা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন।

১৯৫৪-র প্রথম দিকে দিদিমার স্মৃতিভ্রম শুরু হলো, ধীরে ধীরে বহু পুরনো স্মৃতি ছাড়া সবকিছু লুপ্ত হতে লাগল। মাসিমার একার পক্ষে তাঁর দেখাশোনা করা সম্ভব হলো না। আমাদের কাছে থাকতে এলেন দুজনে। যে দিদিমা এক বছর আগেও 'প্রায়শ্চিত্ত' নিয়ে যুক্তি দিয়ে শক্তভাবে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন, তিনিই হাতে চটি জোড়া নিয়ে দিশেহারার মতো বাড়ির লম্বা বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, 'চটিগুলা গ্যালো কই?' মন ও শরীরের ওপর বছরের পর বছর যা ধকল গিয়েছিল, হয়তো এ তারই ফল, দেখতে কষ্ট হতো।

যে দিদিমা আমাদের ছোটবেলায় দাদাকে আর আমাকে প্রতি চিঠিতে জিজ্ঞেস করতেন লেখাপড়া কেমন হচ্ছে, এমনকি আমার জেঠতুতো দাদার এমএ পরীক্ষার ফল জিজ্ঞেস করেছেন, যিনি ১৯৪৬-এ লিখেছিলেন, 'সমীর, বিবি, তাজমহল কেমন দেখিলা জানাইবা। আর কী কী দেখিলা, কেমন লাগিল, লিখিয়া জানাইবা', যিনি হিমালয় ভ্রমণের বই পড়ে আমার নাম রেখেছিলেন অলকনন্দা, চলন্তিকা দেখিয়ে বুঝিয়েছিলেন অলকনন্দা হচ্ছে স্বর্গের গঙ্গা, সেই দিদিমা বই হাতে নেন না, কথা বলেন অসংলগ্ন — এটা মেনে নেওয়া কঠিন হয়েছিল।

কোনো এক মামা এসে দুজনকে কলকাতা নিয়ে গেলেন। ততদিনে বড়মামা পার্ক সার্কাস ময়দানের সামনে দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন। তবু 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' রব উঠল। প্রিয় নাতি প্রবীর ও 'এই আমাগো লক্ষ্মী' স্ত্রী, প্রতিভা তাঁদের ছোট দুটি ঘরের বাসায়, স্বল্প আয়ের সংসারে নিয়ে গেলেন 'মা' ও 'মাসিমা'কে। অতি যত্নে রেখেছিলেন। এঁদের কাছেই দিদিমা শেষ নিঃশ্বাস নিলেন ১৯৫৪-র ডিসেম্বর মাসে।

দিদিমার জীবনের একেবারে শেষের দিকে, ১৯৫৪-র শেষে, বাক্‌শক্তি হারিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকতে লাগলেন। সেই ঘোরে আশাকরি বর্তমান, দেশবিভাগ সব ভুলে গিয়ে উমাকুটিরের আনন্দের দিনে ফিরে গিয়েছিলেন।

মা উমাকুটিরে বড় হয়েছিলেন। তাঁর কাছে এই ছিল বাপের বাড়ি। যেমন লিখেছি, এখান থেকে ১৯৪৬-এ আমরা চিরকালের জন্য ঢাকা ছেড়েছিলাম। এরপর ১৯৭৫-এর প্রথম ভাগে বাবা-মা ঢাকা যান এবং মা তাঁর স্মৃতিঘেরা গেণ্ডারিয়ার বাড়ি দেখতে যান। মার অভিজ্ঞতা তাঁর ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত করি :

'উমাকুটির ফলকটি আজও আছে। চার শরিকে বাড়ি বিভক্ত — চার বাড়িতেই আপ্যায়ন করে ঘরে বসালেন ও চা খাবার অনুরোধ করলেন। গাছপালা, ফুল, বাগান — কিছুই নেই, চারিদিকে আগাছা। বাড়িতে ঢুকবার সেই সুন্দর লাল সুরকির রাস্তার বদলে আছে এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা ইটে ভরা হোঁচট খাওয়ানো পথ। বাড়ির কোণে যেখানে কোমর-উঁচু তুলসীমণ্ডপ ছিল, যে তুলসীগাছে রোজ জল দিয়েছি, প্রদীপ জ্বালিয়েছি, সেটা নেই। ভেঙে, ঠিক সেই জায়গায়, বানানো হয়েছে একটি শৌচালয়। এমন শ্রী-হীন বাড়ি যেন কখনও দেখিনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০২-তে 'উমাকুটির' ফলকটি নেই। ভাঙা কাচ লাগানো দেয়াল বা লোহার গেটও নেই। শৌচালয় তার জায়গামতো। পুরো বাড়ি ঘিরে জানালা-দরজা বারান্দাতে লোহার শিক — যেন বাড়ির শ্বাস রুদ্ধ হচ্ছে। লাল সুরকির রাস্তায় এখন একটি ভাঙা গাড়ির গ্যারেজ। পেছনের বিশাল উঠোন, জমি, সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস বহন করা গাছের সারি, কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেই জমিতে এখন আধুনিক ধরনের ফ্ল্যাট বাড়ি। গেটের ভেতর ঢোকা সম্ভব নয়।

পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়, সময়ের গতিতে পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক। আমার দৃষ্টিকোণও বদলে গিয়েছে — সতীশ সরকার রোড বড়ই সংকীর্ণ, ঝলমলে গেণ্ডারিয়া যেন জীর্ণ। সত্তরের দশকে পা দিয়েছি তাও বহু বছর হলো — আগ্রহ ও কৌতূহল, বিস্ময়ে ভাটা পড়েছে; শুধু স্মৃতি ইতিহাস হয়ে আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায়াৎ মামুদ তাঁর 'গেণ্ডারিয়া-আলস্যঘন দিন' প্রবন্ধে লিখেছেন ওঁর চেয়ে বুড়ো হয়তো আরো পুরনো কথা লিখতে পারেন। ওঁর থেকে দুবছরের বড়, বার্ধক্যে প্রথম থেকেই আমি জয়ী। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি অবধি আমি যেটুকু দেখেছি ও শুনেছি, তা ওঁকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম। যদিও চাক্ষুষ পরিচয় তখনো হয়নি। সেই চিঠির ভিত্তিতে এই পরিচ্ছেদ লেখা শুরু হয়েছিল; তাতে জুড়ে দিলাম স্মৃতি, মায়ের চিঠির বাক্স ও কথোপকথন। ইতিহাস পিছিয়ে গেল অর্ধশতাব্দী, দীর্ঘ হলো কলেবর।

১. চিত্ররেখা গুপ্ত : উনিশ শতকের বিস্মৃত লেখিকারা, পৃ. ৮৭-৮৮।

২. হৈমবতি সেন : *আত্মকথা*, পৃ. ১৮৯
বালবিধবা হৈমবতি সেনের (১৮৬৬-১৯৩৩, দেশ খুলনা) স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। সেকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক হিন্দু বিধবার পক্ষে এটা ছিল দুঃসাহস। বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে তিনি যাযাবরের মতো ঘুরেছেন, কাশী, কলকাতা, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। তাঁর অসাধারণ সাহস, দৃঢ়তা ও সমাজের হঠকারিতা রোমহর্ষক কাহিনি রহস্য উপন্যাসকে হারিয়ে দেয়। নানা কষ্ট, দুঃখ, এমনকি অত্যাচার সহ্য করে ওঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন, Campbell Medical School থেকে পাশ করে ডাক্তার হয়েছিলেন। পরে বিয়ে করে সংসারী হন — ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেছেন বৃদ্ধ বয়স অবধি। আত্মকথা পড়ে মনে হয় পুরো জীবন তাঁর সংঘর্ষের মধ্যে কেটেছে।
১৮৮৮-৮৯ (সম্ভাব্য বছর) উনি ঢাকার গেণ্ডারিয়ার কোনো হিন্দু পরিবারের সঙ্গে থাকতেন, তবে ভরণপোষণের জন্য এক ব্রাহ্ম পরিবারের দেখাশোনা করতেন। তাই 'জাত যাবার', 'জলস্পর্শ করার' প্রশ্ন ওঠে। ওঁর জীবনের লম্বা সফরে গেণ্ডারিয়ার বাস ছিল এক শান্তির নীড়।
হিন্দু-ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পর্কে অশোক মিত্র তাঁর এক অভিজ্ঞতা জানালেন। আপাতদৃষ্টিতে রসিকতা হলেও এর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিচার করা প্রয়োজন। হিন্দু মেয়ের ব্রাহ্ম বাড়িতে বিয়ে হলে মূর্তি পুজো ছেড়ে সাধারণত স্বামীর ধর্মমতে প্রার্থনা করতে হতো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এরকম এক মহিলা প্রার্থনা করছেন সমবেত সংগীতের মাধ্যমে। অশোকদার ভাষায়, "বুঝলে, জন্মগত রীতি-রেওয়াজ বদলানো কঠিন, চট্ করে তো নয়ই, অনেকে কখনো বদলাতে পারেন না। বদলাবেনই-বা কেন? শোনো, এক হিন্দু মহিলার গোঁড়া ব্রাহ্ম বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। প্রার্থনা হচ্ছে, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ...,' এতটুকু গাইবার পর মহিলা থমকে গিয়ে গাইলেন, 'উনি সুন্দর'। মহিলার স্বামীর নাম 'সত্য', সত্যসুন্দর কি করে গাইবেন?' হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়, বংশপরম্পরার বিশ্বাস স্বামীর নাম নিতে নেই, তা কি সহজে ছাড়া যায়?" ভাবি, মহিলা কত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, চিত্তদংশনের মাঝ দিয়ে গিয়ে 'উনি সুন্দর'-এ সমস্যা সমাধান করেছিলেন।

৩. *আরেক রকম*, পুনঃপাঠ, তৃতীয় বর্ষ, সপ্তদশ সংখ্যা, ১-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৫৩। লেখকের বই *গুপ্তাদ কাহিনী* থেকে নেওয়া।

৪. হৈমবতি সেন, পৃ. ২০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. প্রবীরদা আমার মাসতুতো দাদা ছিলেন। শিশু অবস্থায় মাতৃহারা হয়ে দিদিমাকে 'মা' ডেকে গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে বড় হয়েছেন। তাঁর স্মৃতি ও বিশ্লেষণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। ওঁর সঙ্গে ছেলেবেলা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, যা আমি লিখে রেখেছিলাম পারিবারিক ইতিহাস হিসেবে।

এছাড়া আমার প্রশ্নোত্তরে ওঁর দুটি বিস্তারিত চিঠি আছে। এ না থাকলে উমাকুটিরের কথা বিশদভাবে লিখতে পারতাম না। সূত্র আলাদা করে লেখা না থাকলে সব উদ্ধৃতি প্রবীরদার চিঠি বা কথোপকথন থেকে। চিঠি ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

৬. চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে তিরিশ বছর বয়সে দিদিমা হয়েছিলেন, একথা বলতেন দিদিমা হেমেন্দুবালা। বড় নাতি মুকুলদার জন্মবরষ থেকে দিদিমার জন্মবরষ অনুমান করেছি।

৭. ব্যক্তিগত সংগ্রহ। উল্লিখিত প্রত্যেকটি চিঠি ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

৮. বাবা সতীশচন্দ্রর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। উনি নিয়মিত আসতেন। পরে দ্বিতীয় বিবাহের পরও সম্পর্কে ফাটল ধরেনি। নতুন ভাইদের দেখাশোনা দাদারা বড় হয়ে করেছেন, বিশেষ করে দেশবিভাগের পর ভারতে এসে বসবাস করার জন্য।

মাসিমার কাছে গল্প শুনেছি, সতীশচন্দ্র তুমুল দাঙ্গার মাঝে কীভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। কোথায় থাকতেন জানি না, সেখানে স্কুলে সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন। দাঙ্গার উন্মত্ততার মাঝে এসে পড়লেন একবার, মারার জন্য কিছু ছেলে এগিয়ে এলো। কথায় বলে 'রাখে হরি মারে কে?' দলের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ বলে উঠল, 'দাঁড়া দাঁড়া, কে দেখতে দে। আপনি, সতীশ দাশগুপ্ত না? তাই তো, ওনারে কিছু করবা না। আমার যখন বিচার হইতেছিল (সে কি করেছিল জানা নেই), উনি 'জুরি'তে আছিলেন, আমার ফাঁসি রোধ করেছিলেন। ওনার গায়ে যেন একটা আঁচড়ও না লাগে।' দলটি চলে গেল। যতদূর জানি উনি পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এবং আর কখনো আক্রান্ত হননি।

৯. *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩৪৫ পৃ. ৩৯১। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পুস্তিকা*, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮২৪।

১০. *কথোপকথন* : পারুলপ্রভা দত্তগুপ্তা

১১. Organ-এর একটি ছোট্ট সংস্করণ ছিল, যা ঘরে বসে বাজাতে পারা যেত। অনেক জায়গায় একে 'স্পিনেট' বলা হয়েছে।

১২. পরের দিকে আধুনিক গান মায়ের পছন্দ ছিল। শেষ বয়সে গাইতেন। 'রাতের ময়ূর ছড়াল যে পাখা', 'পৃথিবী আমারে চায়' ছিল পছন্দের। আমাদের ছোটবেলায় ছন্দের জন্য শেখাতেন, 'নীলপরী স্বপনে জাগিল রে জাগিল, আমার আকাশ তাই অনুরাগে রাঙিল' বা 'চিকন কালো বেদের কুমার, কোন পাহাড়ে যাও।'

১৩।. গুজরাটি বাড়িতে এ দুটি রোজকার সবজি। মা-মাসিমার হাতের নানাবিধ তরকারি, ডাল, বড়া, ঢাকাই পরোটা ইত্যাদি খেয়ে গুজরাটি জামাই বলেছিলেন, 'আমরা তো বংশপরম্পরায় শাকাহারী এবং গম/বাজরা খাই। কই, আমাদের রান্নায় তো এত রকমারি স্বাদ-রং নেই।'

১৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ. ১৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পুনঃপাঠ, *আরেক রকম*, ১৬-৩১ জুলাই, ২০১৫, পৃ. ৫৪। উনি তিরিশের দশকের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের কথা লিখেছেন, এ কথা মাস্টারদার অনুগতদের ওপরও প্রযোজ্য।

১৬. পরিশিষ্টে চিঠিটি দেওয়া হলো। নামের পর 'রাজবন্দী' দ্রষ্টব্য। খামের ওপর দাদার নামের নিচে লেখা, 'detenue, H. D. Camp'।

১৭. আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬) *সেকালের কথা* নামে ছোট একটি আত্মকথা লিখেছিলেন তাঁর পরিবারের জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে ওঁর কাজের কথা এই বই থেকে নেওয়া। 'পারিবারিক' লেখা হওয়া সত্ত্বেও মূল্যবান বইটি আমাকে দেওয়ার জন্য ওঁর পুত্রবধূ অনিতা সেনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৮. *সেকালের কথা*, পৃ. ১৪

১৯. ঐ, পৃ. ১৭

২০. ঐ, পৃ. ২০-২১

২১. ঐ, পৃ. ২৭

২২. ঐ, পৃ. ৩৭

২৩. সমিতির কাজ খুব ভালোভাবে চলছিল। উনি কল্পনা করতে পারেননি ঢাকা, গেণ্ডারিয়া, সমিতি ছেড়ে চলে আসতে হবে। বাধ্য হয়ে যখন দূরে থাকতে হলো, এতো বছরের কাজ, সংস্থা ছেড়ে থাকতে হলো, নৈরাশ্য, অবসাদ তাকে ঘিরে ধরেছিল। 'ছ' মাস অন্তত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন। উঠতেন না, খেতে চাইতেন না। অনেক সেবাযত্ন করে ওঁর মনকে শান্ত করতে হয়েছে। সমিতি এখনো আছে, হয়তো অন্যভাবে কাজ চলছে। তবে খুব ভালোভাবে চলছে। শুনেছি প্রতি বছর ওঁদের বাৎসরিক উৎসবে আশালতা সেনের স্মৃতিতে কিছু বলা হয়।' *কথোপকথন*, অনিতা সেন, ২ এপ্রিল, ১৯১৬।

২৪. এত সহজে সোনার চেন ছিঁড়ে গেল, কত হালকা ছিল অনুমান করা যায়।

২৫. উত্তর ভারতে শাস্ত্রীয় সংগীতের ঘরানা ওস্তাদরা, যাঁদের আমার কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, খাদ্যরসিক ছিলেন। যেমন 'সিনা পসিনা'র সংগীতশিক্ষা হতো, তেমনি গৃহিণীরা একই পদ্ধতিতে রন্ধনশিল্প শেখাতেন মেয়েদের। ওস্তাদরা বলতেন, 'খাওগে নেই তো গাওগে ক্যা', সুতরাং কী রান্না হচ্ছে তার ওপর নজর। ঘরানা যা-ই হোক, কিরানা, আগ্রা, সাহেসওয়ান, রামপুর, ওস্তাদদের বাড়ির ইস্টু, শমীকবাব বা কোর্মার তুলনা নেই। সাধারণ ভুনাখিচুড়ি বা রোহেলখণ্ডি কলাইর ডালের কি অপূর্ব স্বাদ। আমার বড় গুরুজি, ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ এগারোটা বাজলেই পায়চারি করে তদারক করতেন দুপুরে কী রান্না হচ্ছে। পছন্দ না হলেই মেজাজ খারাপ — বড় মামার কথা মনে পড়ে যেত, 'এইটা কী বানাইলা?'

বিশেষ করে মনে পড়ে প্রবাদপ্রতিম সরোদবাদক, ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের বেগমসাহেবার হাতের 'জর্দা'। ওঁদের ছেলে সরোদবাদক ওস্তাদ রহমত আলী খাঁ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন — দিল্লিতে প্রায়ই নেমন্তন্ন করতেন। প্রতিবার আমার অনুরোধ থাকত জর্দার।

ওস্তাদরা যাঁরা বিদেশে দীর্ঘদিন থাকতেন, নিজেরাও ভালো রাঁধতেন। আমাদের তাড়াহুড়া করে মসলা না ভেজে রান্না ওঁদের পছন্দ ছিল না। অবাক লাগে ভাবতে — নিউইয়র্কে আমি ওস্তাদ আল্লা রাখা খাঁ সাহেব, ওস্তাদ জিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিউদ্দিন ডাগর সাহেবের হাতের রান্না খেয়েছি। ওস্তাদ হাফিজ আহমেদ খাঁ প্রতিবছর আমাদের অতিথি, নিজেই রাঁধতেন, আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে পেঁয়াজ ভাজতে রাজি নই বলে!

বহু বছর কেটে গিয়েছে, অনেকেই নেই; জর্দা, কোর্মা খাবার রসনা, বাসনা আছে, বয়সটা পেরিয়ে গিয়েছে।

২৬. ধান, দূর্বা, আমের পল্লব, ফুল, বেলপাতা মঙ্গলচিহ্ন — নিসর্গ আছে তো আমরা আছি।

২৭. বহুকাল আগে, বছরপঞ্চাশেক তো হবে, ভগিনিসম বান্ধবী মঞ্জুর ছেলে বছরপাঁচেকের তখন, ছুটে এসে আমাকে ছড়িয়ে ধরে আমার হাতের সোনা বাঁধানো শাঁখা দেখে বলল, 'এটা খু-ব সুন্দর।' খানিকক্ষণ পর আবার ছুটে এসে হাতটা জড়িয়ে লাজুকভাবে বলল, 'আমার মায়ের এরকম নেই, তুমি একটা এনে দেবে, মাসি?' চোখে জল এসেছিল। আমি মঞ্জুকে দিতে পারতাম, ও নিজেও বানিয়ে নিতে পারত। সেটা বড় কথা নয়। মায়ের প্রতি সন্তানের নরম-নির্মল ভালোবাসা — মনে নাড়া দেয়।

২৮. ৫নং পুরানা পল্টন পরিচ্ছেদ।

২৯. বিয়ের পর মায়ের কথায় ছেলেবেলার শখের জিনিস মাঝে মাঝে দিয়ে দিতে হয়েছে। খুশি মনে দিইনি। ছয় বছর বয়সে পাওয়া সবুজ রঙের ঢেউ খেলা কাঁচের চুড়ির দুঃখ আজো আছে! আমি উদার নই।

৩০. কর্মঠ, সুবিবেচক, বুদ্ধিমতী, ধীরস্থির, স্নেহময়ী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এমন মহিলা কম দেখেছি। অল্প বয়সে তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ভাগে বিয়ে হয়েছিল, প্রথম দিকে উমাকুটিরে থাকা খুব সহজ হয়নি। পরে কলকাতায় বসবাস যৌথ পরিবার নিয়ে, অনেকটা দিদিমার মতো। তফাত এই যে, অর্থ ছিল অত্যন্ত পরিমিত ও বাসস্থান দুটি ছোট ঘরের ফ্ল্যাট। এ ছাড়া কলকাতার মতো বড় শহরে যে-কোনো সময়ই মধ্যবিত্ত জীবন ছিল যুদ্ধের জীবন।

অবসর নিতে বাধ্য না হওয়া অবধি বৌমা একটি স্কুলে পড়িয়েছেন, সারাদিনের স্কুল। উনি ছিলেন সংসারের কর্ণধার, সবকিছু সামলানো সহজসাধ্য ছিল না, হাসিমুখে সামলাতেন। নাতিদীর্ঘ রান্নাঘরে কত যে রান্না করতেন।

ফোনের ব্যাপার ছিল না, স্কুল-কলেজের জীবনে কত সময় হঠাৎ করে পৌঁছে গেছি ও বাড়িতে — বেড়াতে, থাকতে; কোথা থেকে লুচি, বেগুন ভাজা এসে গেছে। আমি যাব জানলে অথবা 'বিবি যদি আসে', আমার পছন্দমতো মাছ, ভাত, সুক্তো আলাদা করে রাখা থাকত। পারিবারিক জীবনে প্রচুর দুশ্চিন্তা গেছে, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিয়েছেন বা স্থিরচিত্তে বিধান দিয়েছেন। এমন একটি বৌমা (বৌদি) পাওয়া বিরাট সৌভাগ্য — দিদিমার যোগ্য নাতবৌ ছিলেন উনি — 'মনটা আছিল বিরাট।'

৩১. এঁদের গুণ, ভালোবাসা, দায়িত্বজ্ঞান আলাদা করে লিখবার প্রয়োজন নেই — পুরো পরিচ্ছেদ ছেয়ে আছে।

৩২. ১৩৫০-এর পৌষ সংখ্যায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে হেমেন্দুবালা দাশগুপ্তা, পারুলপ্রভা দত্তগুপ্তা, বগলাসুন্দরী দাশগুপ্তা (দিদিমার ননদ)।

৩৩. 'সাখোয়াত গার্লস হাইস্কুল' বোধহয়।

৩৪. নাম না লেখা ইচ্ছাকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫. বরোদার সঙ্গে সম্পর্ক তা হলে ১৯৩৪ থেকে!
'খাড়ি' ছাপের জন্য বরোদা বিখ্যাত ছিল, এখন হয় না। মায়ের বিয়ের গোনাগুনতি কটা ভালো শাড়ির হিসাব আমার আছে, তাদের অস্তিত্ব যদিও নেই। 'খাড়ি' শাড়িটি যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল, টের পেলাম না।

৩৬. বাবার শেষ জীবনে একটি খাতার পাতায় তাঁর মনের কথা, ব্যথা লিখে রাখতেন, প্রায় সময়ে প্রিয় কবিতার মাধ্যমে — বাবার মৃত্যুর পর সেই খাতাতে এই পংক্তিটি পেয়েছি।

৩৭. কোনো কারণে 'গোপাল' বলা হতো, 'গোপালজি' নয়।

৩৮. গানটি শুনেছি বহু পরে।

৩৯. 'কলাপসিবল্' গেট পুরো খোলা থাকত, প্রায় রণপা দিয়ে উঠতে হতো এত উঁচু দোকান। আলমারি ভরা সোনা-রুপার জিনিস। মাটিতে সাদা চাদরে ঢাকা তোশকে, গাওতাকিয়া নিয়ে বসা মালিক। সামনে ছোট হিসাবের টেবিল, যাকে 'মুনিমজি টেবিল' বলা হয়। সে টেবিল থেকে উনি জাদুকরের মতো গহনা বার করতেন।

৪০. ২০০৪-এ আমি ও ২০১০-এ ভাই — কাশীর এই গলিতে দোকানটি আবিষ্কার করেছিলাম। সেরকমই আছে, সাদা চাদরে ঢাকা তোশক, গাওতাকিয়া, চোখ ঝলসানো শাড়ি। একই পরিবারের হাতে আছে। ওঁদের ধুঁয়ো ধুঁয়ো মনে পড়ে ছোটবেলায় আমাদের দেখেছেন, বাবা-কাকাদের কাছে আমাদের কথা শুনেছেন। পঞ্চাশ বছরেরই তো ব্যবধান!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মীবাজার-শরৎকুটির

গেণ্ডারিয়া ছাড়া যাওয়া হতো লক্ষ্মীবাজার শরৎকুটিরে, মায়ের মামাবাড়িতে। বড় বড় ঘর, খোলামেলা দোতলা বাড়ি, ওপরের বারান্দায় কারুকার্য করা লোহার রেলিং — সুন্দর ছিল বাড়িটি। মামি-দিদিমার ভাইদের বাড়ি ছিল এটা, ভাইয়েরা থাকতেন কলকাতায় আর তাঁদের দিদি, জামাইবাবু, ভাগ্নে, ভাগ্নিরা ঢাকায়, এ বাড়িতে। মায়ের মামির ভাইয়েরা মায়ের নিজের মামাদের মতোই ছিলেন। ছোট্টবেলা থেকে যে সেজমামা-সেজমামি, ন'মামা-ন'মামির কথা শুনেছি, তাঁরা এই মামা-মামিরা। এঁরা এত কাছের ছিলেন যে, এঁদের কাছে মধ্যবয়সী হবার পরও মা রয়ে গেলেন তাঁদের 'বুচি' (মায়ের ডাকনাম) আর বড় মামার মেয়ে বৃদ্ধ বয়সেও রয়ে গেলেন 'বচা' (বাচ্চু থেকে)। দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অটুট ছিল। আমাদের প্রজন্মেও সম্পর্কের ব্যতিক্রম হয়নি। এ বাড়ির দুই মামা, বিশুমামা, সুনীলমামা ও মামিরা যতদিন দিল্লিতে ছিলাম মামাবাড়ির আদর-যত্ন দিয়ে তাঁদের 'বিবি'কে ঘিরে রেখেছিলেন, বিবি যে মধ্যবয়সী সেটা ওঁদের নজরে আসত না। আপনজন কথাটার অর্থ ভিন্ন ছিল — সম্পর্ক, পরিবারের সীমান্তরেখা ছিল দীর্ঘ।

মায়েদের স্কুলজীবনে লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে প্রতিবছর দুর্গাপূজা হতো, কলকাতা থেকে সবাই আসতেন; লক্ষ্মীপুজো হতো গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে, এই পুজো সেরে তবে সবাই কলকাতা ফিরতেন। ছোটরা একই সঙ্গে কোনো বাড়িতে থাকতেন, মা-মাসিদের কথায় 'বিশাল খাটে, এক মশারির নিচে, রাত জেগে জেগে গল্প!' বড়দের বাসস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাদা ছাড়া কোনো তফাত ছিল বলে মনে হয় না। আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল শরৎকুটিরে — পেছনের বাগানে।

মা-বাবার বিয়ের আসর কল্পনা করেছি। মা লাল চেলি, ওড়না, গয়নাগাটি, চন্দনের সাজে রূপসী কন্যা হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসা, এ ছবি বিশ্বাসযোগ্য, উপভোগ্য। কিন্তু যুক্তির মানুষ বাবা, কোনো একসময় টোপর পরে, চন্দনের ফোঁটা নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন, সেটা বিশ্বাস করতে অসুবিধে হয়। বাবাকে বিবাহ আসরে নিয়ে গিয়েছিলেন আশুজেঠা[১], নিজে গাড়ি চালিয়ে; আমার সেজজেঠা উপস্থিত থাকলেও আশুজেঠা ছিলেন আসল বরকর্তা। বিয়েবাড়ির ছোট ছোট ঘটনা, আনন্দের ছবি মনের চোখে ভাসে। তবে যে প্রশ্ন বারবার মনে এসেছে, মাকে কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি তা হচ্ছে, নিজের বাড়ি ছেড়ে শরৎকুটিরের মামাবাড়িতে কেন বিয়ে হলো? লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি বড় হলেও পেছনের উঠোন, গেণ্ডারিয়ার বাড়ির তুলনায় অনেক ছোট। প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করে তুলল — এ যেন একটি ধাঁধা।

এই ধাঁধার উত্তর পাওয়া সহজ নয়। একটা কথা জানতাম, দিদিমা উত্তরমুখী উমাকুটিরকে[২] পরিবারের পক্ষে শুভ মনে করতেন না। কেমন যেন একটা ইতস্তত ভাব ছিল। ফরিদাবাদে ভাড়া বাড়িতে সব ভালো চলছিল; শোক, দুর্যোগ, দুঃসময় এ বাড়িতে আসার পর, তাই হয়তো এ বাড়ি থেকে ছোট মেয়ের বিয়ের মতো শুভ কাজ করতে চাননি। এর চেয়ে ভালো কারণ খুঁজে পেলাম না, কিন্তু ব্যাখ্যা মনঃপূত হলো না। প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো পুরনো চিঠি, কাগজ খুঁজতে শুরু করলাম। যা আবিষ্কার হলো তাতে রহস্য গভীর হলো।

১৯৩৪-এর প্রথম দিকে মা-বাবার বিয়ে ঠিক হয়, নিজেদের ও পরিবারের পছন্দ মিলিয়ে সিদ্ধান্ত। সেজজেঠিমা এলেন ঢাকাতে 'মেয়ে দেখতে আসার' নিয়ম রক্ষা করতে। মেয়ে পছন্দ। হঠাৎ ঢাকার 'শশী কুটির', বকশীবাজার থেকে মায়ের কাছে সেজমার তারিখহীন চিঠি, 'তোমাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তোমার পরিবারের সবাই কী চমৎকার, তোমার মায়ের মতো তো মানুষ হয় না। তুমি এত ভালো, কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না, ভেবে খুব খারাপ লাগছে।' বজ্রপাত — বিয়ে ভেঙে গেছে। ভেঙে গেল কেন? ভেঙে গেল, তো জোড়া কী করে লাগল? এ রহস্য ভেদ করলেন দাদা প্রবীর দাশগুপ্ত; ২০০৭ অবধি উমাকুটিরের এক উনিই আমাদের মধ্যে ছিলেন। আগে এঁর কথা কেন মনে হয়নি জানি না।

বিয়ের পাকা কথা, দিনক্ষণ, পাঁজি ইত্যাদি (ঠিকুজি নয় —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুবাড়িতে কোথাও ঠিকুজি নেই) দেখা হচ্ছে, জানা গেল পাত্র-পাত্রী সগোত্র। প্রবীরদার ভাষাতে, 'সগোত্রে বিয়ে হয় না, তবে শাস্ত্রীয় নিয়মে পাত্রীর গোত্রান্তর করলে বিয়ে শাস্ত্রসম্মত হয়। যখন তিনি (দিদিমা), তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শান্তিকে বিয়ে দেন সগোত্রে, তখন তাকে (মাকে) প্রথমেই গোত্রান্তরিত করা হয়েছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর আঘাত প্রায় সংস্কারমুক্ত হেমেন্দুবালাকে দুর্বল করে তুলেছিল, তাই শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে বিধি-ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি শান্তির বিয়ের সময়। এই মহিলাই আমার মায়ের (জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদ্যুৎপ্রভা) বিয়েতে যুক্তি দেখিয়ে গোত্রান্তরিত না করিয়ে সগোত্রে বিয়ে দিয়েছিলেন।' (১১/১১/২০০২)।

গোত্রান্তর করা অর্থাৎ কাউকে দত্তক দেওয়া। যে পিঁড়িতে বসে বিয়ে হবে, বিয়ের ঠিক আগে সেই পিঁড়িতে বসিয়ে ছোট্ট অনুষ্ঠানে মাকে দত্তক নিলেন তাঁর মেজমামা দুর্গাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। গোত্র বদল পালা শেষ হলো, ছক মিলে গেল, গোধূলিলগ্নে মা-বাবার বিয়ে হলো। বিয়ে নিজের বাড়িতে, অর্থাৎ বাপের বাড়িতে হয়, তাই ক্ষণস্থায়ী বাপের বাড়ি শরৎকুটিরের উদ্যানে বিবাহের অনুষ্ঠান।[৩] ধর্ম, শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার নিয়ে দীর্ঘ কাহিনি সমাজের নিষ্ঠুরতার কথা বারবার লিখেছি, শাস্ত্র মানা সমাজের যে অন্য রূপ আছে তা ভেবে দেখিনি বা নজর করিনি। 'বিধান' যেমন কঠিন হয়, দ্বন্দ্বের মুহূর্তে, প্রয়োজনে কাঠিন্যের মুঠি আলগা করে পথও দেখিয়ে দেয়। আবার মনে হয় এ কি শাস্ত্রীয় অনুমতিতে বুঝ দেওয়া ছেলেখেলা নয়। বিবাহের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বাবার গোত্রে মায়ের পরিচয় শুরু হলো, মাঝে নামমাত্র, ছোট্ট সেতুর মতো গোত্রান্তর। সম্পর্কেও কোনো বদল এলো না, মায়ের কাছে উমাকুটির আজীবন রয়ে গেল বাপের বাড়ি, শরৎকুটির তাঁর মামাবাড়ি।

এ বাড়ির মাসিরা ছিলেন আমার প্রিয়, আর প্রাণবন্ত কণা মাসি সবার প্রিয়। আমি তো তাঁকে 'নূরজাহান' রূপে দেখেছি, তাঁর স্থান আলাদা। দিদি রেণু মাসিমা ছিলেন মায়ের নিকটতম বোন-বান্ধবী। বুদ্ধিমতী, রুচিসম্পন্ন, ওঁর কথাবার্তা, সাজপোশাক — সবকিছুতে একটা নিপুণতা ছিল, কাছে থাকতে ভালো লাগত। ঢাকা এলে দিন কাটাতে আসতেন ৫নং-এ, হৈচৈ করে খাওয়া-দাওয়া গল্প। গল্পগুজবের পর বাবা হয়তো একসময় উঠে যেতেন, মা-মাসির আড্ডা চলত। দুজনেরই এক কথা — 'খাবার পর যদি হাত না শুকোলো, চায়ের ইচ্ছে না হলো, তা হলে আর গল্প কি?' ছোটবেলা থেকেই ওঁকে শ্রদ্ধা করতাম; একা মানুষ — কাজে, বেড়াতে নানা জায়গায় যেতেন, কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। আমার সৌভাগ্য, জীবনে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ভরা ছোটখাটো কত সাজাবার জিনিস, কিন্তু আমার কাছে আজো মূল্যবান কাশ্মীর থেকে আনা সোনালি 'চিনার' পাতা আঁকা 'পাপিয়ের মাশ'-এর গোল কৌটো, রেণু মাসির দেওয়া মাকে উপহার। ৫নং-এর খাবার টেবিল, রেণু মাসি, মা-বাবা, আনন্দ, সংঘর্ষহীন জীবন ছুঁয়ে আছে ওই কৌটোটি।

মিনু মাসি, এ-বাড়ির বড় দিদি, গেণ্ডারিয়ার মাসিমার সমবয়সী, দুজনে নিকট-বন্ধু, একটি স্কুলে পড়াতেন। বিবাহিত ছিলেন, সে জীবন ভালো কেটেছে, কিন্তু কয়েক বছর পর স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গার্হস্থ্যধাম ছেড়ে কোথায় গেলেন কেউ জানে না। একমাত্র ছেলে পড়াশোনায় খুব ভালো, কলেজ পাশ করে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন — পূর্বাশ্রমে, অর্থাৎ মায়ের কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। মিনু মাসি লক্ষ্মীবাজারে মা-বাবার কাছে থাকতেন। দুঃখের জীবন, কিন্তু বাবা-মায়ের ছত্রছায়ায়, ভাইবোনদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় মাসি হাসিমুখে থাকতেন। এত ভালো মহিলা কম দেখেছি, কত গল্প যে মায়েরা করতেন, ঘর ভরে যেত মিনু মাসির মৃদু হাসিতে। খুব ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম ওঁকে।

দেশবিভাগে সবাই কলকাতা চলে এলেন। বিশু মামা সরকারি চাকরি পেয়ে দিল্লিতে, মিনু মাসি এঁদের মাকে নিয়ে কলকাতায় ছোট কয়েকটি ঘরে — স্কুলে চাকরি করেন। ছেলে তখন মিশনে নামি মহারাজ,[৪] তাঁকে নিয়ে মায়ের গর্ব। ভালোই ছিলেন। হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসী স্বামী অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এলেন, তাঁকে কোনো প্রশ্ন না করে জামাই হিসেবে পরিবারের সকলে সহজেই মেনে নিলেন। অসুস্থ হয়ে আর কোথায় যাবেন? সেবাযত্ন করা হলো — মন থেকেই করা হলো। এত বছরের একাকিত্ব, দুঃখ-কষ্ট মিনু মাসি কিছুই ব্যক্ত করলেন না, কোনোদিনই করেননি। হিন্দু নারীর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, এখানে স্ত্রীর অভিমানের স্থান থাকলেও আয়তনে সংকীর্ণ, তাছাড়া কেউ যদি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চান তাতে কিছু বলার নেই; আমার হিসাবে যদিও ঠিক মেলে না। তবে আমার মনে রাখা উচিত, এ বহুকাল আগের কথা।

অসুস্থ স্বামী স্ত্রীর সেবা পেলেন, একসময় দেহরক্ষা করলেন। মা ও আমি কলকাতায় — খবর পেয়েই দেখা করতে গেলাম। মিনু মাসি বৈধব্যের বেশে, ছেলের মায়ের গলা খালি রাখতে নেই, তাই গলায় সরু সোনার চেন, বাকি নিরাভরণ — মুখের হাসিটি নেই। হাসি ফিরে এসেছিল ধীরে ধীরে, কিন্তু বাকি জীবন হিন্দু বিধবার আচার-বিচার মেনে কাটিয়েছেন। ওঁদের বিশ্বাস, নিশ্চয়ই মেনে চলবেন, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্বাচীন মনে বিদ্রোহ জাগত, 'আমাগো সমাজে তোমাগো আধুনিকতা চলে না' বলে বয়োজ্যেষ্ঠরা আমার কথা উড়িয়ে দিতেন। এখন মনে হয় এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না, যে স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করেছেন, যাঁদের একটি সন্তান আছে, তাঁদের একের অপরের প্রতি মনের থেকে চিরকাল যোগ থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

লক্ষ্মীবাজার বিশেষ করে মনে পড়ে জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য। বাড়ির সামনে চওড়া রাস্তা, তার ওপর দিয়ে ট্রাক বা লরির ওপর রাখা নানা দৃশ্য ধীরে ধীরে যেত। একবার ছিল পেস্টবোর্ডের বিশালাকার, ভয়ংকর চেহারার, বিকৃত মুখের মানুষের প্রতিকৃতি — দৈত্য-দানবের মতো। নিচে লেখা 'অত্যাচারী কংস'। স্বাধীনতা আন্দোলনের মাঝে কংস যে কে বুঝতে কারো সময় লাগেনি। একবার সুভাষ বোসের জন্মদিনে (বোধহয় ১৯৪৪) মহোৎসব, মিছিল হলো। পেস্টবোর্ডের সুভাষ বোস, বীর সুভাষ বোস, তাঁকে নানাভাবে দেখলাম। Indian National Army নিয়ে তখন বাঙালি মেতে উঠেছে, বৌ-মেয়েদের গলায় 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা'। আমরা জোর গলায় গাইতাম, 'কম পর লুটায়ে যা'। ভাষা বোঝার ক্ষমতা ছিল না, এই কমের নামে কত কত রক্তবন্যা বইবে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না।

মহররমের মিছিল ছিল নামকরা।[৫] একবার দেখেছি, বুক চাপড়ে শোক পালন করছেন অনেক অনেক জনতা। হিন্দু-মুসলমান একে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন বলে মনে হয় না; এই মিছিলকে বলা হতো 'শিয়া-সুন্নির লড়াই'। ছোটদের *বিষাদ সিন্ধু* পড়া ছিল, ওই বয়সে তার মর্ম বুঝতে পারিনি। বড় হয়ে যখন নিজে সোজ-খোয়ানি পড়েছি বা মজলিসে সোজ-মর্সিয়া শুনেছি, তখন জানতে পেরেছি ঐতিহাসিক সত্য, অনুভব করতে পেরেছি এ শোক কত বিশাল! রামপুর ও আগ্রা ঘরানার ওস্তাদরা সম্ভব হলে মহররমে সপরিবারে দেশের বাড়িতে যেতেন। এগারো দিন গান বন্ধ, তানপুরা, তবলা, সারঙ্গি কিছুই বাজবে না, যন্ত্রতে হাত লাগানো হবে না। প্রতি সন্ধ্যায় এঁরা 'সোজ' পড়তেন। সোজ পড়ার ধরন ছিল আলাদা, বিভিন্ন রাগে বাঁধা। আলাপ, দ্রুত নেই, বোলতান, আকার তান, সরগম মানা, তরন্নুম নয়, শুদ্ধ রাগের কাঠামো বাঁধা করুণ কাহিনি। তানপুরার সুর (সা) আর পঞ্চম (পা) না থাকলে সুর বা 'স্কেল' স্থির রাখা কঠিন, পরিবারের দুই কলাকার 'সা' ও 'পা' উচ্চারণ না করে বন্ধ আকারের মতো একনাগাড়ে দুটি স্বর ধরে রাখতেন। যে-কোনো রাগের কাঠামো নেওয়া যেত, তবে চঞ্চল বাহার, বসন্ত বা আডানা জাতীয় নয়। রাগসাগর গাইতে বিখ্যাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব ছয় পঙ্ক্তির 'সোজ' পড়তেন আঠারোটি রাগে, এক এক পঙ্ক্তিতে তিনটি রাগ। এমন মিশ্রণ ছিল যে রাগ বদল লক্ষ করার প্রশ্ন আসত না। ওস্তাদরা পড়তেন গভীর অনুভূতির সঙ্গে, হৃদয়বিদারক অনুভূতি, আর্দ্র নয়ন রাখা সম্ভব হতো না, বিশেষ করে রাগ যদি ভৈরবী হতো। এ অবিশ্যি বহু বছর পরের অভিজ্ঞতা।

উমাকুটিরের চারপাশ ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত, শরৎকুটিরের সামনের রাস্তাঘাট ছিল রমরমা। সামনের বারান্দায় নকশা করা রেলিংয়ে হাত রেখে দোকানপাট, লোকজন, শোরগোল দেখে-শুনে সময় আনন্দে-খুশিতে কাটত। ফেরিওয়ালার ডাক কত রকমের, সরু গলা, ভারী গলা, হাঁক দিয়ে ভয় পাইয়ে দেওয়া, আবার নম্র স্বরে ঝালমুড়ির প্রলোভন। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের হাঁটাচলা, কাছে কোনো প্রতিবাদ বা সভার আওয়াজ — চওড়া রাস্তা, কোনোদিনও আবদ্ধ মনে হয়নি। তখন আমাদের ভালো লাগার বয়স, চিন্তা-ভাবনা নেই, সবকিছুতেই কৌতূহল। রুচিসম্পন্ন এই বাড়ির সঙ্গে আমার অনেক সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে।

২০১০-এ দেখি এই বাড়ির অবস্থা উমাকুটিরের চেয়েও শোচনীয়। একে তো রাস্তায় ভিড়, কোলাহল, দোকান-বাজার ভরা — কিছুই পরিমিত নয়। তদুপরি শরৎকুটির এখন কোনো কলেজ বা টিউশনের ঘাঁটি — পুরো বাড়ি, গেট, পোস্টারে মোড়া। দালান দেখতে পাওয়া যায় না। কোথায় গেল বাহারের রেলিং? ছেলেবেলার একটুকরো আনন্দে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম, দেখি সেই ছেলেবেলার সবকিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. জ্যেষ্ঠভ্রাতাসম আশুতোষ সেন।

২. উমাকুটিরে আজ আর ফলক নেই। কবে তৈরি হয়েছিল জানি না। মাসিমার বৈধব্য হয়েছিল ১৯১৪-তে, তার বছরখানেক আগে (১৯১৩) এ বাড়িতে এসেছিলেন অনুমান করি।

৩. আমার বিয়ের সময় (১৯৫৮) গোত্র নিয়ে বিবাদ নয়, ঘটনা হয়েছিল। দুই পরিবারের — প্যাটেল ও দাশগুপ্ত — মাঝে দূত ছিলেন অশোক মিত্র, বাবার ছাত্র ও ভাবী জামাইর বন্ধু। তাকে বলা হলো জামাইর গোত্র জেনে আসতে, পুরুতঠাকুর জানতে চাইছেন। অশোকদা ফিরে এসে বললেন, 'ও বলেছে ওদের কোনো গোত্র নেই, ওর মা-ও বললেন ওদের গোত্র থাকে না।' আবার বজ্রাঘাত — গোত্র না বললে বিয়ে হবে কী করে? বিয়ের মন্ত্রর মধ্যেই তো গোত্রের উল্লেখ করতে হয়। আবার গেলেন অশোকদা, 'গোত্র বার করো'; প্যাটেল সাহেব হাজির জবাব, অশোকদা এসবে অবিশ্বাসী। ভাবী জামাতা বললেন, 'দ্যাখো, এ কথা বলা হয় যে আমরা সবাই সূর্য বা চন্দ্র থেকে জন্মেছি। তা সূর্য তো চাঁদের থেকে অনেক বেশি প্রখর, তো আমাকে সূর্যবংশী বলে সেই গোত্র বলে দাও।' অশোকদা ফিরে এসে তাই জাহির করলেন, বিবাহের অনুষ্ঠানে মন্ত্রে পাত্রের পরিচয় দিতে বারবার বলা হলো 'সূর্য বংশ গোত্রস্য ' ইত্যাদি। হয়ে গেল বিয়ে গোত্রহীন পাত্রের সঙ্গে। বাঙালি হিন্দু সমাজে এর অর্থ গুজরাটি পরিবারে বোঝার উপায় নেই, উচ্চমানের প্যাটেলদের এক গ্রামে বিয়ে হয় না, গোত্র বলে কিছু জানেন না।

৪. স্বামী নির্জরানন্দ বা মোহিত মহারাজ।

৫. জন্মাষ্টমীর মিছিল, দ্রষ্টব্য, বসু, পৃ. ৪২-৪৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরিশাল

ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিধি আমাদের সীমিত ছিল। গরমের ছুটিতে সাধারণত মহিলারা স্বামীসহ সপরিবারে বাপের বাড়ি যেতেন। আমাদের সেটা হতো না, কারণ মামাবাড়ি একই শহরে। তাছাড়া এ সময় নানা ইউনিভার্সিটির খাতা দেখতে বাবা খুব ব্যস্ত থাকতেন। শুধু বাড়তি আয়ের জন্য নয়, অর্থনীতি কীভাবে কোথায় পড়ানো হচ্ছে, কোথায় ভালো ছাত্র তৈরি হচ্ছে — এসব জানতে উনি উৎসুক থাকতেন। পরীক্ষার খাতায় তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেত। অর্থনীতিতে গবেষণা ও পড়ানোতে মগ্ন থাকার এটাও ছিল একটি অঙ্গ।

খাতা দেখা ছিল বাবার কাজ, আমাদের শখ ছিল খাতা বাঁধা দেখা। বড় বড় খাতা ভরা বান্ডিল, সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে, আঁট করে বেঁধে সুতো দিয়ে সেলাই করা; তার ওপর মোমবাতি দিয়ে গালিয়ে দেওয়া বেঁটে-চৌকোনো লাল টকটকে গালা, তাতে চাপ দিয়ে লাগানো বাবার নামের পেতলের ভারী সিল শুকিয়ে গেলে পরিষ্কার পড়া যায়, 'A.K. Dasgupta, Dacca University'। রেলওয়ে পার্সেলে দূর দূর শহরে যাবে, তাই এত সাবধানতা। এ কাজে যতীনদা সাহায্য করতেন বাবার তত্ত্বাবধানে, আমরা অবাক হয়ে জাদুখেলা দেখতাম। ইংরেজি জানা কাউকে কাছে রাখা যেত না, যদি নাম, নম্বর দেখে নেন — তাই সমীর দূরে। কড়া নিয়ম, ভাঙার প্রশ্ন ওঠে না।

যাই হোক, প্রতিবছর না হলেও মাঝে মাঝে যাওয়া হতো বরিশাল শহরে, বড় জেঠামশায়ের কাছে। বাবাদের দেশ, আমাদের দেশ, পৈতৃক ভিটে বরিশালের গৈলা গ্রামে। যতকাল ঠাকুরদা-ঠাকুমা ছিলেন বাবারা চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই ও এক বোন (বালবিধবা বড় দিদি গৈলাতে মা-বাবার কাছে আজীবন থেকে গেলেন) ছুটিতে গৈলাতে একত্র হতেন। ১৯৩৩-এ ঠাকুমা ও বড় পিসিমা, সুকুমারির মৃত্যুর পর দেশের বাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হলো, বরিশালে বড়ভাইয়ের বাড়ি হয়ে গেল ভাইবোনদের একত্র হওয়ার কেন্দ্র। চার ভাই দূর দূর শহরে থাকতেন (বরিশাল, বর্ধমান, আসামের জোড়হাট ও ঢাকা), বরিশাল যাওয়া সহজ ছিল না। তাছাড়া মা-বাবা-দিদি, দেশের ভিটের আকর্ষণ না থাকায় ঘন ঘন যাওয়ার ইচ্ছেও হতো না। তবে ভাইবোনদের অন্তরের টান, সুযোগ পেলে সবাই বরিশালে একত্র হওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ছোট পিসিমা, সরোজিনী, থাকতেন কাছেই, গোপালগঞ্জ — ওঁর আসার অসুবিধে নেই। বাবারা একত্র হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন, আমরা থাকতাম ঢাকার বাইরে যাওয়ার জন্য। দেশবিভাগ অবধি এ নিয়মই চলেছে।

সবাইকে নিয়ে শহরের বাইরে যাওয়া, অন্তত মাসখানেকের জন্য, সোজা কথা নয়, কাজের অন্ত নেই। বাঁধা-ছাদা ক'দিন ধরেই হতো, হোল্ডলে বিছানা, ট্রাংকে কাপড়চোপড়, সঙ্গে কিছু খাবার — ছেলেমেয়েদের খাবার আবদার সময়ের ধার ধারে না — কিছু বইপত্র, পরিবারের অন্যদের জন্য উপহার, কেনাকাটা করে গোছাতে সময় লাগত। যতীনদা বাড়িতে থাকলেও ঘরদোর গুছিয়ে যেতে হতো, যাতে ফিরে এসে কোনো অসুবিধে না হয়। বাবার চিন্তা ছিল তাঁর বাগান, পরিচর্যা যেন ঠিকমতো হয় সে ব্যবস্থা করতে কিছু কম সময় লাগত না।

হঠাৎ করে রওনা হওয়ার দিন, রাত বলা উচিত — এসে যেত। ঘোড়াগাড়ি ঠিক করে মালপত্র গোনাগুনতি করে কোনোমতে ঘুম দাবিয়ে বাদামতলী ঘাটে যাওয়া, স্টিমারে কেবিনে থাকা, সবই তো নতুন অভিজ্ঞতা। স্টিমার একবার চললে ভিন্ন জগৎ। অফুরন্ত জল, রাশি রাশি ফেনা — ওঠে, নামে, আসে, যায়, নদীর ক্লান্তিহীন রূপ; অবাক হয়ে জাহাজের রেলিং ধরে দেখতাম। রাতের অন্ধকারে আলো করে দেওয়া জোনাকির ঝাঁক; পদ্মা, মেঘনা, প্রশস্ত সব নদীতে দিনে বিশাল মাছের (হয়তো শুশুক বা অন্য কিছু) ঝাঁক, হঠাৎ পিঠ দেখা গেল আর চোখের নিমেষে অদৃশ্য; খালাসিদের রোদে পোড়া বলিষ্ঠ শক্ত চেহারা, তাদের কোলাহল, হট্টগোল, ঘাট এলে ভারী নোঙরের আওয়াজ, নোঙর ফেলার শক্ত পুরু দড়ি, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা সে কি সোজা কথা, সবই অবাক কাণ্ড। কোনো ঘাটে থামলে ছোট ছোট নৌকোয় ঝিকমিক করা তাজা মাছ, হয়তোবা ইলিশ, তরকারি বা ঝালমুড়ির ফেরি — কত রকমের মানুষ, পোশাক — এ তো আমাদের পুরানা পল্টনের একইরকম আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নই। জাহাজের সরু বারান্দায় ছোট বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে, তাদের মায়েরা বলছেন, 'এই, রেলিংয়ের ধারে যাবি না', কেউ মাথায় পুঁটলি নিয়ে আসছেন, কেউ ডেকে শতরঞ্জি পেতে শুয়ে, কেউ প্রাতরাশ করছেন, কোথাও এক কোণে কেউ জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন যদি তা নামাজের সময় হয়, কোনো কোণে এক বিধবা নিঃশব্দে জপের মালা গুনছেন, এই ভিন্ন জগৎ ছিল আমাদের ছুটি।

বরিশাল পৌঁছে সোজা চলে যাওয়া হতো ঝাউতলা রোডে জেঠামশায়ের বাড়িতে; শুরু হতো আমার নিরানন্দ জীবন। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই লম্বা ঘোমটা টেনে মা হয়ে যেতেন বাড়ির ছোট বউ — সোজা হেঁসেলে। নিম্নস্বরে কথা বলতেন, যদি বলতেন; মেয়েকে কাছে টানা শোভন ছিল না। আমি একা — খেলার সাথী নেই। দিদিরা অনেক বড়, বড় দিদি প্রায় মায়ের বয়সী; অন্যজন বছরদশেকের বড়। ওই বয়সে পাঁচ ও পনেরোর মধ্যে দশ বছরের থেকে অনেক বেশি ব্যবধান থাকত। বড় দিদির মতো লক্ষ্মীমন্ত মহিলা কম দেখেছি, আমাকে খুব ভালোবাসতেন, তাই বলে তো আমার সঙ্গে খেলা করবেন না। উনিও সংসারের কাছে ব্যস্ত। দাদারা সমীরের নেতৃত্বে স্বাধীন। দাদা সমীরের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আজগুবি গল্প করে ছোটদের মাতিয়ে রাখার, ওকে নেতা বানাতে অসুবিধে হতো না।

বড়-ছোট মিলিয়ে খুড়তুতো-জেঠতুতো আমরা অনেক ভাইবোন মিলিত হতাম। এক বড় দিদি ছাড়া কারো সঙ্গে হৃদ্যতা হয়নি, যতদূর জানি, অন্য তিন পরিবারের মধ্যেও নৈকট্য আসেনি। আগে ভাবতাম এটা আমার 'একলা থাকা' স্বভাব। পরে মনে হয়েছে এর একটা যথাযথ কারণ ছিল। খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাইবোন আমরা, যে যার মতো আলাদা শহরে নিজেদের পরিবারের গণ্ডির মধ্যে বড় হতাম। আমাদের জগৎ ছিল মা বাবা, আপন ভাইবোনদের জড়িয়ে — আমাদের চিন্তা-ভাবনা, অভিমান, ভালোবাসা, আশা-নিরাশা, খুনসুটি-দৌরাত্ম্য, বন্ধুত্ব এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে দেখা হওয়া কাকা-জেঠাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা নয়; গড়ে ওঠেনি। আমারও তো তাদের প্রতি কোনো মায়া-মমতা জন্মায়নি।

বাবাদের কথা আলাদা। তাঁরা ভাইবোনেরা গ্রামে একসঙ্গে বড় হয়েছেন — একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে, বড়রা ছোটদের আগলে রেখে বহু বছর কাটিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। সর্বোপরি তাঁরা একই মা-বাবাকে ভালোবেসেছেন। ওঁদের পরস্পরের মধ্যে যে গভীর স্নেহ-ভালোবাসা ছিল সেই গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্ক বরিশাল, বর্ধমান, জোড়হাট, ঢাকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না। আমার নিজের অনুভূতি ও দৃষ্টিকোণ দিয়ে এখন সে কথা বুঝতে পারি।

ঝাউতলা রোডে ছোটদের দালানের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না, গেট অবধিও নয়। বাড়িটা ছিল বন্ধ বন্ধ, বাইরের হাওয়া গেলে ভালো লাগত। বাড়ির ভেতরে ছিল অবাধ গতি, যেখানে ইচ্ছে গিয়ে বসে পড়তাম। প্রায় সময় বাবার কাছ ঘেঁষে; ওঁদের কথাবার্তা না বুঝলেও, বাবাকে লম্বা সময় এতটা কাছে পাওয়া পুরানা পল্টনে সুলভ ছিল না; তখন ভাবতাম বরিশাল বেশ ভালো জায়গা। কখনো চলে যেতাম রান্না পাড়ায় মা-জেঠিমাদের গল্প-গুজব শুনতে। অন্দরমহলে সময় কাটিয়ে আর কিছু না হোক, কার মেয়ের বিয়ের বয়স হচ্ছে, কোন মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে, এসবে প্রচুর ওয়াকিবহাল ছিলাম। মেজমা তিরস্কার করতেন, 'এই মেয়ের ওই এক কাজ — বড়দের কথা গেলা।' যাকে বলে 'হক কথা'। মাঝে মাঝে টিপ্পনীও যে কাটতাম না তা নয়। আমার স্বভাব খুব শান্ত-সরল ছিল বলতে পারি না।

বরিশালে একত্র হয়ে বাবারা ছোট তিন ভাই গল্প করে পরিবারের নানাজনের খবর জেনে, দেখা করে, হাসি-ঠাট্টা-আড্ডা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতেন। সেজজেঠিমা গৈলার মেয়ে, ঘোমটা অত লম্বা টানতে হতো না। তিনি আড্ডায় যোগ দিতেন, চা এনে দিতেন। হাসিখুশি মানুষটি এ বাড়িতে এক তিনি 'বৌ' হয়ে থাকতেন না। ঢাকাতে 'চলো, খেলা করি' বলে পুতুল খেলা, পুতুল সাজানো সব করতেন আমার সঙ্গে সঙ্গে, এখানে সত্যি তাঁর সময় নেই। দাদা অমর্ত্যের মায়ের একটি কথা ছিল, 'বুঝলি, আদরে-গোবরে সে খুব ভালো আছে!' সেজমা সে রকম 'আদরে-গোবরে' ভালো থাকতেন। মা-মেজ জেঠিমার (মেজমা) কথা বলতে পারি না — হঠাৎ করে গৃহকর্ত্রী থেকে বড় জায়ের অনুগত মেজ বা ছোট বৌ হওয়ার মধ্যে সুখদায়ক কিছু ছিল বলে মনে হয় না। মেজমা ও মায়ের সত্যিকারের হৃদ্যতা ছিল; একজন বঁটিতে তরকারি কাটছেন বা বঁটিতে মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছেন, অন্যজন বিরাট কড়াইয়ে ডালে সম্বার দিচ্ছেন, ডাল টগবগ করে ফুটে উঠছে, নিরন্তর গল্প হচ্ছে — এই সম্প্রীতির ছবিটি আমার চোখে ভাসে। আমার বয়স যত বেড়েছে, মেজমার প্রতি সম্ভ্রম বেড়েছে — তাঁর নিয়ম থেকে অটল অথচ কি প্রচণ্ড বুঝের, কি প্রচণ্ড বিনাবাক্যে স্নেহ দেওয়ার ক্ষমতা।

বরিশালের বাড়ির কথা লিখতে হলে একটি মধ্যবিত্ত যৌথ সংসারের বিবরণ দিতে হয়, যেখানে পরিবারের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের মধ্যে থাকত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাট ব্যবধান। একটু বয়স হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি যে, এ-বাড়ি সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণার প্রচ্ছন্ন কারণ এ সংসারের নিয়ম-কানুন, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের সম্পর্ক, জ্যেষ্ঠের ক্ষমতা, কনিষ্ঠের আনুগত্য ও দায়িত্ব। এতে প্রশ্ন, আলোচনা, পছন্দ-অপছন্দ বা দ্বিমতের স্থান ছিল না।[১]

ভাইয়েরা বিভিন্ন শহরে নিজের সংসারে স্বাধীনভাবে থাকলেও যৌথ সংসার বলছি কারণ, গৈলাগ্রাম বকশীবাড়ির ছোট হিস্যার দাশগুপ্তদের গঠন ছিল যৌথ সংসারের মতো এবং এর কর্তা ছিলেন বড় জেঠামশায়। পরিবারের সব ব্যাপারে, বিশেষ করে বৈষয়িক ব্যাপারে পুরো নির্ণয় তিনি নিতেন, ছোট ভাইদের নিঃশব্দে মেনে নিতে হতো। ১৯৩৩ সালে ঠাকুমার মৃত্যুর পর বড় জেঠার নির্দেশে গৈলায় পৈতৃক বাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হলো, ছোট ভাইরা তাদের অমত বা মনের ব্যথা ব্যক্ত করার অবকাশ পেলেন না।

বরিশালের ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট, শহরে জেঠামশায় সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। 'রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; সেখানকার সমবায় আন্দোলনে তিনি বিশেষ অংশগ্রহণ করিতেন।'[২] গম্ভীর, রাশভারী, ওঁকে কখনো প্রাণ খুলে হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ওঁর সামনে ছোট ভাইয়েরা যতই তাদের বয়স হোক (যখনকার কথা লিখছি, চল্লিশের দশকের প্রথম ভাগ, তখন সবচেয়ে ছোট, আমার বাবা, চল্লিশোর্ধ্ব), হাসি-গল্প করতে পারতেন না। চিন্তা, দায়িত্বে ভারাক্রান্ত, গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে অফিসফেরত বাড়ি ফিরতেন, আবহাওয়া থমথমে হয়ে যেত, শ্রদ্ধা-সমীহ অতিক্রম করে ভাইয়েরা কথা বলতে পারতেন না। অথচ যে সময়কার কথা বলছি তখন প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাবা চাকরি করছেন, তার আগে মেজ জেঠা বহু বছর। ১৯২৬-এর পর ওঁর নিজের সংসার ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই এবং এই নিজের সংসারের খরচেও আগে মেজ জেঠা, পরে বাবা সাহায্য করছেন। আসলে উনি ছিলেন 'ঋণে ভারাক্রান্ত', গাম্ভীর্যের মুখোশ বলেছি কারণ বরিশালের বাইরে একা যখন দু-একবার দেখেছি, তিনি হাসিখুশি সাধারণ মানুষ।

দাদার আদেশ অমান্য করা ছিল নিয়মবিরুদ্ধ। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা এত বেশি ছিল প্রতিটি আজ্ঞা ভাইয়েরা মেনে নিতেন। আজো মনে পড়ে মেজ জেঠা তাঁদের দাদার কোনো আদেশ যুক্তিযুক্ত নয় বলে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত তাঁর শিশুসুলভ হাসিটি দিয়ে বলছেন, 'তবে দাদা যখন লিখেছেন।' বাবা বড় দাদার সামনেই অমত প্রকাশ করেছেন, শেষ কথা এক, 'তবে আপনি যখন বলছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজ ও ছোট ভাই নিজেদের আর্থিক অনটন বরণ করে দাদার প্রত্যেকটি দাবি কেন মেনে নিতেন, এ ছিল আমার বোঝার বাইরে; এঁদের অর্থের অসংকুলান দেখে মনে রাগ পুষে রেখেছি। পেছনের সুপ্ত ইতিহাস, স্বপ্নভঙ্গ, কর্তব্য, দায়িত্ব, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আমি জানতাম না। জানার ইচ্ছেও রাখিনি। বাবার মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করিনি। বরং দাদার টাকার দাবিতে বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'বড় বাড়ির কথা ছেড়ে দাও, শুধুই চাহিদা, চাহিদার ফর্দ ছাড়া কিছু নেই।' অর্বাচীন মন্তব্য, চাহিদার ওপরে যে 'সম্পর্ক' বলে একটা গভীর জিনিস আছে তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। বিরক্তি প্রকাশ করলে দুঃখ পেয়ে বাবা শান্তভাবে বোঝাতেন, 'ওকথা বলো না, আমি যা হয়েছি, জীবনে যা সাফল্য, সুনাম পেয়েছি — সব কিছু দাদার জন্য। কত কষ্ট করে আমাকে সুযোগের পর সুযোগ দিয়েছেন, তোমরা তো দেখনি।'

ইতিহাস গোলমেলে, শেকড়ের জট খোলা মুশকিল। বকশীবাড়ির ছোট হিস্যার দাশগুপ্ত পরিবারের একসময় হয়তো জমিজমা ছিল, তা বহুদিন আগে। গৈলা গ্রামের জমি কৃষির উপযুক্ত ছিল না, দূরদর্শী হয়ে গ্রামের আশেপাশে জমি কিনে ভূসম্পত্তি না বাড়ালে জমি থেকে উপার্জনের সম্ভাবনা থাকত না। সে যাই হোক, কয়েক পুরুষ ধরে ভাগাভাগি করে ঠাকুর্দামশায়ের পিতা রামপ্রাণ দাসের ভাগে কতটুকু এসেছিল জানি না; পরে উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র পার্বতীকুমারের ভাগে কতটা ভূসম্পত্তি এসেছিল তাও জানি না। মেজ জেঠার পুরনো চিঠি থেকে জানতে পারি ঠাকুর্দামশায়ের নিঃস্ব হওয়ার প্রধান কারণ তাঁর পিতার 'দেনা'। একসময় খবর পেলেন, যে বসতবাড়ি উনি নিজে তৈরি করেছিলেন, তাও তাঁর বাবা বন্ধক রেখেছেন। ভাঙ্গার (সেখানে তাঁর কর্মজীবন ছিল) বাড়ি বিক্রি করে, বাকি সম্বল তাতে যোগ দিয়ে গৈলার বাড়ি ছাড়িয়ে নেন। জমিজমা, খানিকটা অন্যায়ভাবে চলে গেল বকশীবাড়ির উত্তরের হাউলিতে।[৩] মেজ জেঠা লিখছেন, "মনে পড়ে ছোটবেলায় উত্তরের হাউলির ছেলেরা আমাদের বাড়ির গাছে চড়ে ফল পেড়ে বলত, 'এগুলো আমাদের গাছ।' মনে বড় কষ্ট হতো।" আঘাত পেয়েছিলেন পার্বতীকুমার। একবার নৌকো করে কোথাও যেতে যেতে মেজ জেঠাকে বলেছিলেন, 'ওই চর, ওই জমি আমাদের ছিল, settlement-এর সময় ওরা নিয়ে নিয়েছে।' ঝগড়া-বিবাদ স্বভাববিরুদ্ধ, দারিদ্র্য মেনে নিলেন। ক্ষুদ্র পেনশন ছাড়া আয় নেই, সংসার চালানো দুরূহ।

দুরূহ যে হবে সে কথা বড় জেঠামশায় অল্প বয়সে আন্দাজ করেছিলেন এবং লেখাপড়া শেষ করে ভালো চাকরির স্বপ্ন ত্যাগ করে স্কুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের পরই বরিশাল শহরে একটি নিম্নস্তরের সরকারি চাকরি নিলেন; পরিবারের পুরো দায়িত্ব নিলেন। এই হলো তাঁর প্রথম স্বপ্নভঙ্গ। আয়ের বড় ভাগ গৈলাতে পাঠানো হতো; কিন্তু তাতে পরিবারের অর্থকষ্ট উপশম হতো না। গৈলাজীবনের বহু বছর পর ১৯৭২-এ মেজ জেঠামশায় আমাকে লিখছেন, 'গৈলায় আমরা কী কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সম্বল ছিল একটি ধুতি, তার আধখানা পরে বাকিটা ধুয়ে, শুকিয়ে, পরে বাকিটা ধুয়ে নিতাম। তবু কি আনন্দে সেই দিনগুলো কাটিয়েছি।'

বাবা একবার রুষ্ট মনে বলেছিলেন, 'দারিদ্র্যের কী জানিস তুই? জানতে চাস আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমাদের ছেলেবেলা কীভাবে কেটেছে। সে নিয়ে আঁকড়ে বসে থাকিনি। আমরা গ্রামে আনন্দ করে থেকেছি। দারিদ্র্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস না।' আমাদের প্রাচুর্য ছিল না, সংসারে টানাটানি দেখেছি, গরিব কেউ বলতে পারত না, মাসের প্রথমে আমদানি ছিল যতটুকুই হোক — তাই বাবার দরিদ্র ছেলেবেলা কল্পনা করতে পারিনি। কথা এগোতে দিইনি — বাবাকে এরকম বিরক্ত, অধৈর্য দেখিনি। জীবনে বহু বছর আমরা বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত থাকি, নিজেদের মধ্যে ডুবে থাকি — অতীতের চিন্তা করি না। বাবার ছেলেবেলা তো অতীত, তা চিন্তা করার বোধ আমার ছিল কোথায়।

বড় জেঠার কথায় ফিরে যাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক, ১৯০৬-০৭, ওঁর সামনে দায়িত্ব ছাড়া কিছু দেখতে পান না, ছিলও না। শুধু সংসার খরচ নয়, মেজভাইকে শিগগিরই কলেজে পড়াতে হবে, অনেক টাকার ঝুঁকি নিয়ে উনি এই ভাইকে কলকাতায় পড়িয়েছিলেন, ছোট দুই ভাই একেবারেই ছোট, স্কুলও শুরু করেনি, তাদের বড় করতে হবে। শুরু হলো দায়িত্ব ও ত্যাগের ইতিহাস — প্রত্যেকটি দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। নিজের চেষ্টায় যতটা সাফল্য লাভ করা যায় করেছিলেন, তবে কলেজে পড়তে না পারার দুঃখ কোনোদিন যায়নি। বহু বছর পর তাঁর এক পুত্র কলেজ শেষ করার আগে একটি চাকরি পেলেন, শুরুতে সামান্য হলেও উন্নতির রাস্তা খোলা — মোটা মাইনে হতে খুব সময় লাগবে না। জেঠামশায় বাধা দিলেন, লিখলেন, 'অল্পবয়সে পড়াশোনা ছেড়ে ছোট চাকরি নেওয়ার বিড়ম্বনা আমি জানি; আমার ছেলেকে তা থেকে আমি বাঁচাতে চাই।'

বড় জেঠামশায়ের দ্বিতীয় স্বপ্নভঙ্গ ছিল তাঁর অসামান্যা রূপসী, বুদ্ধিসম্পন্না, স্নেহময়ী স্ত্রীর অকালমৃত্যু (১৯১৫)। অর্থকষ্ট সত্ত্বেও উনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি নিটোল, সুষ্ঠু সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভেঙে গেল। আমার ধারণা, প্রথম স্ত্রীকে উনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি[৪], পরবর্তী জীবনের অসংযত, অযৌক্তিক ব্যবহারে যা প্রতিফলিত হয়। ওঁর আশা ছিল ছোট ভাই 'অমি'কে ঘিরে, তার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, তাকে দিয়ে নিজের অপূর্ণ সাধ মেটানো, তাকে বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়া — এর কিছুটা ছিল প্রথম স্ত্রীকে স্মরণ করে, প্রিয় ছোট দেওরটিকে যিনি বড় ভালোবাসতেন। বাবার পড়াশোনার ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কের হিসাব করেননি, ঢাকাতে পাঠিয়েছিলেন প্রকৃত শিক্ষার জন্য, নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শহরের পরিচিত, আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, বাড়ি থেকে এত দূর এসে অমির যেন একা না লাগে। বাবার পরবর্তী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান, সুনামের মূলধন ছিল দাদার সুবিবেচনা ও পৃষ্ঠপোষকতা। দাদার কাছে উনি চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন, 'বৌঠানের' কথা শেষ জীবন অবধি শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সঙ্গে বলেছেন।

বড় জেঠামহাশয়ের স্ত্রী হিসেবে যৌথ সংসারে কর্ত্রী ছিলেন ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আমাদের বড়মা। এ দায়িত্ব উনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বরিশালের বাড়িতে সবাই একত্র হলে তাঁর ক্ষমতা স্বভাবত কারণে বেড়ে যেত; ছোট জায়েদের স্থান যে হেঁসেলে ও গৃহকর্মে সেটা বুঝিয়ে দিতে সময় লাগত না, তাঁর রীতি-রেওয়াজ বা হুকুম অমান্য করা যায় না সে কথা বুঝিয়ে দিতেও সময় লাগত না।

যৌথ সংসার, অনেক সদস্য, তদুপরি ছুটি, বাড়িতে প্রচুর কাজ। রান্নাঘর সামলাতেই দিন কেটে যেত। বড় জায়ের সাহায্য পেলে সুবিধে হতো, সংসার তো ওঁরই। কিন্তু এটা ছিল বড়মার বাৎসরিক ছুটি। কস্তাপেড়ে পাটভাঙা সুন্দর শাড়ি পরে তিনি ব্যস্ত থাকতেন তাঁর ব্যস্ততার ফর্দ দিতে। পরিবারের জন্য তাঁর ত্যাগ স্বীকার নিরন্তর শুনিয়ে যেতেন, বিশেষ করে পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-স্বজন কাছে থাকলে। ছোট জায়েরা যে অলস, গৃহকর্মে ও রন্ধনকর্মে একেবারেই অপটু, সেটা বারবার বলতে দ্বিধা করতেন না। এমন মিষ্ট স্বরে তির্যক মন্তব্য আর বিশেষ শুনেছি বলে মনে হয় না।

মধ্যবিত্ত পরিবার যৌথ না হলেও যখন অল্পদিনের জন্য যৌথ হয়ে যায়, তার রূপ হয় এলোমেলো। ছেলেমেয়েরা তাদের খুঁটি খুঁজে পায় না, কারণ মায়েরা অন্য নিয়মে বাঁধা পড়ে যান। ঝাউতলা রোডের অন্দরমহলে তাই হতো। স্বাধীনতা দূরে রেখে মা-জেঠিমারা হঠাৎ করে বড় জায়ের অধীনে, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও গঞ্জনা শুনে দিন কাটাতেন, সহজভাবেই মেনে নিতেন। হয়তো নিরুপায় হয়ে, হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বশুরবাড়িকে নিজের করে নেওয়ার শিক্ষা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল বলে। আপাতদৃষ্টিতে মনোমালিন্য বা অশান্তি কখনো দেখিনি।

বড় জায়ের নিজগুণের ফর্দে ও অন্যদের অযোগ্যতার হিসেবে আবহাওয়া যখন তিক্ত হয়ে যেত, বুদ্ধিমতী, কর্মঠ, সহিষ্ণু মেজ জেঠিমা কেওড়া ও বর্ধমান মিশ্রিত ভাষায় মাকে বলতেন, 'ওয়ার কথা ছাড়িয়া দাও, ওয়া তো ওই রকমই।' আর একটা কথা বারবার বলতেন, 'বোবার শত্রু নাই, চুপ করিয়া থাকিবা।' এ উপদেশ মা চিরজীবন একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন।

বড়মা যেমন গুছিয়ে কথা বলতে জানতেন, তেমনি মিষ্টি করে চিঠিও লিখতে পারতেন। ১৯৩৬-এ প্রায় দুবছর বরিশালে কাটিয়ে মা ঢাকা ফিরে গিয়েছেন — বাবা বিলেত থেকে ফিরেছেন, এখন নিজের সংসার শুরু করবেন। পুজোয় আমার মামাবাড়ি থেকে বরিশালে তত্ত্ব গিয়েছে, শাড়ি জোড়া পছন্দ হয়েছে জানিয়ে বড়মা, 'মাঐমা' সম্বোধন করে আমার দিদিমাকে লিখছেন, 'শান্তিকে কাছে পেয়ে আপনার কত আনন্দ হচ্ছে বুঝতে পারি। তবে এক মেয়েকে কাছে পেয়ে আপনার এই মেয়েকে (অর্থাৎ বড়মাকে) ভুলে যাবেন না কিন্তু।' উনি দিদিমাকে কখনো দেখেননি, তত্ত্ব পাওয়া ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সুন্দর, সাজানো চিঠি, দিদিমা নিশ্চয়ই তাঁর মেয়ে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এর থেকে আরো উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। আমার বিয়ের কথা বাবা বড় জেঠামশায়কে জানালেন; ওঁর খুশি অন্তরের, 'অমি'র ভালো উনি সর্বদা চাইতেন। বড়মার চিঠি 'ওমা, এ তো সাগর সেঁচে ঝিনুক পাওয়া অমূল্য, অতুলনীয় মুক্তো!' দাদার উপস্থিতি ছাড়া মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান বাবা কল্পনা করতে পারতেন না। চলনদার ঠিক করে, টিকিট পাঠিয়ে, দাদা বৌদিকে দিল্লি নিয়ে এলেন। বহুকাল পর ছোট ভাইয়ের বাড়িতে এসে বড় দাদা গর্বিত। বিয়ের দিন সকালে, আশীর্বাদের দেনা-পাওনা, বিয়ের রীতি-রেওয়াজ নিয়ে 'অনমোল মোতি'র মায়ের সঙ্গে বড় জেঠিমা বাকবিতণ্ডার চেষ্টা করলেন। 'মা' হিন্দি বা বাংলার একবর্ণ বোঝেন না, স্মিতমুখে 'সারু, সারু' — 'ভালো, ভালো' বলতে লাগলেন, সেটা বড়মা বুঝতে পারলেন না; মা 'সাবালিকা', যে বিধি-ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে, শক্তভাবে জানিয়ে দিলেন, গোলমাল এগোতে পারল না।

বড়মা ছিলেন প্রাচীনপন্থী; তবে তাঁর রীতি-রেয়াজ ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, গৈলা বকশীবাড়ির নয়। মেজ জেঠিমার কাছে শুনেছি গৈলাতে ঠাকুমার আমলে মেয়ে-বৌদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। গৃহকর্ম ছাড়া বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে একটি বৃহত্তর জগৎ আছে, সে কথা ঠাকুরদা-ঠাকুমা মানতেন। ঘরের কাজ সামলে গ্রামে একটু বেড়াতে যাওয়া, কোনো পুজো-পার্বণে যাওয়া, সর্বোপরি বাপের বাড়ি যাওয়াতে বাধা ছিল না।

ঠাকুমার মৃত্যুর পর বড়মার বিশ্বাস, রুচি এবং সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হলো। শুধু রোজকার দিনযাপনে নয়, বিবাহের অনুষ্ঠানেও তিনি অনেক প্রাচীন, ভুলে যাওয়া নিয়ম-কানুন ফিরিয়ে আনলেন। মায়ের অভিজ্ঞতা থেকে লিখছি। বহুকাল আগের কথা, ১৯৩৪ সন, মা বিয়ের পর নববধূ হয়ে প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। ঢাকার বাদামতলী ঘাট থেকে স্টিমার নিয়েছেন — শ্রাবণ মাস, শুধু পদ্মা নদী কেন, সব নদীতেই অথৈ জল, চতুর্দিকে শুধু জল আর জল। ঢাকার মেয়ে আমার মা, বুড়িগঙ্গার জলের সঙ্গেও পরিচয় কম। সীমাহীন জলরাশিতে রোমাঞ্চ, কিছু ভীতি, কিছু আশঙ্কা মনে। সকালবেলা বরিশালের কোনো ঘাটে নামলেন। শহরের শক্ত মাটিতে অভ্যস্ত মা, নদীর পারের সিক্ত মাটি ভীতি আরো বাড়িয়ে দিলো।

বধূবরণ করতে নদীর পারে এসেছেন বড়মা, ঠাকুমার অবর্তমানে এ কাজে তাঁরই অধিকার। মাকে দেখে ঘোমটা অনেকখানি নিচু করে দিয়ে প্রথমেই তিনি টুক করে মায়ের চোখের চশমাটি নিয়ে নিলেন। চশমা পরা বৌ দেখলে সবাই যে মন্তব্য করবে, 'চশমা পরা বৌ, এ মেয়ের তো বয়সের গাছ-পাথর নেই।' মায়ের অবস্থা শোচনীয়। ওঁর ভাষায়, 'চশমা ছাড়া আমি তো প্রায় অন্ধ, কাকেইবা বলি সে কথা — সবাই অপরিচিত। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার উপায় নেই। মেয়ে মহলে সারাটা দিন কোনোমতে কাটালাম, বড়দের নির্দেশ মেনে, ছোটদের একটু কাছে টেনে আনার চেষ্টা করে। রাতে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলে বললাম, চশমাটা খুঁজে এনে দিতে। উনি উদ্ধার করে আনলেন; এরপর অবিশ্যি চশমা পরতে কেউ বাধা দেননি।' বাবার ওপরে কথা বলার সাহস বড়মার ছিল না।

সামনে বৌভাত। বড়মা মাকে শিখিয়ে দিলেন, 'তুমি বৌভাতের আসরে চুপ করে বসে থাকবে। শহর ও গ্রাম থেকে বহু অতিথি আসবেন। আত্মীয়, অনাত্মীয় নানা পুরুষ মানুষ নানা প্রশ্ন করবেন। তুমি কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না, বোবা হয়ে থাকবে; মাথাও নাড়াবে না, যে যতই জিজ্ঞেস করুক না কেন। এই আমাদের বাড়ির প্রথা, নড়চড় যেন না হয়।'

মা সেজেগুজে লম্বা ঘোমটা টেনে পিঁড়িতে বসা। এক অতিথি বারবার কিছু প্রশ্ন করছেন আর বলছেন, 'অ বৌ, একটু কথা কও না, অ বৌ, একটু কথা কও না।' ঘোমটার ভেতর থেকে মা আড়ালে দেখলেন এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি বৃদ্ধ, কথা বলতে অনুরোধ করছেন। মা ভাবলেন, 'এত বুড়ো মানুষ, জবাব দিলে কী দোষ হতে পারে?' মায়ের শিক্ষায় প্রশ্নের জবাব না দেওয়াটা অভদ্রতা। মা মৃদুস্বরে হ্যাঁ-না কিছু বললেন।

বৌভাত হয়ে গেল — রাতে গৃহকর্তা, তাঁর ভাইরা ও নিকট পুরুষ আত্মীয়রা খেতে বসেছেন, মহিলারা কাছাকাছি পরিবেশনে ব্যস্ত। বড়মা শুরু করলেন, 'শান্তি যা একটা কাণ্ড করেছে আজ। ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা! প্যারি খুড়া বুড়া-থুড়া হইতে পারে, তাই বলে তার সঙ্গে কথা কওয়া? মাথা নিচু হয়ে গেল আমাদের।' এ শুধু তিরস্কার নয়, সবার সামনে মাকে অপদস্থ করা। আঘাত দেওয়ার সুযোগ তিনি ছাড়তেন না।

নতুন বৌ দেখে এক মহিলা বললেন, 'চমৎকার হয়েছে ছোট বৌ, যেমন সুন্দর তেমন লেখাপড়া জানা।' বড়মার জবাব আসতে সময় লাগল না। 'এ আর এমন কি কথা? আমাদের যদি এসব করতে দেওয়া হতো আমরাও পারতাম।' কথাটি খাঁটি — উনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন। খাঁটি হলেও বাইশ বছরের সদ্য বাপেরবাড়ি ছেড়ে ভিন্ন জগতে আসা নতুন বৌর সুখ্যাতিকে মাটি না করলেও পারতেন।

বৌভাত হয়ে গেল, অতিথিরা যে যার সংসারে ফিরে গেলেন। মায়ের নিজের ভাষায় লিখি, 'বাড়ি একটু খালি হতেই দিদিমণি (অর্থাৎ বড়মা) বললেন, 'যাও, উনুন ধরিয়ে জল গরম বসাও।' আমি তো দিশেহারা — কোনোদিন উনুন ধরাইনি। বাড়িতে মা বলতেন নিজের সংসার হলে তো সারাজীবন রান্নাবাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, এখন পড়াশোনা করুক, গান-বাজনা, বন্ধুদের নিয়ে একটু আনন্দে থাকুক। আমি কি জানি উনুন ধরানোর কায়দা, কোথা থেকে শুরু করব তা-ই জানি না। পাশের বাড়ির একটি মেয়ে 'নতুন বৌ'র কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসত। শেষ পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উনুন ধরালাম। 'জানি না' বললে তো 'পড়াশোনা করা বৌ কোনো কাজের হয় না' আবার শুনতে হবে।

দিনদশেক ছিলাম বরিশালে। রান্নাঘরের সব কাজই করতে হতো, জিজ্ঞাসাবাদ করে শিখেও গেলাম। প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা বৌভাতের দিন বলেছিলেন, 'এমন সুন্দর বৌ, হাতের আঙুলিগুলি অবধি ফর্সা, সুন্দর, মসৃণ।' তিনিই দিনসাতেক পর আবার দেখা করতে এসে বললেন, 'ওমা, নখগুলো এরই মধ্যে হলুদ হয়ে গিয়েছে, কত হলুদ মাখতে হলো তোমায় রান্নাঘরে?' আমার মা সত্যি খুব সুন্দরী ছিলেন, বড়জায়ের গঞ্জনার সেটাও একটা কারণ ছিল।

বিয়ের মাস দুই পর বাবা দু-বছরের জন্য বিলেত যাবেন উচ্চশিক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশায়। মা থাকবেন ভারতবর্ষে। মায়ের খুব ইচ্ছে ঢাকাতে থেকে আরো পড়াশোনা করার, নয়তো চাকরি করার। মায়ের মামাবাড়ির দিদিরা, ঢাকার বান্ধবীরা অনেকেই স্কুলে পড়াতেন। ঢাকাতে একটি স্কুলে মা চাকরি পেয়ে গেলেন, ইচ্ছে পূর্ণ করতে দেওয়া হলো না।

বড়মা সিদ্ধান্ত নিলেন তা হতে পারে না, ছোট বৌ ঢাকা থাকতে পারবে না, তাদের কাছে বরিশালে থাকবে। কারণ দিলেন, 'এই তো সময়, ওকে একটু কাছে পাব, পরিবারের রীতি-নীতি বুঝিয়ে দেব, গৈলা বকশীবাড়ির একজন বলে তৈরি করে দিতে পারব; পরে নিজের সংসার হলে তো আর হবে না।' বড় জেঠাও একই মত দিলেন। মা নিরাশ হলেন কিন্তু বড়বাড়ির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারলেন না। আসলে ততদিনে মা হেঁসেলের কাজ শিখে গেছেন, হলুদমাখা আঙুলে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

মার নৈরাশ্য বা দুঃখ কোনোদিনও যায়নি। এ ঘটনার ষাট বছর পর আমার কন্যা তার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বলো তো, তোমাদের যুগ ভালো ছিল না এখনকার যুগ? তোমার কী মনে হয়?' মা তখন পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা, বাবাকে হারিয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছেন; নাতনিকে জবাব দিলেন, 'দুই যুগেরই ভালোমন্দ আছে। তবে এখনকার দিনে তোমাদের মেয়েদের একটা স্বাধীনতা আছে, তোমরা পড়াশোনা করতে চাও, চাকরি করতে চাও সেটা সম্ভব। আমাদের সময় তো তা ছিল না। তোমার দাদু যখন বিলেত গেলেন, আমার কত শখ ছিল আরো পড়াশোনা করার বা চাকরি করার — একটা স্কুলে ঢাকায় চাকরি পেয়েও গিয়েছিলাম। এই তো ছিল সময় দু-বছর, যখন তোমার দাদু বাইরে। উনি ফিরে এলে নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাব, তখন এসব সম্ভব হবে না জানতাম। কিন্তু আমার বড় জা, ভাশুরঠাকুর মানা করলেন। তোমার দাদু তাঁর বড় ভাইয়ের কথার ওপর কিছু বলতে পারলেন না। আমার নিজস্ব কোনো নির্ণয় নেওয়ার অধিকার ছিল না। সেই হিসেবে, তোমাদের যুগ ভালো।'

পুরনো কথা — অনেকটাই মায়ের কাছে শোনা, কিছুটা চিঠিগুচ্ছ থেকে, কিছুটা নিজের অনুভূতি দিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে একটি অভিজ্ঞতা মনে পড়ে, তাতে আমাদের দেশের কিছু কোণে মেয়েদের স্থান কী ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। মা নতুন বৌ হয়ে এ পরিবারে আসার পর দশ বছর কেটে গেছে — ১৯৪৪ সাল, গরমের ছুটি। প্রায় পুরো পরিবার বরিশালে, এক দিদির বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তাই সবাই একত্র সেখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্রী শিক্ষিতা, পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানে থাকেন ও সেখানে কোনো স্কুলে চাকরি করেন। সুন্দরী না হলেও রং ফর্সা। বয়স কিঞ্চিৎ বেশি, হয়তো ত্রিশের কাছাকাছি। পণ দেওয়া হবে না বলে পাত্রের সংখ্যা সীমিত। পাত্রপক্ষ বরিশালের কোনো গ্রামের, তাদের কোনো দাবি নেই। অন্তত এখন পর্যন্ত তাই শোনা গেছে। পাত্রপক্ষ দিদিকে দেখতে এসেছেন, যদিও পাত্র নিজে আসেননি, বয়স্করাই এসেছেন।

বাবা, জেঠামশায়রা অতিথিদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন। দিদি সেজেগুজে, পিঠে আঁচল জড়িয়ে সলজ্জে ঘরে এলেন। নাম, শিক্ষা ইত্যাদি সাধারণ প্রশ্নাদি করা, সেলাইর কাজ দেখা, গান শোনার পর একজন বললেন, 'মা, একটু হেঁটে দেখাও তো।' হাঁটাটা স্বাভাবিক কিনা পরীক্ষা করার পর বললেন, 'শাড়িটা একটু উঁচু করো তো, মা।' দিদি সে আজ্ঞা পালন করলেন। দিদি দাঁড়িয়ে, ভদ্রলোক তাঁর মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন, 'এবারে পিঠের আঁচলটি সরাও তো, মা।' বাবা তিতিবিরক্ত হয়ে হঠাৎ কঠোর স্বরে পাত্রীকে বললেন, 'যাও, তুমি এক্ষুনি ভেতরে যাও', পাত্রপক্ষকে বললেন, 'নমস্কার, এ সম্বন্ধ হবে না। আপনারা যা করেছেন সেটা আমাদের মেয়ের অপমান।'

পাত্রপক্ষ অবাক হয়ে বললেন, 'এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কী আছে? পায়ে গোদ আছে কি না, পিঠে কুঁজ আছে কি না সেটা তো আমাদের পরখ করতে হয়। আমরা তো ছেলের পক্ষ।' জানি না এ কাজে বাবা ক'জনের সমর্থন পেয়েছিলেন, তবে অন্দরমহলে মাকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এই দিদির অল্পদিন পর ভালো বিয়ে হয়েছিল, কলকাতায় অ্যাডভোকেট ছিলেন জামাইবাবু, হাসিমুখ, মিশুকে মানুষ। আমার তাঁকে একটা বিশেষ কারণে মনে পড়ে। দেশবিভাগের সময় আমরা অনেক সময় বর্ধমানে মেজ জেঠা-মেজমার কাছে থাকতাম। স্বল্প আয়ের বড় সংসার, তার ওপর আমরা, ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা, অর্থের অসংকুলান নিত্যসঙ্গী। দৈনন্দিন খাওয়া ভালো হলেও মিষ্টান্ন বিশেষ থাকত না।

কিন্তু যেদিন দেখতাম শিলবাটা আর নোড়ার মাঝে সাদা কাপড়ে বাঁধা কিছু রাখা আছে, বুঝতাম জামাইবাবু আসছেন, ওটা ছানা, — জল ঝরানো হচ্ছে। সবার জন্য বানানো সম্ভব হতো না, তবে আমরা ছোটরা একটু পেতাম। সেই ঘন দুধের ছানার পায়েস, চৌকো চৌকো রসালো ছানার টুকরো, স্বাদ ভুলিনি, রসনার তৃপ্তি মনে করে জামাইবাবুকেও ভুলিনি।

কাহিনি এতেই শেষ হলো না। আরো দশ বছর কেটে গেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৪-র শীতকাল। পরিবারের নতুন প্রজন্মের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিয়ে, বিবাহবাসর কলকাতা। পাত্রী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। মায়ের ভাষায়, 'উজ্জ্বল, টলটলে মুখে সুন্দরী।' আমি কলকাতায় কলেজে পড়ি, বরযাত্রীদের একজন হয়ে সেজেগুজে বিয়েবাড়ি গেছি। কনে দেখতে ভালোবাসি, তার পাশে ঘোরাঘুরি করি। আলো খুব তেজ না হলেও উনি সবাইকে দেখতে পান, পাতলা ক্রেপ বেনারসির ওড়নার জালি দিয়ে সব শুনতেও পান। কাছে এলেন পাত্রের ছোট দুই বোন, ছেলেমানুষ নন, কলেজ পাশ করা। একজন ঘোর শ্যামবর্ণা, অন্যজন ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, 'গমের রং'। কনে দেখেই 'গমের রং'-এরটি উচ্চ ফিসফিস স্বরে বলে উঠলেন, 'ওমা, এ তো রীতিমতো কালো, এত কালো তো কেউ বলেননি — মুখও তো কিছু সুন্দর নয়, সাধারণ।' বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন, অচেনা মানুষ ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বাঁধতে যাচ্ছেন, এ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তার মনে কী হতে পারে, সে বোধ তখন ছিল না। আজ কেমন কে জানে? বলিহারি এই বৌদির, রূঢ় কথা সম্পর্কের মাঝে আসতে দেননি।[৫]

* * *

বড় জেঠামশায় নানা কষ্ট সহ্য করে, নিজের সুখ ত্যাগ করে দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিশ্চয়ই, তবে 'ত্যাগের' মাসুল নিতে ভোলেননি। এ মাসুল তাঁর ঋণের সুদ থেকে কিছু কম ছিল না; বরং মানসিক চাপ বা পীড়ন বেশি ছিল। মেজভাইকে পড়ালেন, ঋণের বোঝা নিয়ে পড়ালেন, বলা বাহুল্য সে ঋণ মেজভাই শোধ করেছেন, দাদার ওপরে চাপানোর প্রশ্ন ওঠেনি। যথাসম্ভব উনি গৈলা বরিশালে পরিবারে অর্থ-সাহায্য করতেন। কিন্তু আমার ঋষিতুল্য মেজ জেঠামশায়ের প্রতি তাঁর দাদার ব্যবহার নির্মম।

১৯৭২-এ মেজ জেঠিমা মারা গেলেন; ৫৭ বছর একসঙ্গে সংসার করে, হঠাৎ করে নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া চরম দুঃখের। পুরনো কথা মনে ফিরে আসে, স্ত্রীকে কী দিতে পেরেছিলেন তা মনে আসে না, কী দিতে পারেননি সে বোঝা অনেক ভারী হয়ে যায়। বহুকালের জমে থাকা দুঃখ নিয়ে মাকে (উনি মাকে ছোট বোনের মতো দেখতেন) লিখছেন (৬/৮/৭২)

> 'বাড়িতে (অর্থাৎ গৈলা) যখন যেতাম পকেট উজাড় করে সব টাকা বাবা বা দাদার হাতে তুলে দিতাম। টাকাটা দাদার কাছেই যেত। বর্ধমানে ফেরার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিকিটের টাকা যখন চাই, সে এক তুমুল কাণ্ড। দাদার প্রচণ্ড রাগ — এখন টাকা তিনি কোথা থেকে জোগাড় করবেন? আমি অপরাধী, যেন টাকা দাবি করছি। তখন শিখলাম যে, অন্তত বর্ধমান ফেরার টাকাটা হাতে রেখে পকেট উজাড় করব। দাদা-বৌদি বলতেন, আমরা ওঁদের ঘাড়ে বোঝা — বোঝা তো হবোই, সব টাকা তো দাদার কাছে।

বরিশালে থাকতে (প্রথম কয়েক বছর মেজ জেঠা বরিশালে চাকরি করতেন, পরে বর্ধমানে, রাজ কলেজে) মাইনের পুরো টাকা দাদার হাতে দিতাম। তবু একই কথা, ভরণপোষণ উনি করেন। বর্ধমান আসার পর প্রতি মাসে চেক পাঠিয়েছি, ধার করেও পুজোর কাপড়চোপড় নিয়ে গেছি। যতটুকু সম্ভব করেছি, প্রতিদানে পেয়েছি অপমান।

জানো, কলেজ শেষ করার পর শৈলেশকে (সেজভাই) ডাক্তারি পড়ানোর ভার আমি নিলাম। তখনকার দিনেও ডাক্তারি পড়ানো ব্যয়সাপেক্ষ ছিল, প্রথমেই দুশো টাকার প্রয়োজন। অত টাকা কোথায়? শেষ পর্যন্ত তোমার মেজদির হাতের সোনার 'অনন্ত' জোড়া বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করলাম। বলা বাহুল্য, সে অনন্ত কোনোদিন ছাড়িয়ে আনতে পারিনি। শৈলেশের ছাত্রজীবনকালীন তোমার মেজদির প্রচুর অর্থকষ্ট সহ্য করে সংসার চালাতে হতো।' আমি বাহবা চাইনি, কিন্তু অপমানের কি কোনো প্রয়োজন ছিল?

শুধু টাকা দিয়ে সাহায্য নয়, গৈলা — পরে বরিশালে — রান্নাঘর পুরো তোমার মেজদি এক হাতে সামলেছেন। সে কথা কারো একবার মনেও এলো না। এ কথা এত বছর আমাদের দুজনের মধ্যে গোপন ছিল; আজ এত বছর পর তোমার মেজদির দুঃখকষ্টের কথা মনে করে তোমাকে লিখছি।'

বেদনাভরা চিঠি, প্রায় একশ বছর আগের ঘটনা পড়ে মনে বেদনা জাগে। এত তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও লিখছেন,

'দুঃখ, অপমান দাদা-বৌদির কাছে পেয়েছি বলে ভেব না আমি অকৃতজ্ঞ। আমি যেটুকু করেছি সেটা দাদার ত্যাগের পাশে কিছুই নয়, আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি যা হয়েছি, পরিবারের জন্য যেটুকু করতে পেরেছি তা শুধু দাদার জন্য। এ কথা মনে না রাখা পাপ।'

একান্নবর্তী পরিবারের উদার, আত্মত্যাগী, আদর্শ গৃহিণী হিসেবে বরিশাল শহরে বড়মার নামডাক ছিল। বেচারি মেজমা, বিরাট পরিবারের রান্না করে, বাসন মেজে বছরের পর বছর কাটালেন, কেউ তাঁকে স্মরণ করল না। পাট ভেঙে শাড়ি পরার সময় বা সামর্থ্য তাঁর ছিল না; নিজের ত্যাগ, কষ্ট জাহির করার প্রবৃত্তিও ছিল না। শুধু মেজমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন, ১৯৩৭-এ বরিশাল থেকে শৌখিন সেজমার চিঠি মায়ের কাছে, 'ঠাকুর নেই, রান্নাঘর আমাকে সামলাতে হয়। তোমাকে চিঠি দিতে ইচ্ছে করে, কখন লিখি? রান্নাঘর থেকে ফুরসত পেতে রাত বারোটা বাজে।' তাঁকেই বা কে মনে রাখল?

মেজভাইয়ের প্রতি অপমান-বিদ্বেষ কেন ছিল জানি না। একটি সম্ভাব্য কারণ, মেজভাই বড়র থেকে বেশি ছোট নন, দাদার ত্যাগে পড়াশোনা করে বর্ধমানে রাজ কলেজে অধ্যাপনা করলেন। বড়জেঠা হয়তো এরকম চাকরি পেলে খুশি থাকতেন; লেখাপড়ার ওপর সম্ভ্রম গৈলা গ্রামের ঐতিহ্য, ওঁর ইচ্ছা অবাক করার নয়, হয়ে উঠল না। হতাশা লঘু করতেন পরের ভাইটির ওপর নির্দয় হয়ে। গর্ব না করলেও মেজমা ছিলেন জমিদারবাড়ির মেয়ে, বড়মার কাছে সেটা ঘোর আপত্তির বস্তু। মেজমা না বলুন, আত্মীয়স্বজন-পাড়া প্রতিবেশী তো বলতেন। তদুপরি বাবা ও মেজ জেঠার কাছে বড়ভাইয়ের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন 'বৌঠান', সে জায়গা দ্বিতীয়া নিতে পারেননি, না শাশুড়ি-ননদদের কাছে, না দেওরদের কাছে। বড়মা চিরকাল 'দ্বিতীয়া' হয়ে রইলেন, এটা স্বীকার করা সহজ নয়। উনি পারেননি, নানাভাবে তা প্রকাশ করেছেন। কারণ যাই হোক, মেজ জেঠার মতো অমন একটি সৌম্য মানুষের প্রতি এই ব্যবহার পীড়াদায়ক।

মেজ জেঠার মধ্যে ছিল একাগ্রচিত্তে পড়াশোনা, গবেষণা করার অসাধারণ ক্ষমতা। অর্থকষ্ট, টুইশন করার শারীরিক, মানসিক পরিশ্রম, দু-দুবার হৃদরোগে আক্রান্ত মানুষ, — সব অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর গবেষণা করে বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত সুপ্রশংসিত বই লিখেছেন। ওঁর প্রতি বাবার সমীহ ছিল আলাদা ধরনের, শুধু ছোট ভাইয়ের ভালোবাসা নয়, এক উচ্চকোটির চিন্তাশীল গবেষকের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম। মেজ জেঠার অন্য আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল স্নেহ দেওয়ার। আপন-পর জানতেন না, আজমদাকে নিজের ছেলে থেকে কম স্নেহ দেননি; ওঁর কাছে বরিশালের বেলা (বড় দিদি), বর্ধমানের লীলা (জ্যেষ্ঠ কন্যা) আর কাশীর 'বিবি'তে পার্থক্য ছিল না। ঋষিতুল্য কথাটা ভেবেচিন্তে লিখেছি।

১৯৭৭-এ মেজ জেঠার মৃত্যুর পর বাবাকে লেখা অশোক মিত্রের চিঠি (১৬/১২/৭৭)

> 'মেজদাকে হারিয়ে আপনার মানসিক অবস্থা অনুমান করতে পারি। ওঁর সঙ্গে যেক'বার দেখা হয়েছে, প্রচুর স্নেহ পেয়েছি; সবচেয়ে যা মুগ্ধ করেছে তা তাঁর প্রশান্তি। অর্থ নয়, সচ্ছলতা নয়, মানুষকে মহত্ত্বে পৌঁছে দেয় কর্মনিষ্ঠা; ওঁকে দেখে প্রতিবারই এ কথাটি মনে হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ধমানে ফেরত যাওয়ার টিকিটের টাকার ওপর মেজ জেঠার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড উনি লিখেছেন। ঠিক এ জাতীয় ঘটনা মায়ের কাছে শুনেছি। ১৯৩৪, বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন হাজার টাকা ধার নিয়ে বিলেতে পড়তে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিছু টাকা সঙ্গে রেখে বাকি হাজার দুই তাঁর বড়দাদার কাছে রেখে গেলেন, প্রয়োজন মতো বাবা লিখলে, তিনি টাকা পাঠিয়ে দেবেন। এ-ও পরিবারের শ্রদ্ধা-সমীহ বা কঠিন নিয়মের একটি উদাহরণ — ব্যাংকেও রাখা যেত। এসব ব্যবস্থা ভাইদের মধ্যেই হয়, মা কিছুই জানেন না।

বাবা বিলেত থাকাকালে মা বরিশালে। হঠাৎ একদিন শুনছেন, বড়জা উচ্চকণ্ঠে কিঞ্চিৎ অধিক মার্জিত ভাষায় প্রতিবেশীদের বলছেন, 'সে [অর্থাৎ জেঠামশায়) আর কোথায়, বিলাত থেকে ভাই টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, বড় ভাই, তিনি কী করেন, সকাল থেকে এই রোদে টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় বেরিয়েছেন, ঘোরাঘুরি করে যদি কিছু করা যায়। এত টাকা, জোগাড় করা কি সোজা কথা।'

মা লজ্জায় নতমুখ। মায়ের ভাষায়, 'শুধু লজ্জা নয়, বড় ভাশুরঠাকুরের জন্য কষ্ট হলো আর তোর বাবার ওপর হলো রাগ।[৬] কেমন মানুষ তিনি যে বুড়ো মানুষ বড় ভাইর প্রতি টাকার জুলুম করছেন?' বাবা ফিরে এলে মা অনুযোগ করলে সত্যিটা প্রকাশ হলো। জ্যেষ্ঠের ব্যবহারে বাবা অবাক হয়েছিলেন তা নয় — তিনি তাঁর দাদার সংসারের অবস্থা জানতেন। হাতে যতটাই থাকত, সে ভাইরই হোক এবং যত প্রয়োজনীয় হোক, গচ্ছিত টাকা উনি ব্যয় করে ফেলতেন এবং ফেরত দেওয়ার সময় মেজাজ করে, ভাইরা কত অবুঝ এসব বলে গণ্ডগোল বাধাতেন। সঙ্গে চলত ভেতর-বাড়ির টিপ্পনী।

সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় জেঠামশায়ের সংসার ছিল বড়, আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সম্পর্ক থাকত না। সংসার খরচ নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টাও অন্দরমহলে হতো না; বাড়তি আয়ের জন্য বাড়ির কর্তা নানা ব্যবসা, এমনকি একবার একটি ব্যাংকও শুরু করলেন। কোথাও সাফল্য লাভ হলো না, ব্যাংকও নিলামে গেল; ওঁর হিসাব মিলল না — কোনোদিনই মিলল না; বরং দেনা বেড়েই চলল। সুদের হার দিতে বাবাদের পাঠানো টাকা ফুরিয়ে যেত, 'আসল' মেটানোর প্রশ্ন উঠত না। ঢাকা, কাশী, দিল্লি, বিভিন্ন শহরে পোস্টকার্ড আসত আসল টাকা, সুদ, ঘর খরচ, নতুন দেনার ফর্দ দিয়ে, অর্থাৎ বাবার কত টাকা পাঠাতে হবে। ১৯৪৮-এর একটি চিঠিতে লেখা 'মায়ের শ্রাদ্ধের দেনা বাবদ ...'; এঁদের মায়ের মৃত্যু হয়েছিল ১৯৩৩-এ। চিঠি সবসময় পোস্টকার্ডে — দেড়দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর বা খরচ। ঠিকানার দিকের অর্ধেক যা চিঠির জন্য, তার অর্ধেকে থাকত হিসাব; মুদির দোকানের বাকি, শ্রাদ্ধের দেনা, সুদ ইত্যাদি — এগুলো উনি লিখতেন, 'ত্যারছা' করে, যাতে মূল চিঠির সঙ্গে মিলে না যায়, টাকার অঙ্ক পরিষ্কার দেখায়। চিঠির ধাঁচে আমার হাসি পেত, তবে মনের কোনো কোণে কষ্ট হয়েছে।

পরে অর্থনীতিতে যখন 'ঋণের ফাঁদ' বা 'debt trap'[৭] সম্বন্ধে পড়েছি তখন জেঠামশায়ের কথা মনে পড়েছে। এরকম পরনির্ভর জীবন, এত বোঝা বয়ে বেড়ানো কারো পক্ষে সুখপ্রদ হতে পারে না। কিন্তু সত্যি যে উনি কোনোদিন হিসাব মেলাতে পারলেন না।

বাবা বলতেন, 'দাদা হচ্ছেন ডেভিড কপারফিল্ডের মি. মিকবার। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেই চলেছেন, যখন ধনী না হলেও অবস্থা সচ্ছল হবে, যখন দেনা-পাওনার হিসাব আর করতে হবে না, একটি সুন্দর বাড়িতে সুষ্ঠু সংসার করবেন, দুর্ভাগ্যবশত দুজনের একজনের কাছেও সেদিন এলো না। না জানি মনে কত দুঃখ, বোঝা নিয়ে বাবা এ কথা বলতেন — ওঁর দাদার প্রতি ছিল যে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও অগাধ ভালোবাসা।

বালিকা বয়স থেকে আমার স্মৃতিতে বড় জেঠামশায় রুক্ষ ও মেজাজি; চিঠিতে বা সামনে, কত টাকা চাই এর বেশি কোনো কথোপকথন মনে পড়ে না; হয়তো কারো বিয়ে বা কারো অসুস্থতা — এর বেশি নয়। স্নেহ-মমতার নিদর্শন পাইনি। দুটি চিঠি আমার ভুল ভাঙিয়েছে। একটি আমার কন্যার জন্মে, বাবার কাছে আনন্দ-আশীর্বাদের স্নেহপূর্ণ চিঠি, অন্যটি আমার ভাইয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার সাফল্যে[৮] তাঁর উল্লাস ও গর্বে। লিখছেন, 'আমি বলছি, ও অনেক বড় হবে, তার কর্মক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সুনাম হবে।' ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। শুভেচ্ছা-আশীর্বাদে কৃত্রিমতা নেই, অন্তর থেকে লেখা।

এঁদের থেকে নিজেকে দূরে রাখতাম, আমি মা-বাবার ত্যাগ বড় করে দেখেছি। এখন বুঝি আমিও রুক্ষ, অসহিষ্ণু ছিলাম। বড় জেঠার দিক থেকে পরিস্থিতি দেখার চেষ্টা করিনি। শহরে নাম-ডাক থাকলেও পুরো জীবন গেছে সংগ্রামের মধ্যে। পরিবারের দায়িত্ব বাবা হাতে তুলতে (১৯২৬) জেঠামশায় মধ্যবয়সী। এরপর শুরু অন্দরমহলের চাহিদার সঙ্গে সংগ্রাম। দুই ভাইর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর হয়ে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর টাকার দাবি করে, নিজেকে দোষী বা ছোট করা থেকে বাঁচাতেন মেজাজ করে, 'হুঙ্কার' দিয়ে। ভাইদের কাছে কঠোর, নির্দয়, অন্দরমহলে অত্যন্ত দুর্বল, একটি নিরুপায়-অসহায় মানুষ, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে স্নেহ-মমতার স্থান কোথায়?

বরিশালে তাঁর নাম-ডাক ছিল, হারিয়ে গেল দেশবিভাগে; ১৯৫১ কি '৫২-তে চলে এলেন এপারে। অচেনা প্রতিবেশীর মতো রইলেন কলকাতার উপকণ্ঠে। দিন কাটত পেনশনের ক'টি টাকার জন্য এক অফিস থেকে অন্য অফিসে দৌড়াদৌড়ি করে। বয়স প্রায় সত্তর; অপমান রোজ সহ্য করতে হতো। যেটা তাঁর প্রাপ্য তার জন্য ভিক্ষা চাইবার মতো দীনতা পুত্রের বয়সী কেরানিদের কাছে, 'আজ হবে না, কাল আসবেন' শোনা, সে ঝড়-বৃষ্টি হোক বা জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদ। একটি চেয়ারে বসে জিরিয়ে নেওয়ার কথা কেউ বলত না। দেশবিভাগের এ ইতিহাস কেউ লিখেছেন কি না জানি না।

* * *

এ হলো চার দেয়ালের ভেতরের কথা, সমাজের একটি কোণের রীতি-রেওয়াজ। ছুটির আনন্দ, দাদা-বৌদিদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, বরিশালের তাজা মাছ, রসগোল্লা; বড়বৌদির সঙ্গে দূরত্ব থাকলেও গৈলা বাড়ির আভাস যেন এখানেও পেতেন বাবা। এ তো ছুটির ক'দিনের দাদার বাড়ি। বাবার সঙ্গে এ শহরের সম্পর্ক বহু পুরনো; সেই যে ১৯২০ সালে ব্রজমোহন কলেজে পড়তে এলেন তখন থেকে।

গৈলা গ্রামে ভালো স্কুল, ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হওয়া বন্ধু-বান্ধব, বিস্তৃত মাঠে খেলাধুলা, পুকুরে স্নান, নাটক, যাত্রা, গাজন, পিঠে-পার্বণ, সর্বোপরি মায়ের সান্নিধ্যে সতেরো বছর কাটিয়ে পড়তে এলেন শহর বরিশালে। নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্যম, নতুন জগৎ। এখানকার সহপাঠীরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা, তাঁদের রুচি, সংস্কার, জ্ঞান, আলাদা — জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বাদ, হঠাৎ করে বড় হয়ে যাওয়ার নেশা। তবু ভাবি কী কষ্ট না হয়েছিল মায়ের আঁচল ছেড়ে আসতে।

দারিদ্র্য দারিদ্র্য থেকে যায়, অর্থকষ্ট অর্থকষ্টই থেকে যায়, এর থেকে রেহাই সহজে মেলে না। তবু নিজের দু'খানি কোঠা থাকলে গ্রামে পুকুরের মাছ, আঙনের লাউ-কুমড়ো দিয়ে কষ্ট কিছুটা উপশম হয়। শহরের কথা আলাদা, সেখানে সমস্যা তীব্র, প্রকট। বরিশালে জেঠামশায় ও বাবার কী পরিবেশে থাকতে হতো তা বাবার নিজের ভাষায় লিখছি।

'বরিশাল শহরে একসময় একটি ছোট ঘরে থাকতাম, দাদা আর আমি। সেই ছোট ঘরের মাঝে ধুতি টানিয়ে দুভাগ করা। ওদিকে দুজন আর এদিকে আমরা দুভাই। জায়গার অসংকুলানের থেকে আরো অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় সমস্যা ছিল; ধুতির ওপারের এক ভদ্রলোক রোজ গভীর রাতে সুরা পান করে মাতাল হয়ে থিয়েটারের গান গাইতে গাইতে ফিরতেন। গান বন্ধ হতে প্রায় ভোর। গানটি ছিল

'যশোমতি গো, শোন বলি গো
তোর গোপালের জাত গিয়েছে।
কুলকলঙ্কিনী রাধা বিনোদিনী
তারে নাকি কুলের বার করেছে।'

ঘুম বা পরদিন কলেজ, পড়াশোনা প্রায় অসম্ভব ছিল — তবু চালিয়ে নিতাম, খুশিতেই চালিয়ে নিতাম।

খেতাম পাশে গোপালের 'পাইস হোটেলে'। জলচৌকিতে বসা, সামনে জলচৌকিতে খাওয়া। সেখানে পরিচ্ছন্নতা বলে কিছু ছিল না। নিচে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, স্রোতের মতো বয়ে যেত শহরের আবর্জনা, কেঁচো ভরা জল। খিদে, এরই মধ্যে খেয়ে নিতাম।

উলটোদিকে ছিল একটি মিষ্টির দোকান। দোকানের মালিক তার কর্মচারীদের ওপর খুব দরাজহস্ত ছিলেন না। সন্ধ্যেবেলা দোকানের মধ্যেই তিনি পুজোপাঠ করতেন। মাঝে মাঝে শুনতাম কর্মচারীরা বলছে, 'মহাজন, ও মহাজন — আজ একটু হবে নাকি, অনেকদিন তো হয় নাই — একবার হয়েই যাক না।' অর্থাৎ একটু 'হরিলুট' হোক না, মিষ্টি নয়, দু-একটি বাতাসার আশায় এই অনুরোধ। মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ভজন-কীর্তনের পর হরিলুট হতো, বাতাসা পেয়ে দোকানের ছেলেদের কী আনন্দ।[৯]

সবসময় এত খারাপ পরিবেশ না হলেও স্বাচ্ছন্দ্যে কোনোদিনই থাকেননি। বাবা তো দু-বছর, জেঠামশায় বহু বছর এভাবে কাটিয়েছেন। বড় ভাইয়ের ত্যাগ নমস্য, ভাইদের কৃতজ্ঞতা দ্বিধাহীন, সীমাহীন।

গৈলাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের তেজ হাওয়া বইছিল নিশ্চয়ই, বরিশাল শহর ছিল বিপ্লবী ও কংগ্রেস আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সম্ভবত ১৯২৫-এ নেতা সতীন সেন গান্ধিবাদীতে যুক্ত হলেন, গান্ধিবাদীর কেন্দ্র হয়ে উঠল বরিশাল।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালে Bengal Provincial Conference-এর অধিবেশন হয়েছিল। প্রথমদিন কার্যলিপি ভালোভাবে হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন ইংরেজ সরকার কনফারেন্স ভেঙে দিলো এবং রাজনৈতিক নেতাদের ও তাঁদের সহকর্মীদের লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে প্রচুর অত্যাচার করল। সভা ভেঙে গেল। একটি গান বাঁধা হয়েছিল এই অত্যধিক অত্যাচারের ওপর — একটি ছত্র পেয়েছি, 'আজ বরিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়ে।'

১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। কলেজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর আন্দোলন থেকে বাবা নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন। বাইরে থেকে নেতারা আসেন বক্তৃতা দিয়ে ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করতে। বাবার কথায়, 'তখন শহর স্বাধীনতা আন্দোলনে রমরমা। এরই মধ্যে কোনো সময় বরিশালে হলো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। বড় বড় নেতারা আসবেন, এলেন। আমরা সব ভলান্টিয়ার, প্যান্ডেল বাঁধা থেকে সম্মানিত ব্যক্তিদের দেখাশোনা করা, সম্মেলনের ব্যবস্থা — সবই আমাদের ওপর। আজ বিশ্বাস করা যায় না তখনকার সেই উত্তেজনা, সেই দৃঢ়তা — দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এখানেই বিপিন পাল তাঁর বিখ্যাত উক্তি দিলেন, 'লজিক দিতে এসেছি, ম্যাজিক দেখাতে আসিনি।' তাঁর বক্তৃতার যুক্তি, প্রতাপ ও প্রভাব ভাবা যায় না।

চিত্তরঞ্জন দাশ এসেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। আমরা তো তখন ছোট, আলোচনায় ভাগ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এই সম্মেলনের সত্তর বছর পর আমার নব্বই বছর ছুঁই ছুঁই বাবা গর্বের সঙ্গে বললেন, 'ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি, কী আর বলব, তবে ওঁর সুটকেসটি হাতে নিয়ে ওঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে স্টিমার ঘাট অবধি গিয়েছিলাম। যে বাড়িতে উনি উঠেছিলেন তাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল, তাই এতটা কাছে যেতে পেরেছিলাম। উনি মস্তবড় নেতা ছিলেন, এতটা কাছে যাওয়া ছিল এক সৌভাগ্য।'

একটু থেমে বললেন, 'অসহযোগ আন্দোলন চলছে, প্রায়ই ভাবি পড়াশোনা ছেড়ে এতেই ডুবে যাই। এক ভদ্রলোকের কথা শুনলাম, গরিব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, অত্যন্ত মেধাবী, সেরা ছাত্র: ইউনিভার্সিটি পাশ করার পর প্রচুর বেতনের চাকরি সামনে — পেলেনও। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন। এ নিয়ে আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করলাম। তবে বারবার মনে হলো বহু বছর ধরে দাদা পুরো সংসারের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন। আমি পাশ করে তাঁর পাশে দাঁড়াব, পরিবারের কিছুটা দায়িত্ব নেব, মা-বাবার দেখাশোনা করব — এই তো আমার স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন ত্যাগ করা বা দাদাকে নিরাশ করার সাহস আমার ছিল না। আমি নন কলেজিয়েট হয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলাম, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

ছোট ভাই যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত সে কথা বড় ভাই জানতেন না হতে পারে না, বাধা দেননি, হয়তো মনে মনে গর্বিত ছিলেন। ওঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের রাজনৈতিক মত কী ছিল জানা সম্ভব নয়। কারণ উনি সরকারি চাকরি করতেন; ইংরেজ সরকারের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতেন। সাংসারিক দায়িত্বের জন্য এই চাকরিটির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি ছিল, বহুজনের খাওয়া-পরা জেঠামশায়ের ক্ষুদ্র মাইনেতে নির্ভর ছিল, ইংরেজ সরকারের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া উপায় ছিল না, সে আদেশ আমাদের কাছে আজ যতই হাস্যকর লাগুক না কেন। ইংরেজ সরকারের ভারতীয়দের ওপর জুলুমের উদাহরণ দেই।

১৯৩৬, সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যু হলো বিলেতে। সুদূর বরিশালে ফতোয়া এলো, সরকারি কাজের সবার পরিবারসহ কালো ফিতে বেঁধে শোক প্রকাশ করতে হবে। মা, জেঠিমা, দাদা-দিদিরা নির্ধারিত সময় অবধি ওপর হাতে কালো ফিতে বেঁধে দৈনন্দিন জীবন কাটালেন। বাবা তখন বিলেতে, গবেষণারত। গবেষণার কাজ এক দিনের জন্যও বন্ধ হলো না, কালো ফিতে বা অন্য কোনোভাবে শোক প্রকাশের প্রয়োজন হলো না!

পরিবারকে সাহায্য করে দাদার দায়িত্বের ভার লঘু করে দেওয়ার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। শুধু গৈলার সংসার নয়, শুধু মা ও দিদির জীবিতাবস্থায় নয়, যতদিন তাঁর দাদা বেঁচে ছিলেন, বরিশালে বা পরে কলকাতার উপকণ্ঠে, প্রতি মাসে মনি-অর্ডারে ফাঁক পড়েনি। মা-বাবার প্রথম সংসারে, যখন ঢাকার বাড়িতে অর্থকষ্ট, বিলেত যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধার নেওয়া তিন হাজার টাকার অল্প অংশ প্রতি মাসে মাইনে থেকে কাটা হচ্ছে, তখনো বরিশালে জেঠামশায়ের যতটা প্রয়োজন, পাঠানো হয়েছে। কী করে সংসার চলত জানি না; এটা জানি মিল শাড়ি থেকে তাঁতের শাড়িতে পৌঁছতে মায়ের বহু বছর লেগেছে।

মা, বাবা, বড়মার জীবিতকালেই ধীরে ধীরে বড়বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। বাবার মৃত্যুর পর সমবেদনা জানিয়ে মায়ের কাছে দু-ছত্র চিঠিও আসেনি। দুঃখের কথা, তবে দূরে দূরে থাকলে সম্পর্কে ছেদ আসে, বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে। হয়তো যৌথ সংসারের এ-ও এক পরিণাম।

একথাও সত্যি, সম্পর্ক এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। বর্ধমানের দাদা-দিদিদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল; মা-বাবাকে হারাবার পর আমার 'বাপের বাড়ি' হলো বর্ধমানের বাড়ির একসময় প্রায় অপরিচিত দুই দাদার বৌদির বাড়ি — শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায়।

সমাজের চিত্র আঁকতে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিভিন্ন পরিবার সম্বন্ধে লেখার প্রয়োজন হয় মনে করি। এবং নিজের পরিবারকে বাধ্য হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মধ্যমণি করতে হয়, কারণ একেই কাছ থেকে দেখেছি, জানি। বাদ-বিসম্বাদ, ঈর্ষা, না বলা অসন্তোষ, অভিমান — সঙ্গে সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ, বন্ধন, স্নেহ, শ্রদ্ধা একে অপরকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা, এর থেকে ফুটে ওঠে পারিবারিক গাথা। বহুকাল পর মনে এলো কবি শেখ মহম্মদ ইব্রাহিম জকের[১০] একটি উর্দু গজল।

হুমসে জাহিরো পিনহাঁ জো উস গারতগরকে ঝগড়ে হ্যাঁয়
দিলসে দিলকে ঝগড়ে হ্যাঁয়
নজরোঁসে নজরকে ঝগড়ে হ্যাঁয়।

ক্যায়সা মোমিন ক্যায়সা কাফির
কত্তন হ্যায় সুফি ক্যায়সা রিন্দ।
সারে বশর হ্যায় বন্দে হককে
সারে শরকে ঝগড়ে হ্যাঁয়।

গম কহতা হ্যায় দিলমে রহুঁ ম্যায়
জলবা-এ জানাঁ কহতা ম্যায়
কিসকো নিকালুঁ কিসকো রখখুঁ
ইয়ে তো ঘরকে ঝগড়ে হ্যাঁয় ॥

AMARBOI.COM

* * *

বরিশাল বড় শহর, আমাদের চার দেয়ালের বাইরে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন সংস্কৃতি, পরিস্থিতি, জীবনধারা — সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, স্টিমার কোম্পানিতে কাজ করা দু-একটি শিখ পরিবার, ঘোমটা টানা বৌ, স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে, মাঝি, মজুর, মাস্টার — সবাই চলাফেরা করছেন। আছে নানা বিজ্ঞাপন মারা দোকানপাট, বিবিধ কবিরাজি ঔষধালয়, স্কুল-কলেজ-অফিস-কাছারি; কী নেই। আছে গরিব, মধ্যবিত্ত, ধনী; টিনের চালের ঘর, পাকা দালান, বিশাল অট্টালিকা।

হাসপাতাল রোডে এরকম একটি অট্টালিকায় থাকতেন রামচন্দ্রপুরের প্রতাপশালী, প্রভাবশালী জমিদার, কালীপ্রসন্ন গুহ ও তাঁর যৌথ পরিবার। জমিদার মহাশয়ের দৌহিত্রী নলিনী মিত্র, তাঁর ছয় থেকে ষোলো বছর বয়স অবধি দাদামহাশয়ের বাড়িতে থেকে বড় হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। অট্টালিকা ও পরিবারের জীবনশৈলীর বিবরণ, বিশেষ করে দাদামহাশয়ের কথা উনি পরের প্রজন্মদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন একটি ছোট বইতে। সমাজের ইতিহাসের জন্য বইটি অমূল্য।

প্রায় পনেরো-কুড়ি বিঘা জমির মাঝে, সম্ভবত উনিশ শতকের শেষভাগে বানানো এক বিঘা জমি নিয়ে কুড়ি-পঁচিশটি ঘরের বাড়ি ছিল এটি। বাইরে তিনটি ঘাট বাঁধানো পুকুর। এছাড়া বাড়ি থেকে স্বল্প দূরে ছিল গ্রাম থেকে আসা পড়ুয়া ছেলেদের ছাত্রাবাস; সহিস, কোচম্যানের ঘর, এমনকি একটি ডাক্তার ও তাঁর ডাক্তারখানা। কিছু ঘর ছিল গরিব ছাত্রদের থাকার জায়গা, যে ছাত্রদের ভরণপোষণ জমিদারমশায় নিজে করতেন। ধনীর ভরণপোষণে থাকা সবসময় সুখপ্রদ নয়; একটি ছাত্র তার নিজগুণে পরিবারের সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। 'প্রিয়' হলে ঈর্ষা দূরে থাকে না, ষড়যন্ত্র করে তাকে জমিদারমশাইর মূল্যবান আলোয়ান চুরির অপবাদ দেওয়া হলো। আশ্চর্য, উকিল হয়েও গৃহস্বামী কোনো প্রশ্ন না করে, প্রমাণের অপেক্ষা না করে সোজাসুজি ছেলেটিকে চুরির অভিযোগ জানালেন। শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি অভিযোগ তুলে নিলেন না, ভেতরে চলে গেলেন। ভদ্রলোক 'লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে, শরমে মরেছিলেন। গরিব হয়ে ধনীর অনুগ্রহে প্রতিপালিত হওয়ার এ এক নিদারুণ অভিশাপ,'[১১] লিখেছেন নাতনি নলিনী মিত্র।

ওঁরই দেওয়া বাড়ি ও বাগানের বর্ণনা 'ফটকের কাছ থেকে লাল সুদীর্ঘ সুরকির রাস্তাটি সোজা এসে সামনের মেহেদি ঘেরা গোল বাগানের কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঘুরে মিলিত হয়েছে বাড়ির প্রশস্ত সিঁড়ির তলায়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই বিশাল বিশাল স্তম্ভ সংবলিত ছাদের নিচে বিরাট খোলা চত্বর। এখানে তিনটি 'প্রশস্ত দরজা' এবং ভেতরে দীর্ঘ বারান্দা, তার দুদিকে ঘর। একটি ঘরে '৭/৮ জন কর্মচারী সামনে ছোট ছোট কাঠের হাতবাক্সের ওপর খাতাপত্র রেখে কাজ করতেন। সেখানে মধ্যমণি হয়ে বসতেন ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিহিত নায়েবমশায়।'

একদিকে ছিল 'দাদামশায়ের বৈঠকখানা। প্রায় ১২-১৪ ফুট লম্বা টেবিল — দু'পাশে চেয়ার বসানো।' শহর এবং বাইরে থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এখানে আসতেন। এ ঘরেই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করেছিলেন লেখিকা। এঁদের সংস্কৃত শ্লোক, কবিতা, গল্প শুনিয়েছে ছোট ছোট নাতি-নাতনিরা।

ভেতরে ছিল 'হলঘর — আয়তন ১২০০ বর্গফুটের কম নয়।... মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো। মাঝখানে মস্তবড় গোলটেবিল। তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদা ধবধবে ইতালিয়ান মার্বেল পাথরের টপ, বিচিত্র কারুকার্যখচিত মেহগনি কাঠের পাদানি — কালো বার্নিশে চকচক করছে।' চেয়ার-সোফায় ঘরটি সাজানো। 'বৈদ্যুতিক আলোর অভাব পূরণ করছে সিলিং থেকে ঝোলানো স্বচ্ছ কাচের ঝাড় লণ্ঠন। ওইগুলো জ্বালিয়ে দিলে সমস্ত ঘরটি ঝলমল করে উঠত। চার দেয়ালে ছিল চারটি রঙিন দামি তৈলচিত্র। সবক'টিই ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত।'

এই হলঘরে 'একবার রাজনৈতিক সভা বসেছিল, তখনকার দিনের দিকপালদের ঘিরে। সেই সভায় ছিলেন স্থানীয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়, ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং আরো অনেকে।'[১২] ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের তৈলচিত্রের নিচে বসে সভা করতে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা দিকপালদের মনোভাব কেমন হয়েছিল কে জানে?

যৌথ সংসার, বিরাট সংসার — তিন প্রজন্ম একসঙ্গে। শুধু নিজের ছেলেমেয়েরা নয়, ভাই, ভাইদের সংসার এবং নাতি-নাতনি — সব মিলিয়ে ৪০-৫০ জন। বিবাহিত মেয়েরা সবাই কাছে না থাকলেও তাঁদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই দাদামশায়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। মেয়ে-বৌরা সাহায্য করতেন, তবে অন্দরমহলের হাল ধরে রাখতেন লেখিকার দিদিমা, যিনি ন'বছর বয়সে এ বাড়ির বৌ হয়ে এসেছিলেন, গুহবাড়ি হয়ে উঠেছিল তাঁর একান্ত নিজের। বাপের বাড়ি প্রায় অচেনা হয়ে গিয়েছিল।

এই পরিবারের দুটি জিনিস বিশেষ লক্ষণীয়, এঁরা সবাই মেধাবী, কৃতী ও নিজের কর্মস্থলে সফল। কালীপ্রসন্নবাবু নিজে নামি উকিল ছিলেন, কিন্তু জমিদারির দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর ওকালতি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আমাদের ছেলেবেলার প্রবাদপ্রতিম ভাইবোন, দেবপ্রসাদ ঘোষ, যিনি কোনো পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি ও বোন শান্তিসুধা ঘোষ, দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার, জমিদারমশায়ের বোনের ছেলে ও মেয়ে। নলিনী মিত্র নিজে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন, তাই দাদামশায় বরিশাল থেকে সুদূর ঢাকাতে ইডেন কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। শিক্ষয়িত্রী হিসেবে পরে তিনি সুনাম অর্জন করেন। এঁর ছেলে অশোক মিত্রের মেধা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আজো ৮৮ বছর বয়সে তাঁর চিন্তাধারা এবং কলমের প্রখরতা কিছু কমেনি। 'মেধা' এই পরিবারের ঐতিহ্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় যে জিনিসটি ফুটে ওঠে তা হচ্ছে এঁদের আনন্দ করার ক্ষমতা। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই ছিল; এর মধ্যে নতুন যেটা দেখতে পাই তা হচ্ছে কান ফুটো করার উৎসব। ছোট ছোট মেয়েরা হলুদমাখা জলে স্নান করে, লাল চেলি ও মুকুট পরে চিত্রিত পিঁড়িতে বসলে কান ফুটোর অনুষ্ঠান শুরু হতো। বেশ কয়েকটি মেয়ের কান ফুটো একসঙ্গে হতো বলে আমোদ-প্রমোদ অন্যান্য উৎসবের থেকে কিছু কম হতো না। এই উৎসবটির কথা মনে পড়লে চোখের সামনে সুন্দর একটি ছবি ভেসে আসে। পূজা-পার্বণ, বিবাহ, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, কান ফুটো ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাঝে হাসি-গল্প, কৌতুক, গান, আবৃত্তি, নাটক, সর্বোপরি খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এঁরা মিলেমিশে সুখ ভাগ করে নিতেন। রেষারেষি, কলহ, অভিমানের আঁচ পাইনি।

এ বাড়ির অনেকেই নানা উৎসবে কবিতা লিখতেন। একটি উদাহরণ দিই, যদিও এটা প্রয়োজনে। বাড়িতে এত ছেলেমেয়ে, কে বড়, কে ছোট মা-মাসিদেরও মনে থাকে না। মহামুশকিল। এক মামা পাঁচালির অঙ্গে গান বাঁধলেন

'প্রথমেতে রামমালা সবার প্রবীণ
দ্বিতীয়তে রূপমালা, শ্যামমালা তিন।
চারি নম্বরে যদু, পাঁচেতে ভ্যাদন
ছয়ে লিলি, সাতে মধু শুন বিবরণ।[১৩]

আকারে লম্বা, পাঁচালির মতোই এটা পড়া সময়সাপেক্ষ। একসময় পুস্তিকাকারে বের করাতে শুধু আনন্দ নয়, কে দাদা, কে দিদি নির্ধারণ করা সুবিধে হয়ে গেল।

কালীপ্রসন্ন গুহ তাঁর জমিদারি যেমন শক্ত মুঠিতে চালাতেন, বাড়ির সদস্যদেরও সেরকম কঠিন নিয়মে, শক্ত মুঠিতে বেঁধে রাখতেন। বহির্মহলে তো নিশ্চয়ই, রোজকার সংসার তাঁর স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিলেও, অন্দরমহলে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার ওপর ওঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। লেখিকা তাঁর দাদামশায়ের নানা গুণের সঙ্গে জানিয়েছেন কী তীব্র ছিল 'তাঁর মেজাজ। তিনি অন্যায় বা মতানৈক্য একেবারেই বরদাশত করতে পারতেন না। সবাই মানিয়ে চলতে চেষ্টা করত; কিন্তু হঠাৎ সামান্য কিছু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে রক্ষে ছিল না — ভীষণ চটে-চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন।'

কর্তামশায়ের হুকুম বা নিয়ম নানাদিক ঘিরে ছিল। বাড়ির বৌ-মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরোলে গাড়ির সমস্ত জানালা বন্ধ রাখতে হতো। খোলা থাকলে, বাইরের কেউ এদের দেখতে পেলে জমিদারবাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্রু চলে যাবে। গরমে হাঁসফাঁস করলেও নিয়ম ভাঙা অসম্ভব, কর্তামশায়ের মেজাজ কে সামলাবে? উনি নেশার বিরুদ্ধে ছিলেন, পান ও চা বাড়িতে ঢুকতে পারত না। এক দাদা শৌখিন, নিজের ঘরে লুকিয়ে চা ও মাখন লাগানো টোস্ট খেতেন। ভীতির কারণ বোঝা মুশকিল, এঁরা ছিলেন চাকরিজীবী, যথেষ্ট উপার্জন করতেন, স্বাধীন হতে বাধা ছিল না।

অনেক হিন্দুবাড়ির মতো জমিদারবাড়িতে পেঁয়াজ ছিল নিষিদ্ধ। এ নিয়ম কোনো মামা একবার লঙ্ঘন করেছিলেন। পেঁয়াজের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, লুকোনো যায় না, দাদামশায় টের পেয়ে 'অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন — বাড়িটা নাকি ম্লেচ্ছ বাড়িতে পরিণত হয়ে গেল। ভয়ে দোষীরা কেউ খাটের তলায়, কেউ টেবিলের নিচে।'[১৪]

জমিদারমশায় গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, অন্তত ধর্মটিকে উনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে নিজে দেখতেন, সেভাবে। এখানে যুক্তি-আলোচনার স্থান নেই, তাঁর মত অটল। ১৯০৭ সাল। বরিশাল শহরের গণ্যমান্য উকিল তাঁর বালবিধবা মেয়ের পুনর্বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন, শহরের নামি ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানালেন। কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শুধু যে বিয়েতে গেলেন না তা নয়, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্ণয় নিলেন। জমিদারমশাই এর অগ্রণী। বিধবা বিবাহ তাঁর কাছে এতই অধর্মের প্রতীক যে ভগ্নিপতি, অতি প্রিয় বোনের স্বামী বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। বিবাহবাসর জনশূন্য বা অতিথিহীন হয়নি, বরিশালের অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন ও বিনা দ্বিধায় সহায়তা করেন, উপস্থিত থাকেন। এই ছিল বরিশালের সমাজ, গোঁড়া হিন্দু, যাঁদের ধর্ম বিগতকালের ধোঁয়ার জালে আবদ্ধ, আবার প্রগতিশীল মানুষ — যাঁদের জগৎ খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে।

'ব্যক্তিত্বের দাপট ও চরিত্রের দৃঢ়তা', লেখিকার দাদামশায়কে শহরের নানা সভা-সমিতি-সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রাখত। বরিশাল শহরে চলচ্চিত্র আনার পরিকল্পনা করছিল একটি সংস্থা। প্রতাপশালী জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ এর প্রভাবশালী সভ্য। পুরুষ ও মহিলারা আলাদা বসবেন ঠিক হলো, তখন জমিদারমশায় প্রস্তাব দিলেন, 'ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে বারাঙ্গনাদের একত্রে একসঙ্গে বসা নিতান্তই অসমীচীন — অতএব তাদের জন্য ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা হোক।' এ প্রস্তাব গ্রহণ হলো না, তিনি সভ্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। বাড়ি এসে ফতোয়া দিলেন যে, বাড়ির মেয়েরা কেউ সিনেমা দেখতে পারবে না। শত ইচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলেও, নানা কৌশল করেও এঁরা কখনো সিনেমা দেখতে পারেননি। এ বাড়িতে আনন্দ-উৎসব ছিল নিশ্চয়ই, তবে অন্তর্নিহিত অসন্তোষ ছিল না মেনে নিতে পারি না।

বারাঙ্গনাদের প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য, ঘৃণা বেদনাদায়ক। নাতনি নলিনী গান শিখতেন কোনো মাস্টারমশায়ের কাছে। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন আরেকটি গানের শিক্ষক, যার শেখানোর পদ্ধতি আরো ভালো। গান ভালো গাইতেন, শেখার শখ প্রচুর, আর্জি পেশ করলেন দাদামশায়ের কাছে গানের শিক্ষক বদলাবার। মুহূর্তে আর্জি নাকচ হলো, কারণ এই মাস্টারমশায় বারাঙ্গনাদের গান শেখাতে যান। উনি বাড়িতে ঢুকলে বাড়ি অস্পৃশ্য হয়ে যাবে।

ঐশ্বর্য বা সমাজের প্রতিপত্তি থেকে সংবেদনশীলতা, ছেলেমেয়েদের শখ-আহ্লাদের বোধ আসে না, আসে না সমাজের অসমতার অনুভূতি। এঁরা অনেকে দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্টের দিকে চোখ ফেরাতেন না, তাই নায়েবমশায়ের 'ছিন্ন মলিন বস্ত্র' কোনোদিন জমিদারমশায়ের নজরে আসেনি।

ঝাউতলা রোড থেকে হাসপাতাল রোড কতদূর জানি না, তবে অর্থে, সামর্থ্যে, প্রতাপে, প্রভাবে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আমাদের বাড়ি থেকে বহুদূরে ছিল রামচন্দ্রপুরের জমিদারবাড়ি। আমার জেঠামশায়ের হুকুমের গণ্ডি ছিল তাঁর দুই ভাই, মেজ ও ছোট এবং সেটা বৈষয়িক ব্যাপারে — নেহাতই নিরুপায় হয়ে। তিনি ভাইদের, ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন, পকেটে পয়সা থাকলে শুধু ছেলেমেয়েদের নয়, বাড়িতে কাজ করে সেই ছেলেটিকেও সিনেমা দেখতে পাঠাতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের আব্রু ঠুনকো হয় না, দিদিরা স্বচ্ছন্দে দল বেঁধে বেড়াতে যেতেন, স্কুল-কলেজে যেতেন, বলা বাহুল্য, পায়ে হেঁটে। স্ত্রী-মেয়ে-বৌরা বারোয়ারি দুর্গাপূজা দেখতে যেতেন, তাতেও আপত্তি ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত ও সত্যধর্মে বিশ্বাসী পার্বতী কুমারের পুত্র, তাঁর মধ্যে গোঁড়ামি ছিল না। হয়তো বিত্তহীন কঠোর জীবন কাটিয়ে সমাজের বিত্তহীন মানুষদের ব্যথা বুঝতেন; ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, এসব কথা আমার ঠাকুরদামশায়ের শাখা-প্রশাখায় শুনিনি।

জমিদারবাড়ি ফিরে যাই। প্রথম জীবনে স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের আমন্ত্রণ করতেন, অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের সঙ্গ দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্নবাবুর সমর্থন ছিল ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে বা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে। হলঘরের চারটি তৈলচিত্র ছাড়াও এর নিদর্শন ছিল তাঁর শোবার পালঙ্কটি। কাঠের, সাড়ে চার ফুট উঁচু, তিনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেরাজওয়ালা বিশাল পালঙ্কে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হতো, জেনারেল ডুপ্লের খাটের অনুকরণে এটি তৈরি হয়েছিল!

১৯১৮, নভেম্বর মাস, প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ, ইংল্যান্ডের জয়। জয়ের উৎসব চারদিকে। জমিদারবাড়ির প্রতি কোণে, আনাচে-কানাচে — মোমবাতির আলো, পুরো বাড়ি আলোতে ঝলমল। পুরো শহর আলোর স্বপ্নপুরী। পরদিন স্কুলের গাড়িতে ছোট ছোট মেয়েরা আলোর ফুলঝুরির কথা আলোচনা করছে — ছেলেমানুষ, কার জয়, কার বিজয়, তারা কী জানে? হঠাৎ একটি মেয়ে বলে উঠল, 'ইংরেজদের সঙ্গে ওদের শত্রুদের পরাজয় হয়েছে, সন্ধি হয়েছে, তাতে করে আমাদের এ উৎসবের ঘটা কেন? যে ইংরেজের শাসনে আমরা নিপীড়িত, লজ্জিত, বঞ্চিত হয়ে আছি সেই ইংরেজদের আনন্দোৎসবের সঙ্গে আমাদের একাত্ম হয়ে আনন্দ করার কী দরকার?... অশ্বিনী (দত্ত) বাবুর বাড়িতে তো আলো দেওয়া হয়নি।'[১৫]

মেয়েটির নাম সুলভা — চারণকবি মুকুন্দ দাসের মেয়ে।

* * *

AMARBOI.COM

জমিদারবাড়ির অনতিদূরে, হাসপাতাল রোড ও খালের মাঝে থাকতেন আরেক কালীপ্রসন্নবাবু, গৈলার কালীপ্রসন্ন পিপলাই। জমিদার না হলেও গ্রামের চারপাশে প্রচুর জমিজমা ছিল, বরিশাল শহরে, আর বিশেষ করে গ্রামের বাড়ি ছিল বিশাল। নিঃসন্দেহে ধনী পরিবার, বংশপরম্পরায় ধনী পরিবার।

পিতা দুর্গাপ্রসন্ন পিপলাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বরিশালের বিখ্যাত উকিল ছিলেন। ওকালতি করে প্রচুর নাম অর্জন করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে উপার্জন। উত্তরাধিকার সূত্রে ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন, নিজের সুবিবেচনায় জমিজমা আরো বাড়িয়ে নেন। বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়েও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন, নজর ছিল গ্রামে ও শহরে জনহিতকর কাজে। উনি এবং বরিশালের অপর স্বনামধন্য উকিল, আমার পূর্বপুরুষ, বকশীবাড়ির রজনীকান্ত দাশ, হাত মিলিয়ে গ্রামে রাস্তাঘাট তৈরি, খাল কাটা, দীঘি সংস্কার প্রভৃতি কাজে অগ্রণী হয়ে গ্রামের উন্নয়ন করতেন। এঁদের আর্থিক সাহায্য না থাকলে গ্রামে অনেক কিছুই হতো না।

এঁদের সবচেয়ে বড় অবদান ১৮৯৩-তে শুরু গৈলা মাধ্যমিক স্কুল। পরিকল্পনা থেকে স্কুল শুরু অবধি পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থায় এঁরা সাহায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। প্রায় ১২৫ বছর হতে চলল, সেকালের নির্মিত খোলামেলা একতলা স্কুলবাড়ি আজো অটুট; নানা ঢেউ বয়ে গেছে, গৈলা মাধ্যমিক স্কুলের সুনাম কম হয়নি।

এঁদের কর্মজীবন ও জীবন শেষ হয়েছে বহু আগে। পিপলাইবাড়ির কালীপ্রসন্ন পিপলাই বংশের নৈতিক ধারা জারি রেখেছেন — আতিশয্যবর্জিত জীবন। ওকালতি পাশ করে ১৯১৪-তে কাজ শুরু করেন কলকাতাতে ফজলুল হক মহাশয়ের 'কনিষ্ঠ' (জুনিয়র) হিসেবে। কিন্তু কলকাতার আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় স্বাস্থ্যের কারণে সরকারি বিচার বিভাগে যোগ দেন। ...উচ্চ ন্যায়ালয়ে তাঁর সুবিচার এত প্রশংসিত ছিল যে, তাঁদের সুপারিশে সরকার তাঁকে ১৯৪৫-এ 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৬]

পিতার মতো ভূসম্পত্তি তাঁর সময়েও বর্ধিত হয়েছে এবং পিতার মতো উনিও জনহিতকর কাজে মন দিতেন। 'প্রতি মাসে ৩০-৪০ জন সহায়-সম্বলহীন বিধবা ও নিরাশ্রয়া মহিলাদের — যাঁরা কাশীতে গিয়ে শেষজীবন অতিবাহিত করতেন — নিয়মিত মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতেন।' গরিব শিক্ষার্থীদের সাহায্য চিরজীবন করেছেন, বিশেষ করে গৈলা স্কুলের দরিদ্র ছাত্রদের। এ কাজ দেশবিভাগের পরেও চলেছে।

কালীপ্রসন্ন একমাত্র সন্তান ছিলেন, তাই যৌথ সংসার ঠিক বলা চলে না, তবে তিন প্রজন্ম (ঠাকুমা, পিসিমা, বাবা, মা যিনি অল্প বয়সে মারা যান, ছয়টি সন্তান) নিয়ে সংসার ছোট বলা যায় না। বাড়ির আবহাওয়া শান্ত, স্নেহময়: নিয়ম-কানুন, শাসন আছে — ভীতি নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ, খেলাধুলা করতেন, সন্ধেয় শাঁখ বাজার আগে বাড়ি ফিরতেন — কড়া নিয়ম। প্রসাদের লোভে নিয়ম লঙ্ঘন হতো না, লিখছেন পুত্র তপন পিপলাই। দিনের একটা সময় বাবার কাছে *রামায়ণ-মহাভারতে*র কাহিনি শুনতেন বা ঠাকুমা-পিসিমাকে পড়ে শোনাতেন। পরিবারে একটি প্রীতিপূর্ণ নৈকট্য দেখা যায়, সবাই যেন আদরে-আবদারে মানুষ।

যেটা বিশেষ লক্ষণীয় তা হচ্ছে, মতানৈক্য হলে আলোচনা হয়, ছেলেদের তাদের লক্ষ্য বেছে নিতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এক ছেলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন, বাধা এলো না। দুই ছেলে কমুনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত হলেন, তাতেও বাধা এলো না। ছেলেরা নিজেদের সহধর্মিণী বেছে নিলেন তাতে যেমন আপত্তি এলো না, অসবর্ণ বিবাহও কেউ রোধ করলেন না।

দৃঢ়চিত্তের মানুষ কালীপ্রসন্ন পিপলাই, নীতিপথ থেকে তাঁকে টলানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত না। সরকারি পদে থাকলেও ইংরেজ অফিসার বা উচ্চপদের কারো কাছে মাথা নিচু করেননি। একটি উদাহরণে এ বাড়ির মুক্ত হাওয়া, স্বাধীন চেতনা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সাল, উনি সিলেটে সাবজজ। এক সন্ধ্যায় অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরলেন, সবাই চিন্তিত-অস্থির, 'সন্ত্রস্ত, কারণ এরকম অবস্থায় তাঁকে কখনো দেখিনি। ...আমাদের নিয়ম ছিল সবাই একসঙ্গে মেঝেতে কাঠের পিঁড়ি পেতে কাঁসার থালায় খাওয়া। সেদিন উনি বললেন যে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে বলেছেন দাদাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে। কারণ দাদা বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তারা জানেন দাদা তখন সিলেটে বাবার কাছে। দাদাকে বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে দিলে তাঁর (কালীপ্রসন্ন) সম্পর্কে সরকারের ধারণা খুব খারাপ হবে।' পিতার জবাব 'আমি সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি যে, 'ছেলে এখন সাবালক। তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি গড়ে উঠেছে। তার যখন যেমন প্রয়োজন তেমনি আসবে ও থাকবে। তবে সরকারের হাতে উপযুক্ত প্রমাণ থাকলে তারা নিশ্চয়ই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন। আমি তাকে ত্যাগ করব না'... ।'[১৭] পাহারাদার রাখা ছাড়া সরকার কিছু করেনি।

অন্য উদাহরণটি শুধু কালীপ্রসন্নবাবুর নীতিবোধের ব্যাপার নয়, মানুষের মধ্যে তীব্র বন্ধন ও উদারতার পরিচয় দেয়। কালীপ্রসন্ন পিপলাই লক্ষ্মীপুরে সিনিয়র মুনসেফ। কোনো কাজে প্রধানমন্ত্রী (এখন যাকে মুখ্যমন্ত্রী বলা হয়) এ কে ফজলুল হক সেখানে আসেন এবং একদা তাঁর জুনিয়রকে আসতে বলেন। যদিও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল, উনি ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করতে যাননি। 'পরদিন সন্ধ্যায় দেখি ফজলুল হক আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বাবা তখন বেড়াতে গেছেন। আরাম করে ইজিচেয়ারে বসে বললেন, 'বৌমা, আমার জন্য কিছু খাবার তৈরি করো। তোমার কত্তা তো আমার সঙ্গে দেখাও করল না, আসতেও বলল না। কিন্তু আমি না খেয়ে যাচ্ছি না।' পরে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বাবা বিচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের আত্মমর্যাদার কথা বলেছিলেন।'[১৮]

নীতিবোধ, দৃঢ়চিত্ত, আত্মমর্যাদা অমান্য করার প্রশ্ন ওঠে না, তবে সবকিছু ছাড়িয়ে মনে বাজে মর্মস্পর্শী সম্বোধন, 'বৌমা'।

দুর্গাচরণ পিপলাইর পর যেতে হয় তাঁর সহকর্মী রজনীকান্ত দাশের কাছে, গৈলা বকশীবাড়ির স্বনামধন্য ব্যক্তি। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, যে স্কুলে বাবারা তিন ভাই পড়াশোনা করেছেন, সেই গৈলা মাধ্যমিক স্কুল ওঁর তৈরি। ২০০২-তে গৈলা, আগৈলঝাড়াতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল এবং গ্রাম উন্নয়নে ওঁর অবদান কতটা, অনেকেই বললেন। বৈদ্যপ্রধান গ্রাম, তার ওপর ভাই ও আমি বকশীবাড়ির, ওঁর কথা বেশি করে সবাই বলবেন সেটা স্বাভাবিক, তবে রজনীকান্ত দাশের গুণগান বৈদ্যদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। একশ বছর পর এর বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি; যদিও ওঁর দানশীলতার কথা পারম্পরিকভাবে চলে আসছে। দৌহিত্রী মনিকুন্তলা সেন লিখছেন,

> বৈঠকখানার ঘরে ফরাস পাতা বড় চৌকিতে দাদুর একদিকে থাকত মক্কেলদের বসার জায়গা, আরেক পাশে থাকত প্রার্থীদের। একটির পর একটি প্রার্থীর কথা একানে শুনতেন ও অন্যকানে নিজের পেশার কথা। ফাঁক পেলে যা জমা পড়ত তার কিছু কিছু কাগজ মোড়ক হয়ে চুপি চুপি প্রার্থীর হাতে চলে যেত। কাজটি গোপনে সারতেন মুহুরির ভয়ে।

প্রবাদ ছিল তাঁর এক হাত দান করত, অন্য হাত জানত না।[১৯]

উনি প্রায়ই গৈলা যেতেন, সঙ্গে ক্যাশবাক্স থাকত, তাতে খুচরো টাকা-পয়সার মোড়ক। গ্রামের বাড়ির মেয়ে-বৌদের ডেকে কুশল সংবাদ জানবার পর তাদের হাতে গুঁজে দিতেন এক একটি মোড়ক — নিজেদের খরচের জন্য, কখনো বাপের বাড়িকে সাহায্য করবার জন্য। গ্রামে আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার পাশে উনি। সম্পর্কে কাকা, পার্বতীকুমারকে বারবার বলতেন, 'আমি থাকতে থাকতে বাড়িটা ছাড়িয়ে নাও, পরে গোলমাল হবে।' বাড়ি উনি বন্ধক থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

রজনীকান্ত দাশ, দুর্গাচরণ পিপলাই — কর্মজীবন কাটিয়েছেন বরিশাল শহরে, সেখানে শহরের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। প্রাণের টান ছিল গৈলা গ্রামে, অর্থ, মূল্যবান সময়, সুপরামর্শ দিয়ে গ্রামের উন্নতি করেছেন চিরকাল।

আমার কল্পনায় দামামা বাজিয়ে ঝড়ের বেগে উদ্যম ও উদাত্ত কণ্ঠে আবির্ভাব হতো চারণকবি মুকুন্দ দাসের — বরিশালের চারণকবি মুকুন্দ দাসের। নিছক কল্পনা, কেমন যেন ওঁর ক্ষমতার সঙ্গে মিলে যায়। আমার তাঁকে দেখার-শোনার সৌভাগ্য হওয়ার কথা নয়, বাবার কাছে তাঁর 'ম্যাজিক' সম্বন্ধে শুনেছি। নজরুলভক্ত বাবা, পরে কাজী নজরুলকে সামনে থেকে দেখেছেন, শুনেছেন, প্রথম পরিচয় ও প্রেরণা চারণকবির কণ্ঠে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' থেকে, সেই যে বরিশালের কলেজজীবনে শুনেছিলেন। বাবা কেন, হাজার হাজার মানুষকে প্রেরণা দিয়েছেন চারণকবি।

আংশিকভাবে, অত্যন্তই আংশিকভাবে চারণকবির সঙ্গে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় সবিতাব্রত দত্তের মাধ্যমে, *চারণকবি মুকুন্দ দাস* নাটকে। লম্বা, দোহারা চেহারা, বলিষ্ঠভাবে স্টেজে হাঁটছেন, জোয়ারির ঝঙ্কারভরা উদাত্ত কণ্ঠে গাইছেন

'ফেলে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী'

রোমাঞ্চ, শিহরণে পৌঁছে গিয়েছি বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতিয়ে তোলা পূর্ব বাংলায়। কিন্তু এ তো নাটক।

মনিকুন্তলা সেন প্রভাবিত হয়েছিলেন মুকুন্দ দাসের গানে, স্বদেশি যাত্রায়, আবৃত্তিতে। লিখছেন,

> মেয়েরা কেঁদে ভাসাত এ যাত্রা দেখে। গানগুলো যেন জাদু জানত। নইলে যখন গাইতেন — 'ও আমার বঙ্গনারী, পরো না বিলিতি শাড়ি, ভেঙে ফেল বেলোয়ারি চুড়ি' — তখন যেন কে আগে স্টেজে গিয়ে হাতের চুড়ি ভেঙে দিয়ে আসবে — তার একটা প্রতিযোগিতা লেগে যেত। শুধু ভাঙা নয়, কাঁদতে কাঁদতে হাতের সোনার চুড়ি খুলে দিয়ে আসতেও আমি দেখেছি। ঘরে গিয়ে বিলিতি কাপড় ছেড়ে 'বঙ্গলক্ষ্মী' মিলের মোটা শাড়ি ধরতে মেয়েদের আর অন্য প্রচারের দরকার হতো না। একা মুকুন্দ দাসের যাত্রাই যথেষ্ট ছিল।[২০]

AMARBOI.COM

আমার মনে পড়ে,

'এবার মরাগাঙে বান এসেছে
খুলতে হবে নাও,
তোরা এখনো ঘুমাও?'

খাঁটি বরিশালি ভাষা, সুপ্ততা থেকে জাগ্রত করার কী বলিষ্ঠ মন্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে গান দিয়ে মাতিয়ে তুলেছিলেন বরিশালের অতি আপন মুকুন্দ দাস।

* * *

পরবর্তীকালে বরিশালের সংগীত, চিত্রকলার বিকাশ নিয়ে বিশেষ কিছু জানা নেই, শুনেছি শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। সে যা-ই থেকে থাক, পরিবেশ ও শিক্ষা উচ্চমানের আন্দাজ করতে পারি — কারণ বিখ্যাত বাঁশরিবাদক পান্নালাল ঘোষ, ওঁর স্ত্রী, গায়িকা পারুল ঘোষ, ভ্রাতা নিখিল ঘোষ, জ্ঞানী-গুণী তবলাবাদক ও পান্নালালবাবুর শ্যালক, সুরকার অনিল বিশ্বাস (পারুল দেবীর ছোট ভাই) বরিশালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— প্রত্যেকে নামি কলাকার, সংগীতজ্ঞ। পরে কলকাতা, বোম্বাই এলেও এঁদের তালিম শুরু হয় বরিশাল শহরে। দীর্ঘকাল বোম্বাই শহরে থাকলেও নিখিল ঘোষ মহাশয়ের বাড়ির আপ্যায়ন ছিল পূর্ব বাংলার। আমাকে দেখে হঠাৎ একদিন বলেছিলেন, 'তোমাকে বড় ভালো লাগে, তুমি তো বরিশালের।'

ভগবানদত্ত কণ্ঠস্বর ছিল ছোট ভাই অনিল বিশ্বাসের। প্যাটেল ও বিশ্বাস পরিবারে ঘনিষ্ঠতা ছিল, কত শীতের সকালে অনিলদা এসেছেন দিল্লির বাড়িতে, বাগানে রোদ পোহাতে পোহাতে বেতের চেয়ারে বসে তন্ময় হয়ে শুনেছি ওঁর নানা রচনা, বিশেষ করে উর্দু থেকে বাংলা করা গজল। ভাষাবিদ, উর্দু, ফার্সি ভালো জানতেন — কোথায় শিখলেন নিজেও জানতেন না। সুরকার হিসেবে উনি বিখ্যাত, আসলে ছিলেন প্রকৃতভাবে সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক বিশেষ করে উর্দু গজলের। তরজমা করতেন গজলের শব্দের ভেতরকার সূক্ষ্ম ভাব নিয়ে। কঠিন ব্যাপার; বলতাম, 'আপনি তো সরু কাঠি নিয়ে উর্দু শব্দ থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে অন্তরের আওয়াজ বের করেন।'

এমন অনিলদার ভাণ্ডারে শুধু উচ্চাঙ্গসংগীত নয়, ছিল গজল, কীর্তন, ভক্তিসংগীত, লোকসংগীত, ছিল কত কিছু; মনে হতো এক বিশাল অদৃশ্য ঝুলি থেকে উনি বিভিন্ন মণি-মাণিক্য পেশ করছেন। স্টেজে নয়, ঘরোয়া বৈঠকে গাইতেন। ওঁর কীর্তন, লোকসংগীত — আমার প্রিয় ছিল মুশকিল আসান — শুনে অভিভূত হয়েছি। খোলা, দরাজ গলা, বলিষ্ঠ গলা শুধু সুরেলা নয়, প্রত্যেকটি সুর নিজের শ্রুতিতে অটল, স্পষ্ট উচ্চারণ মনকে আকুল করে দিত। গান শিখেছিলেন বরিশালে মায়ের কাছে, উনি ভক্তিসংগীত গায়িকা ছিলেন। আর জীবনের পথে যা শুনেছেন ভরে নিয়েছেন 'ঝুলি'তে। ওঁর মায়ের রচিত একটি ভক্তিসংগীত আমার প্রিয় ছিল। মাকে হারিয়েছেন বহুকাল, ওঁর রচনা অনিলদার কণ্ঠে আরো আবেগপূর্ণ হতো। গানটি ভক্তিসংগীত জগতের সম্পদ। দুঃখের বিষয় সুর জানা নেই। বহুকাল আগে এক চিঠিতে লিখছেন, 'মায়ের গানটি তোমার ভালো লাগে জানি, তোমাকে শোনাতে ভালোবাসি। শোনাতে তো পারছি না — কথাক'টি লিখে পাঠালাম।'

এখনো নদীয়ায় আছে সে চিহ্ন
ভাব অভিব্যক্তি করিতে দান,
যে জানে সে জানে — যে মানে সে মানে —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে জানে — মানে, — মজেরে প্রাণ।
যুগ-যুগান্তের বেদনা বহিয়া —
কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া রহিয়া রহিয়া
কত না কাঁদিছে 'হা নাথ' বলিয়া —
সে শোনে যাহার আছে সে কান।
আর কতদিন রিপুর অধীন
রবে) 'যামিনীর' চিত্ত নিত্য মুক্তিহীন
গুরু) চরণার বৃন্দ গন্ধবিহীন
কুড়াইব শুধু ধন যশ মান।[২১]

* * *

বরিশালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রকৃত ঐশ্বর্য, ঐতিহ্য জানতে হলে চলে যেতে হয় বহুকাল আগের *রংমশালের* পাতায় অমিয় চক্রবর্তীর দুর্লভ লেখায়, 'চলো যাই'। 'খুলনা থেকে নাক উঁচু করা একটি স্টিমারে, চলো বসিগে, চলো যাই — বরিশালে।' ওঁর ভাষা, অনুভূতি আমার করে লেখার হঠকারিতা না করে যতটা সম্ভব উদ্ধৃত করে বরিশাল পর্ব শেষ করি।

স্টিমার থেকে দৃশ্য : 'চতুর্দিক ঘন বর্ষার জলে ভর্তি, সবুজে চোখ ডুবে যায়, কালো কাজল মেঘময় দিনে ছবির মতো গ্রাম, কোথাও রোদ্দুর পড়েছে আড় হয়ে। যাই বলো আর তাই বলো এমন বুকভরা দৃশ্য আর কোথাও নেই। বহু হারানো বছরের পূর্বস্মৃতি জন্মজন্মান্তরের পরিচয় ভরে আছে — এই আকাশব্যস্ত মেঘলা আলো আর নিচের কচি চারা ধান। ...নদীপথে কোথাও ঝিকিয়ে উঠছে তার ঢেউ, বহন্ত উধাও তার প্রাণসলিলে সারি সারি ডিঙ্গি গহনার নৌকো জলের ওপর ঘরোয়া সংসার পেতেছে, দু'পাশে মাঠ, গ্রাম, সুপুরির বন।'

হাটের ব্যাপারী, মাঝিদের আনাগোনার নদী ধারাময়ী।
পাটের চর আর আখের চর —
মেঘবরণী মেঘ।
রূপোলি জল ঢেউ তুলে বয় আমার মধুমতী ॥
হাটের নৌকোয় হাঁড়ি কলসি
উঁচু সাজানো কুমড়ো শষা,
গাঁয়ের ধারে টিনের ছাতের বাড়ি।
রূপোলি জল ঢেউ তুলে বয় আমার মধুমতী ॥
চোখ জুড়োয় গো, চোখ ডুবে যায় ধানের শীষে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাটের চরে আর আখের চরে;
সিঁদুর সোনা দিনের শেষে অস্তমনি গো
রূপোলি জল ঢেউ তুলে বয় আমার মধুমতী ॥

নাজিরহাট এলো। নৌকো করে শষা, তাজা ডিম, দুধ বিক্রি করতে এসেছে গ্রামের লোক, অনেকের পরনে লুঙ্গি, খালি গায়ে রোদ পড়েছে, কখনো ঠায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। শান্ত, ধৈর্যমাখা মুখের ভাব, কত প্রাত্যহিক সংগ্রামে অজেয় তাদের মন, কতখানি সহজ চরিত্রবলে দৃঢ় এদের জীবনী। সংসারে হারে না যে তা নয়, মৃত্যু, অস্বাস্থ্য দীর্ণ-দৈন্য, সংঘশক্তির অভাব বারবার এদের গ্রাম্য সমাজকে বসিয়ে দিচ্ছে যেমন ভেঙে পড়ে ঢেউ লাগা নদীর পাড়ি, কিন্তু তবু দেখো এদের বীর্যের অবসান নেই। হিন্দু-মুসলমান এই নদীচারী, কৃষিজীবী সংখ্যাহীন পরিবার প্রতিদিনই সহযোগী হাটে ব্যবসায়ে এক জীবিকার জাল বুনছে, যেমন করে তারা মাছ ধরার জাল বোনে; এক গলায় প্রাণের সুর তুলেছে যেমন করে সারি গানে জারি গানে বহু কণ্ঠের সুর মেলে। এরাই বাঁচবে।

তাই বলি অবিশ্বাসীর কথা শুনো না, দাঙ্গার কথা শুনো না, বরিশালের গ্রামে এসে দেখো।

বরিশাল শহরটি বেশ দেখতে, কীর্তনখোলা নদীর ওপর জমিয়ে বসেছে। যেদিকটায় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে শহরের রাস্তাটা ঝালকাঠি পর্যন্ত চলে গেছে, সুপুরি আর ঝাউ আর পাম গাছের সারি দেওয়া, সামনে ভরা নদী আর নৌকো, সেদিকটায় বেড়াতে তৃপ্তি লাগে। সর্বক্ষণ নদী হাওয়া দেয়। ওপারের গ্রাম দেখা যায়। শহরটি সুন্দর-অসুন্দরে মিলিয়ে, যেমন হয়। অনেক কবিরাজি ঔষধালয়। বরিশাল শহরে বহু খাল, বহুতর পুকুর, দু-একটি খালে শহরের মধ্য দিয়ে নৌকা চলেছে, পাশেই ব্যস্ত বাজার। স্টিমার ঘাটে নানা বিচিত্র লোকজন, গাছের তলে চায়ের দোকান, অদূরে বাজনা বাজানো জগদীশ সিনেমা।

অশ্বিনী দত্তের বরিশাল। 'শক্তিবাহিনী' মেয়েদের বরিশাল। ঢাকার দীপালি সংঘের অনুরূপ মেয়েদের ওই প্রতিষ্ঠান এখানে নারীপ্রগতির আশ্চর্য কাজ করেছে। পথে-ঘাটে বাড়ির বৌ-গিন্নি থেকে আরম্ভ করে নতুন ছাত্রী দলের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত দেখতে খুব ভালো লাগে। শঙ্কর মঠ দেখলাম, এর সঙ্গে অনুশীলন দলের রাষ্ট্রিক আন্দোলন জড়িত। তারপর নতুন যুগের স্রষ্টা মহাপুরুষের পুণ্যবলে বিভিন্ন বিদ্রোহী দল অখণ্ড স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, সাম্প্রদায়িক ঐক্যযোগের আদর্শ এখানে বড় হয়ে দেখা দেয়। বরিশালের শিক্ষা ও রাষ্ট্রচেতনা বাংলাদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসিদ্ধ। লোকে বলে, এখানে একটি বাড়ি নেই যেখানে মেয়ে গ্র্যাজুয়েট নেই, বা একজন ছেলে জেলে যায়নি।

বরিশালে আর কী আছে? অপরিসীম হৃদ্যতা আর আতিথ্য — যার কোনো শেষ নেই। আর বৃষ্টির সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি।... দুধের অনাবৃষ্টির দিনেও এখানে পাবে ক্ষীর, পায়েস, দই, রসগোল্লা আর পেটভরন্ত মর্তমান কলা। 'হাপুস-হুপুস শব্দ — চারদিক নিস্তব্ধ।'

পূর্ববঙ্গে এসে মনে হলো আমার আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। এই যে সবাই — এদের হৃদয়টা খুব কাছাকাছি থাকে, গভীর সরল এদের দেওয়ার-নেওয়ার ইচ্ছা।

এরা আমার আত্মীয় সব মস্ত আমার পাড়া —
নদী থেকে দেখি নৌকোয় ভেসেছি ঘর ছাড়া।
আম জাম তাল সুপুরির বন নারকোল আর কলা;
ঘোলা বরণ শ্রাবণী জল বইছে তারি তলা;
সারি সারি গ্রামের ছবি বুকের কাছাকাছি —
কাঁচা মাঠে বৃষ্টিতে ঐ ধানের সঙ্গে বাঁচি ॥

'রাখি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় এসব কথা মনে হচ্ছিল।'[২২]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের আনুগত্য শুধু আমাদের বাড়িতে নয়, বহু যৌথ সংসার এ নিয়মে চলত। দ্রষ্টব্য মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদ বৃক্ষ*।

২. *গৈলার কথা*, পৃ. ২১০।

৩. ক) 'প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের পূর্বপুরুষরা যে জমি অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পর অনেকেই নূতন জমি অর্জন করিতে পারে নাই। কালক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ঐ জমি উহাদের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়েই গরিব হইতেছিল। অনেক ক্ষেত্রে নিজ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জমি ছিল না এবং টাকা কর্জ করা অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।... গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছিল।' *গৈলার কথা*, পৃ. ১০৩-০৪।

খ) 'ঋণের বোঝা' – দ্রষ্টব্য তথ্যসূত্র ৭।

গ) 'হাউলি', দ্রষ্টব্য গৈলা পরিচ্ছেদ।

৪. দ্রষ্টব্য *বিষাদবৃক্ষ*, পৃ. ১০০।

৫. নববধূর মনের দিকটা না ভেবে কথা বলা বাংলার একচেটিয়া নয়। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি বরোদাতে এক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছি — বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্রের সদ্যবিবাহ হয়েছে। বধূমাতা উচ্চশিক্ষিতা, ফর্সা, বুদ্ধিমতী, ধনী — প্রচুর সোনা নিয়ে এ বাড়িতে এসেছেন শুনলাম। শ্বশুরমশাই অধ্যাপক। নতুন বউ কাছে, শুনতে পাচ্ছেন অগ্রাহ্য করে বলতে লাগলেন, 'প্রার্থী (candidate) বেশ কয়েকজন ছিল, সবাইকে নম্বর দিলাম। এটি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। প্রথমটির সঙ্গে কথাবার্তা জমল না, তাই এই মেয়ে।' বুঝলাম, দীর্ঘকাল পরীক্ষার খাতা দেখে, চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনপত্র পড়ে, নম্বরের পেছনে যে মানুষ থাকেন, ভুলে গেছেন।

৬. মা তাঁর বড় ভাশুর ঠাকুরকে সমীহ করতেন। মনে ব্যথা দিতেন বড়মা।

পারিবারিক কাহিনিতে সেজভাই সম্বন্ধে কিছু লিখিনি, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। বরিশালে 'ধার শোধ', টাকার অঙ্কের কথা যখন হতো, উনি নীরব থাকতেন, দায়িত্ব নিতেন না।

'আদরে-গোবরে' সেজমার মনে ঘোর প্যাঁচ ছিল না, শুধু শাড়ি-গহনার শখ অন্যদের অন্তত আমাকে বিব্রত করত। ওঁর ওপর হাতের গহনা, 'আর্ট ডেকো' নকশার লাল চুনি-মুক্তোর কানপাশা দেখে কলেজজীবনে বলেছিলাম 'বড় সুন্দর'। সরল মনে জবাব দিলেন, 'এগুলো তো তোমার মায়ের গয়না, পছন্দ হলো — নিয়ে নিলাম'। চাইলেই দিয়ে দেওয়া এটা মায়ের নির্বুদ্ধিতা না ঝামেলা এড়ানোর চেষ্টা জানি না। হয়তো কোনোটাই নয়, মায়ের মধ্যে 'আপন' করে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল, সেজ জাকে 'আপন' ভেবে থাকতে পারেন।

৭. উপমহাদেশের ঘরে ঘরে আজো ঋণের ফাঁদে পড়া লাখ লাখ মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশপাশে কতজনের স্বপ্ন, নিজের কঠিন জীবন থেকে ছেলেমেয়েদের বাঁচানো, তাদের লেখাপড়া করিয়ে সচ্ছল জীবন দেওয়া। কিন্তু ঋণ, মহাজনের সুদ — সে জট যায় না। শুধু কি তাই? আছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ — খরচের খাতা বেড়ে চলে। 'ধার' একমাত্র রাস্তা।

২০০২-এর ডিসেম্বরে ঢাকা থেকে চাঁদপুর গিয়েছিলাম, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে মহিলারা, যাদের জীবনে বদল এসেছে, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে। গাড়িতে না গিয়ে ঘাট থেকে রিকশা করে গ্রামের ভেতরে যাচ্ছি, একা। চতুর্দিকে মন-মাতানো শ্যামল-সবুজ।

রিকশাচালক বললেন, 'জানেন দিদি, গ্রামীণ ব্যাংক ভালো ঠিক, তবে মাইয়ার বিয়ার লইগ্গা তারা টাকা দেয় না। আমার মাইয়ার বিয়া সামনে, অন্তত ষাইট হাজার টাকা লাগব, পামু কই? ছুটতে হইব সেই গ্রামের মহাজনের কাছে। সুদের ভারে মইরা যামু, আরো রিকশা চালামু, দ্যানা কি শোধ হয়?' তাকে কী বোঝাব? রোদে পোড়া, চামড়া শুকিয়ে যাওয়া, চুলে-দাড়িতে মেহেদি ছোঁয়ানো, অল্পবয়সে বৃদ্ধ, বড় 'আপন' করে কথা বলছিলেন। দায়িত্ব, চিন্তার ভারে গালে-চোয়ালে ভাঁজরেখা পড়া ক্লান্ত-করুণ চেহারা মনে পড়ে — তখন গ্রামের শ্যামল-সবুজ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

৮. হিন্দি ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে 'স্টার' পেয়ে ভাই পার্থ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পুরো উত্তর প্রদেশের বোর্ডে প্রথম হয়েছিল।

৯. লেখিকার সঙ্গে কথোপকথন, ১১/১১/৯১।

১০. শেখ মহম্মদ ইব্রাহিম জক (১৭৮৯-১৮৫৪), দিল্লি। উনিশ বছর বয়সে মোগল দরবারের প্রধান সভাকবি হন, আমৃত্যু তা-ই ছিলেন।

গজলের মর্মার্থ

প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রাণীর
সৃষ্টিকর্তা এক অনন্ত পরম
সত্য — তারা এক তারে বাঁধা।
দ্বন্দ্ব, ঝগড়া হৃদয়ের সাথে
হৃদয়ের, ঘর-সংসার-গৃহে,
আপনজনের মাঝে।

অনুবাদ ইফতেখার আহমেদ, বরোদা।

১১. নলিনী মিত্র, পৃ. ২৫।

১২. পৃ. ১৪-১৭।

১৩. পৃ. ৬৭।

১৪. পৃ. ৬৪।

১৫. পৃ. ৩৯-৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. পিপলাই পৃ. ২৭।

১৭. পৃ. ৬১-৬২।

১৮. পৃ. ৬২।

১৯. কমল চৌধুরী, পৃ. ৪৭৫-৭৬

২০. পৃ. ৪৭৬-৭৭

২১. যামিনী অনিল বিশ্বাসের মায়ের নাম, এখানে ভণিতা হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। শেষ জীবনে দিল্লিতে পুরনো বন্ধুদের হারিয়ে নিজেকে শেকড়হীন মনে করতেন অনিলদা। লিখছেন, 'কোথাও যাই না, তাই কারো সঙ্গে দেখা হয় না। সাধারণ যোগাযোগও নেই প্রায়। এ সম্বন্ধে আমার দু-লাইন —

ন দোস্ত ন দীরম ন দাওয়ৎ ন পাতি

মিট্টি কো শায়েদ হ্যায় মিট্টি বুলাতি।

২২. *রংমশাল*, ১৩৫৩, সংখ্যা আশ্বিন মাস, পৃ. ২২৩-২২৬।

রংমশালের পাতা ফুলঝুরি বা রংমশালের মতোই নানা রঙের, কাগজ পুরু। বয়সের ভারে রং ও তার ওপরে ছাপা স্তিমিত। 'চলো যাই বরিশাল' কতবার পড়েছি — শেষ করেছি 'ধানের' সঙ্গে 'বাঁচি' কবিতা দিয়ে। হঠাৎ অল্পদিন আগে চোখে পড়ল শেষ বাক্য 'রাখি পূর্ণিমার রাতে...'। কোন রাখি পূর্ণিমার রাতে একথা ভেবেছিলেন জানি না, হয়তো ১৩৫৩, বাক্যটি আমার নজরে এলো — রাখি পূর্ণিমা, ১৪২৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৈলা

আমার দেশ গৈলা গ্রাম, বরিশাল জেলার গৈলা গ্রাম; সেখানে আছে আমাদের পৈতৃক ভিটে, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য। গ্রামে বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন 'বাড়ি'র নামে চিহ্নিত হয়। আমরা বকশীবাড়ির। নদী-খাল-বিল বর্ষায় জলে ভরা, ভিজে সপসপে গ্রাম, দীঘি-পুকুরের স্নিগ্ধতা, ঝলমলে রোদে সুপারি-নারকেল-বাঁশবনের ছায়ার গ্রাম, ছোটবেলা থেকে রূপকথার মতো শুনে এসেছি বাবার কাছে, তাঁদের ছোটবেলার গৈলার জীবনের বর্ণনা। ঠাকুর্দামশায়, পার্বতীকুমার, ভাঙ্গাতে কাজ করলেও সংসার ছিল গৈলাতে। বাবারা, ভাইবোনেরা বড় হয়েছেন দেশের বাড়িতে। তাঁদের বড় হওয়ার সুখস্মৃতি, মা-বাবা-দিদি-বৌঠানের স্নেহস্মৃতি এই গ্রাম, বকশীবাড়িকে ঘিরে।

'পৈতৃক ভিটে'র কথা শুনে পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন জানতে ইচ্ছে করল। সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের ইতিহাস, নানা পরিবারের ইতিহাস, বংশপঞ্জি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 'ভবদাশে'র বংশ বলে গৈলার বহু পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়, তবে তিনি কবে কোথায় ছিলেন সঠিক জানা নেই, মতে অনৈক্য আছে। আদি পুরুষ বলে আমরা মানি এই বংশের ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রকে। ইনি ছিলেন সংস্কৃতের বিখ্যাত পণ্ডিত, ''কলাপ ব্যাকরণের 'কাতন্ত পরিশিষ্ট' নামক প্রসিদ্ধ টিকা রচয়িতা।''[১] কথিত আছে যে, উনি বিক্রমপুর থেকে গৈলা এসেছিলেন কোনো টোলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য, সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি;[২] এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও মনে হয় চারশো-সাড়ে চারশো বছর আগে গৈলা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের বাড়িকে বলা হতো কবিরাজবাড়ি, বিভিন্ন প্রজন্মের সন্তানাদি সেখানেই থাকতেন। 'কবীন্দ্র হইতে নিম্ন চতুর্থ পুরুষ রামেশ্বর ও তাঁর ভাই হরিনারায়ণ কবিরাজবাড়ি হইতে এই বাড়িতে (বকশীবাড়িতে) প্রথম আসেন। রামেশ্বরের অধস্তন পুরুষ গৌরকিশোর গৌরনদি থানায় 'বকশী' ছিলেন এবং তদবধি এই বাড়ি 'বকশীবাড়ি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।'[৩] বিংশ শতাব্দীতে 'ভিত' ছাড়া রামেশ্বর দাশের বাড়ির কিছু অবশিষ্ট ছিল না, একেই 'পৈতৃক ভিটে' বলা হতো।

গৈলার কথা লিখছি, সে গৈলা ঠিক কোথায়? বরিশাল শহর থেকে উত্তর-পশ্চিমে ছাব্বিশ মাইল দূরে বললে দিশা দেখানো হয়, অনন্যতা বোঝানো যায় না। ছবির মতো গ্রামের মানচিত্র এঁকেছেন *মনসামঙ্গল* কাব্যের রচয়িতা, কবি বিজয় গুপ্ত, ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের বোন রুক্মিণী দেবীর সন্তান।

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘন্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥[৪]

'ফুলশ্রী', ভিন্নমতে 'ফুল্লশ্রী' ছিল গৈলার পাশের মৌজা, এতই সংলগ্ন যে এক পা গৈলাতে, অপরটি কখন ফুল্লশ্রীতে পড়ল বোঝা সম্ভব নয়। কাব্য করতে চাইলে বলতে হয়, 'একই বৃন্তে দুটি ফুল'। 'গৈলাকে বাদ দিয়ে যেমন ফুল্লশ্রীর ইতিহাস রচিত হতে পারে না, ঠিক তেমনি ফুল্লশ্রীকে বাদ দিয়েও এককভাবে গৈলার ইতিহাসও রচনা করা যায় না।'[৫]

কারা থাকেন এ গ্রামে? *মনসামঙ্গলে* আছে,

চারি বেদধারি তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বাস নিজ শাস্ত্রেতে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বাস তথা লিখনের সুর।
অন্য জাতি বাস নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় ॥[৬]

'অন্য জাতি' শুধু শাস্ত্রে কেন, ছিলেন 'কর্মে সুচতুর'। তাঁরা ছিলেন (নামে) মালাকার, কর্মকার, কুম্ভকার, গোয়ালা, ধোপা, কাহার, কামার, রজক, আরো নানা পেশার মানুষ। কবির সময়ের পর পেশার বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হয়েছে, যে-কোনো সমাজ ও তার আর্থিক পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিবিধ কর্মে সুচতুর মানুষ। হিন্দু ছাড়া অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসীরা কবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছেন সঠিক জানা নেই, তবে অনুমান করা হয় ষোড়শ শতাব্দীতে গৈলাতে মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসীদের বসতি ছিল। খ্রিষ্টীয় ধর্মীয়রা আসেন কিছু পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসেন ব্রাহ্মরা। এই সময়ে গ্রামের কয়েকজন সত্যধর্মে দীক্ষিত হন।

ফুল্লশ্রীর রাস্তার পাশে মসজিদ ছিল, গ্রামের এক ভজনগৃহে খ্রিষ্টান ধর্মীয়রা রবিবারের উপাসনা ও ভজন গান করতেন। ধর্মীয় বিরোধ গৈলাতে কখনো হয়নি, আজ অবধি নয়।

গৈলাকে জলভূমি বলা হয় — দুই নদীর মাঝে খাল-বিল-দীঘিতে ভরা একটি ভূখণ্ড। জলের জন্য গ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য আলাদা। কত রকমের গাছ যে ছিল, নারকেল, সুপুরি, বাঁশবন সবার মনে আসে, ছিল তাল, অশোক, পলাশ, বকুল, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, চালতা, বেল, কলা, কামরাঙ্গা, করমচা — তালিকা শেষ হয় না। ফুল নানা রকম — জবা, অপরাজিতা, কাঞ্চন, গাঁদা, অতশী, গন্ধরাজ, বেশিরভাগ পুজোর ফুল। গ্রামে কখনো থাকিনি, বাবার কাছে শোনা কথা — তবু মনেপ্রাণে আমি গৈলার। শুষ্ক বরোদাতে নারকেল, জাম, কলা, কামরাঙা, করমচার যত্ন নিই। লাল করমচায় গাছ নুয়ে পড়ে, কামরাঙাতে পাখি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠোকর মারে, আমার কেমন যেন দেশের ছোঁয়া লাগে।

শহরে থেকেছি, গ্রামের বিধিব্যবস্থা জানা নেই। বাড়ি সম্বন্ধে আবছা ধারণা হয়েছিল। কিন্তু দালানকোঠা কীভাবে তৈরি হতো, কতটা যৌথ, কতটা ব্যক্তিগত, বুঝতে সময় লেগেছে। বিভিন্ন পরিবার থাকতেন এক 'বাড়ি'তে, কিন্তু তা একটি দালান বা যৌথ সংসার নয়, বাড়ি অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের সংলগ্ন বাসস্থান, নিকট আত্মীয়দের 'পাড়া'। বকশীবাড়ির মতো বহু বাড়ি আছে, দাশের বাড়ি, রামনাথ দাশের বাড়ি, শিবাই দাশের বাড়ি — সূত্র ষোড়শ শতাব্দীর দুই ভাই ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র ও ভাই রামচন্দ্র দাশ। জাতের ব্যাপার নেই, কলহ স্থায়ী হয় না, বাড়ি ছিল এক শাখার আত্মীয়দের নিকটে থাকবার সুব্যবস্থা। যখন পরিবার বেশি বিস্তৃত হয়ে যেত, কেউ ভিন্ন জায়গায় গিয়ে আস্তানা গাড়তেন। আদি দুই ভাইয়ের শাখা-প্রশাখা গৈলা গ্রামজুড়ে। 'দীঘি-পুকুর গাছপালা ঘেরা বিরাট এলাকা জুড়ে একই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বসবাস ছিল ছড়িয়ে। আজকের মত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বসবাস ছিল না তখন', লিখছেন গৈলার কালিপদ সেন।[৭]

অন্যান্য ব্যক্তিগত কাহিনির মতো গ্রামের কথাও নিজেদের বাড়ির উদাহরণ দিয়ে জানাই। 'গ্রামের পূর্ব-উত্তর প্রান্তে এই বাড়িটি (বকশীবাড়ি) তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে বা হাউলিতে পৃথক চণ্ডীমণ্ডপ।'[৮] বকশীবাড়ি ছিল বিস্তৃত, এক এক হাউলিতে অনেক দালান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচুর জনসংখ্যা। 'একসময় এখানে অন্তত এক হাজার জনের বসবাস ছিল, বকশীবাড়িতে সবাই শিক্ষিত। স্ত্রী-শিক্ষার চলন ছিল,' বলেছিলেন গৈলার ভৈরব গুপ্তের বাড়ির সুনীল গুপ্ত মহাশয়। শহর থেকে এত ভিন্ন ব্যবস্থা যে আন্দাজ করতে হয়, সে সময়ের কেউ তো নেই। কোনো এক পূর্বপুরুষকে ধরে সোজা শাখার থেকে আসে একটি হাউলি, হাউলির ভেতর বিভিন্ন আত্মীয়ের বিভিন্ন দালান, যেমন ঠাকুর্দামশায়দের দুই ভাইয়ের দুই দালান। যে বাসিন্দারা নিকটাত্মীয়, তাঁদের এক চণ্ডীমণ্ডপ, সাধারণত এক দুর্গাপূজা। অন্য হাউলিতে থাকতেন জ্ঞাতিরা, ভিন্ন চণ্ডীমণ্ডপের। চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে পাড়া বা 'বাড়ি'র নকশা। বকশীবাড়িতে তিনটি শাখা, তিনটি চণ্ডীমণ্ডপ।

কোনো এক হাউলিতে ছিল 'ঘরজামাই'র বাড়ি। ইনি কে, কোন হাউলির, এমনকি কোন প্রজন্মের জানি না, তবে মনে হয় অন্তত তিন পুরুষ আগের। মোট কথা, কোনো একসময় এ বাড়ির এক হাউলির ঘরজামাই এখানে থাকতেন, নাম থেকে গিয়েছিল, নাম আমাদেরও মনে লেগেছিল। তাঁর স্থান ছিল উচ্চ কারণ বিজয়া দশমীতে বিসর্জন, শান্তিজলের পর আলিঙ্গন বা কোলাকুলির অনুষ্ঠান হতো 'ঘরজামাইর' বাড়ির সামনে।[৯] ছবি সামনে আসে, কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবি পরে মুখে হাসি নিয়ে পুরো বকশীবাড়ির পিতা-পুত্র, খুড়া-জেঠা, পিতামহ সবাই একত্র হচ্ছেন ঘরজামাইর আঙিনায়। একে অপরকে শুভেচ্ছা, স্নেহাশীর্বাদ জানাতে।

হাউলির বাসিন্দারা ছিলেন নানা পেশার — কেউ ধনী উকিল যেমন রজনীকান্ত দাশ, কেউ রায়বাহাদুর যেমন শ্রীমন্ত দাশগুপ্ত; আবার অবসরপ্রাপ্ত পার্বতীকুমার, যাঁর ছেলেরা অর্থান্বেষী ছিলেন না, থাকলেও সাধারণ সরকারি চাকরি বা অধ্যাপনা করে ধনী হওয়া বা উপাধি পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়ির তিন ভাগের মধ্যে বিবাদ-সদ্ভাব দুই-ই ছিল। মনে হয় বাবাদের প্রজন্মে সদ্ভাবের পাল্লা ছিল ভারী। জ্ঞাতি দাদা শ্রীমন্ত জেঠা ৫ নং-এ আমাদের পড়শি ছিলেন, যাতায়াত ছিল, সময়ে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। ওঁর ছোট ভাই হরিজেঠা নিজের জেঠামশায়ের মতো ছিলেন।[১০]

বকশীবাড়ির শোভা ছিল বাঁধানো সিঁড়ি ঘাট পরিবেষ্টিত বিশাল দীঘি, একপাশে শিবমন্দির। চতুর্দিকে খোলা সবুজ গাছপালা, দীঘিরপাড়ের দৃশ্য মনোরম, সবুজ, শীতল। বয়স্করা এখানে আসতেন শান্তিতে পূজা পাঠ, প্রার্থনা করতে, মহিলারা শিবমন্দিরে পুজো দিতে। দীঘি ছাড়া ছিল সাতটি পুকুর, ব্যবহার ভিন্ন। কোনোটা মেয়েদের স্নানের, একটি হয়তো বাসন মাজা, কাপড় কাচার। পুকুরের ব্যবহার সবার, হাউলি দিয়ে চিহ্নিত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পুকুরের যোগ থাকত খালের সঙ্গে, যাতে 'খাল' দিয়ে নদী থেকে মাছ আসে। বকশীবাড়িতে শুধু নয়, এ ব্যবস্থা পুরো গৈলাতে, মাছের অভাব হতো না।

বকশীবাড়ির বংশতালিকা দীর্ঘ; আমাদের কাছে ঠাকুর্দামশায়ের সময় থেকে এর শুরু। ঠাকুর্দামশায় পার্বতীকুমার দাশ 'ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা মহকুমার মুনসেফ কোর্টের সেরেস্তাদার ছিলেন এবং ওখানকার হাই ইংলিশ স্কুল (বর্তমান নাম ভাঙ্গা পাইলট স্কুল) স্থাপন করিয়া (১৮৮৯) বহুকাল তার সেক্রেটারি ছিলেন। ভাঙ্গাবাসীগণ তাঁহাকে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বরাবর স্কুল ছুটি দেওয়া হইত। এমনকি পাকিস্তান হওয়ার পরেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।'[১১]

বহু বছর পরের কথা — এখানেই বলে নিই। বাবা একবার বলেছিলেন ভাঙ্গা স্কুলে তাঁর বাবার নামে কিছু করবার ইচ্ছে, বৃত্তি বা প্রাইজ। দেশবিভাগ হয়ে গিয়েছে বহুকাল, কীভাবে খোঁজখবর নিই, ভেবে উঠতে পারিনি। ২০০২-তে ভাই ও আমি গৈলা যাচ্ছি — পথে ভাঙ্গাতে স্কুল দেখতে গেলাম।

আমাদের আপ্যায়নের কথা লিখে বোঝানো মুশকিল। হঠাৎ মনে হলো ঢাকার মিষ্টি ফিকে। প্রিন্সিপাল বজলুর রহমান মহাশয় ও অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো, বড় ভালো লাগল শিক্ষার প্রতি ওঁদের অনুরাগ, ছাত্রদের প্রতি বাৎসল্য দেখে, আবার আধুনিক জগতে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে কথা বলে। স্কুলের শতবর্ষ ওঁরা বড় করে উদ্‌যাপন করেছিলেন, তাতে পার্বতীকুমারের নাম তো আছেই, নানা প্রাক্তন ছাত্রের লেখা আছে, ভারত থেকে লেখা পাঠিয়েছেন, এমনও আছে। গাড়িতে উঠে বুঝলাম, যে স্বপ্ন দেখে ঠাকুর্দামশায় স্কুল শুরু করেছিলেন সে স্বপ্ন সফল হয়েছে।

ঠাকুর্দামশায় এই স্কুল শুরু করেছিলেন এটা আমাদের বাড়িতে *ঠাকুরমার ঝুলি*র গল্পের মতো — খুব ছোট থেকে শুনেছি। তবে এ কল্পনা নয়, সত্যি ঘটনা। আশ্চর্য হলাম ১৮৮৯-এর স্কুলবাড়ি দেখে, মজবুত ভিত, চওড়া দেয়াল অটুট। ইংরেজি ফ্যাশনের মস্ত দালান — সোজা নয়, গোলাকার হয়ে ঘুরে যায় চারদিকের বারান্দা। বারবার মনে হলো এই বারান্দা দিয়ে কতবার আমার পূর্বপুরুষ হাঁটাচলা করেছেন, হয়তো সামনে থেকে তৈরি করেছেন, এ বংশের মেয়ের কাছে পবিত্র স্থান।

ছেড়ে আসতে মনটা কেমন করল। আমার খাতায় লেখা আছে, 'যতোক্ষণ সম্ভব পেছন ফিরে তাকিয়ে রইলাম, আর তো কখনও দেখব না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঠাকুর্দামশায়ের প্রায় অমর কীর্তি।' আমার মনটা 'না'র দিকে দুলে থাকে, কখনো কি ভেবেছিলাম একবারও দেখব?

তখন কিছু বলিনি, ফিরে এসে প্রিন্সিপাল মশায়কে চিঠি লিখি বাবার ইচ্ছে জানিয়ে। উনি সাদরে রাজি হলেন, আজ দশ বছরের ওপর স্কুলের দুটি ছেলেমেয়ে — যে এসএসসিতে প্রথম হয়, অন্য যে আট ক্লাসে প্রথম হয়, পার্বতীকুমার দাশ প্রাইজ পান। বজলুর রহমান বলেছিলেন স্কুলে তাঁর দুটি সমস্যা, একটি শৃঙ্খলার অভাব, অন্যটি মেয়েরা ছেলেদের থেকে ফল ভালো করছে। এটা মেয়েদের বিরুদ্ধে কথা নয়, ওঁর স্কুলকে আরো ভালো করতে চান। প্রাইজের ছবিতে অনেক সময়ই মেয়েদের দেখি। এ কাজটা সম্ভব হয়েছে গৈলার দাশের বাড়ির অজয় দাশগুপ্ত, ঢাকার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জয়ন্ত কাঞ্জিলাল[১২] এবং স্কুলের উৎসাহের জন্য। ওঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পার্বতীকুমার ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস ছিল না। ওঁর ধর্ম ছিল 'সত্যধর্ম', গুরু : গুরুনাথ সেন। ১৭/১/১৯২৫-এ পুত্র প্রফুল্ল কুমারকে লিখছেন, 'তোমরা মুহূর্তের জন্যও মনে করিও না যে আমি দেবদেবীর উপাসক — নিশ্চয় জানিও আমি সেই অদ্বিতীয়, অনন্ত গুণনিধান ও অনন্ত পিতার উপাসক।' এই ধর্মের মন্ত্র ছিল 'ওম', মহাশূন্যকে উদ্দেশ করে 'ওম' বা 'ওঁ' ধ্বনি উচ্চারণ করা ছিল এঁদের প্রার্থনা। ছেলেদের পড়াশোনা দেখা, নিজে বই পড়া ছাড়া ওঁর সময় কাটত 'ওঁ' মন্ত্র পাঠ করে। বাবার মনে পড়ে, তাঁর বাবা জানালার পাশে বসে বই পড়ছেন, নয়তো 'ওঁ' উচ্চারণ করছেন। শীতে আলোয়ান গায়ে দেওয়া। এমনি মনে হতো সংসার থেকে নির্লিপ্ত, কিন্তু ছেলেদের শিক্ষার প্রতি নজর কড়া। বিকেলে সেজ জেঠা ও বাবা, পিঠাপিঠি ভাই খেলতে যেতেন, সেই জানালা থেকে তাঁদের বাবা রোজ বলতেন, 'Boys, come before dark' — 'ছেলেরা, সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরো।' অমান্য করার প্রশ্ন উঠত না, তাছাড়া সাপখোপ, জল, জঙ্গল — সন্ধ্যার পর বাইরে থাকার ইচ্ছেও হতো না।

বিকেলে উনি দীঘির ঘাটে বসে প্রার্থনা করতেন, সেই 'ওম', কিন্তু মন্দিরের দিকে তাকিয়ে নয়, উলটোদিকের শূন্য বা আকাশের দিকে চেয়ে। উনি সমাজের আচার-বিচার বিশেষ মানতেন না। বাবা বলতেন ঠাকুমা কখনো সিঁদুর পরতেন না, কারণ সিঁদুর পরে স্বামীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করার কোনো যুক্তি ঠাকুর্দামশায় খুঁজে পাননি। সেকালে এ ছিল দুঃসাহস। এঁর ছেলে যুক্তিতর্ক নিয়ে জীবন কাটাবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আর একটি মন্ত্র ঠাকুর্দামশায় জপ করতেন, পরে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রায় প্রতি সপ্তাহে শুনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্ম উপাসনা : ওঁ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং... ।[১৩] গৈলার বাড়িতে কারো জ্বর হলে উনি থার্মোমিটার লাগিয়ে ধীরে ধীরে এক, দুই করে একশ গুনতেন, এক মিনিট হয়ে যেত, থার্মোমিটার দেখতেন। পাশে এসে 'ত্বমেকং...' মন্ত্র পাঠ করতেন। পিতা থেকে পুত্র, পুত্র থেকে পুত্র-কন্যা, মন্ত্র পাঠের ধারা বরোদা, কেমব্রিজে চালু!

দীঘির দিক থেকে এলে প্রথমে বিচারঘর, তারপর আমাদের বাড়ি, যে বাড়ি আমাদের পিতামহ কর্মজীবনে বানিয়েছিলেন। পাকা দালান, ছোট বলা যায় না। তিনটে বড় বড় ঘর, সামনে বারান্দা, পেছনের দিকে দুটি ছোট ঘর, প্রসবের জন্য বা অসুস্থ কারো নিরিবিলি থাকবার জন্য। একবার মেজ জেঠার অদ্ভুত ব্যাধি হয়েছিল — সারা গায়ে, মুখে লাল ফোস্কা, জ্বলুনি, যন্ত্রণা। কবিরাজমশায় ওষুধ দিয়ে বললেন, সূর্যের আলো থেকে দূরে, অন্ধকার ঘরে তিনদিন থাকতে হবে; মাছ, ডিম খাওয়া বন্ধ। আলো যেন কোনোমতে ওঁকে স্পর্শ না করে। একটি ছোট ঘরকে অন্ধকূপ করে তিনদিন কাটালেন, সুস্থ হয়ে গেলেন।

বড় দালানের লাগোয়া ইংরেজি 'এল'-এর মতো লম্বা রান্নাঘর — রান্না, খাওয়া-দাওয়া এখানে। মেঝেতে বসে কাঁসার থালাতে হুল্লোড় করে মায়ের হাতের রান্না, ছোট বয়সে এর থেকে মোলায়েম কী হতে পারে? নিরামিষ ঘর লাগোয়া — বড় পিসিমার জন্য। পেছনে পুকুর, এই পুকুর থেকে খাল-বিল পার করে গলুইয়ের নৌকাতে যাওয়া যেত অন্যান্য গ্রামে বা গৌরনদীতে, স্টিমার, গয়নার নৌকো, পানসির নৌকো ধরতে।

শহরে কি গ্রামে, মধ্যবিত্ত পরিবার পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। গৈলাতে বাবারা ভাইবোনেরা ছাড়া ছিলেন ঠাকুমার ভাইপো খোকা ও দুই দৌহিত্রী — ছোট পিসিমার দুই মেয়ে, সুরোবালা, আমাদের বড়দি, লাবণ্যবালা, আমাদের সুন্দরদি। দৌহিত্রীদের মামাবাড়িতে বড় হওয়ার প্রথা ছিল বরিশালে। আত্মীয়স্বজন আরো থাকতেন, নাম মনে নেই। অর্থসংকট ছিল। ভাই পার্থ লিখেছে, 'গৈলাতে বাবারা গরিব ছিলেন, তবে ক্ষুধা মিটতো। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে সরকারি চাকুরিতে মাইনে যে অত্যন্ত কম ছিল এবং চাকরি থেকে অবসর নিলে পেন্সন প্রায় না থাকার মতো, তা নানা রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি। পরিবার বড় হতো অর্থের অসংকুলান এড়ানো যেত না। তবু তো গ্রামে থাকায় খোলা হাওয়া ও তাজা মাছ-ভাত-সবজি খেয়ে বাবাদের স্বাস্থ্য ভালো ছিল, শহরে সে সুবিধে ছিল না।'[১৪]

এছাড়া ছিল নিষ্পাপ, নির্মল আনন্দের জীবন। মনে পড়ে মেজ জেঠার চিঠি, 'গৈলাতে আমাদের ছোটবেলা কি আনন্দে কেটেছে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝাতে পারবো না। দিদি ছিলেন মায়েরও বাড়া, এমন আগলে রাখতেন আমাদের।' ১৯৭৬-এ বাবাকে লিখছেন, 'তুমি এখন কতো বড়ো হয়েছো, কতো নাম করেছো, তুমি আমাদের গর্ব — আমার কিন্তু সেই ছোট 'অমি'কে মনে পড়ে যে সারাক্ষণ ছোটাছুটি করে দুষ্টুমি করতো (playing pranks), আবার চট্ করে মায়ের কাছে গিয়ে বসে পড়তো।'

বাবা দুষ্টু ছিলেন অবিশ্বাস্য, তবে একাধিক সূত্রে এটা শুনেছি। দুষ্টুমি ছিল এ-মাঠ থেকে ও-মাঠে দৌড়াদৌড়ি করা, এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে সাঁতার কাটতে যাওয়া, আবার ভয়ে পালিয়ে আসা — একটু বড় হলে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে হাডুডু বা যে-কোনো গোলাকার জিনিস, এমনকি জাম্বুরা নিয়ে বল খেলা। বাড়িতে শখ ছিল কাঁচা আম বা চালতে ছেঁচে নুন-লঙ্কা দিয়ে রসিয়ে খাওয়া বা জাম, বরইতে নুন দিয়ে বন্ধ বাসনে ঝাঁকিয়ে খাওয়া, যা আমরা ঢাকাতেও করতাম। আম, চালতা, জাম আনা বাবার কাজ, মাখানো ব্যাপারটা করতেন বোনঝিরা, সুন্দরদি এক বছরের ছোট, বড়দি চার বছরের বড়। বড়দি ছিলেন বাবার খেলার সাথি, আবার 'অমি'কে অভিভাবকের মতো আগলে রাখতেন।

দিদিরা ব্রত করতেন, ভোরবেলা পুকুরপাড়ে যেতে হতো, তখন বাবা চলনদার। একটি ব্রতর কথা বলতেন, 'থোকের' ব্রত বা মাঘমণ্ডলের ব্রত বালিকাদের জন্য। লম্বা বাঁশের কাঠির মাথায় দূর্বাঘাসের গুচ্ছ লাগিয়ে নানান ফুলের মালা গেঁথে বাঁশের ওপর জড়িয়ে পুরো কাঠিটি সাজানো হতো। মাঘ মাসের শীতে কাক-পক্ষী ডাকার আগে মেয়েরা সুসজ্জিত কাঠি বা 'থোক' নিয়ে নিজেদের পুকুরের ঘাটে যেতেন। কাঠি নিচু করে দূর্বাগুচ্ছ জলে ছুঁইয়ে সে জল গায়ে ছিটিয়ে সুর করে ছড়া বলতেন।

যে জল ছোঁয় নাই কাগে আর বগে
সেই জল ছুঁইলাম মোরা দূর্বার আগে।[১৫]

বকশীবাড়ির দিদিরা সূর্যদেবতাকে আহ্বান করে আরেকটি ব্রত রাখতেন। একইভাবে বাঁশের লাঠি ফুলের মালা ঘিরিয়ে সাজানো, তবে লাঠির মাপ ছোট, দূর্বাঘাস নেই। পুকুরপাড়ে পূর্বদিকে তাকিয়ে সুসজ্জিত লাঠি হাতে গাইতেন,

ওঠো রে সুর্য্য উদয় দিয়া
তেলির ঘরের কোন ছুইয়া
তেলির মাইয়া বড়ো সেয়ান
তেল জুগায় বিয়ান বিয়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠো রে সুর্য্য উদয় দিয়া
মালির ঘরের কোন ছুইয়া
মালির মাইয়া বড়ো সেয়ান
ফুল জুগায় বিয়ান বিয়ান।

এভাবে প্রার্থনা চলতে থাকে — সূর্যদেবতা যেন বিভিন্ন পেশার মানুষের ঘরে তাঁর কিরণ ছড়িয়ে যান।

গৈলার কথা লিখছেন লাবণ্যবালা, ১৯৮৬ — বিজয়ার পর 'বিবির মেয়ে তার মামাবাড়ির যত্ন পায় শুনে বড় ভালো লাগলো। ভালো মামাবাড়ি, মামাবাড়ির আদর পাওয়া কী জিনিস আমরা জানি। গৈলার সে দিনগুলি ভুলতে পারি না — দিদিমা, দাদামহাশয়ের স্নেহ। আজও দাদামশায়ের হাতে লেখা চিঠি আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে।' বড়দি এ সময় স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলায়, অতীত নিয়ে ভাবছেন। বয়স ৮৭ বছর। লিখতে কষ্ট হয়, আঁকাবাঁকা অক্ষরে বাবাকে লিখছেন, 'স্নেহের অমি, কতদিন যেন তোমাকে দেখি না — আর কি কখনো দেখা হবে? তোমার চিঠি পেলেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে, আমার বড় আদরের কুট্টি সোনা অমির কথা মনে পড়ে। কোথায় গেল মামাবাড়ির সেই দিনগুলি? যখন জলের সময় কাপড় দিয়ে মাছ ধরতাম। সেই গুঁড়ি গুঁড়ি মাছের স্বাদ বড় রুই-কাৎলাতে থাকত না।' গ্রামের জীবনের ছবি এর থেকে সুন্দর কী হতে পারে?

খাওয়া-দাওয়া প্রায় বাড়িতেই ছিল সাধারণ, যেমন স্বল্প আয়ের গৃহস্থদের বাড়িতে হয়। ঠাকুমার সংসারেও তাই। দুবেলার জলখাবারে থাকত খই, মুড়ি, এক ফোঁটা শর্ষের তেল, চিড়ে, নারকেল কুরো, কলা, হয়তো নাড়ু, মোয়া, গুড়। রান্নাঘরে বসে বাটিতে বা বেতের ধামাইতে খাওয়া হতো। ছেলেরা দৌড়ে বাইরে খেলতে যেতে চাইলে গামছার খুঁটেও নিতে পারতেন। ঠাকুমা, বড় পিসিমার নিয়মে বাবারা তা করতে পারতেন না। লোভনীয় ছিল পান্তাভাত, রাতের ভাতে জল দেওয়া ভাত। তাকে কী দিয়ে মাখা হতো জানি না, একটু বেলা হলে রান্নাঘরে মহিলারা জলখাবার করে খেতেন, স্কুল না থাকলে বাবাদের চোখ থাকত এর ওপর, মায়ের কাছ ঘেঁষে বসে পান্তাভাত খাওয়া। পোড়া শুকনো লঙ্কা দেওয়াতে স্বাদ, সুগন্ধ দুই-ই ছিল অপূর্ব। বর্ধমানের বাড়িতে এ-পর্ব রোজ হতো, আমি 'উষ্ট' নিয়ে ঝগড়া করে নির্লজ্জের মতো রান্নাঘরে মেজমার পাশে বসতাম, সুস্বাদু 'মাখার' এক 'দলা' পাবার জন্য!

দুপুর বা রাতে যেমন হয় — ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি। পুকুরে মাছ পাওয়া যেত, প্রতি বাড়িতেই কিছু তরকারি হতো, খুব একটা অসুবিধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো না। বরিশালের রান্নায় নানা রকমের ডাল হতো — বিভিন্ন তরকারি দিয়ে ডাল। ডাল খাওয়া হতো শেষে, মাছেরও পরে। ছোটদের দুধের বরাদ্দ ছিল, পায়েস জন্মদিনে, শুভদিনে — নিয়ম রক্ষায় মতো। পিঠে-সংক্রান্তিতে সম্ভব হলে কয়েক রকমের পিঠে, অন্তত একরকম — ওই, নিয়মরক্ষা। কালীপুজোর দিন পাঁঠার মাংস রান্নার নিয়ম ছিল, সেটা কতটা পালন করতে পারতেন ঠাকুমা, জানি না। গৈলার রান্নার কী বিশেষত্ব সে সম্পর্কে কিছু শুনিনি, তবে বেতের কচি ডগা ভাতে সেদ্ধ করে নুন তেল দিয়ে বা শুক্তো তৈরি করলে উপাদেয় হতো শুনেছি। চাইনিজ খাওয়াতে 'কচি বেত' বা 'ব্যাম্বু শুট' খেয়ে থাকি, ভারতীয় রান্নাতে ব্যবহার এক গৈলাতেই দেখছি।

সাধারণভাবে শুক্তো-চচ্চড়ি, তাজা মাছের ঝোল খেয়ে স্বাস্থ্যের লোকসান হয়নি, পোলাও-মাংস-লুচি না পাওয়ার খেদ ছিল না। মা-বাবা-দিদিকে ঘিরে এ বাড়িতে ছিল একতা।

কর্মজীবনে ঠাকুর্দামশায় গৈলার বাইরে থাকতেন, জেঠামশায়ও তাই। দেশের বাড়িতে মহিলা ছোটদের নিয়ে একা। অভিভাবকের প্রয়োজন থাকে, কবিরাজ মশায়কে ডাকা, ওষুধ আনা, ডাকঘরে যাওয়া, মাসকাবারি জিনিসপত্র আনা, কে করেন? বাইরের কাজের ব্যবস্থা করবার জন্য কাউকে চাই। এসবের জন্য ছিলেন 'বাড়ির জেঠামশায়'। তাঁকে এভাবেই ডাকা হতো। আপন নন, হয়তো জ্ঞাতি ভাই। যতদিন গৈলার সংসার ছিল 'বাড়ির জেঠামশায়' সংসারের নানা প্রয়োজনে লক্ষ রেখেছেন। ঘরকন্না সুষ্ঠুভাবে চালানোর কী চমৎকার ব্যবস্থা। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে নামটা — 'বাড়ির জেঠামশায়', তাঁর কাজের পরিধি তো বাড়ি, বকশীবাড়ি, গৈলা গ্রাম!

* * *

আমাদের পরিবারের কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি 'খোকাকাকা'র কথা না লিখি। বাবাদের পঞ্চম ভাই, সবচেয়ে ছোট, খোকা (ভালো নাম জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি, 'খোকাকাকা' বললে একনাগাড়ে সবাই চিনে নিতেন) ছিলেন বাবাদের মামাতো ভাই, বাড়ি উজিরপুর। ছোটবেলায় মাকে হারান, বাবা আসামে কোনো চা-বাগানে ডাক্তার, ক্বচিৎ কদাচিৎ দেশে আসতেন। সবার স্নেহের, আদরের প্রিয় ছোটভাই গৈলাতে পিসিমা, অর্থাৎ আমার ঠাকুমার কাছে থাকতে ভালোবাসতেন, এখানেই বড় হয়েছেন। সদা হাসিমুখ, উনি আলোর ফুলকি ছড়িয়ে ঘরে ঢুকতেন। ইংরেজি ভুল লিখলে রাগ করতেন, তাছাড়া কখনো মেজাজ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিনি। গৈলা, বরিশাল, ঢাকা, বর্ধমান, কাশী, কলকাতা — সব জায়গা আনন্দে ভরে দিতেন।

শুনেছি, ছোটবেলায় ওঁর এক বিশেষ প্রতিভা ছিল — হিজিবিজি বক্তৃতা দেওয়া। গৈলাতে থিয়েটারের শখ ছিল প্রচুর, বকশীবাড়ির কোনো চত্বরে স্টেজ বেঁধে থিয়েটার করা হতো, যেমন অন্যান্য বাড়িতেও হতো। গ্রামের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু — দর্শক ও শ্রোতা। খোকাকাকা ছোট, সবেমাত্র অক্ষর পরিচয় হয়েছে, স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ অভিনেতা বা বক্তার মতো, কিছুটা অঙ্গভঙ্গি করে ভাষণ দিতেন। পুরোটা হিজিবিজি, একটি বাক্যও নেই, আ-কার ই-কারসহ বাংলা হরফ যেমন মনে আসে (এর রিহার্সাল হতো না) হাত নাড়িয়ে আওয়াজ উঁচু-নিচু করে এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতেন মনে হতো এক বিশাল পণ্ডিত বা নেতা ভাষণ দিচ্ছেন বা এক ছোটখাটো তালপাতার সেপাই বিরাট ফৌজকে প্রেরণা, উৎসাহ দিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কাকার অভিনয় জনপ্রিয় ছিল।

পিসির বাড়িতে আদরযত্নে থাকলেও ওঁর জীবনে কোনো এক জায়গায় শূন্যতা ছিল। হঠাৎ একদিন বাড়িতে একটি চিঠি পাওয়া গেল, 'আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, সেই খোঁজে বাহির হইলাম।' গৈলায় চিন্তার বিরাম নেই, বরিশাল, উজিরপুর, গোপালগঞ্জ (যেখানে ওঁদের দিদি থাকতেন) ভাইদের পাঠানো হলো, খবর পাওয়া গেল না। সবাই উদ্বিগ্ন, ভীত, পুলিশে খবর দেবেন — এমন সময় কাকা ফিরে এলেন, 'দূর, আর ভালো লাগল না, একা একা কতদিন ঘোরা যায়?' তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, জানি না — যখনই জিজ্ঞাসা করেছি, জবাব ছিল, 'আরে ওসব কথা ছাড়ো না।' কোনো একসময়ে চা-বাগানে ওঁর বাবা খুন হয়েছিলেন, কাকার দিশাহারা হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়।

বরিশাল থেকে কলেজ পাশ করলেন, ইন্ডিয়ান টি-বোর্ডে চাকরি নিয়ে কর্মজীবন এ কাজেই কাটিয়ে দিলেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতেন, সেটা ওঁর খুব ভালো লাগত। স্পষ্টবাদী, সত্যির এদিক-ওদিক হতে পারে না, বলতেন, 'জানো, আমি সত্যি কথা বলি, যুক্তি দিয়ে কথা বলি, সেটা সবাই ঝগড়া মনে করেন, তাই আমার আর প্রমোশন হলো না।' তাতে আক্ষেপ ছিল না, বরং এই কর্মনিষ্ঠ মানুষটির টি-বোর্ডের প্রতি মনের যোগ ছিল। কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বলতেন, 'এই দ্যাখো, আমাদের দোকান — এক কাপ চা খাবা নাকি?'

আমরা যখন কাশীতে উনি মধ্য প্রদেশ বা উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। প্রায় ছুটিতে আমাদের কাছে আসতেন, মেয়েরা ছোট — স্কুল কামাই করলে ক্ষতি হতো না। ওঁর ভাষায়, 'বুঝলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তিবৌদি, পকেট খালি, ঠিক করলাম অমিয়দা, বৌদির কাছে কিছুদিন কাটিয়ে আসি।' বাড়ি হৈ হল্লোড়, আনন্দে ভরে যেত।

'পকেট খালির' একটি উদাহরণ ওঁর নিষ্পাপ মনের পরিচয় দেয়। নাগপুরে কাজ করেন, এক ছুটিতে বললেন, 'নাগপুরে ভারি সুন্দর শাড়ি পাওয়া যায়, তোমার জন্য পাঠাব।' বারো বছরের মেয়ের শাড়ি পাওয়ার আশায় আনন্দ বোঝা যায়। কিছুদিন পর নাগপুর থেকে পার্সেল এলো, আমার শাড়ি, কচি কলাপাতা রঙের ওপর হালকা সোনালি জড়ির পাড়। আমার নজর চতুর্দিকে, দেখি মা পোস্টম্যানকে দশ টাকা দিলেন। অমনি প্রশ্ন, 'কাকা শাড়ি পাঠালেন, তুমি টাকা দিতে গেলে কেন?' মা কিছু বুঝ দিলেন। আসলে সেই আর্থিক টানাপড়েন, দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কী করে দেবেন? মায়ের খুব কাছের মানুষ ছিলেন, নিশ্চয়ই বুঝিয়ে গিয়েছিলেন COD করে শাড়ি পাঠাবেন। এমন শিশুসুলভ, প্রাণখোলা মানুষ দুর্লভ। দুর্লভ মানুষটির মতো দুর্লভ উপহার, শাড়িটি আমার কাছে সুরক্ষিত আছে।

পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন, ইংরেজি খুব ভালো জানতেন। চল্লিশের দশকে ভালো ইংরেজি জানা ছিল প্রকৃত শিক্ষা, আমাকে ভালো করে ইংরেজি শিখতেই হবে। কিন্তু ব্যাপারটি ছিল ভয়াবহ। কাশীতে আমার ইংরেজি শিক্ষার ভার নিতেন, কোনো এক বই নিয়ে বলতেন 'এই চারটে পাতা মুখস্থ করো। কোনো ভাষা শিখতে হলে মুখস্থ হচ্ছে পথ।' একদিন পর পরীক্ষা। একবার দিলেন লিও টলস্টয়ের *Twenty-three Tales*-এর চার পাতা, আমার দ্বারা হলো না, উনি রায় দিলেন, 'না অমিয়দা, এই মেয়ের ইংরেজি শেখা হবে না।' পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ইংরেজিই যদি শেখাবে তো কোনো ইংরেজের লেখা না দিয়ে অনুবাদ কেন?' জবাব 'অনুবাদটা খুব ভালো এক ইংরেজের করা।' এরপর ধরতেন আমার বাংলা লেখার অস্পষ্টতা। শান্তিনিকেতন ফিরে যাব ছুটির পর, কী কী চাই তার ফর্দ লিখেছি; গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি চাইছ? শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজের কাপড় না কোনো ব্লাউজের সঙ্গে মিলিয়ে শাড়ি? যদি দ্বিতীয়টা চাও, ঠিক হবে না। তোমার লেখা স্পষ্ট করে বলে না।' ঠিক ধরেছিলেন, বাংলা শেখাবার সময় হলো না, তবে ওঁর তত্ত্বাবধানে ইংরেজিটা কিছুটা দখলে এসেছে।

কাকার সংসারে অর্থসংকট স্বাভাবিক। সরকারি চাকরি, প্রমোশন হলো না, মুদ্রাস্ফীতির শেষ নেই, চার মেয়ে নিয়ে সংসার ছোট নয়। তবু সংসার ছিল বাদবিসম্বাদহীন সুখী। দীর্ঘস্থায়ী হলো না, হঠাৎ বড় মেয়ে, সুনন্দা মারা গেল, সম্ভবত ১৯৪৯-এ। কাশীতে টেলিগ্রাম এলো দিন দুই পর, আমাদের বাড়িতেও শোকছায়া। বাবা ওঁদের কাছে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন (কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতেন মনে নেই), রাতে দরজায় কড়া নাড়া — খুলে দেখি খোকাকাকা, শোক-দুঃখ সহ্য না করতে পেরে ছুটে এসেছেন দাদা-বৌদির কাছে। দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর ভেঙে পড়া চেহারা আজো চোখে ভাসে।

সন্তান হারানোর দুঃখ ভোলা যায় না — ওঁরাও ভোলেননি। সময়ে সামলে উঠে জীবনকে জোড়া লাগাতে চেষ্টা করেছেন, প্রায় স্বাভাবিকভাবে থেকেছেন তবে সেটা 'প্রায়'।

গৈলা-বরিশালের জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, যেমন থাকতেন সে সময়কার বহু ছেলেমেয়ে। বরিশালের বিখ্যাত গান্ধিবাদী সতীন সেনের বোনকে বিয়ে করলেও গান্ধিবাদী হননি। স্পর্শকাতর মানুষ, জীবনের অভিজ্ঞতা বামপন্থার দিকে টেনে নিয়েছিল, আশ্চর্যের কিছু নয়। ষাটের দশকে বুঝতে পারলাম শুধু বামপন্থী নন, কাকা ছিলেন নকশাল আন্দোলনের সমর্থক। অবাক হইনি।

* * *

এককথায় যদি গৈলা গ্রামের প্রেরণা, লক্ষ্য বলতে হয় তা হচ্ছে 'শিক্ষা'। সংস্কৃত শিক্ষা বহু শতাব্দী ধরে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি নজর। জলের দেশ থেকে স্থল কলকাতা যাওয়া কঠিন, সময়সাপেক্ষ, গৈলাবাসী তাও সেখানে গিয়ে কলেজে পড়তেন — ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতেন। বাড়ি থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে মেধাবীরা বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসতেন। টোল, পাঠশালা গ্রামে বহুকালের, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুযায়ী স্কুল ছিল না; ১৮৯৩-তে সেই ফাঁক পূরণ করলেন রজনীকান্ত দাশ, দুর্গাচরণ পিপলাই ও বন্ধুরা। বিভিন্ন বাড়ি থেকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হলো — শুরু হলো স্কুল। কয়েক বছরে ছাত্রসংখ্যা এত বেড়ে গেল যে আলাদা জমি নিয়ে নতুন স্কুলবাড়ি বানানো হলো; আজো সেখানেই আছে, বাবারা যেসব ঘরে ক্লাস করেছেন, সেভাবেই আসল বাড়িটি আছে। এদিক-ওদিক নতুন শাখা হয়েছে। সামনে খোলা মাঠ, ঢুকলেই ইচ্ছে করে ছুটে বেড়াই।

স্কুলের পরিচালনা রজনীকান্ত দাশ শক্ত হাতে করেছেন প্রথম ক'বছর, বয়স হওয়ার পর ১৯০৭-এ অন্য হাতে তুলে দেন। মাইনে বেশি দিতে পারতেন না। নিয়মিত দিতে পারবেন কি না তার নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু শিক্ষকতা করার নেশা অনেকের মধ্যে থাকে, তাঁরা যোগদান করেছিলেন। স্কুল এবং গৈলার পরম সৌভাগ্য যে মজুমদারবাড়ির কৈলাস চন্দ্র সেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারি চাকরি, নিয়মিত মাইনে এবং ক্রমিক পদোন্নতির মায়া ছেড়ে গৈলা স্কুলের প্রিন্সিপাল হতে রাজি হলেন। প্রথমদিকে তো মাইনে কত পাবেন, আদৌ পাবেন কি না তার ঠিক ছিল না। সাঁইত্রিশ বছর তিনি এই পদে ছিলেন, যে পোক্ত ভিত্তি বেঁধেছিলেন, আজো এদিক-ওদিক হয়নি। 'ছাত্রদের প্রতি গভীর স্নেহ অথচ কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতা দ্বারা এই স্কুলের তথা গ্রামের যে উপকার তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।'[১৬] ওঁকে বলা হতো 'বাঘা মাস্টার' — দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করতে জানতেন। পড়ানোর ধরন আলাদা ছিল, শুধু সিলেবাস দেখে পড়ানো নয় — ভালো বই পড়ে আলোচনা করে ছাত্রদের কৌতূহল বাড়াতেন, চিন্তা করতে শেখাতেন। পরীক্ষার পড়া তো ছিলই। বাবা বলতেন শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি একাগ্রতার জন্য তিনি দুজনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ, কৈলাস সেন ও লাওনেল রবিন্স। কৌতূহল, আগ্রহ, নিজের মতো করে চিন্তা করা, সবকিছুর প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রথম জীবনে কৈলাস সেন মহাশয়ের কাছে।

গৈলা স্কুল যিনি গড়ে তুলেছিলেন, সেই কৈলাস সেনের মৃত্যুর পর স্কুলের প্রাঙ্গণে একটি স্মৃতিসৌধ বানানো হয়েছে; তাতে লেখা 'Death divides, memory lingers.' 'মৃত্যু, কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, স্মৃতি চিরকাল থেকে যায়।' দাশের বাড়ির অজয় দাশগুপ্ত বলেছিলেন, এটা বাবার লেখা। বাবার মতো অগুনতি ছাত্র 'বাঘা মাস্টারমশাই'র স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রেখেছেন।

গ্রামে বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন গোলারপাড়ের গুপ্তবাড়ির ননীগোপাল গুপ্ত, যাঁকে আমরা ননীমামা বলে ডাকতাম। প্রথম দিন থেকে ওঁরা স্কুলে একসঙ্গে পড়তেন, খেলাধুলা, পড়াশোনা সব একসঙ্গে। ননীমামা গান করতেন, একটু বড় হওয়ার পর স্কুলে, বাইরে, অনুষ্ঠানে উনি গাইতেন, বাবা সঙ্গে তবলা বাজাতেন। বরিশালে গান-বাজনার শখ-চল ছিল, এখনো আছে। গান-বাজনা, বই পড়া ছাড়া এঁদের বন্ধুত্ব ছিল 'আলোচনা' ঘিরে। সেই যে ছেলেবেলায় আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাতে জীবনদর্শনও থাকত, ননীমামার মৃত্যু অবধি বন্ধ হয়নি। রাজনীতি, সংসার, বৃহত্তর পৃথিবী, দৈনন্দিন সমস্যা, আশা-নিরাশা, গ্রামের কথা, পরিবারের কথা — এ নিয়ে ননীমামার কলকাতার বাসায় দুজনে খাটে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। মামা কলকাতায় এক কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, হরিনাথ দে রোডে থাকতেন। বাবা কলকাতা এলে এমন হয়নি যে একটি বিকেল ও-বাড়িতে কাটাননি। আমরা দুই পরিবার খুব কাছের ছিলাম, কলেজজীবনে কত বিকেলে ও-বাড়ির ইন্দিরা মামিমার হাতের নিমকি-শিঙ্গাড়া খেয়েছি। হোস্টেলজীবনে ভালো রান্নার সুগন্ধ দূর থেকে পাওয়া যায় — পার্ক সার্কাস থেকে হরিনাথ দে রোড কতই বা দূর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঁর হাতের নিমকি এত সুস্বাদু ছিল যে আমার কন্যা ওঁকে ডাকত 'নিমকি দিদিমা'।

ননীমামার ছোট বোন বেলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার সেজ জেঠামশায়ের, কাছের সম্পর্কের কারণ সেটা নয়, বিয়ে বহু বছর পরে। গৈলাতে এ-বাড়ি ও-বাড়ি বিয়ে হতো অনেক সময়। হিন্দুদের মধ্যে সাতপুরুষ না কেটে গেলে বিয়ে হয় না, আমাদের পূর্বপুরুষ ত্রিলোচন দাশরা দুই ভাই তো বহু পুরুষ আগের, তাই গোলারপাড়ের গুপ্তবাড়ির মেয়ে বকশীবাড়ির বউ, ছেলে কালুপাড়া সেনদের বাড়ির জামাই — এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমার জেনে খটকা লেগেছিল, প্যাটেল সমাজে একই গ্রামের ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে না, তাদের এক পরিবারের মনে করা হয়। নিয়ম লঙ্ঘন করতে বিশেষ দেখিনি।

বাবার অন্য বন্ধু ছিলেন ওঁর জেঠতুতো দাদা, টোকানিদা, দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বাবা যেমনই ছটফটে, দাদাটি তেমনই শান্ত, ধীরস্থির। শুধু ভাই বলে বন্ধন নয়, বাবার দিক থেকে ছিল একটি অত্যন্ত খাঁটি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। পড়াশোনায় মন ছিল না, বাড়ির পরিবেশ পছন্দ ছিল না, স্কুল পাশ করে শ্রীশ্রী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধু হয়ে গেলেন। নাম — শ্রী বৈদ্যনাথানন্দ। দেরাদুনের কাছে কোনো আশ্রমে থাকতেন। একজন বিশ্বাসী, অন্যটি সাধুসন্তে পুরো অবিশ্বাসী — দুজনের প্রীতির সম্পর্কে ছেদ এলো না। গেরুয়া পরতেন, জপের মালা গলায় থাকত, কাশী, দিল্লি নানা জায়গায় আমাদের বাড়িতে এসেছেন, আমরাও গিয়েছি ওঁর আশ্রমে — বাবা-মা প্রত্যেক বছর যেতেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আলোচনা হতো, দুজনে নিজের নিজের বিশ্বাসে অনড়। যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন 'টোকানিদা', সাধন-পূজন ছাড়াও যে জীবন থাকতে পারে তা বোঝেন, এমন সাধুকে কেন শ্রদ্ধা করব না? হাসিঠাট্টা করতেন, নরম স্বরে আড্ডা দিয়ে দিন ভরে দিতেন। বাবা গ্রাম থেকে দূরে বহু বছর, টোকানিদাকে দেখলে বোধহয় ছোটবেলার 'অমি'র জীবনের আনন্দ উপলব্ধি করতেন। ওঁর সৌম্য চেহারা, হাসি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

পুরনো দিনের কথা মনে করে দুটি ছড়া, গ্রামের ছড়া — বাবা আমাদের শোনাতেন। একটি অর্থহীন শোনালেও হয়তো গূঢ় অর্থ আছে।

এ পারে থ্যা মারলাম ছুরি,
পরল কলাগাছে
আড়ু বাইয়া রক্ত পড়ে,
কার বাপের সাইধ্য।

দ্বিতীয়টি অর্থহীন নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইবারকার ঝরে
ক্যারামুদ্দির বিলে
দুইটা ভুই গ্যাছে বাওয়া
কিসের ভাই খাওয়া লওয়া
ঘরের ডোয়া ভাইঙ্গা নিল চোরে।

বাবার শেষজীবনের খাতায় এ দুটি লেখা আছে।

* * *

বারো মাসে তেরো পার্বণের গ্রাম ছিল গৈলা। প্রধান নিশ্চয়ই দুর্গাপূজা। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক নাগাদ গ্রামে ২২৫টি পুজো হতো! একদিকে ছিল কুমারপাড়া — সেখানে প্রতিমা তৈরি হতো — প্রতিমার কাঠামো, খড়ের মূর্তি দেখতে ছোটরা দল করে যেতেন। যেদিন কাঠামোতে মাটির প্রলেপ দেওয়া হতো, সারা গ্রামে রব উঠত — পথেঘাটে চেনা-অচেনা একে-অপরকে বলছেন, 'আজ বুঝি লেপ পড়বে?' অর্থাৎ পুজো তো এসে গেল।

গ্রামবাসী যাঁরা পরিবার নিয়ে বাইরে থাকতেন, পুজোর সময় যতটা সম্ভব বাড়ি আসতেন, বিভিন্ন বাড়িতে আদরযত্নের প্রস্তুতি শুরু হতো বহু আগে। এ সময় চতুর্দিকে ব্যস্ততা। গৈলার বাজারে বিশেষ করে মাছের বাজারে ভিড়, কাপড়-চোপড়ের দোকান, মিষ্টির দোকান বা মুদির দোকান, চতুর্দিকে ভিড়, পথে চলার জায়গা নেই। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে পুজো হতো, এ সময় ঈর্ষা, ক্লিষ্টতার বিসর্জন, সবার মুখে হাসি।

গৈলাতে এটা ছিল নাটকের সময়। সম্ভব হলে কলকাতা থেকে নাটকের দল নিয়ে আসা হতো, আর ছিল বিভিন্ন 'বাড়ি'র নাটক। কালীবাড়ির সামনে স্টেজ বেঁধে নাটক হতো। গান-বাজনা তো ছিলই। শাস্ত্রীয় সংগীত ছাড়া ছিল দেশপ্রেমের গান, নজরুলগীতি ইত্যাদি। চার-পাঁচদিন বড্ড তাড়াতাড়ি কেটে যেত, হঠাৎ করেই এসে যেত দশমী, প্রতিমা বরণ, প্রতিমা বিসর্জন, শান্তিজল ছেটানো, ধান-দূর্বা নিয়ে আশীর্বাদ, প্রণাম, আলিঙ্গন, কোলাকুলি।

আমাদের বাড়িতে ছিল একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, 'যাত্রা'। গ্রাম হোক, শহর হোক, সবাই এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেন, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা ইত্যাদিতে অন্য শহরে যাবার 'যাত্রা' করা মানা, তা কে মেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলতে পারে? সুতরাং দশমীর রাত্রে ছিল শুভদিনে বাৎসরিক যাত্রা। সব অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফিরে আবার বাড়ি থেকে বেরোনো, ডান পা প্রথমে দিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে আবার ডান পা প্রথমে ফেলে বাড়ির চৌহদ্দির থেকে বেরোনো, একটু ঘুরে বাড়ি ফিরে গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া, মিষ্টি খাওয়া। এদিনে 'যাত্রা' করলে বছরের যে-কোনো দিন যাত্রা করা যায়। ঠাকুমা-ঠাকুর্দার মেনে চলা প্রথা, মা-বাবা মেনে চলতেন, এখন পরিবারে আমি ছাড়া কেউ বিজয়া দশমীতে 'যাত্রা' করেন বলে জানি না।

চৈত্র মাসে আসে নীলপূজা — নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজা। শুনেছি এটা বৈদ্যদের মধ্যে বেশি চালু ছিল, বৈদ্যপ্রধান গৈলাতে নীলপূজা বড় করে মানা হতো, চারদিন ধরে চলত। বাবা বলতেন ছোট ছেলেরা নীল-সাদা রং সারা গায়ে মেখে শিব সাজত, এদের বলা হতো 'বালা'। সঙ্গে 'গৌরী' সাজেও ছেলেরা থাকত। তারা 'দোলা' (পালকি) বাড়ি বাড়ি নিয়ে গৃহস্থের মঙ্গল প্রার্থনা করে শিবভক্তির গান গাইত। গৃহস্থরা দোলাতে পয়সা দিতেন। গান ছিল শিব বা মহাদেবের মাহাত্ম্য নিয়ে — তিনি সবার বড়।

পিরথিবিতে যতো পুষ্প তাহা বা
কহিব কতো হে —
হিয়া — রে সর্ব পুষ্পে মোহিত জবা।

(বাজনা-নাচ)

পিরথিবিতে যতো ফল অ তাহা বা
কহিব কতো হে —
হিয়া — রে সর্ব ফলে মোহিত বিল্ব।

(বাজনা-নাচ)

পিরথিবিতে যতো দেবতা তাহা বা
কহিব কতো হে —
হিয়া — রে সর্ব দেবতা মোহিত মহেশ।

(বাজনা-নাচ)

মনে করিয়ে দেয় ইমন রাগের শাস্ত্রীয় সংগীত — অন্তরা :

সব দেবনমে মহাদেব বড়ে হ্যাঁ
তীরথমে য্যাসে গঙ্গা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলপূজার বাউলসংগীত ভিন্ন রসের। মেনকা গৌরীকে জিজ্ঞাসা করছেন,

'রূপে গুণে ধন্যা রে রাজার ঝিয়ারী।
কোন বা মন্ত্রে ভোলা তোরে করলো ভিখারী ॥

গৌরী গাইলেন :

সকল দিয়া কাঙ্গাল সাজে
সেই সে মহেশ্বর।
তার ডাকেই মুই কাঙালিনী
ঘুচলো আমার ঘর ॥

আমাদের বাড়িতে পূজা পাঠ বিশেষ হতো না। এক তো আর্থিক পরিস্থিতি, তাছাড়া সত্যধর্মে বিশ্বাসীর বাড়িতে মূর্তিপূজার চল না থাকাই স্বাভাবিক। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল, ক্ষেতে পাকা ধান, কাটা ধান, 'নবান্ন' ছিল নতুন ধানের উৎসব। সাধারণভাবে হলেও এ উৎসব আমাদের বাড়িতে হতো। নতুন ধান বাড়িতে ঢেঁকিতে কুটে উৎসর্গ করা হতো পূর্বপুরুষদের — বলা হতো পার্বণ শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধের পর্ব শেষ না হলে চাল রান্না হতো না। চালের গুঁড়ো, কলা, ডাবের জল, গুড়, দুধের সর, নারকেল ইত্যাদি দিয়ে অপূর্ব সুস্বাদু কিছু মাখা হতো। কলাগাছের বাকল বা ছাল দিয়ে তৈরি পাত্রে সুস্বাদু বস্তুটি ছেলেরা নিয়ে যেতেন ছাদে — পাতিকাকদের সরিয়ে দিয়ে দাঁড়কাককে আমন্ত্রণ জানাতেন,

ও কাউয়া কো কো কো
আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন
আইয়ো যাইয়ো কাকবলি লইয়ো
কাকবলির কলাটা লইয়া
পুবদিকে চাইও।

উদগ্রীব হয়ে থাকতেন কখন 'কাউয়া' আসবে, কোনদিকে চাউনি যাবে, কখন নিচে এসে অমৃতসমান 'মাখা'টি খেতে পারবেন। সেদিন দুপুরে রান্না হতো না, পেট ভরে 'মাখা'র স্বাদ। পুরো বরিশালের উৎসব — প্রতিটি মানুষের চোখে দেখা যায় 'নবান্নে'র তাৎপর্য, আনন্দ। সবুজ, সোনালি ধানের দেশ, বরিশাল।

ভাদ্রসংক্রান্তিতে আইগলঝাড়া (গৈলা থেকে অল্প দূর) খালে হতো নৌকো দৌড়ের প্রতিযোগিতা। এই উপলক্ষে রাস্তায় মেলা। একে বলা হতো বাইচ খেলা, গৈলার খালেও হতো। সরু, দুশো-তিনশো হাত লম্বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকো এর জন্য আলাদা করে বানানো হতো, অনেক মাঝি মিলে বৈঠা ফেলে নৌকো দৌড় করতেন। গৈলা-ফুল্লশ্রীর সবার উৎসাহ, শুনেছি হাজার হাজার লোক খালের পাশে দাঁড়িয়ে হৈ-হুল্লোড় করে মাঝিদের উৎসাহ দিতেন। অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের বোট রেসের কথা এত শুনি, সে তো গৈলার বাইচ খেলার কাছে শিশু!

চৈত্রসংক্রান্তির দিন কয়েকটি বাড়ির সামনে বসত 'থৌল' বা মেলা — এক পয়সা, দুপয়সা নিয়ে ছোটরা যেতেন মেলার আনন্দ নিতে। এদিন ছিল বড় মেলা, পুরো বৈশাখ মাস কোনো না কোনো বাড়ির সামনে থৌল বসত; গৈলার মানুষ যেন চুপ করে থাকতে পারতেন না — উৎসব চাই।

ফুল্লশ্রীর মনসাবাড়ি বিখ্যাত — পাশে দীঘি, শুনেছি কবি বিজয় গুপ্ত স্বপ্নে মনসার ঘট দেখে এই দীঘিতে ঘট পেয়েছিলেন ও মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সে ছোট মন্দির আর নেই, এখন আছে মনসাদেবীর বিরাট পিত্তল মূর্তি, টাইলস দিয়ে সাজানো দেয়াল। সাপ থেকে বাঁচানোর দেবী, তাঁর পুজো গ্রামের মানুষ মনপ্রাণ দিয়ে করেন, শ্রাবণ মাসে 'রায়ান গান' গেয়ে দেবীর মাহাত্ম্য জানান।

স্বপ্নে ঘট পাবার কথা লিখিত রূপে কোথাও নেই, তবে *মনসামঙ্গলে* 'স্বপ্নাধ্যায়' নামক পালায় আছে,

'হেন মতে স্বপন কথা কহিয়া উপদেশ।
নাগরথে চলি গেল আপনার দেশ।
স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিন্দ।
হরি হরি নারায়ণে স্মরয়ে গোবিন্দ।
প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশ দিশা।
স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা।
হরি নারায়ণ ভাবি নির্মল করি চিত।
রচিতে আরম্ভ করে মনসার গীত।'[১৭]

* * *

গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে ছিল কবীন্দ্রবাড়ি। কবীন্দ্র হলেও ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রর বংশের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল না। পূর্বপুরুষ শুনেছি বিক্রমপুর থেকেই এসেছিলেন, কবে কেন, জানতে পারিনি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মদনকৃষ্ণ দাশ কবীন্দ্র তাঁর বাড়িতে একটি টোল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাপন করেন। ক্রমে এই টোল সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়, সংস্কৃত ও কবিরাজি শিক্ষার জন্য দূর দূর থেকে ছাত্ররা আসতে শুরু করলেন। শুধু সংস্কৃত নয়, এখানে শেখানো হতো আয়ুর্বেদ, সঙ্খ্যা, বেদান্ত, ব্যাকরণ, কাব্য ও ভাষা। ছাত্ররা সবাই বাড়িতে থাকতেন, প্রথমদিকে থাকা-খাওয়া-পড়ার টাকা নেওয়া হতো না। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যখন দুশোর ওপর হলো তখন টাকা নেওয়া শুরু হলো। ১৮৯৬/৯৭-এ টোল হয়ে গেল সংস্কৃত কলেজ।[১৮] এ বাড়িতে কয়েকজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন — চন্দ্রকুমার কবিভূষণ, মদন কৃষ্ণের নাতি, ত্রিপুরার মহারাজার রাজ কবিরাজ, তাঁর দুই পুত্র ললিতমোহন কবিসাগর, ভুবনমোহন কবীন্দ্র। আগে গৈলা গ্রামে সংস্কৃত শেখা যেত কিন্তু পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না; ছাত্রদের অসুবিধে হতো। পরে গ্রামে যাঁরা উদ্যোগী হয়ে ইংরেজি স্কুল বানিয়েছিলেন তাঁদের প্রচেষ্টায় কবীন্দ্র কলেজ বিভিন্ন বিষয়ের উপাধি কেন্দ্র হয়ে গেল।

কলেজ চালাতে অর্থের প্রয়োজন। ললিতমোহন দাশ ও ভ্রাতা ভুবনমোহনের চেষ্টায় ইংরেজ সরকার ও ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে মাসিক সাহায্য ২০০ টাকা মঞ্জুর হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিরাট সাহায্য। এই টাকা থেকে 'বিদেশ হইতে ভাল পণ্ডিত অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।'[১৯] গৈলাতে শিক্ষা বা সামাজিক কাজে একতা ছিল। ছাত্রসংখ্যা একসময় এত বেড়ে গেল, কবীন্দ্রবাড়িতে রাখা সম্ভব নয়, তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ, যেমন রজনীকান্ত দাশ, নিজেদের বাড়িতে তাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। ক্রমে সরকারের সাহায্যে ছাত্রনিবাস তৈরি হয়, আলাদা করে গ্রন্থাগার তৈরি হয়। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের একাধিক অধ্যাপক কবীন্দ্র কলেজের কৃতী ছাত্র।

কবীন্দ্রবাড়ি ছিল অনেক জমির ওপর অনেক দালান নিয়ে, পরিবার বড়, তাছাড়া ছাত্রদের আবাস। ইন্দিরা মামিমা প্রথম গৈলা যান ১৯৩৮-এ — দিদি শাশুড়ি গ্রাম দেখাতে নিয়ে গেলেন। ১৯৯০-এর দশকে বলেছিলেন যা সবচেয়ে বেশি মনে আছে তা হচ্ছে কবীন্দ্রবাড়ির সুন্দর করে ছড়ানো বিবিধ দালান, তার ঝকঝকে সাদা দেয়াল ও অসংখ্য পুকুর। কাছে গেলে শোনা যেত ছাত্ররা সুর করে শ্লোক পাঠ করছেন — মনে হতো উচ্চমানের সমবেত সংগীত।

গৈলাতে আমাদের দিকে মেয়ে-বৌরা পর্দায় থাকতেন না, পাড়ায় বেরোবার অধিকার ছিল — ইন্দিরা মামিমার গ্রাম দেখতে যাওয়া তা প্রমাণ করে। কবীন্দ্রবাড়ি ছিল আলাদা। এ বাড়ির এক বধূমাতা তাঁর জীবনী চারটি খাতায় লিখে গিয়েছেন, যা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল বারো বছর বয়সে তেতাল্লিশ বছর বয়সের চন্দ্রকুমারের সঙ্গে, ইনি ছিলেন তৃতীয় পক্ষ। বাড়ির অন্য মহিলাদের, বিশেষ করে শাশুড়ি ও ছোট জায়ের কাছ থেকে নির্যাতনের বিবরণ পড়লে চোখে জল আসে। বাড়ির বাইরে কোথাও যাওয়া তো অসম্ভব, এমনকি সংসারের কাজে পুকুরে যাবার পথে ছাত্রদের সংস্কৃত পাঠ শুনবার অধিকারও তাঁদের ছিল না। মানসিক নির্যাতন ছাড়া ছিল শারীরিক খাটুনি। পরিবারের রান্না, ছাত্রদের রান্না মহিলারা একত্র হয়ে করতেন, সবাই ক্লান্ত হয়ে যেতেন, 'ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারতাম না।' অন্দরমহল ও বাইরের রূপে তফাত অনেক পরিবারে থাকে। এ যেন ভিন্ন গৈলা।

কবীন্দ্র কলেজ তার খ্যাতি নিয়ে চলতে লাগল। দেশবিভাগের পরেও কিছুদিন চলল, ১৯৫১-৫২-তে বন্ধ হয়ে গেল। ততদিনে পরিবারের প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছেন, ছাত্রসংখ্যা কমে গিয়েছে, কলেজ চালাবার মতো সে রকম পণ্ডিতও পরিবারে নেই। কলেজ শুরু হবার সময় গৈলার অবস্থাপন্ন নিমদাশ বাড়ি থেকে আসবাবপত্র দান হয়। কলেজ বন্ধ হলে কিছু জিনিস গেল গৌরনদী স্কুল বা কলেজে, বাকি গৈলা স্কুলে। গৈলা গ্রামের গৌরব, কবীন্দ্র কলেজ, ইতিহাস হয়ে গেল।

উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দুই কবীন্দ্রবাড়ির মধ্যে রেষারেষি ছিল, বলেছিলেন সুনীল গুপ্ত মহাশয়, বিনা বিদ্বেষের রেষারেষি। 'আমাদের দিকের বাজার মস্তবড় হলো, ওঁরা শুরু করলেন হাট। আমরা পুজোতে দুদিন থিয়েটার করি তো সরস্বতী পুজোয় ওঁদের যাত্রাগান তিনদিন।' দুপাড়ায় খুব আসা-যাওয়া ছিল মনে হয় না। তবে দুদিকেরই লক্ষ্য শিক্ষা, আমাদের দিকেররা চাকুরি, ওকালতি ইত্যাদি করেন, গৈলার বাইরে যান; ওঁরা সংস্কৃত ও কবিরাজির ঐতিহ্য এগিয়ে নিয়ে চলেন তাঁদের বিশাল বাড়িতে। কর্মসূত্রে ঢাকা, ত্রিপুরা গিয়েছেন, তবে আসল কর্মস্থল, কবীন্দ্রবাড়ি, গৈলা।

হেন পুজো নেই যা কবীন্দ্রবাড়িতে হতো না। দুটি উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী পুজো প্রায় সব বাড়িতে হয়, বিশেষ করে যেখানে পড়ুয়া থাকে, তবে সাধারণভাবে। কবীন্দ্রবাড়িতে এই পুজো ছিল এলাহি ব্যাপার, মা সরস্বতী আসতেন তাঁর আট সখী নিয়ে। প্রচলিত কাহিনি — বহুকাল আগে কবীন্দ্রবাড়ির কেউ সরস্বতী পুজোর দিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আটটি সুন্দরী বালিকা হেঁটে আসছেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবীন্দ্রবাড়িটি কোথায়? আমরা দেবী সরস্বতীর সখীরা, তিনি নাকি এসেছেন, তাঁর কাছে যেতে চাই।'[২০] সেই থেকে এ বাড়িতে মা সরস্বতীর মূর্তির সঙ্গে থাকতেন আট সখী।

এ সময় তিনদিন যাত্রা — তিলধারণের স্থান থাকত না। কোনো বাড়িতেই সবাই দয়ালু হন না। শোনা যায়, যাত্রার দর্শকের স্থান যখন ভরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল, একবার নিম্নবর্গের দর্শকদের চাবুক দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।[২১] কথাটার সত্যতা আছে মনে হয়, অন্য সূত্রে জেনেছি, এরকম হয়েছিল। পরদিন আহতরা দল করে এসে বাড়ির কর্তা ললিতমোহন কবিরাজের কাছে অভিযোগ করে দোষীর শাস্তি চাইলেন। দোষী পলাতক — কবিরাজমশায় নিজের জামা খুলে পিঠ খালি করে বললেন, 'নে, আমার পিঠে চাবুক মার।'[২২] সমস্যা মিটে গেল, নিম্ন চাষা মালিকের বিরুদ্ধে কী বলবে।

এখানে বলা দরকার, অন্যায়, অত্যাচার কবীন্দ্রবাড়িতে শুধু হতো না, বকশীবাড়িতেও এর দৃষ্টান্ত আছে। এ বাড়ির 'বিচারক' কাকা বাবাকে একদিন তাঁর বিচারসভা বা 'কোর্টে' নিয়ে গেলেন। মস্ত বড় ঘর, তাঁর 'জুনিয়র' ঘরে বসা। বাঁদিকে হাঁটু গেড়ে বসা লুঙ্গি পরিহিত দুই চাষি — নারকেল চুরির অপবাদ। বাবা বললেন, 'আশ্চর্য বিচার — ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই দুই 'আসামি'কে পা দিয়ে প্রচণ্ড লাথি মারলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন অপরাধ কী। প্রমাণের প্রশ্ন আসে না। সহ্য না করতে পেরে বেরিয়ে এলাম।'

কবীন্দ্রবাড়ির কথা বাকি আছে। ধুমধাম করে হতো কার্তিকপুজো — এক কার্তিক মূর্তি নয়, একুশ কার্তিকের পুজো হতো। এটা কোন মত বা কোন কাহিনির জন্য জানি না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চন্দ্রকুমার কবীন্দ্রর এক পুত্র তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের গৈলা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বছর দু-একের জন্য। ভাইবোনদের একজন, বিশ্বপতি দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ২০০৪-এ। কয়েক বছর নিকট বন্ধুর মতো কাটিয়েছি, বছর তিনেক আগে উনি চলে গেলেন। গৈলাতে ছিলেন যখন আট-দশ বছর বয়স, ১৯৩৮-৪০। কোনো কারণে এঁদের স্কুলে পাঠানো হয়নি, যদিও দু'বছর ছিলেন গ্রামে। বালক বিশ্বপতি একা একা গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, কৌতূহল ছিল, জানবার শিখবার ইচ্ছে ছিল, ওঁর কাছে ছোট ছোট কথা শুনেছি। প্রথমদিকে বাড়ি থেকে রাস্তা ছিল না, ধানক্ষেত ভেঙে চলে যেতেন গৌরনদী, বড় নৌকো, স্টিমার দেখতে। গ্রামে অবাধ গতি, বর্ষায় এত জল হতো, প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে নিজেদের ছোট নৌকো থাকত, অন্য বাড়িতে বা বাজার ইত্যাদিতে যাবার জন্য। এত জল থাকত যে সাঁকো বা বাঁশের 'চার' দিয়ে রাস্তা বা নালার ওপার যেতে হতো। সত্তরের কোঠায় বসে আমরা নিজেদের গ্রামকে 'ভেনিস' মনে করতাম!

গাছপালার দেশে নানান পাখি থাকবার কথা। কাক, দাঁড়কাকের কথা জানি, উনি দেখেছিলেন, 'ফেচুকাক'। একেবারে কাকের মতো, ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশমিশে কালো, বুকের দিকটা পুরো জ্বলজ্বলে হলুদ। আর দেখেছিলেন ডাহুক। মনে পড়ে গেল ছড়া, যা বলে আমাদের ছোটবেলায় বাবা আমাদের সঙ্গে খেলা করতেন, আমি মেয়েকে বলেছি।

ঘুঘুসাই, ঘুঘুসাই
দা'খান কই, দা'খান কই,
দা দিয়া কি করবা
কলাগাছ কাটুম
কলাগাছ দিয়া কি করবা,
বৌ ভাত খাবে,
বৌ-কই,
জলে গ্যাছে,
জল কই,
ডাউকে খাইছে,
ডাউক কই,
তারাবনে গ্যাছে,
তারাবন কই,
পুইরা গ্যাছে,
ছাই কই,
ধোপায় কাপড় কাচতে নিছে,
ধোপা কই
যুদ্ধে গেছে,
যুদ্ধ কই,
ভাইঙ্গা-গ্যাছে ॥[২৩]

কবীন্দ্রবাড়ির বড় পুকুরের ওপারে ঘন উঁচু আগাছা — ঘাসের মাঝে বিশ্বপতি দেখেছিলেন হালকা খয়েরি রঙের চতুস্পদ। 'জানেন বাড়িতে বলিনি জেঠামশায়দের ভয়ে।'

কৌতূহল ছিল, কিছু করতে চাইতেন। বন্ধু ছিল কয়েকজন, সারাদিন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগত না, যেতে শুরু করলেন 'গৈলা সেবাগ্রাম'। পাঠাগার ছিল, বই পেতেন, এছাড়া শরীরচর্চা, ব্যায়াম ইত্যাদি। '...সৃষ্টিমূলক কাজকর্ম ও ব্যায়ামাগার ছাড়া গৈলা সেবাগ্রামের প্রধান দৃষ্টি ছিল রাজনৈতিক চেতনা ও বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রবর্তন ও ঐ যুবশক্তির সংগঠনের উদ্দেশ্যের দিকে।'[২৪] ধর্ম-নির্বিশেষে যুবকরা এই সংগঠনে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৬৬-তে সেবাগ্রামের কাজ চলছিল, প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ অটুট ছিল। বিশ্বপতিবাবুর জেঠামশায়রা 'সেবাগ্রামের' 'রাজনৈতিক আন্দোলনে'র শিক্ষার কথা জেনে গেলেন, সেবাগ্রাম যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধ হলো। ওখানে নৈশ স্কুল ছিল, তাতে যাবার প্রশ্নই ওঠেনি।

জেঠামশায়দের 'সেবাগ্রাম' সম্বন্ধে চিন্তিত হবার কারণ ছিল। বিশ্বপতিবাবুর দুই কাকা স্কুলজীবনে ওখানে ব্যায়ামচর্চা করতে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। এঁদের মা লিখছেন (১৯১৯ নাগাদ), 'জানিতে পারিয়া ছোট ছেলেকে বুঝাইয়া পড়াশুনার দিকে ফিরাইয়া আনিলাম (ইনি পরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন), শত চেষ্টা করিয়াও মেজ ছেলেকে রাজি করাইতে পারিলাম না। সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিল।' পুলিশের নজর এড়িয়ে কিছুদিন ছদ্মবেশে পলাতক ছিলেন, পরে বন্দি হয়ে হিজলি শিবির ও অন্যান্য জেলে বহু বছর কাটিয়েছেন। কারামুক্ত হন যখন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত, বলেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র অংশুপতি দাশগুপ্ত। ১৯৩৯ ওঁর মায়ের মৃত্যুর আগেই উনি মারা যান। ওঁর জন্ম সম্বন্ধে মায়ের লেখন : 'আঠারই ফাল্গুন (সন নেই) আমার একটি ছেলে জন্মিল। সকলে বলিল ছেলের রাশি নক্ষত্র অতি উত্তম। দেখিতেও বড় সুন্দর। তখন কে জানিত যে এই ছেলেই পরে আমার জীবনের এত অশান্তির কারণ হইবে।' (১৯১৯-২০)

দশ বছরের ছেলে বিশ্বপতি — গুলি-ডাণ্ডা খেলবার মানসিকতা নেই, বাড়িতে তাঁর প্রতি নজর দেবার কেউ নেই। ওদিকে সবকিছুতেই মানা। যেতে শুরু করলেন এম এন রায়ের বিশ্বাসে বিশ্বাসী 'Society for the Cultivation of Rationalist Thought' — গালভরা নাম, গুরুগম্ভীর আলোচনা — এদের সান্ধ্য অধিবেশনে। তীক্ষ্ণবুদ্ধির মানুষ, নির্বোধের মতো বসে থাকতেন না, কিছুটা বুঝতে পারছেন সে ইঙ্গিত দিতেন। স্কুলে না যাওয়া, গ্রাম চষে বেড়ানো, শিক্ষায় কৌতূহলী আরো কয়েকজন বালক যেতেন ওঁর সঙ্গে। আশ্চর্য, সভ্যরা এদের উপস্থিতিতে বিরক্ত হতেন না, বরং হাসিমুখে বেঞ্চে বসতে বলতেন। কে ভেবেছিল এম এন রায়ের বাণী জলের দেশের দূর গ্রামের গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল।

বিপ্লবী আন্দোলন গৈলাতে ছিল, বকশীবাড়ি, কবীন্দ্রবাড়ি, পিপলাইবাড়ি, অন্যান্য বাড়ির অনেকে এতে যোগদান করেছেন ও কারাবরণ করেছেন। সবচেয়ে বিখ্যাত কালুপাড়া সেনবাড়ির তারকনাথ সেন, যিনি হিজলি ক্যাম্পে বন্দি অবস্থায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।

পিপলাইবাড়ির বড়মা ছিলেন বাল্যবিধবা পিসিমা। তিনি গ্রামে থেকে জমিজমা দেখাশোনা করতেন। দিন কাটত পুজোআর্চা নিয়ে। নরম মানুষ, একবার বাড়ির অন্য কোনো হিস্যার বৌমা এসে বললেন, 'বড়মা, আমার বড় টাকার দরকার, কিছু টাকা দিন।' প্রশ্ন না করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়মার উত্তর, ‘আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই, বাছা — এই কুড়ি ভরি সোনার গোট আছে, এইটি নিয়ে যাও।’ দিয়ে দিলেন। এহেন বড়মা বরিশালে শঙ্কর মঠের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন; ‘শঙ্কর মঠের তাৎপর্য্য হল সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে কিছু বিপ্লবীও গা ঢেকে (ছদ্মবেশে) ওখানে থাকতেন। ওঁদের প্রতি বড়মার সমর্থন ছিল। ওঁর দেওয়া একটি পাথরের ফলক শঙ্কর মঠে ১৯৯২ অবধি ছিল।’[২৫]

শহরের মানুষ আমি, ভাবতাম গ্রামে কী থাকতে পারে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, স্বদেশি আন্দোলন, বিজ্ঞানচর্চা, বিদ্যাচর্চা, সাহিত্য-সংগীত শহরের, গ্রামের জীবন তো সাদামাটা। কত বড় অন্যায় ভাবনা, ভুল ভাবনা, গৈলা গ্রাম আমাকে বুঝিয়ে দিলো।

গ্রাম থেকে ফিরবার পথে বড় আশা নিয়ে দেখতে গেলাম কবীন্দ্রবাড়ি; আমাদের পাড়া থেকে দূর, পথ নির্জন, বসবাস নেই। পাড়াও নির্জন, পায়ে চলা রাস্তা, পথ দেখিয়ে কয়েকজন নিয়ে গেলেন ভেতরে। বাচ্চারা ঘিরে ধরল। সংস্কৃত কলেজের প্রধান দরজার কাঠামো ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। সাদা ধবধবে দালানের জায়গায় আছে কয়েকটি জীর্ণ কুটির। পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে, যে দুটি আছে, জল একেবারে ঘোলাটে, কী যেন শক্ত হয়ে জমে আছে জলের ওপর। আগাছা চতুর্দিকে। যাদের সঙ্গে দেখা হলো, ভদ্র — সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তবে অতীত সম্বন্ধে জানেন না, কেনই-বা জানবেন, এ বাড়ির মাখনলাল কবীন্দ্র দেশবিভাগ অবধি গৈলা ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে সবাই পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতা, ইছাপুর ইত্যাদি জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। থেকে গিয়েছিলেন ললিতমোহন কবিসাগরের অতিবৃদ্ধা প্রথম স্ত্রী, যার দেখাশোনা, শেষকৃত্য মুসলমান প্রতিবেশীরা করেছিলেন, এমনটাই বলেছিলেন বিশ্বপতিবাবু। আর ছিলেন ‘কড়াই’ কবীন্দ্র (ভালো নাম লিখে রাখিনি)। ১৯৭২-এ (সম্ভবত) পশ্চিমবঙ্গ চলে আসার আগে হঠাৎ করে মারা গেলেন, শেষ হয়ে গেল কবীন্দ্রবাড়ির দুই শতাব্দীর ঐতিহ্য।

* * *

বকশীবাড়ির পুরনো দিনে ফিরে যাই। মা-অন্তপ্রাণ বাবার। বাবা ছোট, পাঁচ-ছয় বছরের বেশি নন, ঠাকুমা খুব অসুস্থ, কী হবে কেউ জানে না। বাবা দিশেহারা; পুজো পাঠ চারদিকে দেখেছেন, ঠিক করলেন ভগবানের উদ্দেশে একটি পয়সা দিয়ে প্রার্থনা করবেন মাকে ভালো করে দিতে। দিদির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে গেলেন এক নিরিবিলি পুকুরে, প্রার্থনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে। হঠাৎ মনে হলো, 'এতো তো ভগবান আছেন, কাকে দেবো, কার কাছে বলবো মাকে ভালো করে দিতে? কোনো একজনের নাম নিলে অন্যরা যদি অসন্তুষ্ট হন, মা যদি ভালো হয়ে না যান?' একটু ভেবে 'ভগবানরা, তোমাদের যার ইচ্ছে আমার ভেটটি নাও, মাকে ভালো করে দাও', বলে পয়সা পুকুরে ছুড়ে দিয়ে ছুটে বাড়ি এলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি/মূর্তি ভাবে আমি দেব — হাসে অন্তর্যামি।' সেই অন্তর্যামী বোধহয় বাবার আকুলতা শুনতে পেয়েছিলেন — ঠাকুমা ভালো হয়ে গেলেন।

কোন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব সে দ্বন্দ্ব মেটাবার চেষ্টা বাবা কোনোদিন করলেন না। দিল্লিতে দুর্গাপূজায় যেতেন বন্ধু বীরেন গাঙ্গুলির সঙ্গে আড্ডা দিতে, মণ্ডপের কাছাকাছিও যেতেন না। প্রায় আশি বছর বয়স, মা, পার্থ ও জামাতাকে নিয়ে, আরো অনেকে মিলে চড়াই-উতরাই, বরফ, শীত সামনা করে গেলেন বদ্রিনাথ। সবার মনে তীর্থযাত্রা — অত কাছে গিয়েও বাবা বদ্রিনাথের মন্দিরে গেলেন না। 'আমি তো এসেছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে, হিমালয়ে ঘোরা কি সোজা কথা, এসেছি সবার সঙ্গে সময় কাটাতে, মন্দিরে কেন যাবো?' পার্বতীকুমারের পুত্রের মনের জোর পিতার মতো ছিল। 'রথযাত্রা, লোকারণ্য' কবিতাটি ছিল বাবার প্রিয়।

কনিষ্ঠ সন্তান, বাবা ছিলেন ঠাকুমার আদরের আর বাবার সব আবদার ছিল মায়ের কাছে। নিয়মকানুনের বিরোধী, স্বাধীনচেতা ছেলেকে ঠাকুমা বুঝতে পারতেন। নিজের মতো তাকে বড় হতে দিতেন।

গৈলার পর অনেক বছর কেটে গেছে, গ্রামের ছোট অমি সসম্মানে পড়াশোনা শেষ করেছেন, এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ঢাকাতে থাকেন, থাকতে ভালোবাসেন। মন থাকে মায়ের কাছে। কত কষ্ট করে মা বছরের পর বছর একা হাতে এ সংসার চালিয়েছেন, বাবা জানতেন। ইচ্ছে হতো মায়ের যত্ন নিতে। পিসিমার বয়স হচ্ছিল, যে সেবা তিনি ঠাকুর্দামশায়ের করেছিলেন, অতটা তাঁর মায়ের জন্য করতে পারতেন না। তাছাড়া আমাদের সমাজের নিয়মে যতদিন স্বামী ছিলেন, বাড়ি ছিল নিজের, ১৯২৬-এর পর পুত্র যতই ভালো হোন, সংসার তাঁদের। অনেক সময় গৈলা ছেড়ে ঠাকুমা-পিসিমাকে বরিশালে থাকতে হতো। এসব নিয়ে বাবা মনে ব্যথা পেতেন। টাকা দিয়ে সাহায্য করা আর যত্ন নেবার মধ্যে তফাত আছে। অধ্যাপক হবার পর একবার মা ও দিদিকে বকশীবাজারের বাড়িতে বেশ কয়েক মাসের জন্য এনেছিলেন। ঠাকুমাদের নিয়ে কলেজের অনুষ্ঠানে যেতেন — সে খুশি আলাদা।

ঠাকুমার প্রজন্মের মহিলারা শিক্ষিতা হতেন, ঠাকুমার হাতের লেখা ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি সুন্দর, পরিষ্কার — মুক্তোর মতো। ওঁর চিন্তা ছিল ছোট ছেলে বিয়ে করছে না কেন। ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে লেখা চিঠি, 'অমি, তুমি বিবাহ করিতে কেন রাজি হইতেছ না, বুঝিতে পারি না। তোমাকে বিবাহিত দেখিলে আমি মনে শান্তি পাইবো। আর এই যে মটরমালা ও পাড়ের শাড়ি ছোট বধূমাতার জন্য রাখিয়াছি, তুমি বিবাহ না করিলে কাহাকে দিব?' চিন্তা স্বাভাবিক, ঠাকুমা বৃদ্ধ, উনি চলে গেলে বাবার পাশে কে থাকবেন? প্রসঙ্গত; মটরমালা মা পেয়েছিলেন, পাড়ের শাড়ি বেহাত হয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা, বাবার ভয় ছিল যদি বধূমাতা তাঁর মাকে যোগ্য শ্রদ্ধা না দেন, তাই মায়ের জীবিতাবস্থায় বিয়ে করবেন না ঠিক করেছিলেন।

১৯৩৩-এর গরমে ঠাকুমা খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন, বড় পিসিমা তার এক মাস পরে। মাকে হারিয়ে বাবা ভেঙে পড়েছিলেন। ঠাকুমার শ্রাদ্ধ হয়েছিল গৈলাতে, বর্ধমানের বড়দা বলেছিলেন, 'আমি তখন ন'বছরের। বাড়ির সামনের বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ রেখে কাকামণির হৃদয়বিদারক কান্না কখনো ভুলতে পারি না।'

ঠাকুমার শ্রাদ্ধে এক তুমুল কাণ্ড হয়েছিল। মৃত্যুর আগে কোনো সময় উনি ছেলেদের বলেছিলেন, 'আমি চলে গেলে তোরা আর কতদিন আমাকে মনে রাখবি? তাই বৈদ্যদের নিয়ম অনুযায়ী এগারো দিনের অশৌচ না রেখে তিরিশ দিনের অশৌচ রাখিস। এই তিরিশ দিন তো মনে রাখবি।' কেন বলেছিলেন জানি না, তবে বাবারা তাই করলেন — শ্রাদ্ধ গ্রামে, বকশীবাড়িতে। মৎস্য ছোঁয়ার দিন বিরাট নেমন্তন্ন, নিজেদের হাউলির, জ্ঞাতিদের হাউলির, আরো পরিচিত, বাইরের আত্মীয়স্বজন নিয়ে অনেকজনের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা। মাছ. মাংস, তরিতরকারির সরঞ্জাম আগে থেকে করতে হবে, শেষ মুহূর্তে পাওয়া যাবে না। জ্ঞাতিরা বেঁকে বসলেন, শুধু জ্ঞাতি কেন, নিজেদের হাউলির অন্যরা বেঁকে বসলেন, 'নিম্নজাতির তিরিশ দিনের অশৌচ রেখে তোমরা জাতিভ্রষ্ট হয়েছো, আমরা কেউ আসবো না।' বড় জেঠামশায় ঘাবড়ে গেলেন, চিন্তায় পড়লেন, কতজনের রান্না করাবেন, সত্যি যদি কেউ না আসেন, অথৈ জলে। চিন্তা স্বাভাবিক। খাবার নষ্ট ছাড়াও, এ তো ঠাকুমাকে অপমান, পরিবারকে অপমান।

বাবার ব্যক্তিত্ব কড়া; দাদাকে বললেন, 'আপনি যত নেমন্তন্ন দিয়েছেন, সেই হিসেবে ব্যবস্থা করুন। তারা যদি না আসে, না আসুক — কোনো ক্ষতি হবে না, গ্রামে নিমন্ত্রিত করার লোক প্রচুর আছেন। তাঁদের জন্য ভোজ হবে। পুরো দায়িত্ব আমার।' বাবার ভাষায়, 'দাদা সেইভাবে পুরো তালিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা করলেন। রান্না হলো। হুমকি তো দিলেন সবাই মিলে, যেই দেখলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বেপরোয়া, রান্নাবান্না হয়েছে, অমনি সুড়সুড় করে সবাই, এমনকি গ্রামের মোড়লরা এসে শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়ে গেলেন। দরিদ্রদের খাওয়ানোর কথা বলেছিলাম, সেটা পরের দিন হলো।' গোঁড়ামি, কিঞ্চিৎ ঈর্ষা, শক্ত জবাবে মত বদলানো, এ না হলে সমাজ কী?

ঠাকুমা ভেবেছিলেন ওঁকে কেউ মনে করবেন না। ওঁকে হারানোর দুঃখ বাবার কখনো যায়নি। শান্তিনিকেতনে, নিজে যখন বৃদ্ধ, বলতেন, 'মাকে হারানোর দুঃখ যে কি সে আমি জানি, যে হারিয়েছে সে-ই বুঝবে।' দিদিকে হারিয়ে ভাগ্নিদের লিখছেন (১৯৬৭), 'তোমাদের খুবই কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারি। মা থাকা আর না থাকার মধ্যে বিরাট তফাৎ।'

১৯৯০-৯১। বাবা তখনো গবেষণা করছেন, লিখছেন, রিকার্ডো, মার্শাল কেউই তাঁর চিন্তার থেকে দূরে নন। শান্তিনিকেতনের বাড়ির সামনের বারান্দায় প্রিয় বেতের চেয়ারে বসে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। সামনে গোলাপ বাগান, আকাশচুম্বী গাছ। বলেন, 'জায়গাটা বড় সুন্দর, তাই না? একটা গ্রাম্য ভাব।' গ্রামের কথা বলতেন, ভাবনা পুরনো দিনে ফিরে যেত। ওঁর মা-বাবার কথা বলতেন। গৈলা চিরকালের জন্য দূরে চলে গেছে, তা ওঁকে আঘাত দিত। ঢাকার সঙ্গে তাও যোগাযোগ ছিল, গ্রাম দেশ বড্ড দূরে চলে গেল। মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যেতেন, হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বলতেন,

এ পারে থ্যা মারলাম ছুরি
পড়ল কলাগাছে ...।

* * *

গ্রামের জীবনের কথা প্রথম যখন শুনেছি, আমি এত ছোট যে জীবন ব্যাপারটাই বোধগম্য ছিল না, দেশে যাবার কৌতূহল থাকার প্রশ্ন ওঠে না। ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাস, হঠাৎ শুনলাম বরিশালের বড় দিদি যাঁর আমি আদরের ছিলাম, যিনি বাড়ির জ্যেষ্ঠা কন্যা, তাঁর বিয়ে। প্রথা অনুযায়ী বিয়ে হবে গ্রামে, বকশীবাড়ির বাড়ি থেকে। ঠাকুমা নেই, দশ বছর হতে চলল, শ্রাদ্ধশান্তির পর বাবা দেশে যাননি, তাঁর মনের বিষাদ, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলার গ্রামে ফিরে যাবার তীব্র ইচ্ছে আজ বুঝতে পারি। ভাই ছোট, মাত্র পাঁচ মাসের, ওকে নিয়ে যাওয়া সোজা নয়, ব্যবস্থা হলো কোনোভাবে — বার হলো সুটকেস, ট্রাঙ্ক, হোল্ডল, গেলাম বরিশাল। এক সন্ধ্যেয় বসলাম গয়নার নৌকোয় — আত্মীয়স্বজন দূর দূর থেকে এসেছেন, অনেক জন আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহের সামগ্রী, ঘর বহু বছর বন্ধ, কী অবস্থায় আছে কে জানে, সুতরাং বাসনকোসন, বিছানাপত্র, ফর্দ লম্বা। নৌকো দুটি পুরো ভাড়া নেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই। কারণ গয়নার নৌকো তো লোকাল ট্রেনের মতো প্রতি ঘাটে থামে। ঘাটে আসার অল্প আগে ঢাক বা নাকারা বাজিয়ে গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেয় 'আসছি'। তাঁরা নিজেদের পুঁটুলি-প্যাঁটরা নিয়ে নৌকো ধরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যান। ভাড়া হয় কটি ঘাট তার ওপর। তাই মনে করি, পুরো নৌকো ভাড়া করা হয়েছিল। মায়ের কাছে শোনা বেশি, আমার তো ধু-ধু মনে পড়ে — বয়স ছিল পাঁচ বছর পাঁচ মাস।

বরিশাল থেকে ছাব্বিশ মাইল হলে কী হবে, সময় লাগত চব্বিশ ঘণ্টা, জোয়ার-ভাটার ওপর সময়। কখনো গুণটানা করে মাঝিরা নৌকো আগে নিয়ে যান, কখনো পাল তুলে নৌকো ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পথে একাধিকবার খাওয়া-দাওয়া। একসময় পৌঁছলাম গৌরনদী — নৌকো বদলাতে হবে। উঠলাম ছোট ছোট নৌকোয়, অনেকক্ষণ পর পৌঁছলাম বাড়ির ঘাটে। বাবা কোনো কারণে এলেন দুদিন পর, দেখি খালি পা! স্টিমারে আসছিলেন, বিদ্যাসাগরী চটি জাহাজের রেলিংয়ের নিচ দিয়ে পড়ে গেল। হাসাহাসিটা মনে আছে। গৈলার বাজারে চটি নিশ্চয়ই পাওয়া যেত।

ঠাকুর্দামশায়ের বাড়িখানা তখনো অক্ষত — ছেলেরা থাকবেন সেখানে। আমরা থাকব 'মহিমালয়' নামে এক বাড়িতে, কোন হাউলির জানি না, হয়তো এটাই ছিল ঘরজামাইর বাড়ি, কে জানে। দোতলা মস্ত বাড়ি, বড় বড় ঘর, ধবধবে সাদা দেয়াল বোধহয় বিয়ের জন্য নতুন করে চুন লাগানো হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া আমাদের বাড়ির রান্নাঘরে। দেখতে গেলাম 'পৈতৃক ভিটে' — মস্ত বড় চত্বর, যার ধারগুলো এবড়ো-থেবড়োভাবে ভাঙা, ভেতরে প্রচুর জায়গা। এখানে স্টেজ বেঁধে পারিবারিক থিয়েটার হতো যখন আমাদের বাড়ি ছিল ভরা। এবার বাবা-জেঠারা থিয়েটার করলেন, *মানময়ী গার্লস স্কুল*। শতরঞ্জির ওপর বসা ছাড়া কিছু মনে নেই, মনে থাকার কথা নয়। গেলাম দীঘি দেখতে, সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য থমকে দিলো, পুরানা পল্টনের দীঘি থেকে অনেক বড়। বকশীবাড়ির উঁচু উঁচু গাছ মনে পড়ে, বিশেষ করে নারকেল, সুপারি।

দিদি ছিলেন বড় জেঠামশায় ও তাঁর প্রথমা স্ত্রীর কন্যা। মাকে হারিয়েছিলেন যখন তাঁর দুবছরও হয়নি। ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, পিসিমা, কাকাদের আদরে বড় হয়েছেন, মাতৃহারা ছোট্ট মেয়ে। মেজ জেঠা ও বাবার অত্যন্ত প্রিয়, মায়ের সমবয়সী বন্ধু — ভাশুরঝি, দিদির বিয়ে হচ্ছে ধুমধাম করে। পুরো পরিবার একত্র হয়েছে, বহুকাল পর এ বাড়িতে হাসি ফুটেছে। বিয়ের রাতে মনে হলো পুরো গ্রাম এসে জড়ো হয়েছে বকশীবাড়িতে। হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি, মহিমালয় বিয়ের মণ্ডপ থেকে দূরে, শান্ত হয়ে ভাই ঘুমোতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিমালয়ের নিচের ঘরে সাজানো হয়েছে বিয়ের যৌতুক, আটটি বেনারসি কাতানের শাড়ি, খুলে দেয়ালে টাঙানো, গাঢ় রঙের ওপর আসল সোনা বা রুপোর লতাপাতা, ফুল। শাড়ি কখনো ভুলি না। এক গা গয়না পরে সেজেগুজে মুকুট পরে দিদি বসে রইলেন, মণ্ডপ বোধহয় পৈতৃক ভিটেতে, লগ্ন আসতে আসতে আমি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে।

দিদির বিয়ের ভোজে কী ছিল জানি না, তবে বরিশালের বিয়ের খাবারের গল্প করেছেন গৈলার কালুপাড়া সেনের বাড়ির দুহিতা, অনিতা সেন। ওঁরা থাকতেন জামসেদপুর, কখনো বরিশাল, গৈলা যাননি, কিন্তু ওঁদের রান্নার ঠাকুর ছিলেন বরিশালের, তাঁর কাছে শোনা গল্প।

প্রথমে আসত নানা রকমের ডাল, মুড়োর ডাল, পাঁচমিশালি তরকারি দিয়ে ডাল, অন্যান্য সবজি দিয়ে, এমনকি কচু বা মিষ্টি আলু দিয়ে ডাল, আমের ডাল, অন্তত পাঁচ রকমের ডাল। সঙ্গে ভাত। এরপর বিভিন্ন রকমের শাক, তরিতরকারি, চার-পাঁচ রকমের মাছ। সঙ্গে আবার ভাত। টক অবশ্যই। মিষ্টি, বরিশালের রসগোল্লা। খাওয়া শেষ — অতিথিরা উঠছেন, কন্যাপক্ষ থেকে কয়েকজন মিলে সজোরে হাত নাড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন,

বইসেন মশায়
বইসেন মশায়
আরো আছে গো
আরো আছে ।

AMARBOI.COM

একাধিকবার আশ্বাস পাবার পর নিমন্ত্রিতরা আশা নিয়ে আবার বসে পড়লেন। তখন

আইল কি? তিতার ডাইল ।[২৬]

ভেবে দেখলে মনে হয় ওই মাছ-মাংসের পর তেতোর ডাল তো মুখশুদ্ধি, এতে হাসবার কী আছে? তা ছাড়া বরিশালে তো ডাল দিয়ে খাওয়া শেষ হয়। দিদির বিয়েতে নেমন্তন্নের রান্না এরকমই হয়েছিল নিশ্চয়ই।

বাসন্তার জমিদারবাড়িতে বিয়ে হয়েছিল দিদির। তত্ত্বে যে গহনা এসেছিল তা মধ্যবিত্ত পরিবারের কল্পনার বাইরে। আট ভরি সোনার কান, পাঁচ ভরি সোনার টিকলি, গলায় ময়ূর বসানো সোনা-জড়োয়ার চিক। ময়ূর এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়ে, কত পুরনো কে জানে। গৈলা যাওয়া ছিল একটি অভিযান, সবার কত অভিজ্ঞতা হলো। বাবা, জেঠারা পুরনো স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন করে নতুন স্মৃতি নিয়ে ফিরলেন। মা প্রথমবার তাঁর আসল শ্বশুরবাড়িতে কদিন থাকলেন, প্রকৃতভাবে যেন বকশীবাড়ির বৌ হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদা সমীর সারা গ্রাম ঘুরে বেড়িয়ে, নতুন বীরত্ব দেখিয়ে আমাকে আরো অবাক করে দিলেন। আমার মনে কিসের স্মৃতি, যাকে বেশ আঁট করে মনে বেঁধে রেখেছি? একটি ময়ূরকণ্ঠী।

ষাটের দশকে দিল্লিতে পরিচিত গহনার দোকানে দেখি প্রায় সে রকম, 'প্রায়' কথাটি মনে রাখা দরকার, চিক — সোনার নয়, সস্তা মুক্তোয় গাঁথা রুপো, পাথর ও মীনা দিয়ে গড়া ওরকম ময়ূর — এ ময়ূরও এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়ায়। হাতছাড়া করতে পারলাম না, সে আমার গহনার বাক্সে বছর পঞ্চাশ ধরে সুখে বিরাজ করছে, সুখ বিতরণ করছে! মুক্তো গাঁথতে দিলাম, স্যাকরা তাচ্ছিল্য করে বললেন, 'মেকি মুক্তো, এ গহনার মূল্য নেই।' আমার কাছে সে কী মূল্যবান, অপরে কী জানবে?

২০০২-এর ২২ ডিসেম্বর ভাই আর আমি গৈলার পথে রওনা হলাম। একরাত গ্রামে থাকব, পৈতৃক ভিটে, বকশীবাড়ি যাওয়ার বড় ইচ্ছে। সঙ্গে চললেন অর্থনীতিবিদ এনামুল হক, পার্থর ছাত্রসম, ঢাকায় অধ্যাপনা করেন, আর গৈলার দাশের বাড়ির অজয় দাশগুপ্ত, তাঁর স্ত্রী, বুদ্ধিদীপ্তা, কৃষ্ণা চন্দ্র। এক সপ্তাহ আগে অজয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, আত্মীয়তা বুঝতে সময় লাগেনি — একই গাঁয়ের মানুষ তো, সম্পর্কে অজয় আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, কৃষ্ণা আমার 'নতুন বৌমা'। এনাম ও অজয় মিলে ভাঙ্গা, গৈলা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

ষাট বছর পর ভাইবোন দেশে যাচ্ছি — পাঁচ বছর পাঁচ মাস আর পাঁচ মাস বয়স থেকে আজ আমরা পঁয়ষট্টি আর ষাট; এত বছর পর গ্রামে যাবার অভিযান, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি চেষ্টা করলেও ব্যক্ত করা যায় না, তবু কিছুটা না লিখে পারছি না।

'বাসা' ও 'বাড়ি' শব্দ দুটির ব্যবহারের পার্থক্য আমার খেয়ালে আসেনি। ক'বছর আগে কন্যা রেহানা নিউ ইয়র্ক থেকে চিঠি লিখল, "এখানে আমার প্রতিবেশীরা বেশিরভাগ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। ওঁরা বলেন, 'বাসায়' যাচ্ছেন? কখনো 'বাড়ি' বলেন না। কেন?" উত্তর এলো নরেশদার (গুহ) কাছ থেকে :

রেহানার প্রশ্নের একটা উত্তর আমার মনে আসছে, তুমি তাকে জানিয়ো। রাজশেখর বসু তাঁর উৎকৃষ্ট প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী *চলন্তিকায়* লিখেছেন — বাসা মানে ভাড়াটে বাড়ি, lodging বা নীড়, nest যেমন পাখির 'বাসা', যেটা স্থায়ী বাসের জায়গা নয়। পূর্ব বাংলা থেকে লেখাপড়া করতে বা চাকরি করতে আমরা বাঙালরা যখন কলকাতায় আসতুম তখন কলকাতার থাকার জায়গাকে আমরা বলতুম 'বাসা'। আর বাড়ি ছিল পূর্ব বাংলায় 'পৈতৃক' ভিটে। এর মধ্যে একটা দুঃখবোধ লুকিয়ে আছে, যা রেহানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক বুঝবে না, কেননা পৃথিবী জোড়া প্রায় সবাই আমরা refugee, ঘরছাড়া, অনিকেত, মুসাফির।

আমি আর ভাই বাড়ি যাচ্ছি। কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয়নি। আমি ভিড়, কুয়াশা, লঞ্চের (বা স্টিমার) জন্য লাইনে অপেক্ষা করা, লঞ্চে ওঠা, ঝালমুড়ি, ডাব, প্রচণ্ড আড্ডা নিয়ে ব্যস্ত। বাইরের খাওয়া খাব না বলে সঙ্গে অনেক কিছু আনা হয়েছে, ওদিকে যেই ভাই বলল, 'খা, ঝালমুড়ি খা, কিছু হবে না', মনের আনন্দে দুই ঠোঙা খেয়ে নিলাম। পদ্মা নদী পার হতে মনে হলো, 'ইস, শেষ হয়ে গেল!' ছোটবেলা জাহাজ থেকে নামতে ঠিক এরকমই মনে হতো। শুরু হলো ধানক্ষেত, পুকুর, শ্যাওলা, গাছপালা, জীবনানন্দ দাশের খইরঙা হাঁস, ঝাউগাছ, শালিক, হিজল ঘাস। ঘোরের মধ্যে শুনছি চেনা নাম, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কোটালীপাড়া। এবারে থামা, টেকেরহাট এসেছি। রাস্তার দুপাশে গুড়ের থালা, সোনালি খয়েরি রঙের 'হাজারি গুড়'। এক যুগ আগে বরিশাল থেকে ৫নং-এ আসত বালাম[২৭] (নাকি বাদাম) চাল আর হাজারি গুড়।

গৌরনদী ছিল জলপথে যাতায়াতের কেন্দ্র, এখন তার প্রাধান্য কমে গিয়েছে, দোকান, পসার ভরা ছোট শহর — বীরভূমের বোলপুরও হতে পারত। রাস্তা আরো সুন্দর হচ্ছে, যতদূর চোখ যায় সবুজ শস্যক্ষেত, জল, এ সবুজ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। রাস্তার দু'ধারে উঁচু উঁচু গাছ, দুদিকের ডালপালা মিশে 'ক্যাথিড্রালের আর্চ' হয়ে গিয়েছে। পথিককে স্বাগত জানাবার তোরণ। গৈলা দূর নয়।

বেলা শেষ হতে চলল, হঠাৎ অজয়ের গলায় শুনলাম, 'এই তো স্কুল, গৈলা স্কুল।' পথে বড্ড দেরি হয়েছে, স্কুলের সবাই দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করে বাড়ি চলে গিয়েছেন, দরজায় তালা। দমবার পাত্র নই আমরা, রাস্তার পাশে চায়ের দোকান দেখলাম। ছোট্ট জায়গা, আছে শুদ্ধ ঘি, হালকা মাটি পোড়া রঙে মাটির ভাঁড়ে মিষ্টি দই, উলটে দিলেও পড়বে না, সন্দেশ আর চা। পাশে ছোট কাপড়ের দোকান। বেঞ্চে বসে চা, এত ছোট কাপ কখনো দেখিনি, তাও আবার অর্ধেক ভরা। দুই 'আধা' ঘন দুধ, মিষ্টির কড়া চা খেয়ে ক্লান্তি দূর হলো। বাড়িতে তো দুধ চিনি ছাড়া বিস্বাদ চা খাই। কাঁচা সন্দেশ ছেড়ে দেওয়া যায় না, গৌরনদীর দুধে আলাদা কিছু আছে, নাকি আমার বংশপরম্পরার রুচি অজান্তে আমার মধ্যে এসে গেছে।

এরপর ঝড়ের মতো নানা কিছু হলো। আইগলঝাড়ার ডাকবাংলোতে থাকার ব্যবস্থা, ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। মনে হলো ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গেলাম, এত গাছপালা, রাস্তা ভালো। নামেই ডাকবাংলো, পাঁচতারা আরাম। ঢুকে বিশ্বাস হলো না — যারা স্কুলে অপেক্ষা করছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই এখানে, টেবিল ভরা মিষ্টি। বরিশাল, গৌরনদী থেকে এসেছেন প্রেসের ছেলেরা — ফটো, মাইক, সমারোহ। অজয় তার স্যার পার্থ কাকুর জন্য কিছু বাদ রাখেনি, মুশকিল হলো স্যার পার্থকে বাংলায় ভাষণ দিতে হবে। চুপি চুপি আমাকে বলল, 'এই, তোর দিকে তাকালেই শব্দটা বলে দিবি।' বেশি শেখাতে হলো না। বংশধরের কথা বলে মাতিয়ে দিলো। হৈচৈ গল্পগুজবের পর হলো পাঁচতারা খাওয়া। গৈলাতে দুটি ভোজ হলো, সবকিছু উপাদেয়, অসাধারণ; আমার চোখের সামনে আছে অজয়দের বাড়ি, পরের দিন পাবদা মাছের দৈর্ঘ্য আর ডাকবাংলোর কই মাছের দৈর্ঘ্য। শুনেছিলাম আমন চাষ[২৮] বন্ধ হওয়ায় কই মাছ বড় হয় না, স্বাদ কমে গিয়েছে। আজগুবি গল্প। আইগলঝাড়া-গৈলার মুরব্বি ভদ্রলোকরা নিজেরা দাঁড়িয়ে তদারক করলেন, জীবনে এমন হার্দিক আপ্যায়ন খুব কম পাওয়া যায়।

যেটা কখনো ভাবিনি, অজয়ের পরিবারের মতো ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র ও রাঘবেন্দ্র দাশের বংশের বেশ কয়েক বাড়ি এখানে রয়ে গিয়েছে, ছাড়বার কথা ভাবেনি। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে ভাগ নিয়েছেন, গৈলাকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে রক্ষা করার জন্য মুসলমান ভাইদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন এবং এ কাজে সফল হয়েছেন। এমন দুজন, কবিরাজবাড়ির মিহিরবাবু ও রামনাথ দাশের বাড়ির দুলালবাবু পুরো সময়টা সঙ্গে রইলেন। রইলেন সঙ্গে আইগলঝাড়ার নীলকণ্ঠ বেপারী, কবি বিজয় গুপ্তর ওপর গবেষক। রাত বেশি হতে এঁরা চলে গেলেন, আমরা ডাকবাংলোর চারদিকের ঘন গাছ, জঙ্গলের সামনে নীল আকাশের নিচে আড্ডা দিলাম প্রেসের ছেলেদের সঙ্গে। কৌতূহল আছে, মেধা আছে, প্রশ্ন করে নতুন কিছু শিখতে চায়। আমাদেরও শিখবার আছে, গ্রাম সম্বন্ধে, বরিশাল সম্বন্ধে কতটুকু জানি? শীতের রাতের আমেজ, আন্তরিক আড্ডা, এ সুযোগ বারবার আসে না।

পরদিন সকালে স্কুল পরিদর্শন করব ভেবে গেলাম। কী জানি কোন ঘরে বাবা বসতেন, জেঠারা বসতেন? গিয়ে দেখি বিরাট অভ্যর্থনা, সংবর্ধনা। স্কুল ছুটি দিয়ে শামিয়ানা টানিয়ে অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত। আগের রাতের পরিচিত অনেকেই এখানে। গৈলার মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা আছে, একবারও মনে হয়নি আমরা বাইরের। কর্তৃপক্ষ থেকে ভাষণ দেওয়া হলো গৈলার বিখ্যাত সন্তান, অমিয় কুমার দাশগুপ্তর দুই সন্তানকে স্বাগত জানিয়ে। আজ ভাইয়ের বাংলা অপেক্ষাকৃত সাবলীল, বলল, 'দ্যাখ, আজ কিন্তু তোর দিকে বেশি তাকাতে হয়নি।' ছোট ভাই ছোটটি থেকে যায়।

মোহিত করল গান। লাল পাড় হলদে শাড়ি পরে শীতের ঝকঝকে সকালে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল মেয়েদের। ছেলেমেয়ে সমবেত, দ্বৈত, একক সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি। একটি মেয়ের কণ্ঠের 'আলো আমার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো আমার, আলোয় জীবন ভরা' আমি ভুলিনি, আজো কানে বাজে। মনের মাঝে শুনতে পাই, বৃদ্ধ বয়সের দিনগুলো আলোয় ভরে দেয়। এমনই অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই ননীমামা গাইতেন, বাবা তবলা বাজাতেন। গান শেখান শ্রী রায় (নামটা জানা হয়নি)। এমন শিক্ষক পাওয়া সৌভাগ্য। পরে এক পত্রিকায় ছবি দেখেছিলাম সুনীল গুপ্ত মেসো, তবলা ও হারমোনিয়ামের সঙ্গতে শাস্ত্রীয় সংগীত গাইছেন গ্রামের অনুষ্ঠানে। গৈলাতে সংগীতের ধারা অটুট।

চা, সন্দেশ, রসগোল্লার সঙ্গে প্রিন্সিপাল বেলায়েত হোসেন ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা হলো। প্রিন্সিপাল ছাত্রবৎসল, দূরদর্শী, ছাত্ররা মেধাবী, ভালো শিক্ষক পাওয়া মুশকিল। জগৎটা বদলে গিয়েছে, সবার নজর শহরের দিকে। তাও দক্ষতার সঙ্গে স্কুল চালাচ্ছেন। এখানে শৃঙ্খলার সমস্যা আছে মনে হলো না। শিক্ষকদের মধ্যে উদ্যম আছে, পেশা মাসকাবারের মাইনের জন্য নয়, নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা দেবার লক্ষ্য আছে। এ উদ্যম গুজরাটে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

স্কুল প্রাঙ্গণ ভরা, প্রাক্তন বৃদ্ধ ছাত্রদের সঙ্গে রয়েছে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা। এগিয়ে এলেন ওয়াজিদ সর্দার, পাতলা-ছিপছিপে, লম্বা, শেরোয়ানি পরা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, সোজা দাঁড়ান, চলেন — বয়স ১০১ বছর; বাবার থেকেও বড়। বললেন, 'আপনার বাবাকে আবছা মনে পড়ে, লেখাপড়ায় ভালো, দুষ্টু ছিল ছোটবেলায়।' সেই দুষ্টুমি। কৈলাস সেন মহাশয়ের স্মৃতিসৌধ দেখতে নিয়ে গেলেন, মনে পড়ল ঠাকুর্দামশায়ের শ্রাদ্ধে বাবাকে দেখিয়ে কী বলেছিলেন। 'এই ছেলেটার মাথা চিরকালই ভালো তবে শুধু খেলাধুলায় মন। লেখাপড়ার দিকে টেনে আনতে সময় লেগেছে। ভালো ভালো বই পড়িয়ে, শুনিয়ে পড়াশোনায় মন বসিয়েছি।'

আরো কত প্রাক্তন ছাত্র এলেন, কেউ বললেন বকশীবাড়ির কথা, পুরনো দিনের জনবহুল, সমৃদ্ধ গ্রামের কথা বা জানতে চাইলেন আমাদের কথা। দুই বৃদ্ধ বললেন, 'আমরা আপনাগো প্রজা।' কী জানি, হয়তো আমাদের এক ফালি জমি ছিল। প্রজা বললে কী হবে, আজ ওঁরা আমার নমস্য। গৈলাতে বিবিধ সমাবেশে পেলাম আন্তরিকতা, দেশের ছেলেমেয়ে বাড়ি ফিরেছে, তাদের নিজের করে নেওয়া। দুর্লভ এ ভালোবাসা।

এতজন একত্রিত, লক্ষ করলাম, চতুর্দিক পরিচ্ছন্ন, একটি কাগজের টুকরো কোথাও উড়ে নেই; পোশাক-পরিচ্ছদ সবার ধবধবে সাদা, কোনো মালিন্য নেই। স্কুল ছাড়তে কষ্ট হলো নিশ্চয়ই, স্মৃতি রইল একটি ভদ্র, পরিচ্ছন্ন সমাবেশের, বহুদিন যেন এমনটি পাইনি।

আব্দুল মান্নান স্কুলে বাংলার শিক্ষক, দিদিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিঠি লিখতেন, নিজের লেখা কবিতা পাঠাতেন। গ্রামের খবরাখবর দিতেন। অবসর নিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল, ওঁকে খুব স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করি। ফিরে এসে প্রিন্সিপাল সাহেবকে চিঠি লিখেছিলাম, সে চিঠি উনি পুরো স্কুলকে পড়ে শুনিয়েছেন, জানালেন ভাই মান্নান। ২০০৩-এর জুলাইতে বাবার শতবর্ষ স্কুলে উদ্‌যাপন হয়েছে সে কথাও উনি জানালেন। গৈলা গ্রামের সঙ্গে বাবার ছিল আত্মার টান, এত বছর হয়ে গেল গৈলাবাসী তাঁকে গর্বের সঙ্গে সন্তান করে রেখেছেন।

এবার গ্রামের পথে পায়ে চলা। যাব বকশীবাড়ি। আমি মনকে শক্ত করেছি, আবেগ আসতে দিলে যদি ঝরনার মতো বয়ে যায়? সঙ্গে অনেকে, বয়স্ক, মধ্যবয়সী, বাচ্চারা — নিয়ে গেলেন যেখানে ছিল তিন হাউলি, তিন চণ্ডীমণ্ডপ, জ্ঞাতি আত্মীয়স্বজনের কাকলি, কোলাহল, হয়তো বা মাঝেমধ্যে কলহভরা বকশীবাড়ি। সে এখন বুনো ঘাস, বাঁশবনের জঙ্গল বা পোড়ো জমি। বিচারঘরের উঁচু দেয়ালে শ্যাওলা, ইটের মাঝে অশ্বত্থের জট। হাজারখানেক লোকের থাকবার মতো বিবিধ দালানের অবশিষ্ট একটি খণ্ডর, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাওয়া যায়। হয়তো এটাই ছিল আমাদের বাড়ি। ছাদ থেকে দেখতে পেলাম গ্রামের শোভা, জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'। মনের চোখে দেখলাম হেলেঞ্চার ঝোপ, হিজল, জামরুলগাছে বসা চিল, ঝাউগাছ, গঙ্গাফড়িং, কাঁঠাল, জাম, বট।

বকশীবাড়ির শেষপ্রান্তে আছে একটি নতুন বাড়ি, একটি আবাস যার নাম একসময় ছিল 'মহিমালয়'। গ্রামবাসী কেউ কিনে তাঁদের পছন্দমতো বানিয়েছেন। আত্মীয়তার সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। নারকেলগাছের পাতার দোলায় বারান্দায় রোদ, ছায়া; আমাদের বাড়ির দিকের শূন্যতা, নির্জনতা আঘাত দিলো। হঠাৎ বাইরের কয়েকজন এসে বললেন, 'আসেন, ডাবের জল খান। এই অনেক আনছি — ঢাকা লইয়া যান। আপনাগোই তো জিনিস, আমরা সামলাইতেয়াছি।' ভদ্রতা থেকে বলা নয়, মন থেকে বলা। বকশীবাড়ির দুই ছেলেমেয়ে তাদের ঐতিহ্যকে সম্মান করে, মানুষদের নিজের ভাবে, সে কথা এঁরা কদিন আগেও জানতেন না, তাও এই আত্মীয়তা।

কাষ্ঠপুত্তলি হয়ে থাকব ভেবেছিলাম, পারিনি। পুরোদিন মনে ঘুরল, বাবা এই পথে বছরের পর বছর হেঁটেছেন, এইসব মাঠে ছোটাছুটি করেছেন, এই স্কুলের ঘরে লেখাপড়া করেছেন, বাড়ি নাইবা থাকুক এই জমিতে তাঁর মায়ের কোল ঘেঁষে থেকেছেন, বাবার ছোটবেলার ছবি মনে এলো। আর সেই অর্বাচীন ভাবনা, 'আহা, আমি যদি তখন থাকতাম, বাবাকে খেলতে, দৌড়োতে, দুষ্টুমি করতে দেখতে পেতাম।'

'ফেরা' নিরাশ করতে পারে, নিরাশ হইনি। গ্রামের অবক্ষয়ের কথা বলা হয়, গৈলার শান্তিপ্রিয়, পরিচ্ছন্ন, সম্প্রীতি ও শিক্ষা অনুরাগী জীবনে অবক্ষয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিনি। ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে, আর 'ফেরা' হবে না।

বংশপরম্পরার চত্বরটি, যার ভগ্নাবশেষ প্রথমবার গৈলা গিয়ে ছুটে দেখতে গিয়েছিলাম, যার ওপর স্টেজ বেঁধে বাবা, জেঠামশায়রা নাটক করতেন, অনেক খুঁজলাম। সে আজ নিশ্চিহ্ন। ওটা 'বংশের তিলক' ভেবে রাখা হতো, তা 'তিলক'রা তো আজ এক যুগ ধরে শিকড়হীন, ঘরছাড়া। ঘর আমরা ছেড়ে গিয়েছি, কাকে কী বলব?

মিহির সেনগুপ্তর *বিষাদবৃক্ষ* পড়ে মনে হয়েছিল 'পিছারার খাল' কাহিনির নায়ক। এমনই ছিল বকশীবাড়ির পেছনের 'পুখইর', যা খাল দিয়ে নদীপথে যেত। এখান দিয়ে ষাট বছর আগে আমাদের দিদি, বাড়ির বড় মেয়ে, মুকুট পরে, আট ভরি সোনার 'কান', পাঁচ ভরির টিকলি, ময়ূর বসানো জড়োয়ার নেকলেস আর বেগুনি রঙের বেনারসি পরে ছোট্ট নৌকোতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। আমার পাঁচ বছরের মনে রূপকথা মনে হয়েছিল, সে রকমই রয়ে গিয়েছে।

সে পুকুর এখন শুষ্ক ভূমি। অনেক পুকুরই শুকনো, আগাছায় ভরা, ঘোলাটে।

> 'যারা চলে গিয়েছিল
> তাদের সঙ্গে কত কী চলে গিয়েছিল
> দিঘির রং ধূসর হয়েছিল।'[২৯]

AMARBOI.COM

তবু গ্রাম সুন্দর, স্নিগ্ধ — পায়ে চলা পথ ইতিহাস-জড়িত — আমাদের বংশের চারশো বছরের ইতিহাস।

ফিরে এসে সুনীল গুপ্ত মেসোকে গৈলার অভিজ্ঞতার কথা লিখলাম। চিঠির উত্তরে উনি লিখলেন।

> (০৭/০৫/০৩)
> তুমি ঝড়ের বেগে এসেছিলে আবার ঝড়ের গতিতেই চলে গিয়েছো। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না। এখানেই জমাট বাঁধা দুঃখ — তোমার আমার সকলের।

যতই দেশবিভাগ হোক, বাড়ি খণ্ডর হোক, ওই খণ্ডর, ওই গৈলা-বকশীবাড়ি আমার পরিচয়। আমার ঘরে বাবা-মা ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ছবির পাশে বকশীবাড়ির মাটি রাখা রয়েছে। মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে, '(তবু) তুমি থেকো, দুটি কথা ক'এয়ো, ভুলে যেন দূরে যেও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. *গৈলার কথা*, পৃ. ক
২. ঐ পৃ. ১৯
৩. ঐ পৃ. ২০৯, *গৈলার কথা* ও *আমাদের বংশ তালিকাতে* পার্থক্য আছে।
৪. *মনসামঙ্গল কাব্য*, পৃ. ৪। 'মানুষের মঙ্গলের জন্য এই কাব্য পাঠ হয়, তাই মঙ্গলকাব্য'। মতান্তরে মনসার গান এক মঙ্গলবার আরম্ভ করে পরের মঙ্গলবার সমাপ্ত করতেন বলে মঙ্গলকাব্য নামে অনেকে অভিহিত করেন, লিখেছেন গিরীন্দ্রনাথ দাস পৃ. ২৬-২৭
৫. কমল চৌধুরী, পৃ. ৪৮১
৬. *মনসামঙ্গল কাব্য*, পৃ. ৪
৭. কমল চৌধুরী, পৃ. ৪৮৩
৮. *গৈলার কথা*, পৃ. ২০৮
৯. সৌজন্য কেয়া সেনগুপ্তা
১০. হরিজেঠার কথা বিশদভাবে 'ওয়ারী' পরিচ্ছেদে আছে।
১১. *গৈলার কথা*, পৃ. ২০৯-১০
১২. শ্রী জয়ন্ত কাঞ্জিলাল ঢাকাতে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উচ্চপদে ছিলেন, ট্রাস্ট বানাবার সবকিছু উনি করেন। ওঁর সাহায্য না থাকলে টাকা পাঠানো ইত্যাদি সম্ভব হতো না। স্টেট ব্যাংক থেকে এখনো সাহায্য পাওয়া যায়। আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।
১৩. ওঁ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশম্
ত্বমেকং জগৎ কর্তৃ-পাতৃ প্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরম নিশ্চলং নির্বিকল্পম ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো
বয়ন্ত্বাম্ভজামো
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং
নমামঃ ॥

দ্বিতীয় প্রার্থনা বাংলায়
তোমার করুণায় নাথ,
সকলই হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্বত সম
বাধা যায় দূরে।
প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যে এই দুটি প্রার্থনা করলে মনে শান্তি আসে, বলতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়েদের। এই মন্ত্রের বলে ও আশ্বাসে হয়তো উনি জমিজমা হারিয়ে দারিদ্র্যজীবন শান্তি ও ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

বরিশালে ওঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি এন্ট্রান্স পাশ, ষাট টাকা মাইনেতে চাকরি করেন, রজনীবাবু (রজনীকান্ত দাশ) এন্ট্রান্স পাশ করেননি, ওকালতিতে অন্তত এক হাজার টাকা মাসে রোজগার করেন, আপনার ঈর্ষা হয় না?' ঠাকুর্দামশায়ের উত্তর, 'রজনীকাকার সঙ্গে হিংসা-রেষারেষি কেন থাকবে? আমিও তো সুখ-শান্তি নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। দারিদ্র্য আমাকে শক্ত করেছে, নিত্য পরম পিতাকে স্মরণ করতে শিখিয়েছে। ঈর্ষা কেন করবো?'

১৪. ই-মেইল, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৬

১৫. পাঠান্তরে অর্থের পার্থক্য আছে

যেই জল ছোঁয়নালো
　　কাগে আর বগে
সেই জল ছুঁইলাম মোরা
　　দুব্বার আগে।

দ্রষ্টব্য　মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, পৃ. ১১১

১৬. *গৈলার কথা*, পৃ. ৬৯

১৭. *মনসামঙ্গল কাব্য*, পৃ. ৪

১৮. *গৈলার কথা*, পৃ. ৫৬

১৯. 　　　পৃ. ৫৭

২০. আমাকে বলেছিলেন কবীন্দ্রবাড়ির বিশ্বপতি দাশগুপ্ত যাকে 'মেজদা' বলে ডাকতাম।

২১. কথোপকথন, কবীন্দ্রবাড়ির দুহিতা, পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা, চিত্রিতা দেবী। পুনে, জানুয়ারি ২, ২০০৪। কলকাতায় থাকলেও উৎসবে মাঝে মাঝে গৈলা যেতেন।

২২. কথোপকথন　কবীন্দ্রবাড়ির অংশুপতি দাশগুপ্ত ও মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪।

২৩. এছাড়া অন্য রূপও পাওয়া যায়।

২৪. *গৈলার কথা*, পৃ. ১৩৪

২৫. তপন পিপলাই, পৃ. ৫৮

২৬. অনিতা সেন, বাবার স্কুলের সহপাঠী নলিন সেনের কন্যা, ছাত্র সমররঞ্জন সেনের স্ত্রী।

২৭. তপন পিপলাই লিখেছেন 'বালাম', আমার স্মৃতিতে 'বাদাম'।

২৮. বহুকাল আগে (১৯৬৮) ভারতে উত্তর প্রদেশে বিজনোরের কাছে একটি পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়েছিলাম। আমন চাষ সেখানে নেই, চাষে মন বসল না।

২৯. কবি আলোক সরকার　*শোনো জবাফুল* থেকে। কালীকৃষ্ণ গুহ, অক্ষয়বটের দেশ, আরেক রকম ১-১৫, বৈশাখ, ১৪২৪, পৃ. ৫৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

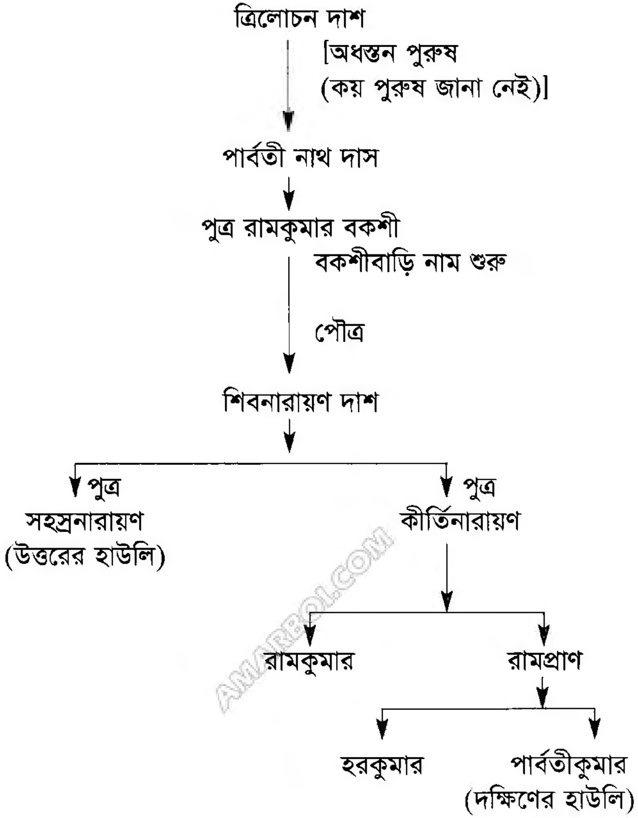

[তৃতীয় হাউলি কাদের ছিল জানা নেই। এক বাড়িতে বিভিন্ন হাউলি কীভাবে শুরু আন্দাজ পাওয়া যায়। শিবনারায়ণ দাশ অবধি বসতবাড়ি ভিন্ন হলেও বকশীবাড়িতে হাউলি একটি। পরিবারের জনসংখ্যা বাড়ে, সম্পত্তি ভাগ হয়, একই বাড়িতে একাধিক হাউলির সৃষ্টি হয়, চণ্ডীমণ্ডপ আলাদা হয়।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ-অধিকরণ-ওয়ারী

স্মৃতিকে সততই সুখের, মধুর বলা হয়, হয়তো তাই। সময়ের ব্যবধানে ভালোটাই ছেঁকে তুলি। আমার স্মৃতি যতটা শান্ত পরিবেশের ছবি আঁকে, বড়দের কাছে তা ছিল না। যে সময়কার কথা লিখছি তখন আমাদের ছোট্ট পরিধির বাইরে হিংসা, অভাব, অশান্তি রাজত্ব করছিল। অনেক দুঃখ, অনেক মৃত্যুর সামনা করেছে মানুষ, আমরা ছোটরা দেখতে পাইনি, বুঝতে পারিনি। ১৯৪৩-এ এলো দুর্ভিক্ষ, বাবা রোজ পাংশুমুখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে পথে কী হাহাকার, মৃত্যু দেখে এসেছেন, মাকে বলতেন। একদিন এসে এক বৃদ্ধার কথা বললেন; কঙ্কালসার বৃদ্ধা ফেনের জন্য ঘুরে ঘুরে গাছের তলায় পড়ে মরে গেলেন। আমার এক দিদি বরিশাল থেকে লিখলেন, 'রোজ দু'বেলা একমুঠো ভাত কম খাবে।' তাই করলাম, কতটা সাহায্য হলো জানি না। বরিশাল থেকে ১৫-৯-৪৩-এ চিঠি দিচ্ছেন গৈলা বকশীবাড়ির প্রভাত, 'কয়েকদিন হয় শ্রীমান শ্রীমন্ত (বকশীবাড়িতে বাবাদের জ্ঞাতি ভাই) বাড়ীতে যাহাদের খুব অভাব, যাহারা দুই বেলা খাইতে পারে না, তাহাদের এবং গুরুঠাকুরের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পঞ্চাশ টাকা আমার নিকট পাঠাইয়াছে এবং তোমাদের সকলের নিকট চিঠি দিতে লিখিয়াছে। শ্রীমান অতুল (আমার বড় জেঠামশায়) দেড় মণ চাউল দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তাই সকলের কাছে লিখিতেছি যে তোমরা সকলে যদি কিছু কর তবে এই দুর্দিনে তাহাদের প্রাণ রক্ষা পায়। আমি ইহাদের জন্য অস্থায়ীভাবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে চেষ্টা করিতেছি। শীঘ্রই কাজ শেষ করিয়া বাড়ী (গৈলা) যাইব।'

আশ্চর্য — গ্রাম গৈলাতেই পাঁচ মাস আগে বকশীবাড়ির ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিস্যা, আমরা পুরো পরিবার, গ্রামের সবাইকে নিয়ে কত আনন্দ করেছি দিদির বিয়েতে। গ্রামের জীবন ছারখার হতে সময় লাগে না।

১৯৪৩-এর ২ নভেম্বর অর্থনীতিবিদ জে. জে. অন্‌জারিয়া বোম্বাই থেকে বাবাকে লিখছেন, 'তোমাদের ওদিককার অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে পড়ে অত্যন্ত চিন্তিত আছি। এই যে টনে টনে বস্তা বস্তা শস্য পাঠানো হচ্ছে, শুনছি কলকাতাতে এবং বাংলার অন্যান্য জায়গায় ঢেলে দেবার জন্য, সেগুলি আসলে যাচ্ছে কোথায়? তার কী হচ্ছে? আমাদের খাদ্য সমস্যা ও গ্রামের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছি এবং নানা জায়গায় লিখছি, তবে তাতে কী লাভ হবে জানি না।... দেশের অবস্থা দেখে বিমর্ষ হয়ে যাই, আবার যখন রাজনৈতিক দিক (অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম) দেখি, উৎফুল্ল হয়ে যাই। তোমার কী মনে হয়, আমরা কি কখনো স্বাধীন হব? শুধু রাজনীতির দিক থেকে নয়, সমাজব্যবস্থার দিক থেকেও।'

আশালতা সেন, তাঁর জীবনীতে লিখছেন, '১৯৪৩ সালে আমি যখন (ভারত ছাড়ো) আন্দোলন করে জেল থেকে বের হয়ে এলাম তখন সারা বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছে। এই দুর্ভিক্ষ পুরোপুরিই মানুষের তৈরি। জাপানী সৈন্য বাংলার সীমান্তে এসে পড়েছে। শত্রুর হাতে যাতে না পড়ে এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অনেক নৌকা নষ্ট করে ফেললেন। খাদ্য আমদানী বিশেষভাবে বাধা পেল। ভারতের মোট ফসল, আগের বছর থেকে ভাল হলেও, বাংলায় ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিল। আমি অর্দ্ধাহারী, অনাহারীদের খাদ্য বিতরণের কাজে লেগে গেলাম।'[১] 'নৌকো নষ্ট' থেকে অন্‌জারিয়ার প্রশ্ন, 'কোথায় যাচ্ছে সব শস্য', তার উত্তর পাওয়া গেল।

আমাদের পাড়া ছিল ভেতরের দিকে, মাঠ দিঘি পার হয়ে, এতদূর হেঁটে অনাহারে জর্জরিত মানুষ আসতে পারতেন না। এই দুর্দিনের প্রত্যক্ষদর্শী আমি ছিলাম না। কিন্তু কী ভয়ানক ক্ষুধা নিয়ে তারা একটু ফেন বা খুদের আশায় বাঁচার চেষ্টা করছিল ও অসফল হচ্ছিল, সেটা ওই ছোট বয়সে আন্দাজ করতে পারতাম।[২]

যুদ্ধ চালু, শোনা গেল রেশন হবে। যাদের জমা টাকা ছিল বাজারে গিয়ে ধানের গোলা ভরার মতো জিনিস কিনে ট্রাঙ্ক ভরলেন। মাকে একজন বললেন, 'মার্কিন আর লংক্লথের যতগুলা থান পাইলাম নিয়া আসলাম।' কতটা কাজে লাগল জানি না। কেউ হয়তো কিছু চাল ডাল কিনে রাখলেন। মাস্টারমশায়দের পুঁজিও নেই, জিনিস জমা করবার প্রবৃত্তিও নেই। আমাদের সবার গোলা খালি রয়ে গেল, চলল খাদ্য সংগ্রহের লড়াই। মার্কিন লংক্লথের কথায় মনে পড়ল ১৯৮০-র দশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লন্ডনে দেখা এক পুরনো জিনিসপত্রের বাজার। এক বাড়ির জঞ্জাল অন্য কোনো সংসারের শখের সামগ্রী, এই ভেবে বাজার বসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত পেয়ে চীনদেশ থেকে কেউ নিয়ে এসেছিলেন চীনে সিল্কের একটি বিরাট থান, সঞ্চয়, যদি কখনো কাজে লাগে। কেউ খুলেও দেখেনি। কোনো বিত্তশালী মহিলার মৃত্যুর পর নিলামে কুড়িয়ে পাওয়া দামে কেনা, চড়া দামে বিক্রি করা। আনকোরা নতুন থান, হালকা সোনালি রং, দেখতে বড় সুন্দর — খুললে শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবে।

যুদ্ধের মধ্যে সবই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্জয় দামের। রেশনের কলেছাঁটা চাল দুর্গন্ধে খাওয়া যেত না, রেশনে কখন কী পাওয়া যাবে তাও জানা যেত না। বাজারে সুজি নেই, সুজি তো শখের খাবার, প্রয়োজনও নেই। কোথা থেকে কেউ অল্প এনে দিলেন, তাই দিয়ে তৈরি হলো সুজির রুটি। আমাদের তিন ভাই-বোনের মধ্যে ভাগ করে দিলে তার পরিমাণ এমন হলো যে, স্বাদ বুঝতে পারার আগেই শেষ হয়ে গেল। 'থিন অ্যারারুট' বিস্কিটের জন্য বসে থাকতাম কবে পাওয়া যাবে। গোল বিস্কিটের ধারটা ছিল ঢেউ কাটা (scalloped); একটি একটি ঢেউ আলাদা করে ভেঙে প্রথম আস্বাদন, তারপর সেই গোলাকৃতি বিস্কিটে। দাদাতে-আমাতে 'রেস' ছিল, slow walk-এর মতো, কে বেশি সময় নিতে পারে শেষ করতে, এমন মূল্যবান জিনিস তো সচরাচর পাওয়া যায় না। পয়সা বিস্কিট পাওয়া যেত, পয়সার মতোই ছোট আর এক পয়সায় অনেক। যতীনদা নিয়ে আসতেন: লুফে নিয়ে নিতাম। আমাদের তো এসব টুকটাক পেলেই মজা, লুচি-বেগুন ভাজা যতই সুস্বাদু ও লোভনীয় হোক, সেটা তো গম্ভীর ব্যাপার, খেলা নয়। অপূর্ব সুন্দর ছিল 'বুড়ির মাথার পাকা চুল', কী ফুরফুরে গোলাপি রং! ফেরিওয়ালা নিয়ে আসত, বাইরের জিনিস খাওয়া মানা ছিল, আজো এর স্বাদ জানি না।

যুদ্ধের সময় অন্য গুরুতর সমস্যা, 'ভেজাল', শর্ষের তেলে ভেজাল। শোনা গেল শর্ষেক্ষেতের আগাছা 'শেয়ালকাঁটা' মিশিয়ে তেল বানানো হচ্ছে। ঘরে ঘরে শর্ষে তেলের ব্যবহার, সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ল হাত-পা নিঃসাড় করে দেওয়া ব্যাধি 'বেরিবেরি'। শুদ্ধ বা ভেজাল কী করে বোঝা যেত জানি না, আমরা কীভাবে রোগমুক্ত ছিলাম তাও জানি না, তবে চল্লিশের দশকের প্রথমভাগে বেরিবেরির ভীতি পরিষ্কার মনে আছে।

খেলনাপাতি পাওয়া যেত না — মেলা থেকে আনা ভেঁপু, বাঁশি, তীর-ধনুক, একতারা যা যিনি বিক্রি করেন তিনি ছাড়া কেউ বাজাতে পারেন না — মাটির পুতুল আর বাবার তৈরি উলের বল ছাড়া। মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে পেতাম চিনির পুতুল, হাতি, ঘোড়া, পাখি, কতকিছু। খাওয়া-খেলা দুই-ই। খেলা নিজেদেরই করে নিতে হতো। আমার একটা লোমওয়ালা লাল ভালুক ছিল, তাকে আমি এত ভয় পেতাম, কোনো কাজে লাগত না। নিজেরাই পুতুল বানিয়ে নিতাম, তাতেও আনন্দ ছিল। দুটি লম্বা কাঠি ক্রসের মতো বেঁধে পুতুলের কাঠামো হতো। পুরনো শাড়ির টুকরো দিয়ে গোল মাথা, তাতে কাজল দিয়ে চোখ-নাক আঁকা। আঁকার হাত ভালো থাকলে দেখতে বেশ হতো। এদের শাড়ি, জামা, ধুতি, পাঞ্জাবি বড়রা বানিয়ে দিতেন। পুতুলনাচের পুতুলের (পাপেটের) মতো দেখতে বলে এদের দিয়ে পুতুলের বিয়ে দেওয়া যেত না। তার জন্য বড়রা বানিয়ে দিতেন বড়মাপের পুতুল, ভুরু, নাক, কান, ঠোঁট হতো কালো, লাল রঙের সুতো দিয়ে সেলাই করা। শাড়ি, গয়না দিয়ে সাজাতে হতো। বর সাজাতে হলে আরো ঝকমারি, কোঁচানো ধুতি কি সোজা কথা? আমার, কৃষ্ণার এছাড়া কিছু ছিল না। শুনেছি বিলেতে কথা বলে, কাঁদে এরকম 'ডল' পাওয়া যেত — আমাদের নেই বলে কিন্তু আক্ষেপ ছিল না। যা দেখিনি তার ওপর লোভ কী করে করি?[৩]

অনেক কষ্ট করে, এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে বাবা ভাইয়ের জন্য দুধের পাউডার Lactogen নিয়ে আসতেন নবাবপুর থেকে। বড়দের যতই অসুবিধে হোক, আমাদের দৌরাত্ম্য কম হয় না। এই দুধের পাউডার অত্যন্ত সুস্বাদু, আমাদের হাত থেকে বাঁচানো সোজা কথা নয়। পাওয়া যায় না, তাই Lactogen-এর টিনের কাছাকাছি যাওয়া মানা; কিন্তু আমাদের চোখ সেই গাঢ় নীল-সাদা টিনের ওপর, কোনোমতে মায়ের চোখ এড়িয়ে দাদা যদি একটু বের করে নিতে পারেন। দাদার আঙুল মোলায়েম; মোলায়েম হলে কী হবে — দু'একবার পার পেয়ে গেলেও একদিন গোটা টিনটাই মাটিতে পড়ে গেল। কাদের কীর্তি সেটা বুঝতে কারো বাকি রইল না। সেদিন অতি লোভ হয়েছিল, দ্বিতীয় চামচ নিতেই এই অবস্থা!

ছোটবেলায় দাদা এরকম আরো ভয়-ডরহীন কাজ করতেন। আমরা ওয়ারীর বাড়িতে — পাশের বাড়িতে শান্তিনিকেতন থেকে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এসেছেন। মায়ের হাতের সন্দেশের নাম ছিল, ভাবলেন ঋষিতুল্য মানুষ ক্ষিতিদাদুর জন্য সন্দেশ নিয়ে যাবেন। দুধ পাওয়া সহজসাধ্য নয়, তাও জোগাড় করে যত্ন নিয়ে সন্দেশ বানিয়ে পাথরের রেকাবিতে রেখে অন্য কাজে গেলেন — ঠাণ্ডা হলে দিয়ে আসবেন। কাজ সেরে রান্নাঘরে এসে দেখেন সন্দেশ দশটি জায়গামতো আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি খুঁটে খাওয়া। দাদার কাজ, ভেবেছিলেন একটা গোটা মিষ্টি নিলে মায়ের নজরে পড়বে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকটি কিঞ্চিৎ বিকলাঙ্গ হলে নজর এড়ানো যাবে!

এই দুষ্টুমি করা দাদা সমীর মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যেতেন। ভাইয়ের জন্ম হলো ১৭ নভেম্বর, ১৯৪২। মনে পড়ে ঠিক পরের দিন, বাড়ি ভরা আত্মীয়স্বজন, দাদা আলাদা করে আমাকে বসার ঘরে নিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'বুঝলি, চিন্তায় পড়েছি — সমস্যা আছে। ভাবছি ভাইটাকে stamp collect করতে শেখাব কিনা — এটা ঠিক করতে পারছি না। তুই কী বলিস?' দাদার দশ বছর, আমার পাঁচ।

ভাই তার দশ বছর বয়সে মনোযোগ দিয়ে stamp সংগ্রহ করত। এ গল্প ভাইতে-আমাতে অনেক সময় হয়। পুরানা পল্টন ফিরে যাই, ওর যদিও ঢাকা মনে নেই।

যুদ্ধকৃত সমস্যা আমাদের জীবনকে বছরের পর বছর আঘাত করেছে, মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অন্য বেদনাদায়ক সমস্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হঠাৎ করে শুরু হতো, কাবু হতেন সবাই, কিন্তু এও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। নির্মমতার ব্যথা ছাড়া ছিল দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তা, চিন্তা, কখন কী হবে। হঠাৎ করে শুরু হয়ে যেত, সাবধান হওয়ার সময় পেতেন না কেউ; সাবধান হওয়ার উপায় ছিল না, স্কুল, কলেজ, অফিস, বাজার সবকিছু তো বন্ধ করা বা কামাই করা যায় না। কত সন্ধ্যেয় দেখেছি মা বাইরের বারান্দায় উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে, বাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। সংসারের কাজে কলেজফেরত বাবাকে অনেক সময় নবাবপুর যেতে হতো, মার দুশ্চিন্তা তাই বেড়ে যেত। বাবা ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন, কপালে চিন্তার রেখা। সকালে যতীনদা বাজার থেকে খবর নিয়ে আসতেন, আহত-নিহতের হিসেব, কোন পাড়ায় কী হচ্ছে। কিছুটা গুজব, কিছুটা সত্যি, এই নিয়েই থাকতে হতো। আবার হঠাৎ করেই শান্তি ফিরে আসত। সবকিছু সত্ত্বেও আমাদের ছোটদের দিন খেলাধুলা, পড়া নিয়ে ভালো কাটত।

একদিন জানা গেল রমনার কাছাকাছি সেনাবাহিনী এসেছে। প্রথম তাঁবু দেখলাম, প্যারাসুটের কথা শুনলাম, হয়তো দেখলাম। গোরা সৈন্য দোরগোড়ায় দেখে রোজকার নিয়মে ছন্দপতন হলো। এক বৃদ্ধ হাঁটতে বেরিয়ে রোজ বাবাকে বলতেন, 'ওরা আসছে, আসছে, এসে গেল' — অর্থাৎ জাপানিরা ঢাকায় এলো বলে। জাপানি বোমার আশঙ্কায় সরকারি নির্দেশ এলো বাড়ির উঠোনে 'ট্রেঞ্চ' অর্থাৎ গুহা খুঁড়তে হবে, সাইরেন বাজলে নিজেদের রক্ষা করবার জায়গা হিসেবে। ৫ নম্বরে সরু-লম্বা গুহা বানানো হলো যাতে অন্তত আট-দশজন বসে থাকতে পারে, ঢুকবার রাস্তা সংকীর্ণ। কোনোদিন লুকোতে হয়নি, তবু ভীতিদায়ক। বিশ্বযুদ্ধ আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তিপ্রিয় জীবনে হানা দিলো। রমনাতে, কী কাছাকাছি, সৈন্যদের জন্য একটি রেস্টুরেন্ট খোলা হলো, নাম Rendezvous, আমরা দেশিমতে তাকে রেন্ডেজভুজ বলতে লাগলাম, যখন 'রঁদেভু' বলতে শিখলাম, নিজেকে বিজ্ঞ মনে হলো। এই রেস্টুরেন্ট থেকে মাঝে মাঝে তাজা পাউরুটি আনা হতো — কী তার স্বাদ! সবচেয়ে স্বাদের ছিল রুটির ওপর বিস্কিটের মতো একটি মোহর। এমন রুটি পেলে সৈন্য কাছাকাছি থাকলে আপত্তি কিসের?

আপত্তি এলো শিগগিরই — ঘোরতর আপত্তি — কিন্তু এর বিহিত করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজ সেনাবাহিনীর অফিসারদের জন্য ভালো বাসস্থান চাই, পুরানা পল্টনের বাড়ি অধিগ্রহণ করা শুরু হলো। মিষ্টিদিদের পল্টন ভিলা, কৃষ্ণাদের গরম ভবন, ঝর্ণাদিদের নীলজ্যোতি, প্রিয় ৫নং অধিগ্রহণের তালিকায়, আমাদের অন্যত্র যেতে হবে। মা বলতেন মাটির একটা 'টান' আছে — ৫নং বাড়ি ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়েছিল; বহু আনন্দে সেখানে থেকেছি, বড় হয়েছি, এ মাটিতে আমাদের শেকড় ছিল, 'টান' ছিল শক্ত। নিরুপায় হয়ে ছেড়েছিলাম। বাবার বন্ধুরা, সম্ভবত পরামর্শ করে, বাড়ি নিলেন ওয়ারীতে। মিষ্টিদি, কৃষ্ণা, আমরা সবাই এখানে। এ তো খোলামেলা পুরানা পল্টন নয়, সাবেকি পাড়া, বাড়ি বড় — ধাঁচ আলাদা। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ভাড়া করা, কেউ গেলেন দোতলা বাড়ির ওপরতলায়, কেউ প্রশস্ত একতলা বাংলোর একদিকে কটি ঘর নিয়ে। আমরা এলাম লারমিনি স্ট্রিটে, জগৎকুটিরের ছোট বাড়িতে।

জগৎকুটির ছিল আশুজেঠার, ইউনিভার্সিটিতে কৃষি-রসায়নের অধ্যাপক আশুতোষ সেনের পৈতৃক বাড়ি — দুটি বাড়ি লাগোয়া, বড় বাড়ি, ছোট বাড়ি। ছোট বাড়ি খুব ছোট নয়, তাতে আমরা। ৫নং বাড়ি ছেড়ে এখানে এলাম, নতুন জীবন শুরু হলো।

ছোট বাড়ি বলা হলেও বাড়ি খুব ছোট ছিল না, তবে গেণ্ডারিয়ার ভাষায় বলতে হয় বাড়িটার কোনো 'ধ্যাও-চ্যাও' ছিল না। নিচে অনেক কটা ঘর, কিন্তু অন্ধকার। রান্নাঘরে আলো-হাওয়া, রোদ আসত না, ছোট্ট কুঠুরির মতো। জমি নিঃসার, বাগান করার প্রশ্ন আসে না। আর ছিল বাঁদরের উপদ্রব; গাছে, ডালে, ছাদের রেলিংয়ে তারা বিরাট লম্বা ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে থাকত। ভেতরবাড়িতে, বারান্দায় বিরাজ করত না, এই ছিল বাঁচোয়া। ওপরের ঘরগুলো ভালো ছিল, আমার দিন সেখানেই কাটত। যতই অন্ধকার বা বাঁদরের ভয় হোক, আলাদা করে নিজেদের বাড়ি, এর থেকে বেশি কী চাইতে পারি। কিন্তু ওই যে 'মাটির টান',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরানা পল্টনের কথা ভোলা যায় না।

নানা অসুবিধে সত্ত্বেও ধীরে ধীরে মা-মাসিরা আগের মতো সুন্দরভাবে সংসার করতে লাগলেন, ওয়ারীতে স্বাভাবিক পরিবেশ এসে গেল। রোজ বিকেলে পরিমলকাকার আসার রুটিনে বাধা পড়ল না। ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সবার জন্য এখানেও অবারিত দ্বার। ছোট বাড়ির ছোট্ট রান্নাঘরে চিরকালের মতো মা প্রচুর রান্না, মিষ্টি, জলখাবার বানাতে লাগলেন। যদি রাশ টানতেন তা ইচ্ছাকৃত নয়, খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত না। দুধ পাওয়াও ভার ছিল, তা সত্ত্বেও সবার হাসিমুখ। বাবার লেখা, পড়াশোনা, চুলচেরা বিচার চিরাচরিত গতিতে চলতে লাগল। ওপরে বসার ঘরে একদিকে জানালার পাশে বাবার টেবিল, বইয়ের আলমারি তার পাশে। 'নীলজ্যোতি'র ঝর্ণাদিরা উলটোদিকে থাকতেন; মেসো বলতেন, 'নিঝুম রাতে একটি দৃশ্য রোজ দেখা যায়, অমিয়বাবু রাত জেগে একমনে লিখে চলেছেন।'

বাবার লেখার সংকলন থেকে বুঝতে পারি এত দুর্যোগের মাঝেও কত কাজ উনি করেছেন। কালোবাজার, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি ওঁর বিখ্যাত লেখা এই সময়কার। চতুর্দিক অন্ধকার রাখার নির্দেশ যখন এলো, কালো কাগজে ঢাকা বন্ধ দরজা-জানালার মাঝেই কাজ করছেন।[৪]

জগৎকুটিরের বড় বাড়ি, পুরানা পল্টনের সব বাড়ির থেকে অন্যরকম। পৈতৃক সম্পত্তি — প্রচুর জমির ওপর পুরনো আমলের পোক্ত দালান, প্রশস্ত বারান্দা, মস্ত বাগান — রজনীগন্ধা, গোলাপে ভরা। দোতলায় বিশাল বসার ঘর, সাবেকি আমলের আসবাবপত্র, প্রায় পুরো ঘর গালিচা দিয়ে ঢাকা: নানা শখের জিনিসের মাঝে রাখা চৌকোনো টেবিল, তাতে লাল, সবুজ রঙে গোল গোল খোদাই করা হাতির দাতের ঘুঁটি। বর্মা থেকে আনা 'মাজং' খেলা।

জেঠা ছিলেন শিকারি, বসার ঘরে, খাবার ঘরে বিরাজ করত ওঁর শিকার করা চামড়াসহ বাঘের মাথা। লম্বা খাবার ঘরে ছোট-বড় বাঘের মাথার মাঝে pride of place হিসেবে ছিল বিরাট একটি 'বাইসন'। Bison-এর চোখে করুণ ভাব অবাক হয়ে দেখতাম, পরক্ষণেই বাঘের দাঁত দেখে দৌড়ে পালিয়ে যেতাম। এক পাশে কাচের প্লেট, গ্লাস, ছুরি-কাটা রাখার লম্বা অনুচ্চ আলমারি, what notও বলা যায় — তার ওপর পেতলের শান্ত, সৌম্য, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি। এ-ও বর্মা থেকে আনা। বুদ্ধের সৌম্যমূর্তি ঘিরে নিরপরাধ, নিরীহ হরিণ বা হিংস্র হলেও শখের শিকার বাঘ রাখা যে বেমানান, বেখাপ্পা, একটা বৈষম্য, সে-কথা তখনকার দিনে কারো মনে হতো না। হওয়ার কারণ ছিল না, একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলা মনে করা হতো, যেমন বিলেতে। এ-বাড়ি — বড় বাড়ি, ছিমছাম, সাজানো-গোছানো, নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, পরিচিতদের আসা-যাওয়া; আমাদের অল্পদিনের বাসা — এলোমেলো, জনসমাগমে সরগরম। ও-বাড়ি সুপ-রোস্টের, আমাদের সুক্তো-চচ্চড়ি মরিচঝোলের। ছোটদের সুবিধে, দুবাড়ির স্বাদই নিতে পারে।

মাসি-জেঠার মেয়ে মঞ্জু ছিল আমার খেলার সাথি। চিরকাল প্রিয় বন্ধু রয়ে গেল। দুবাড়ির মাঝে দরজা ছিল, তার সামনের সিঁড়িতে বসে কত পুতুল খেলেছি। পুতুলের শাড়িতে রাংতা দিয়ে জরির পাড়, আঁচল, বুটি বানানো, কুঁচি দিয়ে পরালে বেনারসির থেকে কিছু কম না। মঞ্জু থাকলে খেলায়, খুশিতে দিন কাটত, ও কোথাও চলে গেলে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যেতাম। মাসির সঙ্গে অনেক সময়ই মঞ্জু শান্তিনিকেতন থাকত, দাদা অমর্ত্য ওখানে পড়তেন তাই। চার বছরের বড়, স্কুলে-পড়া এই দাদাটি যখন ঢাকায় থাকতেন, অন্য দাদাদের মতোই, আমাদের বিশেষ 'পাত্তা' দিতেন না, গুরুগম্ভীরভাবে পড়াশোনা দেখিয়ে চলে যেতেন। মাঝে মাঝে গল্প করলে, শান্তিনিকেতনের ভাষায়, 'বর্তে যেতাম'। এঁর কাছ থেকে একটু প্রশংসা পাবার জন্য বসে থাকতাম। পেয়েও যেতাম; আজো বসে থাকি, আজো পেয়ে যাই।

সময়ে মঞ্জু হয়ে গেল আমার ছোট্ট বোনের মতো। আমাদের কথায় কোনো রাখঢাক থাকত না, ছোটবেলায়, পরে স্কুল-কলেজ জীবনে, বিবাহিত জীবনে, জীবনসঙ্গীকে হারিয়ে একাকিত্বে একে অপরের আনন্দ-স্বপ্ন, আশা-নিরাশা-দুঃখের কথা ভাগ করে মনে শান্তি পেয়েছি। আমার থেকে তিন মাসের ছোট, স্কুলজীবনে ওর ওপর প্রচুর সর্দারি করেছি। বড় হয়ে স্পষ্টবাদী মঞ্জু বলেছে, 'বিবি, এ কাজটা ঠিক করিসনি, তোর অন্যায় হয়েছে।' সেই মঞ্জুই চিঠি দিয়েছে, 'তোকে দেখিনি বহুদিন, কলকাতা আয়, দেখা হলে মন খুলে কথা বলে একটু শান্তি পাব।' ছোটবেলার খুনসুটির গল্প করে আবার কত হাসাহাসি করেছি।

একবার এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেল। ভোরে উঠে দেখা গেল, সিঁদ কেটে জগৎকুটিরের বড় বাড়িতে চুরি হয়েছে — ডাকাতি বলা উচিত। পেছনে খোলা মাঠ, পোড়ো জমির মতো, সেখান থেকে সিঁদ কেটে সুড়ঙ্গ করে ডাকাতরা ঢুকেছিল খাবার ঘরে মেঝে গর্ত করে। মাসি-জেঠা ওপরে ঘুমিয়ে, আমরা পাশের বাড়িতে, কেউ টের পাইনি। প্রচুর জিনিস চুরি হলো, পুলিশ-কোর্ট সবই হলো, কিছু পাওয়া গেল বলে মনে পড়ে না — তবে রহস্যকাহিনিতে দাদা যা পড়তেন সেটা সামনে রেখে কিছু গোয়েন্দাগিরি করলেন। নিজেকে লায়েক মনে করলেন। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেহেতু ওঁর পেছনে পেছনে ঘুরি, আমিও এসব কাজে ভাগ নিলাম। কিন্তু মনে একটা ভয় ঢুকে গেল। বাড়ির পেছনে, কিছুটা দূরে ডুমুরগাছ ছিল — ভয় ছিল ডাল বেয়ে উঠে কোনো লম্বা চোর তার লম্বা হাত বাড়িয়ে শিকের মাঝ দিয়ে ঘরের জিনিস চুরি করবে। একদিন জানালা খোলা রেখে নিচে যাচ্ছি, বললাম, 'চুরি হতে পারে, চোর যদি লম্বা হয়?' দাদা আর আমি বার্ধক্যে পা দেবার পরও শুনেছি দাদার গলায়, 'কিরে, লম্বা চোর এলো নাকি?' বাড়ির পেছনের দেয়ালে ভাঙা কাঁচ লাগানো ছিল, ভাবতাম নিরাপদে আছি। সে বিশ্বাস ভেঙে গেল, ভয় তো ঢুকবেই।

সিঁদকাটা ডাকাতদের কথা আলাদা, ছিঁচকে চোর, সাধারণ পেশাদার চোর — এদের উপদ্রব বা উপস্থিতি ছিল ওয়ারীতে। হয়তো বা অন্যান্য পাড়াতেও। অনিশ্চিত, উথাল-পাথালের সময়, ১৯৪৪-৪৫, অভাব-অনটন চতুর্দিকে; এই দুর্যোগে চৌর্যবৃত্তি বেড়ে যাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। একথা আজ সত্তর বছর পর যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি, তখন ভীতি ছাড়া কিছু ছিল না। চোরের হাত-পা লম্বা, রণপা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ঘরে ঢোকে, এই ভাবনা থাকত। আর মনে হতো, পুরানা পল্টনে তো সামনের বা উঠোনের দরজা দিনের বেলায় বন্ধ করা হতো না, ওয়ারীর ওপর রাগ একটু বেড়ে যেত।

এখানে থাকতে শুরু হলো জাপানি বোমার ভয় ও ব্ল্যাকআউট। জানালা-দরজা বন্ধ করে কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে টিম টিম আলোতে সন্ধ্যে কাটাতে হতো। বাবা তখন সিগারেটের প্যাকেট ছোট ছোট চৌকোনা করে কেটে তাতে ইংরেজির হরফ লিখে wordmaking খেলা তৈরি করলেন। এটা scrabble-এর পূর্বপুরুষ। এই খেলাতে সন্ধ্যে খুব হৈ-হৈ করে কাটত — যদি কারো শব্দ কেটে আমার কাছে নতুন শব্দ বানিয়ে আনতে পারি। একবার মায়ের ring কেটে bring বানিয়েছিলাম, সে কী তৃপ্তি! Wordmaking-এর ফলে দাদার আর আমার ইংরেজি জ্ঞান বেড়ে গেল, বানানও ভালো হলো। তবে বাইরে খেলতে যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ হলো ছোটদের জন্য।

ওয়ারীর বাড়ি ঠিক বাড়ি না মনে হলেও ওই বছর দেড়েক নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কেটেছে। খুশিতেই কেটেছে। বাড়ি থাকত সরগরম, পারিবারিক সদস্য ছাড়াও দাদা-দিদি, কাকা-জেঠা অনেকেই এসে থাকতেন। ঢাকায় দাঙ্গা, প্রফেসর জুন্নারকরের বাড়ি খুব নিরাপদ নয়, ওঁর মেয়েরা আমাদের কাছে থাকতে এলেন। এই দিদিরা সত্যিকারের গুণী ছিলেন, ওঁদের কাছে আমি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করা, সেলাই, কাঠি দিয়ে পুতুল বানানো কতকিছু শিখেছি। শান্ত হয়ে বসতে শিখেছি, এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাট শিক্ষা। পরীক্ষা দিতে কেউ ঢাকা আসবেন, গ্রামের সূত্রে কোনো দাদা বা ভাগ্নে ট্যুরে আসবেন, ওয়ারীর বাড়িতে থাকতেন। বাবার ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, এঁদের আসা-যাওয়া সর্বদাই থাকত।

একজনকে খুব মনে পড়ে, হরিজেঠা, বাবার জ্ঞাতিভাই, যিনি রেলওয়েতে কাজ করতেন। নানা জায়গায় ঘুরতে হতো: এদিক-ওদিক যাবার পথে আমাদের কাছে কদিন কাটিয়ে যেতেন। ওঁর মেয়ে লতুদি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। জেঠামশায় এলে এঁর সঙ্গে থাকত একটি আর্দালি, আরেকটি 'ইকমিক কুকার'; কোনো ছোট স্টেশনে রাত কাটাতে হলে কুকারে রান্নাটা হয়ে যেত। 'ইকমিক কুকার' ছিল প্রেসার কুকারের পূর্বজ। হরিজেঠার নানা নদী-জঙ্গলের গল্পের থেকে লোভনীয় ছিল এই কুকারের রান্না। স্তম্ভের মতো গোল, লম্বা, ভেতরটা ফাঁকা, এমন একটি পাত্রে জল ভরে তাতে টিফিন ক্যারিয়ারের চারটি ঢাকা বাটিতে তেল-মশলা মাখা কাঁচা রান্না রেখে, ওপর দিয়ে আঁট করে বন্ধ করে তোলা উনুনে ঢিমে তাপে বসিয়ে দেওয়া — এই ছিল পদ্ধতি। ধীরে ধীরে রান্না হতো — অপূর্ব স্বাদ। ভবিষ্যৎ জীবনে যখন আমাদের কাঠ বা কয়লার উনুন নেই, চেষ্টা করেছিলাম গ্যাসের স্টোভে বসাতে। কোনো স্বাদ এলো না।

ওয়ারীতে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় বারদুয়েক এসেছেন। বৈঠকে কী বলেছেন তা তো আমি বুঝিনি, দুটো গল্প মনে আছে। অল্প বয়সে কাশীতে সংস্কৃত পড়তেন — সংস্কৃত পড়া মানেই মুখস্থ। শ্রুতি-স্মৃতির ওপর পরীক্ষা হতো, পরীক্ষক সংস্কৃতর কয়েক পাতা পড়ে শোনাবেন, একবার শুনেই ছাত্রকে তার পুনঃপাঠ করতে হবে। ছাত্ররা এত পারদর্শী ছিলেন যে ওঁর এক সহপাঠী পরীক্ষকের পাঠ শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কীভাবে বলব — শুরু থেকে আরম্ভ করব নাকি শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত যাব?' ধ্বনি, ছন্দর ওপর দখল বিস্ময়কর।

রসিক মানুষ ক্ষিতিদাদু। বিক্রমপুরী টানে কথা বলতেন, রসিকতা করছেন ওঁর চেহারা দেখে বোঝা যেত না। এক বাড়িতে অতিথি হয়ে গিয়েছেন, গৃহকর্তা আম এনে বললেন, 'ল্যাংড়া বলে তো দিলো, দেখুন সত্যি কি না।' এক টুকরো চেখে দাদু বললেন, 'না, দুই পাও-ই আছে!'

গৈলার সূত্রে এক জেঠিমা ঢাকাতে থাকতেন — প্রায়ই আসতেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করতেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই, তিনি তো মা। চেহারা, নাম মনে নেই, চওড়া নক্সা পাড়ের শাড়ি সাধারণ করে পরে, পানের ডিব্বাটি হাতে হঠাৎ করে দুপুরে এসে যেতেন। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ, হাতে চুড়ি, বালা, গলায় বিছা হার। ওঁকে বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে আছে ভাষার জন্য; বরিশালের বাইরে থেকে জেঠি-কাকি অনেকেরই ভাষা ছিল মেলানো-মেশানো। কানে মধুর লাগত, আবার হাসিও পেত। যাই হোক — ১৯৪৫ সাল, ওঁর তৃতীয় ছেলে দাদার সমবয়সী, বার্ষিক পরীক্ষা সামনে। দাদা সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ান, সন্ধ্যেবেলায় শান্তি লাইব্রেরির বইতে খয়েরি কাগজের মলাট লাগান। পড়তে বসেন না, সেটা সবার নজরে। একদিন দাদার দিকে কটাক্ষ করে, শুধু দাদাকে কেন, মাকেও কটাক্ষ করে বললেন, 'সামনে পরীক্ষা, আমার ছেলে তো 'পড়থে পড়থে' (প খোলা, পোড়থে নয়) শুকাইয়া গেল — রাত জাগিয়া জাগিয়া পড়ে। দুধের বাটি সামনে ধরিয়া দি — তাও খায় না, সময় নাই।' মাকে অনুপযুক্ত অভিভাবক মনে করতেন, সমীর তো 'পড়থে'ই বসে না। তবু ভালোভাবেই পাস করে যেত। মা ঠিক উলটো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভালো-মন্দ কিছু বলতেন না। বড় হওয়ার পর ভাই হেসে হেসে বলত, 'আচ্ছা মা, তুমি কেমন, আমাদের নিয়ে ভালো ভালো কথা কেন বলো না? এই তো মাসি-কাকিরা ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে কত বড়াই করে যান। তুমি শুনে খুশি হও, কিন্তু আমাদের কথা বলো না।' এসব বললে মার একই উত্তর, 'আমার কে? সব ভগবানের ছেলেমেয়ে।'

AMARBOI.COM

* * *

সিনেমা দেখার অভ্যাস মধ্যবিত্ত ঘরে খুব একটা ছিল না, আমাদের বাড়িতে একেবারে না। হঠাৎ এক সিনেমা এলো, *উদয়ের পথে* — শহরে শহরে হৈ-হৈ, এত চমৎকার বই! লেখক জ্যোতির্ময় রায়, আমার মামিমার দাদা ও আমার বাবার বন্ধু। অভিনেত্রী বিনতা বসুর অভিনয় ও সৌন্দর্যের প্রশংসা চতুর্দিকে, 'তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কী যে,' এই গান সবার গলায়। মামিমা ঠিক করলেন পুরো পরিবারকে নিয়ে তাঁর দাদার সিনেমা দেখাবেন। সাড়ে সাত টাকার টিকিট সবচেয়ে দামি, পেছনের সারিতে বসে অনেকে মিলে ওই ছবি দেখলাম। কী বুঝলাম জানি না, তবে বিনতা বসুর রূপ দেখে চমক খেয়েছিলাম। অভিনয় ও গানের তুলনা নেই। মামিমা বললেন, 'দাদা ছবিটা ভালো করেছেন, তবে ও-ই যে গানের পেছনে যারা backgroud music, যেমন সেতার-তবলা ইত্যাদি বাজাচ্ছেন, একটা দুটো শটে তাদের দেখানো হয়েছে — এটা ঠিক করেননি। বাড়িতে বসে গাওয়া, backgroud music থাকারই কথা নয়, সেটা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু দেখানো কেন?' ওঁর সমালোচনা খাঁটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, জানি না জ্যোতির্ময় রায় কী বলেছিলেন।

কিছুদিন পর খবর এলো বিনতা বসু এখন বিনতা রায়, জ্যোতির্ময় রায়ের স্ত্রী। মামিমার দাদা মানে আমাদের মামা, তদুপরি বাবার বন্ধু, আমাদের পায় কে? এক অভিনেত্রী মামিমা হলেন, কলকাতা থাকেন তাতে কী? আমরাও চিত্রজগতের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। মামিমা কলকাতা গেলেন ভ্রাতৃবধূকে দেখতে, ফিরলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বৌদি কীরকম?' একজন তারকা কীরকম হন, সাধারণ মানুষের মতো? মামিমার উত্তর এলো, 'বুঝলি, আমাদের মতো। তবে একটা তফাত। ধর, যদি আমার হঠাৎ বেরোতে হয়, একটু সময় লাগবে, তৈরি হতে হবে। বৌদি সবসময়ই ফিটফাট, তৈরি; বললেই উঠে বেরোতে পারেন।' সংসারের কাজকর্ম, রান্নাবান্না নিজের হাতে করার দায়িত্ব থাকলে ঘর্মাক্ত কলেবর, কাপড়ে-আঁচলে হলুদ লাগা, মা-মামি-মাসিদের তৈরি হতে সময় তো লাগবেই — তাঁরা কী করে হুট করে যাবেন? বুঝতে পারলাম, এই সবসময় সাজগোজ করে থাকাটা অভিনেত্রী হবার অঙ্গ!

এরপর জ্যোতির্ময় রায় আর একটি ছবি করেছিলেন, নাম বোধ হয় *অভিযাত্রী*। এ বই চলল না। সিনেমা দেখতে অভিজ্ঞ, ছোটমামা বললেন, গল্পতে নতুনত্ব ছিল না। অমনি হঠাৎ করে জ্যোতির্ময় রায়, বিনতা রায়ের কথা জনতা, পত্রিকা সবাই ভুলে গেলেন। আমি বিনতা রায়কে দেখি ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার দিদিমার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে, মামাবাড়িতে — কলকাতায়। ততোদিনে বিনতা বসুর (রায়) চেহারার জৌলুস চলে গিয়েছে — ছেলেবেলার *উদয়ের পথে*র নায়িকার সঙ্গে বিশেষ মিল নেই। এই প্রথম একটি চিত্রতারকাকে দেখলাম, ভালো লেগেছিল। শান্ত, নম্র চেহারা, পরিশ্রান্ত, তাও আকৃষ্ট করেছিল আমাকে।

মা-মাসিরা, অর্থাৎ অধ্যাপকের স্ত্রীরা, ফ্যাশনের ধার-কাছ দিয়ে যেতেন না। Style আসত কলকাতা থেকে। ওয়ারীর বাড়িতে আসতেন মনুমামা, মনু দাশগুপ্ত, মায়ের মাসতুতো ভাই। কলকাতা থেকে এসে আসর জমিয়ে দিতেন। ওঁর স্ত্রী, আমাদের শুক্লা মামিমা মাঝে মাঝে ঢাকা আসতেন সেজেগুজে একটা অন্য দুনিয়ার সুগন্ধ নিয়ে। ওঁর নানা শাড়ির রং, কারুকার্য, একটি সোনার ব্রোচ, oval shape-এর, আমার বালিকা মনে গেঁথে গিয়েছিল। ঢাকা ছাড়ার পর শুক্লা মামিমাকে দেখিনি; কিন্তু সেই সুন্দর সাজ-পোশাক, চেহারা, আজো আমার সামনে। সবকিছু বদলে গেছে, বদলাবেই তো; কে আছেন, কে নেই হিসাব করা মুশকিল — কিন্তু আমার ছোটবেলা আমার কাছে জীবন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে লিখলাম, মা-মাসিদের ফ্যাশন ছিল না, ঢাকায় ইউনিভার্সিটির বাইরে কী হতো তার সঙ্গে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম না। দাদা-দিদি, মাসি-মামি বাইরে থেকে কেউ এলেই এসব দেখতে পেতাম।

মায়ের মামাতো দিদি রেনু মাসিমা পাটনায় কলেজে পড়াতেন, কলকাতার হালচালের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রেনু মাসি নানা রকমের খোঁপা করতে ভালোবাসতেন, নতুন নতুন ধরনে চুল বাঁধতেন। একবার পরিবারের কোনো দিদি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'কী যে করস, তর খোপা কখনো উঁচা, কখনো নিচা, একটা শিখি তো তুই আরেক ফ্যাশন আনস, আমরা যাই কই?'

শাড়ি-গয়নার ওপর আমার নজর ছোট থেকেই ছিল; হয়তো মায়ের এতে কোনো শখ ছিল না বলে, বা নানা ধরনের নকশা (design) এমনিতেই পছন্দ হতো বলে। ছাপা শাড়ির নকশা ও রং, বেনারসিতে সূক্ষ্ম কাজ, আমার চোখে ঠিক পড়ত। মামিমার নীলাম্বরীর থেকে গাঢ় নীল বেনারসির ঘন জরির পাড়, আঁচল, বুটি আজো ভুলিনি। পেছনে তাকিয়ে মনে হয় মায়ের জীবনে জাঁকজমক ছিল না বলে আমার ভেতরে হয়তো দুঃখ ছিল, সেজন্য যা আমাদের জগতের নয় তার প্রতি লক্ষ্য বেশি, স্মৃতিও পরিষ্কার। তখন বুঝবার ক্ষমতা ছিল না যে মায়ের কাছে জাঁকজমক ছিল লেখাপড়া, আমাদের বৃহত্তর পরিবারের চিন্তাশীল আলোচনাকে ঘিরে। এটা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ওঁর চিন্তাভাবনার অঙ্গ ছিল, কী পরিবেশ তাঁকে এভাবে তৈরি করেছিল, বলতে পারি না। বাবাকে হারিয়ে মা যখন আমাদের কাছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, মুখের হাসিটি আগের মতো, তবে উৎসাহ হারিয়ে গিয়েছে, হঠাৎ করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতেন যখন রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ নিয়ে চারপাশে আলোচনা শুনতেন। একদিন দুর্নীতি নিয়ে উত্তেজিতভাবে, উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হচ্ছে, মা বলে উঠলেন, 'ওই তো Gresham's law — bad money drives away good money.[৫] বাজে লোক সমাজ থেকে ভালো লোকদের বার করে দেয়।' আবার পূর্ববৎ মৌনতা।

এরপর কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। মা মৌন, ক্লান্ত, কথা বলতে কষ্ট হয়। প্রায় সময় রবীন্দ্রসংগীত গুনগুন করেন — রোজ সন্ধ্যেয় ওঁর হাত ধরে আমি গান শোনাই, একটু সাথ দেন। এর বেশি কিছু নয়। মুখের হাসিটিও যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। বরোদাতে একদিন ভাই পার্থর কোনো বক্তৃতার পর, মায়ের খাটে পুত্র, জামাতা, কন্যা, দৌহিত্রী পরিবেষ্টিত মা বসা, যথারীতি মুখে কথা নেই। ভাইর বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আমরা চারজন সজোরে আলোচনা করছি, হঠাৎ ভাই নিচুস্বরে আমাকে বলল, 'দ্যাখ, মাকে দ্যাখ — কীরকম মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছেন, মুখে কীরকম তৃপ্তির হাসি। মা তো এই দেখে, শুনে, ভাগ নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন।' সত্যি, এই একটি জিনিসে মার হাসি, উৎসাহ ফিরে আসত। চিন্তাশীল অধ্যাপকদের সঙ্গিনীরা এই মনোভাব নিয়ে জীবন কাটাবেন, বাইরের আড়ম্বরের প্রয়োজন হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। আমার বুঝতে বহু বছর লেগেছে।

ওয়ারীর বাড়িতে আমি যেন হঠাৎ করে মায়ের আঁচল ছেড়ে একা নানা কিছু করতে শুরু করলাম। ১৯৪৪-এর উনিশে ডিসেম্বর[৬] ঢাকা থেকে শান্তিনিকেতনের পথে রওনা হলাম আশুজেঠার সঙ্গে, পৌষমেলা দেখব বলে। মা-বাবা সঙ্গে কেউ নেই। গোয়ালন্দ স্টিমারের রান্না বিখ্যাত। জেঠার সঙ্গে ডাইনিংরুমে খেতে বসেছি। এই প্রথম ছুরি-কাঁটা দিয়ে খেতে দেখলাম, শিখলাম। জেঠা শিখিয়ে দিলেন। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায় বিশাল মাছের টুকরো একটি, হয়তোবা রুই, তার ওপর হালকা খয়েরি রঙের সস। ঝকঝকে প্লেটে সুন্দর করে সাজানো। চেহারা এখনো আমার সামনে ভাসছে — ওই স্বাদ ও চেহারা ভোলার নয়। আশুজেঠার তখন একটু সাহেবিয়ানা ছিল। পরে সেটা দেখিনি। গল্প শুনেছি গোয়ালন্দ স্টিমারেই, ঢাকার বিখ্যাত পণ্ডিত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশুজেঠার ছুরি-কাঁটার ব্যবহার দেখে বলেছিলেন, 'আশু, সাহেব হওয়া বড় কষ্টকর।' ছুরি-কাঁটার ব্যবহারে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছড়া অনেক কালের। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কানাঘুষা চলত যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে বেলগাছিয়ায় সাহেবি খানার সঙ্গে ছুরি-কাঁটার ব্যবহার হয়। ছড়ার গান শুরু হলো

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি-কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।[৭]

যদিও সেন পরিবার বা আমাদের পরিচিত কোনো পরিবারের ওপর প্রযোজ্য নয়, এই প্রসঙ্গে আধা ইংরেজ হওয়া, আধা ইংরেজি শেখা পুরুষ, মহিলা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেখা দুটি ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছড়া মনে পড়ছে। প্রথমটি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১১-১৮৫৯) লেখা

পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট, দাঁত কাটে বিসকুট,
গো টু হেল ড্যাম হুট, মা বাপেরে বলেছে।
এর চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কার হয়,
দেখো আর মহাশয় আশাতরু ফলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমসাময়িক ছিলেন রূপচাঁদপক্ষী নামক হাসির কবিতা রচয়িতা। এই হাসির গানের পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে মথুরা, যেখানে কৃষ্ণ আছেন রাজা হয়ে। বৃন্দা গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেউড়িতে রাজার দারোয়ান তাঁকে আটকেছে। বৃন্দা তখন বলছেন —

লেট্ মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী,
এসেছি ব্রজ হতে আমি ব্রজের ব্রজনারী।
বেগ ইউ ডোরকিপার লেট মি গেট
আই ওয়ান্ট সি ব্লক হেড
ফর হুম আওয়ার রাধে ডেড, আমি তারে সার্চ করি।
মরাল ক্যারেকটার শুন ওর, বাটার থিফ্ ননীচোর
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর চোর, মথুরার দণ্ডধারী।
রাখাল ভূপাল কপাল ভারি
কহে আর্ সি ডি বার্ডকিং ব্ল্যাক ননসেন্স ভেরি কানিং
ফ্লুটেতে করে সিং মজায়েছে রাই কিশোরী
কুলনাশা বাঁশি করে করি।[৮]

ব্যঙ্গ-কৌতুক যতই থাকুক না, ছুরি-কাঁটা অনভ্যস্ত, অপটু হাতে সুস্বাদু মাছ খাবার পর কোনো একসময় গোয়ালন্দ পৌঁছে ট্রেন ধরলাম। আশুজেঠা ওপরে উলটোদিকে, যাতে আমার ওপর নজর রাখতে পারেন, আমি নিচে। নিচে থেকে মনে হলো আমি একাই চলেছি, বড় হবার দিকে আরেক পা বাড়িয়েছি, ঠিকমতো সবকিছু রাখার দায়িত্ব আমার। রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, ট্রেন থামা, বাইরে আলো, কোলাহল, অনেক মানুষের ছুটোছুটি। আমি ভাবলাম পৌঁছে গিয়েছি, ট্রেন যদি অন্য কোথাও চলে যায় তো আমাদের কী হবে? চেঁচিয়ে জেঠার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম। উনি ব্যস্ত হয়ে নেমে এলেন, 'সে কি, শিয়ালদা পৌঁছে গেছি?' দেখা গেল ওটা মাঝের কোনো স্টেশন। ট্রেন যে গন্তব্যস্থলের আগেও থামে তা কি আমি জানি? আমি জলের দেশের মানুষ, যদি কোনো জ্ঞান থাকে তো তা বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, খাল-বিলের; ট্রেন চড়া তো শিখিনি। আমাদের সময় মধ্যবিত্ত পরিবারে ছোটদের জগৎ তাদের মতোই ছোট থাকত, সাবালিকা হতে সময় লাগত।

পৌষমেলার বিশেষ কিছু মনে নেই। অনেক দোকান ছিল; কোনো এক জায়গায় ছ'পয়সা দিয়ে দিদিমার জন্য পুত্র-কন্যা পরিবৃতা মা দুর্গার ছবি কিনেছিলাম, দুর্গাপূজার প্রতিমা যেমন হয় তেমন। সে ছবি বাঁধিয়ে দিদিমা পুজোর আসনে রেখেছিলেন, রোজ পুজো করতেন, দেশবিভাগ সেই ছবি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ উমাকুটিরের চতুর্থ প্রজন্ম মা দুর্গার এই প্রতিমূর্তি রোজ পুজো করে। বেশ স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছিলাম মনে হয়, চিঠিপত্রতে দেখছি শান্তিনিকেতন থেকে আমাকে কেউ নিয়ে গিয়েছিলেন বর্ধমানে মেজ জেঠামশায়ের কাছে। মেজমার চিঠি আছে, 'বিবি ভালো আছে, দিদিদের কাছে আনন্দে আছে।' এ চিঠিতে তিনি আরো লিখছেন যে, আমার দিদিমা ও মাসিমা তীর্থযাত্রার পথে কলকাতা এসেছিলেন, সেখান থেকে বর্ধমান এসে আমাকে দেখে গেছেন, ওঁদের কাছে দু-দিন কাটিয়ে গিয়েছেন। আমার কিছুই মনে নেই। সাধারণত মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে 'মা' গিয়ে থাকতেন না। এক্ষেত্রে দু'পক্ষই মুক্ত চিন্তার ছিলেন, বর্ধমানের বাড়ির আতিথেয়তা নামকরা, তাই দিদিমারা ও-বাড়িতে গিয়েছিলেন। ১৯৪৪-এ এটা প্রগতিশীল ব্যবহার, অথচ মেজমাকে চিরকাল সবাই 'সেকেলে' বলে ভয় পেতাম।

মেজমার চিঠিতে আছে, 'তোমাদের কলকাতার বন্ধুরা যাঁদের সঙ্গে ঢাকা ফিরে যাবে, তাঁদের কাছ থেকে খবর পেলে বিবিকে কলকাতা পৌঁছে দিয়ে আসব।' বন্ধুদের ওপর বিশ্বাস ও আমার ওপর ভরসা অবাক করে দেয়, একটি সাত বছরের মেয়েকে এতটা একা ছেড়ে দেওয়া সোজা কথা নয়। কিছু মনে না থাক, এতটা বিশ্বাস পেয়েছি ভেবে গর্ব হয়।

১৯৪৫-এর জানুয়ারি মাসে ফিরে এলাম ওয়ারীর ধূসর বাড়িতে। মঞ্জু আর আসবে না, শান্তিনিকেতনে পাঠ-ভবনে পড়বে। কে জানত, তিন বছর পর আমিও সেখানে যাব পড়াশোনা করতে? ক'মাস পর হঠাৎ করেই আশুজেঠা অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে, ঢাকার বাড়ি সবকিছু ছেড়ে, চলে গেলেন কলকাতাতে বসবাস করতে। সাবেকি আমলের জীবনধারা লুপ্ত হলো, হারিয়ে গেল গালিচা, মাজংয়ের টেবিল, ঘুঁটি, বাইসন। শান্তিনিকেতনের বাড়িতে বুদ্ধের সৌম্যমূর্তি, দুটি শিংয়ের মাঝে তামার ঘণ্টা আর 'ইবনি' রঙের পালিশ করা সরু বাঁশের দুটো চৌকোনো চেয়ার ছাড়া ঢাকার কিছু দেখিনি। রান্নাঘরে বদল এলো, চপ, কাটলেট, সুপ, রোস্টকে 'ওইদিক থাক' বলে জাঁকিয়ে বসল ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল।

বড়বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ও-বাড়ির দুটি ছবি ভুলতে পারিনি। বাড়ির একদিকে গোশালা ছিল, জেঠার বাবার আমল থেকে। আমাদের বারান্দার এক কোণ থেকে দেখা যেত। কত সকাল-বিকেল রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চিত্তে দেখেছি শক্ত হাতে দুধ দোয়ানো হচ্ছে, বিশাল পাত্রে উপচে পড়ছে। বাছুরগুলো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামবাংলার দৃশ্য — মনোরম। মাসিরা যখন ঢাকা ছাড়লেন, আমার মামা, গোপেন মামা, গোশালা কিনে নিলেন, তখন তিনি অবস্থাপন্ন আইনজীবী। সে সুখ কদিন আর ভোগ করতে পারলেন, দেশবিভাগে সবই ছন্নছাড়া, দিশেহারা হয়ে গেল।

অন্য ছবিটি এক নববধূর। সেন পরিবারের বড় ছেলের (জেঠার দাদার জ্যেষ্ঠপুত্র) বিয়ে হয়েছে, কলকাতা থেকে তিনি নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন পৈতৃক ভিটে দেখাতে। মাসিরা কেউ নেই, বাড়ি খালি; ওঁরা দুজন ও-বাড়ির বন্ধ বারান্দার লোহার গরাদ লাগানো জানালায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, ছোট বাড়ি দেখছেন। পাতলা, লম্বা, নাতিদীর্ঘ গ্রীবা জড়িয়ে সোনার ঝলমলে চিক, কালো চুলের খোঁপা, ফর্সা রঙে সোনালি আভা, সোনালি জরির কারুকার্য ভরা লাল টুকটুকে ঢাকাই শাড়িতে আধঘোমটা দেওয়া, সালঙ্কারা নববধূ এত অপূর্ব সুন্দরী আমি কখনো দেখিনি। বারান্দার রেলিং ঝুঁকে নিষ্পলক চোখে দেখেছি। ঠিক সত্তর বছর আগেকার কথা, কতকিছু মন থেকে মুছে গিয়েছে, আজো আমার মনের মাঝে এই রূপসী নববধূর ছবি জানালার ফ্রেমে বাঁধা আছে।

বড় বাড়ি বন্ধ হয়ে গেল বলে দুই পরিবারের বন্ধুত্বে ভাটা পড়ল না। তরুণ বয়সে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা উমাকুটিরে সান্ধ্য আড্ডায় বড়মামার সহপাঠি/বন্ধু হিসেবে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা/অনুষ্ঠানের উদ্যোগে। পরে দু'জনেই ঢাকাতে অধ্যাপনা শুরু করলেন। প্রথমে মাসি এলেন জেঠার জীবনে, বছর দুই পর মা, বাবার জীবনে। শুরু হলো তিন প্রজন্মের আন্তরিকতা।

ঢাকাতে থাকতেই জেঠা শিকার করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শখ ছিল মাছ ধরার — মাঝেমধ্যে তা-ই করতেন। মাসি ঢাকাতে না থাকলে মায়ের কাছে পৌঁছে যেত মাছ। দিল্লিতে শখ নেশায় পরিণত হলো। এক বন্ধুকে নিয়ে প্রতি ছুটির দিন চলে যেতেন শহরের আশপাশে — নদী, হ্রদ, জলাশয়, যেখানে মাছ আছে। সারাদিন বড়শি ধরে বসে শ্রান্ত হয়ে ফিরতেন সন্ধ্যেবেলা; ভালো মাছ পেলে মুখে থাকত বিজয়ের হাসি।

মাছ ধরার সঙ্গীকে মা বলতেন জেঠার 'ফিসাত বন্ধু', (ফিশ থেকে)। মাসি দিল্লির বাইরে থাকলে মাছ নিয়ে আসতেন মায়ের কাছে, ঝাল, ঝোল, শর্ষেবাটার জন্য। মায়ের হাতে গেণ্ডারিয়ার সুগন্ধ ছিল, জেঠার পছন্দ ছিল। আঁশছাড়া বড় মাছ আনলে মাকে শিখিয়ে দিতেন কীভাবে 'রোস্ট' করতে হয়। মাছ ধরার নেশা তাঁর এত তীব্র ছিল যে, মাছের খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে সপ্তাহের পাঁচ দিন সারাদিন সরকারি বাড়ির বিরাট বেড়া, ঝোপ-ঝাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেঁচো ইত্যাদি জড়ো করে বেড়াত। বাকি দুদিন বড়শি-খাদ্য ইত্যাদি নিয়ে জেঠার সঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়া। মাসি হেসে বলতেন, 'ও যে কোন ঝোপে আছে জানার কি উপায় আছে? ঝোপের অন্ধকারে ঘুপটি মেরে বসে থাকে, মুখে রা শব্দটি নেই। কোনো কারণে যদি ওকে আমার প্রয়োজন হয়, সামনে-পেছনে বাগানে ঘুরে দেখি বেড়ার কোথায় ওর শার্টটি ঝুলছে, তার কাছাকাছি ওকে আবিষ্কার করতে হয়।'

ছোটবেলায় খানিকটা দূরত্ব ছিল, গম্ভীর বলে একটু ভয় পেতাম। পরে সেটা কেটে গেল, প্রচুর স্নেহ পেয়েছি ওঁর কাছে। অলকা থেকে 'লকা' বলে ডাকতেন, ওঁর জীবনের শেষদিনেও আমি কাছে ছিলাম, ওই নামেই ডেকেছেন।

মানুষটি সরল ছিলেন, প্যাটেল জামাই তাঁর প্রিয় ছিল, 'জামাই' বলেই ডাকতেন। বহু সন্ধ্যে কাটিয়েছি একসঙ্গে, ভ্রমণের গল্প হতো — ওঁদের, আমাদের। বিশেষ করে বাঘ-চিতা যদি দেখে এসে থাকি, সে গল্প আরো রসালো হতো। নিজের শিকার জীবনের কথাও বলতেন। গল্প করতে ভালোবাসতেন, কোনো মজার কথা বলে নিজেই সজোরে হেসে উঠতেন — ওঁর হাসিটা আজো শুনতে পাই। সাহেবিয়ানার কথা লিখেছি, তা বহু আগে — আমার মনে পড়ে জেঠাকে শান্তিপুরী ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, তাতে সোনার বোতাম — বাইরে বাগানে বসে আড্ডা দিচ্ছেন।

বাবাকে আশুজেঠা ছোট ভাইয়ের মতো মনে করতেন, বৈষয়িক ব্যাপারে যে বাবা একেবারেই নির্বোধ সে কথা মনে করিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। জোর করে বাবাকে দিয়ে শান্তিনিকেতনে বাড়ি করিয়েছিলেন (ভাগ্যিস!), পরে আমাকে বললেন, 'তোমার বাবার কাণ্ড দেখ, বাড়ি করেছে, যত বড় ঘর, তত বড় বাথরুম!' অর্থাৎ কোনোদিনই কিছু শিখল না। আবার একবার বললেন, 'অমিয় গেল I.M.F. কাজ নিয়ে, ওয়াশিংটনে — বিরাট চাকরি; শহর ভালো, কাজ ভালো লাগে না — ছাত্র পড়ানো নেই। দু-বছর পর ফিরে আসতে বদ্ধপরিকর। বকুনি দিয়ে, বুঝিয়ে চিঠি দিলাম একাধিক, অন্তত তিন বছর যেন থাকে, তা হলে পেনশন পাবে। এর যে কী প্রয়োজন সে পরে বুঝবে। অমিয়র তো এসব খেয়াল একেবারেই নেই।' বাবা সুবোধ বালক, ছোট ভাইয়ের মতো একথা মেনে নিলেন, অবসর জীবন সোয়াস্তিতে কাটল।

বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাবার প্রতি আস্থা না থাকলেও পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে বাবার পরামর্শ ছাড়া চলতেন না। বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতিতে টেনে আনা,[৯] কেমব্রিজে তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা প্রকাশ হওয়ার পর কোনো বিদেশি কোম্পানিতে মোটা মাইনেতে চাকরি না নিয়ে Ph.D করা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটিই ছিল বাবার পরামর্শে। দ্বিতীয় আলোচনার সময় আমি ঘরে ছিলাম, জেঠার চিন্তা 'অমিয়, Ph.D করে চাকরি কী পাবে? সেই তো পড়ানো।' ১৯৫৫-তে এই চিন্তা স্বাভাবিক, বিশেষ করে জেঠাদের প্রজন্মে শিক্ষকতার মাধ্যমে উপার্জন বেশি হতো না। পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়তো যেতেন না, বাবার কথায় উনি নিশ্চিন্ত হলেন।

তীক্ষ্ণ মেধার পুত্রবৎ অমর্ত্যকে নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল, স্বপ্নের অধিক সাফল্য দেখে গিয়েছেন, তবে নোবেল বিজয়ী হওয়া দেখে যেতে পারেননি। প্রত্যেক বছর অক্টোবর মাসে বলতেন, 'এ বছর ও পাবে', 'ও' কে সে কথা বুঝতে অসুবিধে হতো না। এ সময় শান্তিনিকেতনের বাইরে কোথাও গেলে অমর্ত্যকে কী টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে তার খসড়া সেক্রেটারির কাছে রেখে যেতেন।

অমর্ত্যর কাছে বাবা ছিলেন একাধারে কাকা ও শিক্ষক। Poverty and Famines-এর উৎসর্গে লিখেছেন, 'যিনি আমাকে প্রথম ধনবিজ্ঞানের মর্মবাণীতে দীক্ষিত করেছিলেন, সেই অমিয় দাশগুপ্তকে।'[১০]

অমিতা মাসির সংসার করার ধরন বা ধাঁচ ছিল আলাদা — মা, মীরা মাসি, জুনো মাসির থেকে ভিন্ন। বিত্তশালী পরিবারের গৃহকর্ত্রী, বাড়িতে অনেকজন কাজ করেন, নিজের হাতে অতটা করতে হতো না, কঠোর স্বরে, মিষ্ট ভাষায় কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। নানাদিকে নজর থাকত, হেঁসেলে, বাগানে বা ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখায়। ঘড়ির কাঁটার মতো সংসার চলত। বাড়িতে মুরগি রাখতেন, প্রত্যেকটি ডিমে তারিখ লেখা থাকত: বাড়িতে সন্দেশ বানিয়ে প্রতি বাক্সে তারিখ লিখে রাখতেন। মনে পড়ে আমাকে একবার বলেছিলেন, 'তোর মা, তুই, মঞ্জু — যে যখন আসে, চা-জলখাবার দিস। মনে রাখিস, এ বাড়িতে ঠিক বিকেল চারটায় এলে চা পাবি, সঙ্গে দুটি সন্দেশ।' চারটার এদিক-ওদিক হতো, শিঙ্গাড়াও পাওয়া যেত, তবে দাশগুপ্ত বাড়ির মতো শান্তিনিকেতনে power cut-এর অন্ধকারে সন্ধ্যে আটটায় অতিথিকে বলা হতো না, 'একটু চা করি?'

শক্ত মুঠিতে সংসার চালানোর মানে এই নয় যে, কাজের মানুষদের যত্ন নিতেন না। কোন মেঝেনের (কাজের মহিলা) বাচ্চার অসুখ, কার ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানোর জন্য সাহায্য দরকার চারদিকে খেয়াল রেখে, ওষুধ, পথ্য, পড়ার খরচের ব্যবস্থা করতেন। শক্ত মুঠি বা খোলা মুঠি, এ সাহায্য ছিল তখনকার সামাজিক প্রথা।

স্কুল-কলেজ জীবনে মাসির কাছে অনেক থেকেছি, কিছুটা শিখেছি। দশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে হোস্টেলে থাকতে ভীষণ কষ্ট হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা-বাবা-ভাইকে ছেড়ে এসেছি, মনে হতো ঢাকার খোলা আকাশ থেকে হোস্টেল শ্রীভবনে[১১] বন্দির মতো আছি। বসে থাকতাম সপ্তাহ শেষে কবে বুধবার, ছুটির দিনে মাসিদের প্রতীচী বাড়িতে যাব। মঞ্জুর সঙ্গে গল্প, খেলা — মাসিকে সারা সপ্তাহের নিজের কাজের ফর্দ দেওয়া এসব ছিল। সবচেয়ে প্রিয় ছিল দুপুরের খাবারের পর মাসির হাতের পায়েস। বারান্দায় দেয়ালে লাগানো ছোটদের খাবার টেবিল, অমর্ত্য, মঞ্জু, আমি একসঙ্গে বসা। মঞ্জু ও আমি টেবিলের নিচে পা দুলিয়ে পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতের মতো চেটেপুটে পায়েস খেতাম। যেই পায়েস শেষ হতো অমনি কাড়াকাড়ি 'তলানি' কে পাবে, কতটা পাবে। এত বেশি হুল্লোড় করতাম তলানি নিয়ে যে, মাসি ঠিক করলেন প্রতি বুধবার এক একজন পালা করে এই সুস্বাদু, একটু 'লেগে গেছে', পোড়ানো গন্ধের বস্তুটি পাবে। ক'সপ্তাহ ম্যাজিকের মতো কাজ করল, তারপর শুরু হলো জোট হওয়া — মঞ্জুর দিন হলে সে দাদাকে না দিয়ে আমার সঙ্গে ভাগ করে নেবে, আমার পালা হলে হয়তো আমি মঞ্জুকে না দিয়ে দাদার সঙ্গে ভাগ করব। দলাদলির ব্যাপার — অর্থনীতিতে একে সুচোখে দেখা হয় না, অমর্ত্যর ধনবিজ্ঞানে মনোযোগ দিতে তখনো ক'বছর বাকি, আমার আরো কিছু বেশি। আমরাও যে কখনো ছোট ছিলাম, খুনসুটি করতাম, বিশ্বাস করা মুশকিল, আবার ভেবে বেশ ভালো লাগে। কী আনন্দে দিনটা কাটত, একদিকের অর্ধগোলাকৃতি বারান্দা থেকে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানক্ষেত; সন্ধ্যেবেলা মুখ ভার করে আলের ওপর হেঁটে শান্তিদেব ঘোষদের বাড়ির পাশ দিয়ে শ্রীভবনে ফিরে যাওয়া। পথে কুঁচের ঝোপ থেকে কাঁটা এড়িয়ে লাল বিচি তুলে নিতাম, মালা কখনো বানাইনি, নেহাতই সময় কাটানোর জন্য এ কাজ।

সবকিছু ছাড়িয়ে মাসির যে ছবি পরিষ্কার তা হচ্ছে মৃদু হাসির সঙ্গে গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলা। অল্প হাসিতে ওঁর গালে রেখা পড়ত, তাতে সাধারণ কথাও মনে ধরত। ঢাকায় জেঠার বন্ধুরা ওঁর নাম রেখেছিলেন 'প্রিয়ভাষিণী', সত্যিই তাই ছিলেন।

শুধু যে গুছিয়ে কথা বলতেন তা নয়, চিঠির মধ্যেও একটা সাজানো ভাব ছিল, যেন কথা বলছেন। একটি উদাহরণ দিই। ভাই পার্থকে উনি 'ভূতনাথ' বলে ডাকতেন। ভাই বছরতিনেকের, মুখে, হাতে, পুরো কালি মেখে জগৎকুটিরের মাঝের দরজায় গিয়ে গর্বের সঙ্গে মাসিকে বলল, 'এই দ্যাখো, দামানা' (দামানা কেন ডাকত জানি না।)। মাসি বললেন, 'ওমা, তুই যে দেখি একেবারে ভূতনাথ' — রয়ে গেল মাসির কাছে ওই নামটি। ১৯৬৭-তে পার্থর বিয়ের খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মাসির চিঠি "অতি সুখবর। যে ভূতনাথ আমাকে 'দামানা' বোলে ডাকত, যে ভূতনাথ তার জেঠাকে মোটর কিনে দেওয়ার জন্য করুণ আবেদন জানিয়েছিল, যে ভূতনাথ তালগাছ শুধু সোনারই হয় বিশ্বাস কোরত,[১২] সেই ভূতনাথই এখন সাবালক হয়ে তার বৌ নির্বাচন কোরেছে ভাবতে যে কত আনন্দ এবং মজা লাগছে তা কী বলব। মেয়েটির এবং তার মা-বাবারও পরম ভাগ্য মনে করি — ভূতনাথের মতো ছেলে এবং তোমাদের মতো পরিবারকে আত্মীয়ভাবে পাচ্ছে বোলে।" (৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৭)। এরপর দেখা হলে মাসি বললেন, 'শান্তি, একেই তো বলে জাতে-গোত্রে বিয়ে, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপকের ছেলে বিয়ে করছে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপকের মেয়েকে।' বাঙালি পাত্র ও ইংরেজ পাত্রীর বিয়েকে 'জাতে-গোত্রে' মিলেছে বলা, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি এক মাসি দিতে পারতেন।[১৩]

চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন, রাশি রাশি চিঠি আছে মায়ের ঝাঁপিতে, মাসির লেখা — তাঁর জীবনের নানা মোড়, ব্যক্তিগত সমস্যা, অনুভূতি জানিয়ে। মাসির ঝাঁপিতে নিশ্চয়ই মায়ের লেখা প্রচুর চিঠি আছে। আগেকার দিনের মানুষ, inland letter বা কাগজে বিন্দুমাত্র জায়গা খালি থাকত না দুজনেরই চিঠি লেখার কায়দায়! জেঠার শেষ সময়ে মা মাসির পাশে ছিলেন, বাবা যখন আমাদের ছেড়ে গেলেন, মাসি মাকে আগলে রাখলেন।

মাসিকে শেষ দেখেছি ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে, তাঁর জামাই ও আমি দুজনেই শান্তিনিকেতনে। উনি তখন সুপরিচিত লেখিকা — বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি। সকালে মাসির সেক্রেটারির বারতিনেক ফোন এলো, মাসি জামাইকে দেখার জন্য ব্যগ্র — বহুকাল দেখেননি। যে ছবি দেখে আমি অভ্যস্ত, গিয়ে দেখি ঠিক তাই; মাসি সুন্দর সাদা খদ্দরের শাড়ি পরে পেছনের বারান্দায় বসা। তফাত এই যে, সামনে এখন একজন বসে তাঁর কথা, বক্তব্য লিখে নিচ্ছেন — ইনি ফোন করেছিলেন। বয়স হিসেবে চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ বিশেষ দেখলাম না। কথা বলেন, নানাজনের খোঁজখবর করেন, কিন্তু অসংলগ্ন, পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে, বিষয় খাপছাড়া। বয়সে এটা স্বাভাবিক, তবু যে মানুষটির বিরাট গুণ ছিল সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলা, সেই 'প্রিয়ভাষিণী'র বার্ধক্যের ছাপ দেখে দুঃখ হয়েছিল।

সেদিন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে 'bizarre'। যে জামাইকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাঁকে ও আমাকে 'প্রতীচী' বাড়ির গেটে আটকে দিলো পুলিশ। দেখলাম বাগানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো শিবিরে পুলিশ বসা। আমার স্বামী শান্ত-ধীরস্থির মানুষ, মিষ্টভাষায় কথা বললেও পুলিশ নারাজ। তারা আমাদের চেনে না, লিখিত রূপে আমাদের নাম নেই। হতবাক হয়ে ফিরে যাচ্ছি, এক পুলিশের হয়তো আশি বছর বয়সের আইজি প্যাটেলের ওপর দয়া হলো, আমাদের ঢুকতে 'আজ্ঞা' দিলেন। অপমানিত বোধ হলেও মাসিকে দেখা আমাদের মনে প্রথম, ভেতরে গেলাম — কাউকে কিছু বলে অনাসৃষ্টি করাতে কোনো লাভ হয় না। সময়ে বদল আসে, আমার ছোটবেলার 'প্রতীচী' ছিল চারদিক খোলা, আল দিয়ে, ক্ষিতিদাদুর বাড়ির ভেতর দিয়ে, অন্যদিকে রায় পরিবারের গিন্নিকে, 'বৌমা, কেমন আছো' বলে দৌড়ে, মাঝে মাঝে সামনের গেট দিয়ে ঢোকা, সে মাসি-বাড়ি আর নেই। আর ফিরে যাইনি।[১৪]

মা-বাবা মঞ্জুকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন — পুজোতে আমাদের জন্য এক রকম শাড়ি কেনা হতো। বাবার মৃত্যু হয় ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে। ১৯৯১ সালের পুজোতেও অসুস্থতার মধ্যে বাবা নিজে পছন্দ করে আমাদের দুজনকে ঠিক এক রকম শাড়ি দিয়েছিলেন। বাবাদের প্রজন্মে বন্ধুত্বের সংজ্ঞায় এটা অস্বাভাবিক ছিল না। বাবা চলে যাওয়ার পর মাকে লেখা মঞ্জুর চিঠি

> কাল মার ফোনে খবরটা পেলাম তখন থেকেই মনটা বহু বছর পার হয়ে ছেলেবেলায় ঘোরাফেরা করছে। তখন আমরা সবাই ছিলাম, কেউ আমাদের ছেড়ে যায়নি। তারপর আমাদের ভাই-বোনদের সংসার হয়েছে, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তোমাদের স্নেহ-আশীর্বাদ সকলে পেয়ে এসেছি। সুখের দিনেও তোমরা, বিপদের দিনেও। তাই সেখানে কোথাও ছেদ পড়ে গেলে সারামন হাহাকার করে ওঠে। বাবা তো আমাদের ছেড়ে গেছেন সে-কবেই। তবু কাকা ছিলেন, এবার সে জায়গায়ও ফাঁক এসে গেল। জানি তোমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে, তবু স্বার্থপরের মতনই বলবো আমাদের জন্য তুমি ভালো থেকো। এবারে শান্তিনিকেতনে তোমাদের ওখানে গেলে বারান্দা থেকে সহাস্য মুখে কাকা এগিয়ে আসবেন না এটা মেনে নিতে সময় লাগবে।' (১৫/১/৯২)

অমর্ত্য লিখেছিলেন, 'কাকার স্মৃতি সব কিছুতেই জড়ানো ঐ সুন্দর (নিরালা) বাড়িতে। কাকার বারান্দায় বসা চেহারাটা খুবই মনে পড়ছে। কাকা যে চলে গেছেন মানা সহজ নয় আমাদের কারুর পক্ষেই।' (১৮/১/৯২)

স্মৃতি ধারাবাহিকভাবে চলে না, ভবিষ্যৎ-অতীত-বর্তমান এলোমেলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলে, হেরাফেরি করে। ওয়ারীর বাড়ি থেকে বহু বছর পার হয়ে এসেছি, এবার সেখানে ফিরে যাই।

মঞ্জু কাছে না থাকাতে আমি বড় একা হয়ে গেলাম। বুলবুলদি, সত্যব্রতদা, অন্য দাদা-দিদিরা, সবার সামনে পরীক্ষা, আসা-যাওয়া কম। ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে বাবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় কাজে গেলেন। বেশিদিন থাকেননি, সেটা তো আমরা জানতাম না। ভাই ছোট, বছরতিনেকের, দেখতে গোলগাল ফর্সা, ডল পুতুলের মতো — আদরের ভাই, খেলার সঙ্গী নয়। একাকিত্বের একটা লাভ হলো, আমি প্রচুর বই পড়তে শুরু করলাম — সাত-আট বছরের সামর্থ্যে যা কুলোয়। পৌষমেলার পর কিছু সময় কেটেছে, ধীরে ধীরে একটা স্বাধীন চিন্তাধারা, মত-অভিমত সৃষ্টি হচ্ছে আমার মধ্যে। সমাজের নানা বিধি-ব্যবস্থার ওপর গুরুতর প্রশ্ন আসছে, আঘাত দিচ্ছে। লক্ষ করেছি দিদিমা-ঠাকুমাস্থানীয় সবাই থান পরেন, একবেলা খেতে পান, বছর ধরে উপোষ প্রায়ই নির্জলা; এঁদের অসহনীয় কষ্ট-দুঃখের বিবরণ দিয়েছিলেন এক বিধবা কন্যার মা, *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায়, বহুকাল আগে, ১২৭০ সনে।

‘কেমনে হেরিব আমি এ চাঁদ বদন।
শুকায়ে হয়েছে যেন কালীর বরণ ॥
অবলা বধিতে হেন সংসার তামসী।
কে সৃজিল বল পাপ একাদশী ॥
না গেল গলের অধে বিন্দুমাত্র বারি।
এ সব যাতন আর দেখিতে না পারি ॥

চলিবার শক্তি নাই মুখে নাই রব।
জিয়ান্ত হয়েছে বাছা শ্মশানের শব ॥’[১৫]

এঁদের শখ-আহ্লাদ করার অধিকার নেই, পাপ যেন তাঁদের ঘিরে রেখেছে, নিয়ম ভঙ্গ করলেই আক্রমণ করবে, পরিবারের অকল্যাণ হবে। তার থেকেও খারাপ লাগত, সমাজে তাঁরা ‘অশুভ’, কোনো শুভ কাজে তাঁদের হাত দিতে নেই, মুখ দেখাতে নেই — এঁরা বিধবা। এমন কেন?

এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার মতো বড় হইনি, আবার ভুলে যাওয়ার মতো ছোটও নেই। প্রশ্ন বা সমস্যা আরো তীব্র হলো শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে। বাড়িতে ওঁর লেখা ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমতি' ও 'পথ-নির্দেশ' নিয়ে একটি সংকলন ছিল। কড়া হুকুম, শেষোক্ত 'গল্প' পড়বে না। যা হয়, দাদা অমনি লুকিয়ে পড়ে নিলেন। আমি পিছু হটতে রাজি নই, চুপি চুপি পড়ে নিলাম।

'পথ-নির্দেশ' পড়ার সময় আমরা ওয়ারীতে থাকি — আমার বয়স আট। পড়ছি — গুণীন্দ্র অসুস্থ, মরণাপন্ন; খবর পেয়ে হেমনলিনী ছুটে এসেছেন; হঠাৎ করে উদয় হওয়া গুণীন্দ্রর 'আপনজন'দের রান্নাঘরে দেখে ক্রোধে, উদ্বেগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাচ্ছেন। অমনি 'পথ-নির্দেশ' ওয়ারীর বাড়িতে সাজিয়ে নেওয়া হলো। 'আপনজন'রা আমাদের রান্নাঘরে, সামনের একফালি বারান্দা দিয়ে হেম গটগট করে হেঁটে যাচ্ছেন, অগ্নিদৃষ্টিতে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছেন, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাদের লুঠতরাজ।' নিজের পরিবেশে কাহিনি সাজিয়ে নিতে কোনোদিনই আমার সময় লাগত না। কিন্তু এবার তাতে স্বস্তি পেলাম না।

হেম বিধবা। গল্পের মাঝে গুণীন্দ্রর কোনো উক্তিতে সে ফোঁস করে বলে ওঠে, 'হা অদৃষ্ট। যে রক্ষক, সে ভক্ষক।'[১৬] প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম, হেম নিষ্ঠুর; বুদ্ধি-বিবেচনা, ভালোবাসা নিমেষে উড়ে গেল? এছাড়া দীক্ষা, মন্ত্র, গুরু সব অবান্তর মনে হতো, আমাদের বাড়িতে কেউ মানতেন না। বিধবা বিবাহ কেন হতে পারে না, হিন্দু ব্রাহ্মতে কেন বিবাদ সেসব বুঝি না, কাহিনি যে সমাজের নিষ্ঠুরতাকে কেন্দ্র করে তাও বুঝি না।

আমার কাছে 'পথ-নির্দেশ' নেহাতই একটি গল্প, গুণীন্দ্র হেমনলিনীর বিয়ে হতে পারল না, কাহিনি অসম্পূর্ণ, দয়াহীন — লেখকের ওপর রাগ হলো।

এরপর লুকিয়ে পড়লাম *পল্লী-সমাজ*। মা-বাবা অনেক সময় *পল্লী-সমাজ* নিয়ে আলোচনা করতেন, বিশেষ করে রমেশের কথা। সে বহু বছর পর বাবার মৃত্যুতে গ্রামে ফিরেছে, সরল মনে রমাকে মনে করিয়ে দেয় রমেশ যেদিন মাতৃহারা হয়েছিল সেদিনের কথা। ছোট্ট রমা বলেছিল, 'রমেশদা, তুমি কেঁদো না, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব' — [আরো বলে], তোর সে কথা বোধকরি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত?'[১৭] এ কথা মনে বড় ব্যথা দিয়েছিল, তাই এই উপন্যাস পড়ার চেষ্টা। কঠিন বই, পরিধি বিরাট, গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ, চক্রান্ত, কৌলীন্য, জাত, সংস্কার পড়ার ধৈর্য নেই, তবু চেষ্টা করি। এখানেও একই ব্যাপার, রমা-রমেশের বিয়ে হতে পারে না। কেন? এ তো সমাজের বিধান। রমেশের জেঠাইমা কোনো এক ব্যাপারে রমেশকে বুঝিয়েছিলেন, 'সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেই হবে।'[১৮] রমেশ বা আমার মাসিমা, দিদিমারা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই খুদে পাঠক মেনে নিতে পারলেন না, অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল।

রমাকে নিজের মতো করে গড়ে তুললাম, আমার 'রমা' শ্যামবর্ণা, পাতলা, লম্বা, কালো লম্বা কেশ, নরম-মায়ালু মন, মায়ালু চোখ — গ্রামের কলহে, চক্রান্তে, একাকিত্বে শরীর জরাজীর্ণ — তাও রূপসী। সে জানে রমেশ নিষ্পাপ, পবিত্র, কিন্তু তার কাছে সে যেতে পারে না, সহানুভূতি, ভালোবাসা ব্যক্ত করতে পারে না। রমেশের জেঠাইমা পালকিতে রমাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাচ্ছেন। রমেশ এসেছে জেঠাইমার পায়ের ধুলো নিতে। আমার মনের ছবিতে রমা জেঠাইমার পাশে, পালকি চলছে, রমা ঘাড় ফিরিয়ে সজল নয়নে, আকুল নয়নে রমেশকে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। পালকি তার গতিতে চলতে লাগল, থেমে যাওয়ার, ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠল না। এই অসম্পূর্ণতা ছিল আমার সমস্যা।

আমার প্রশ্ন বা সমস্যার জবাব শরৎচন্দ্র প্রশ্ন আকারে দিয়েছেন। *পল্লী-সমাজের* শেষে জেঠাইমা বিশ্বেশ্বরী রমেশকে বলছেন, 'সংসারে তার [রমা] স্থান নেই, বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্ছি; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এতবড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনইবা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা।'[১৯] প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে হয় না — আমার প্রশ্ন বা সমস্যার ছায়া দীর্ঘ, সমাধান আসেনি। বাঙালি সমাজের কথা সঠিক জানি না, তবে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝি যে গুজরাটি হিন্দু সমাজে, বহু ক্ষেত্রে, আজো স্বামী হারানো নারীর ওপর 'অশুভ' তকমাটা পোক্ত করে লাগানো আছে।

নিষিদ্ধ বই পড়ে কত সময় কাটাব, গূঢ় প্রশ্ন নিয়েইবা কত চিন্তা করব। আবার সেই এঘর-ওঘর, মায়ের পেছনে ঘুরে বেড়ানো, লম্বা বারান্দায় যোগ-বিয়োগ করা আর ভাইকে নিয়ে খেলা করা। ভাই একটু একটু কথা বলে, দিদি বলে ডাকে, পেছনে হেঁটে বেড়ায়, বড় দিদি হওয়ার আনন্দ উপভোগ করি, মাঝে-সাঝে বকুনি দেওয়ার একজন আছে, তা-ও উপভোগ করি — দাদা-দিদিদের নির্দয় হতে সময় লাগে না — তবু আমার পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ 'বেকার'। একা বা বেকার হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ ওয়ারী; এ ছিল ভিন্ন জাতের পাড়া। পুরানা পল্টনের মতো পাড়া পাড়া ভাব ছিল না। পুরনো বসতি, অনেকের পৈতৃক বাড়ি, কোথাও কোথাও তিন প্রজন্ম একসঙ্গে থাকেন। প্রতিবেশী-সখ্য বিশেষ ছিল না, তার একটা কারণ বাসিন্দারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতেন — কেউ আইনজীবী, কেউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা ডাক্তার, আবার কেউ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। বিস্তৃত পাড়া বলে বাড়ির বাইরে ছোটদের একা ঘোরাফেরা করার অনুমতি ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা প্রায় বন্ধ, নামে ওয়ারী হলেও থাকে দূরের পথে। বাড়িতে বাগান ছিল না, শুধু একটি বড় গাছ, তাতে ছোট পিঁড়ির দোলনা।

ঝর্ণাদি মাঝে মাঝে আসতেন দোলনা দুলতে, এই ছিল বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ। দোলনা দুলতেও সমস্যা ছিল, কখন বাঁদর আসবে কে জানে। ওয়ারীতে শীত-বসন্তও টের পেতাম না — বাগান নেই, জেঠারা চলে যাওয়ার পর পরিচিত কোনো বাড়িতেই নেই, ফুলের গালিচা কোথায় পাব? এ দৃশ্য দেখতে ক'বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, ১৯৪৭-এ কাশী যাওয়ার পর বাগান ফুলে ভরে উঠল। ওয়ারী ভালোমন্দর বাইরে, পুরানা পল্টন নয় যে। যাই হোক, আমার অবস্থা দেখে মা ঠিক করলেন আমাকে গান শিখতে পাঠাবেন।

মায়ের কাছে রবীন্দ্রসংগীত, বাবার কাছে ডি এল রায় ও নজরুলগীতি শিখেছি আরো ছোট থেকে, তা সে তো বসে তালিম নয়, কোনো নির্ধারিত সময়েও নয়। কিছু শুনে শেখা, কিছু যখন যেমন সময় হলো। এবারে শিখব শাস্ত্রীয় সংগীত। শাস্ত্রীয় সংগীত শেখাতেন এক মাস্টারমশাই, খুব দূরে নয়, তাঁর কাছে শিখতে শুরু করলাম। কয়েকজন মিলে ক্লাস হতো। তপতি দাম, তখন তাঁর গায়িকা হিসেবে নাম হচ্ছে, উনিও আসতেন। যত্ন করে শেখাতেন মাস্টারমশাই। অনেকের সঙ্গে বসে সা রে গা মা করতে ভালো লাগত, বাড়িতে, সুরে, বেসুরে জানি না, রেয়াজ করতাম। ভাইকে শেখাবার চেষ্টা করতাম, ভাই খিল খিল করে হাসত। কিছুদিন পর মাস্টারমশাই ঠিক করলেন ছাত্রীদের নিয়ে (কোনো ছাত্র মনে পড়ে না) একটি প্রোগ্রাম করবেন। অনুষ্ঠানের আগেই আমরা পুরানা পল্টন ফিরে গিয়েছি। তিন তালে কাঁচা ছিলাম, একদিন ওঁর সামনে রেয়াজ করতে গিয়ে এতই গোলমাল করে ফেললাম যে মাস্টারমশাই বললেন, 'বিবি তিন তাল ওয়ারীতে ফেলে এসেছে!' তিন তাল মনে হয় সোজা, আমার আজো মনে হয় সবচেয়ে কঠিন। বহু বছর পর আমি যখন আবার শাস্ত্রীয় সংগীত শিখছি, ঘরানার ওস্তাদরা বলতেন, 'তাল মাথা থেকে আসে না, মনের ভেতর থেকে আসে। মাত্রা সম্বন্ধে যদি চিন্তাই করবে তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগের বিস্তার কী করে করবে? এর রূপ কী করে পেশ করবে?' সময় লাগে, হঠাৎ এক সময় তিন তালও মনের ভেতর থেকে অজান্তে এসে যায়, এর ছন্দ মনের মাঝে বসে যায়।'

যাই হোক, সেই বেতালা বিবিকে দিয়েই গাওয়ালেন প্রোগ্রামে, 'তুহুঁ মেরা সঙ্গজিনা বো-লো পিহারবা।' এভাবেই শুনতাম, এভাবেই গেয়েছি। পরে জানতে পেরেছি এটা ভূপালি রাগের পুরনো বন্দিশ, নিশ্চয়ই 'না বোলো পিহারবা।' কথা ভাগ করা সেই 'দুলিয়া নন্দের' মতো।

অন্য বন্দিশ যেটা শিখেছিলাম তার সঙ্গে অনেক বেশি অত্যাচার হয়েছিল। 'দেবী দুর্গে সদা গাওরে মানবা', এই পর্যন্ত ঠিক, তার পরেই ধরতাম 'জাকিকির পা-সুসব।' আসলে বোধহয় 'ইয়া কি কিরপা...', 'সুসব' আজো বুঝে উঠতে পারিনি। সত্তরের দশকে ডগরবন্ধু দিল্লিতে তাঁদের বাসায় নানা বন্দিশ শোনাচ্ছিলেন। খম্বাবতীর পুরনো সাধরা হিসেবে উদাহরণ দিলেন, 'দেবী দুর্গে সদা গাওরে মানবা।' সে সময় খেয়াল হয়নি এটা আমার ছেলেবেলার সেই গান, তা হলে 'সুসবে'র রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেত। সুর ঠিক হতো, কিন্তু বাণী? রানীকাকিমার পড়ুয়া ছেলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মা আমাদের নিয়ে বড়াই করতেন না সেটা ঠিক, তবে কন্যা কোনো ব্যাপারে কৃতী লাভ করলে লিখে রাখতেন। বিনা মন্তব্যে, ওঁর নিজের কী মনে হলো তা কখনো জানাননি। ১৯৪৫-৪৬-এর ডায়েরিতে লেখা

> ১৩৫৩ সালের ১ বৈশাখে গীত-সদনের (নিশ্চয়ই আমার গানের স্কুলের নাম) উৎসব উপলক্ষে জগন্নাথ কলেজে বিবি 'বসন্ত-নৃত্য' এবং classical song 'তু মেরা সঙ্গ জিনা' গান করে সবার প্রশংসা অর্জন করে।
>
> ১৩৫৩ সালে রবীন্দ্রস্মৃতি উৎসব উপলক্ষে পুরানা পল্টনে মহিলাদের উদ্যোগে অভিনীত ঋতুবঙ্গে বিবি বসন্ত-নৃত্য করে — বিউলি হলে।[২০]
>
> {১৯৪৬-২২শে মে
>
> ১৩৫৩-জ্যৈষ্ঠ} পুরানা পল্টনের বিদ্যামন্দির স্কুলে বাল্মীকি প্রতিভার দস্যু সর্দার সাজিয়া বিবি নাচ-গান করে।
>
> ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে পুরানা পল্টনে ছোট মেয়েদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা অভিনয় হয় — তাহাতে বিবি ক্ষিরির পার্টে অভিনয় করিয়া সকলের প্রশংসা পায়।'

প্রশংসা পাওয়া কঠিন ছিল না, দর্শক-শ্রোতা সবাই কলাকারদের পরিবার, বন্ধু — বেতালা, বেসুরা সবই ভালো লাগে, বিশেষ করে ছোটদের কাছ থেকে।

বয়স হওয়ার পর যখন পেছনে তাকানোর অভ্যেস অধিক মাত্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, চিন্তা করেছি, একটি সাত বছরের মেয়েকে মা-বাবা কেন শান্তিনিকেতন পাঠিয়েছিলেন। শুধুই কি পৌষমেলার অভিজ্ঞতা বা জেঠা-জেঠিমার আদরে থাকার জন্য? অন্য কোনো কারণ ছিল কি? পুরানা পল্টন ছেড়ে আসাটা আমি ভালোভাবে মেনে নিতে পারিনি, ওয়ারীর বদ্ধ পরিবেশে দিন দিন মনমরা, অভিমানী হয়ে যাচ্ছিলাম। মা-বাবা ব্যস্ত, দাদারা খুব সদয় নন, বোনেদের ভীতু মনে করে অবজ্ঞা করা কঠিন নয়। সারা বছরের ধকলের পর মা-বাবারা যেমন সপরিবারে 'চেঞ্জে' যান, আমাকেও সে রকম 'চেঞ্জে' পাঠানো হয়েছিল। ফল ভালো হলো — দাদাদের তাচ্ছিল্য অগ্রাহ্য করে ভীতু থেকে স্টেজে নামলাম, অভিমানী থেকে 'আর্টিস্ট' হলাম — আর কী চাই।

* * *

চুপি চুপি নভেল পড়া আর গান শেখা, এরই মধ্যে কোনো সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেল, ইংরেজ ও তাদের বন্ধুরা বিজয়ী। এত বড় একটা ঘটনা, ছোটদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দাদাকেও সে রকম উচ্চবাচ্য করতে দেখলাম না। ওয়ারীতে সেনাবাহিনী, তাঁবু দেখিনি, কালো পর্দা টানা রাতে খেলা করেছি বাড়ির ভেতর — যুদ্ধ দূরের ব্যাপার, আমাদের চিন্তা-ভাবনার বাইরে। কৃষ্ণা আর আমি চোখ গোল গোল করে বলাবলি করতাম, 'জানিস, যুদ্ধ চলছে', এ ছাড়া কিছু নয়। ইংরেজরা জিতেছে, তাতে আমাদের কী? আমরা তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ব্যস্ত, দিল্লিতে এদের বিচার হচ্ছে, ইংরেজদের ওপর প্রচণ্ড রাগ। রব উঠেছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস নেই, 'হিরো' এখন শাহনওয়াজ খান, যিনি দিল্লিতে কাঠগড়ায়। উদ্যম যেমন হঠাৎ করে আসে, তেমনি হঠাৎ করেই নিভে যায়। কিছুদিন হৈচৈ করলাম, বিশেষ করে দাদার উৎসাহে. 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা' গাইলাম, ভাইও একটু-আধটু 'কদম' বলল, তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এসে অন্য চিন্তায় ডুবিয়ে দিলো।

বহু বছর পর মিরাট শহরে শাহনওয়াজ খানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, INA-এর এক যোদ্ধার সঙ্গে করমর্দন করে রোমাঞ্চ হয়েছিল। ওঁর মেয়ে, নাম সম্ভবত জাহানারা বেগম, আমার পাশে বসেছিলেন — কথা বলে ভালো লেগেছিল। খাঁ সাহেব তখন মন্ত্রী, যতই সৎ হোন, মন্ত্রীর স্থান আলাদা — চল্লিশের দশকের জাদু নেই। তাছাড়া এর অনেককাল আগে 'হিরো'র জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন অন্য একজন, নাম — 'চে গেভেরা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ শেষের একটি জিনিস পরিষ্কার মনে আছে — প্যারাসুট সিল্ক। বছরের পর বছর কাপড়-চোপড় এমনকি মার্কিন, লংক্লথ পাওয়ার অনিশ্চয়তার পর বাজারে এলো প্যারাসুট সিল্ক, পরিত্যক্ত প্যারাসুটের কাপড়। নতুন কিছু পেয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ফ্যাশন হলো এ সিল্কের ফ্রক, ব্লাউজের, কয়েক বন্ধু রংবেরঙের বাহারের জামা পরতে লাগলেন, আমার তা হলো না। মা প্রাচীনপন্থী, অজানা জিনিসে হাত দেবেন না। কিঞ্চিৎ বঞ্চিত মনে হলো নিজেকে। শান্তিনিকেতনে কয়েক দিদির ব্লাউজে কারুকার্য করে সাধ মেটালাম, তখন মনে হলো কাপড়টি খুব সুবিধের নয়। খেয়াল হলো হাওয়া-বাতাস ঢোকে না, অস্বাস্থ্যকর এ কাপড় তো সিল্কই নয়, পুরোপুরি মেকি। কয়েক বছর পর পরিত্যক্ত প্যারাসুটের গুদাম খালি হয়ে গেল — ফ্যাশন ফিরে গেল সুতি, সিল্ক, সাটিনে।[২১] ছেলেদের জন্য অভিজাত সিল্ক ছিল 'ডবল ঘোড়া' বস্কির সিল্ক — দুটো ঘোড়ার ছাপ থাকত থানে। খাঁটি জিনিস যুদ্ধের সময় দুর্লভ বস্তু, নতুন চাকরি শুরু করছেন এমন ছেলেরা চেষ্টা করতেন অন্তত একটি শার্ট এই কাপড়ের বানাতে। প্যান্টের জন্য বহু বছর শৌখিন ছিল 'মখ্‌খন জিন'। লম্বা প্যান্ট পরার পক্ষে ছোট, তাও ভাইয়ের আবদার ছিল 'মখ্‌খন জিনের'। ধবধবে সাদা এই প্যান্ট এত পছন্দের, তখন তো বাড়িতে ইস্ত্রির ব্যাপার ছিল না, প্যান্ট ভাঁজ করে তার ওপর চারটি বালিশ দিয়ে ভাই বসে থাকত — ইস্ত্রি হবে ভেবে!

ওয়ারীতে থাকতে বিরাট ঘটনা আমার স্কুলে ভর্তি হওয়া। বাবা অল্পবয়সে স্কুলে যাওয়া বিশ্বাস করতেন না, কেউই তেমন করতেন না — কৃষ্ণা, আমি, সমবয়সী সবাই, বাড়িতেই পড়াশোনা করতাম। ওয়ারীতে একা পড়ে গিয়েছিলাম বলেই বোধহয় মা ঠিক করলেন আর বাড়িতে নয়। দাদা স্কুলে যায় — সে ঈর্ষাও তখন প্রচুর ছিল, সকালে টিফিন নিয়ে পড়ার ঘরে আমার ছোট টেবিলে বসে পড়াশোনা বা পড়াশোনার ভান করতাম। বলা বাহুল্য, টিফিনের নির্ধারিত সময়ের আগেই বাক্স খালি হয়ে যেত! সামনের বাড়িতে প্রীতিদি ইডেন স্কুলে পড়ান — ইডেন মায়েরও স্কুল, প্রীতিদির সঙ্গে কথা বললেন। ভর্তি হতে পরীক্ষা দিতে হবে। স্কুল তখনো পুরান ঢাকায়। মাঠে বসে পরীক্ষা দিতে হলো। এক প্রশ্ন ছিল, বিশেষ্য/বিশেষণ দিয়ে বাক্য পুরো করতে হবে। আমি বাংলা লিখতে-পড়তে ভালো পারতাম, কিন্তু বিশেষ্য, বিশেষণ কখনো শুনিওনি, শিখিওনি। বাক্যটি ছিল '— ফুলটি ছিঁড়িও না'। অনেক চিন্তা করে লিখলাম, 'ফুটন্ত ফুলটি ছিঁড়িও না'। পরীক্ষক অবাক হলেও বাক্যটি বোধহয় ব্যাকরণসম্মত হয়েছিল, ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। Second shift-এ যেতাম, মনে আছে রোজ চেষ্টা কী করে প্রথম shift-এ বাড়ি ফিরতে পারি। এ ছাড়া স্কুল সম্বন্ধে কিছু মনে নেই। মায়ের খাতায় ভর্তি হওয়ার দিন-ক্ষণ লেখা আছে, তার পাশে আমার আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, '১লা মাঘ (সোমবার) বিবি Class V-এ ইস্কুলে ভর্ত্তি হয় (১৩৫২)।' মাকে অনুকরণ করে লেখা, মা ইংরেজি তারিখ দিয়েছেন, 'জানুয়ারী ১৯৪৬ সন, ৮ বৎসর আড়াই মাস বয়সে।' 'বিবি' নামে কয়েকটি পাতা আছে তাঁর কন্যার কীর্তিকলাপ নিয়ে 'বিবি ৩ বৎসর ২ মাস বয়সে ইংরেজি লিখিতে এবং পড়িতে আরম্ভ করে।[২২] ক্রমে ক্রমে অঙ্ক এবং ৫ বৎসর বয়সে বাংলা শিখে। ৪ বৎসর বয়সে map-pointing-এ সকলকে আশ্চর্য্য করে।' 'ডায়েরিস্ট' হিসেবে লেখা না গর্ব, বলা সম্ভব নয়। আমার কৃতিত্ব এখানেই শেষ, আর কিছু লেখা নেই।

এ সময়কার আরেকটি বিরাট ঘটনা, আমার *রংমশাল* পত্রিকার গ্রাহক হওয়া। মা-বাবা ১৯৪৬-এ গ্রাহক করলেন আমাকে — গ্রাহক নম্বর ৩১৯১। কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ছোটদের এই মাসিক পত্রিকার তুলনা হয় না। গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, অনুবাদ গল্প, নাটক, সমসাময়িক সব নামকরা লেখকের লেখা আছে এতে। যে দুটি খণ্ড আমার কাছে সংরক্ষিত আছে, পড়ে শুধু রোমন্থন নয়, আজো উপভোগ করি, নতুন কিছু শিখতে পাই, জানতে পাই। চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে *রংমশালের* পাঠকরা চিরকৃতজ্ঞ।

ভাইয়ের পড়াশোনা সম্বন্ধে কোনো ডায়েরি পাইনি — হয়তো খুঁজে পাইনি। ওর চার বছর বয়স থেকে আমরা স্থিতিহীন, নানা শহরে বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে বা অল্পসময়ের বাসাতে দিন কেটেছে। অনিশ্চিত অবস্থায় মা হয়তো ডায়েরি লেখেননি। বছরপাঁচেক বয়সে ভাইয়ের লক্ষ্য ছিল রেলগাড়ির ইঞ্জিন ড্রাইভার হওয়ার — ট্রেনে যাতায়াত ছিল ওর বিশেষ অভিজ্ঞতা। বর্ধমানে জেঠার বাড়িতে ভাঙা ট্রাইসাইকেলের চাকা তুলসীতলায় পুঁতে, সারাদিন হুইসেল/ট্রেনের হুশ আওয়াজ করে চাকা এদিক-ওদিকে ঘোরাত। ওর বিদ্যা দেখে মেজমা নাম দিয়েছিলেন, 'পণ্ডিত'। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে কাশীতে যাওয়ার পর দেখা গেল, হিন্দি জানে না — স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়, ক্রিকেট হয়ে গেল ধ্যান-ধারণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কালের বাড়ি, সামনে প্রচুর জমি; দুটি বিশাল গাছের মাঝে বানানো হলো ক্রিকেটের পিচ। বন্ধু রবিকে নিয়ে ক্রিকেট খেলা হলো নেশা। সমবয়সী রবি, স্কুল শুরু করেনি, ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকে যে মহিলা সাহায্য করতেন বাড়ির কাজে, তার ছেলে। রবি চিরদিনের জন্য বন্ধু রয়ে গেল। কেমব্রিজ থেকে এসে ও কাশীতে রবির সঙ্গে দেখা করে।

শুধু ক্রিকেট খেলা করলে তো চলবে না, এক মাস্টারজি আসতে শুরু করলেন হিন্দি শেখাতে। মাস্টারজিকে খুব পছন্দ, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল — দুজনেই নরম স্বভাবের — স্নেহ-শ্রদ্ধার অভাব নেই। মাস্টারজি প্রথম পার্থর মেধা লক্ষ করে প্রচুর আশীর্বাদ করেছিলেন। এরপর শুরু হলো স্কুল, মাস্টারজি আসেন, বাকি সময় ক্রিকেট। স্কুলের বাস বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়, মা সেখানে অপেক্ষা করেন, নেমেই ভাই মায়ের আঁচল ধরে দিনের কীর্তি-কাহিনি বলে। বয়স সাত বছর। একদিন নেমেই বলল, 'মা, মা, আজ অঙ্ক পরীক্ষা ছিল — আমি দশ-এ আড়াই পেয়েছি।' মা ঘাবড়ে গেলেও শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আড়াই পেলি, টিচার তোকে কিছু বললেন না?' চটজলদি জবাব, 'ও-মা টিচার কী বলবে উয়োই তো নম্বর দিয়েছে!' (হিন্দি শিখে ছোটবেলায় ওর বাংলায় একটু হিন্দি এসে যেত)। সেই ছোট ভাই আজ বিশ্ববিখ্যাত গবেষক, অর্থনীতিবিদ, দর্শন শাস্ত্রে চিন্তাশীল, অঙ্কে পারদর্শী, Environmental Economics-এর কর্ণধার, কেউ বলবেন জন্মদাতা। সর্বোপরি, ব্যক্তিগত জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে একটি খাঁটি মানুষ। 'পণ্ডিত' নাম যথাযথভাবে সার্থক হয়েছে।

এবারে যা লিখছি তা অনেকে 'আষাঢ়ে গল্প' মনে করবেন, কিন্তু এ পুরোপুরি খাঁটি, সত্যি ঘটনা। ভাইয়ের ওপর অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আশীর্বাদ/ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কী করে হলো; ১৯৫১, দাশগুপ্ত পরিবারের আমরা চারজন প্রিন্সটন বেড়াতে গিয়েছি — সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবার পরিচিত অধ্যাপক আছেন। এক বন্ধু গাড়ি চালাচ্ছেন। ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে আইনস্টাইনের নাম শুনেছি, বৈজ্ঞানিক ও উঁচু মাপের মনীষী। বোস-আইনস্টাইনের জন্য ওঁর কথা বেশি করে হতো। সেদিন প্রিন্সটনে ঠিক হলো, চলি, আইনস্টাইনের বাড়িটা তো দেখি। সাদামাটা দোতলা বাড়ি, সামনে সামান্য জমি, সিঁড়ি ভেঙে গেলে বারান্দা, ভেতরে যাওয়ার দরজা। কথা হচ্ছে, 'এই মনীষীকে যদি একটু দূর থেকেও দেখতে পেতাম।' সে সময় এই ইচ্ছে বিস্ময়কর ছিল না, সাধারণ মানুষ আমরা, গান্ধিজি বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখে নিজেদের ধন্য মনে করতাম। এরকমই অনেকদূর থেকে গান্ধিজিকে দেখেছিলাম ১৯৪৬/৪৭-এ দিল্লিতে, দূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে কবিগুরুকে দেখেছিলেন বাবা, ঢাকাতে ১৯২৬-এ 'তুরাগ' বোটের কিনারায়।

গাড়ি আইনস্টাইনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ কী মনে হলো, 'আসছি, জিজ্ঞেস করি উনি কোথায়' বলে মা-বাবা কিছু বলার আগেই ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শান্তিনিকেতনে আশ্রমে ও ওয়াশিংটনে Roosevelt High School-এ পড়া চৌদ্দ বছরের আমি, ভয়-ডর, আমতা আমতা ভাব নেই। ন-বছরের ভাইটির হাত ধরে গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে 'বেল' বাজালাম। শান্ত মুখশ্রী, ধীরস্থির মধ্যবয়সী এক মহিলা দরজা খুলে অবাক হলেন। নির্ভয়ে বললাম মা-বাবা, আমাদের কথা; আমি আর ভাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে দেখতে চাই — মা-বাবা, বন্ধুটি গাড়িতে। মহিলা জবাব দিলেন, 'উনি তো ইনস্টিটিউট থেকে ফিরে এখন একটু আরাম করছেন, আধা ঘণ্টা পরে এসো, আমি জিজ্ঞাসা করে রাখব।' উৎকণ্ঠা নিয়ে সময়টা কাটালাম শহরে এদিক-ওদিক করে — ফিরে যেতেই মহিলা বললেন, 'মা-বাবা-বন্ধু সবাইকে নিয়ে ভেতরে এসো, বসো — উনি এখুনি আসছেন।'

বাড়ির মতোই সাদাসিধে বসার ঘর, আড়ম্বরহীন, ইউরোপের অভিজাত art deco ডিজাইনের কয়েকটি চেয়ার সাজিয়ে রাখা। তখন তো 'অভিজাত ডিজাইন' জানতাম না, মনে হয়েছিল হাতলহীন চেয়ারের পিঠটা এত উঁচু আর সোজা — এ কেমন? এরকম চেয়ার ব্যবহার করলে শিরদাঁড়ায় কখনো ব্যথা হবে না!

একটু পর শুনছি চটির দৃঢ় আওয়াজ, খস্, খস্, খস্, খস্; সিঁড়ি দিয়ে নামছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ঘরে ঢুকে বললেন, 'এইটি বাবা, এইটি মা, এইটি মেয়ে, এইটি ছেলে, আর এইটি বন্ধু?' ঠিক ছবির মতো চেহারা, উসকো-খুসকো সাদা চুল, অসাধারণ উজ্জ্বল চোখ — মনে হয় অতল গভীরের সবকিছু উনি দেখতে পান — জ্বলজ্বলে চোখে হাসি, মুখে হাসি। 'তোমরা গান্ধি, ট্যাগোরের দেশ থেকে এসেছো, বাহ্!' কুশলপ্রশ্নের পর বাবা অর্থনীতিবিদ জেনে অর্থনীতির ওপর নানা কথা বললেন। সে তো বুঝিনি, তবে Homo Economicus দুজনকেই ক'বার বলতে শুনলাম। 'গান্ধি-ট্যাগোরের' দেশের এক পরিবারকে দেখে খুশি হয়েছেন মনে হলো — আপ্যায়ন আন্তরিক। যখন ফিরে আসছি, মা পার্থকে বললেন, 'তোমার আজকের দিনের কথা মনে থাকবে তো — তুমি যে এঁকে দেখেছ?' অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বললেন, 'ও ভুলবে না। ওর চোখ দেখে বোঝা যায়, ও যা দেখে তা কখনো ভুলে যায় না।' একে আমি আশীর্বাদ/ভবিষ্যদ্বাণী মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে বারান্দা অবধি এলেন, যতক্ষণ না গাড়ি ছাড়ল, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন বহুপরিচিত বন্ধু।[২৩]

* * *

সময়ের লাগাম আবার শিথিল হয়েছে, রাশ টানেনি।

মাসিরা যখন কলকাতায়, সম্পর্কে বাবার দাদা, হীরালাল জেঠা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আসেন। ইনিও শিকারি, জেঠার শিকারের বাঘের সঙ্গে এঁর বাঘেরাও সঙ্গ দিতে থাকল, সঙ্গে সঙ্গে চলল শিকার, জঙ্গলের গল্প। ইনি একসময় স্বদেশি করতেন, সেই সূত্রে বারীন ঘোষের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বারীন ঘোষ একবার ওঁর অতিথি হয়ে এসেছিলেন, ছোট একটি সভা হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। তখনকার নিয়মমতো পুরুষরা ঘরের ভেতর, মা-মাসিরা দরজার বাইরে বারান্দায়। মা প্রশ্ন করেছিলেন, 'শুনেছি, জেলে থাকতে আপনাদের কাছে পেঁপের মধ্যে ছুরি লুকিয়ে পাঠানো হতো। সত্যি কি?' আশ্চর্য, প্রশ্ন মনে আছে, উত্তর মনে নেই।

শিকার, সাঁতার, খেলাধুলা, নানাকিছুতে পারদর্শী হীরালাল জেঠা, কোনো ইনস্যুরেন্স কোম্পানির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, লেখাপড়ায় ঝোঁক ছিল, অধ্যাপকদের সম্ভ্রম করতেন। বাবা, পরিমলকাকা ঢাকা ছেড়ে যাওয়াতে নিজেকে একা মনে করতেন। স্ত্রী-সংসার ছিল না। ১৯৪৬-এ আমাদের অল্প পরেই জগৎকুটির ছেড়ে উনি চলে আসেন পুরানা পল্টনে। সেখান থেকে ১৭/৭/৪৭-এ লেখা বাবাকে চিঠি — আমরা তখন কটকে। 'পল্টনের অধিবাসীরা আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে। নৈরাশ্যের দিকটা বেশি। নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত কবে জানা যাবে জানি না। উড়িষ্যা দেখি নাই, একবার যেতেই হবে — শরতে বা শীতে, যদি অবস্থা অনুকূল থাকে। পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে রেডিওর মারফতে নিখিল বিশ্বের চিরন্তন কান্না শুনছিলাম — 'সাথীহারা কাটে বেলা।' তোমাদের কথা ভেবে এ গান আরো মনে এলো।' ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল সীতারামপুরে বেশকিছু জমি নিয়ে, ঢাকার পুরনো বন্ধু, আত্মীয়দের সঙ্গে নতুন 'পুরানা পল্টন' বানাবেন। শেষ জীবনে আবার সবাই কাছাকাছি থাকবেন। বাবা, সুবোধমামা, পরিমলকাকা এ কাজে সহযোগিতা করেছিলেন; কিন্তু সরকারি অনুমতির গাঁট খোলা সহজ ছিল না, হীরালাল জেঠা তাঁর স্বপ্ন সফল করতে পারেননি। ১৯৫০-৫১-তে অবসরপ্রাপ্তির পর 'সাথীহারা' হয়ে বেলা কাটালেন।

ওয়ারীর বাড়িতে নানাজনকে কাছে পেয়েছি, একটু বড় হয়েছি বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনেও আছে বেশি করে। যার কথা খুব মনে পড়ে তিনি পিসিদিদি, হীরালাল জেঠার মা। আমার ঠাকুর্দামশায়ের প্রথম স্ত্রী বিয়ের অল্পদিন পরেই মারা যান। পরে ঠাকুর্দামশায় আমার ঠাকুমাকে বিয়ে করেন। পিসিদিদি ছিলেন প্রথম স্ত্রীর ছোট বোন। দিদি না থাকলেও আমাদের বাড়ির সঙ্গে এঁর ও এঁর পরিবারের সম্পর্ক অটুট ছিল[২৪] — ঠাকুমা এঁকে নিজের ছোট বোনের মতোই রাখতেন। কোনো কারণে বাবা এঁকে মাসি না বলে পিসি ডাকতেন, তাই তিনি পিসিদিদি। জগৎকুটিরে পিসিদিদি মাঝে মাঝে এসে থাকতেন, প্রায় দুপুরে আমাদের কাছে চলে আসতেন। পিসিদিদি তখন বৃদ্ধা — রোমন্থন করতে ভালোবাসেন, আমরা শুনতে ভালোবাসি। গৈলার কথা, ঠাকুমার কথা — ওঁর দিদি যিনি কতযুগ আগে চলে গিয়েছেন, ওঁর ভগ্নিপতি আমার ঠাকুর্দামশায় সম্বন্ধে নানা গল্প, গ্রামের জীবনের কথা। সেই জীবনের স্বাদ আলাদা, পুকুর, মাছ, বুনো ফুল, সবুজ ধানক্ষেত, সোনালি ধান, নারকেল, সুপুরি, বাঁশবন, জল, বৃষ্টি, ব্রত, গাজন, চড়ক, মেলা — কত গল্পই না করতেন। দিদির কথা বলে চোখ মুছতেন, 'বকশীবাড়ির পেছনের খাল দিয়ে নৌকা করে নিজের গ্রামে ফিরছি, আজো দেখতে পাই দিদি তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় চেয়ে রইল — নৌকো বাঁক নিল, দিদিকে আর কখনো দেখলাম না।'

এই বৃদ্ধ বয়সে মায়ের কালো সাদা পুরনো ছাপের শাড়ি নিয়ে, পুরনো মিলের শাড়ির পাড়ের সুতো টেনে, কাঁথা সেলাই করতেন। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ওঁর হাতটা ঠিক চলত। বিবন দাইয়ের দেওয়া চিনেমাটির পেয়ালা-পিরিচের সঙ্গে এই কাঁথাও নানা দেশ, পথ ঘুরে মায়ের সম্পত্তির অটুট ভাগ হয়ে ছিল। এটি এখন আমার কাছে আমার পূর্বপুরুষের সঙ্গে বাঁধন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. আশালতা সেন, পৃ. ৩৪-৩৫। অমর্ত্য সেন তাঁর বিখ্যাত বই, *Poverty and Famines* (১৯৮১)-এ ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এই ধাঁচে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, বইটি তাঁর শিক্ষক অমিয়কুমার দাশগুপ্তকে উৎসর্গ করা।
২. দ্রঃ হাসান আজিজুল হক, *আগুনপাখি* স্বল্পপরিসরে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা যেভাবে দিয়েছেন, তার ওপর কিছু যোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
৩. লোভ কি সত্যি ছিল না? তেরো বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে আমেরিকাতে ওয়াশিংটন শহরে আমার প্রথম আবদার, বাহারের ফ্রক, টুপি পরা, চোখ বোজে-মেলে, বসিয়ে দিলে কাঁদে, এমন একটি পুতুল। বহু বছর এ আমার সঙ্গী ছিল।
৪. দাশগুপ্ত এ. কে., Collected Works.
৫. 'মূল্যহীন বাজে টাকা বাজার থেকে আসল টাকাকে তাড়িয়ে দেয়'।
৬. সঠিক তারিখ জানি কারণ ২০ ডিসেম্বর আমার খোঁজখবর দিয়ে অমিতামাসির চিঠি মায়ের ঝাঁপিতে আছে।
৭. চক্রবর্তী, পৃ. ১৭৯
৮. গোস্বামী, পৃ. ৯৮-৯৯
৯. অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পাবার পর নানা দৈনিক পত্রিকার সাক্ষাৎকারে অমিতামাসি এ কথা বলেছেন।
১০. অশোক মিত্র; পৃ. ৩৯-৪০
১১. শ্রীভবনের নাম পরে শ্রীসদন হয়েছে।
১২. ছেলেবেলা মথুরা কি বৃন্দাবনে জগৎ শেঠের উপহার সোনার তালগাছ দেখেছিল।
১৩. আমার ভ্রাতৃবধূ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ প্রো. জেমস মিডের কন্যা।
১৪. পুলিশের দোষ নেই – তাদের যে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটা তারা পালন করেছে। যিনি আমাদের ফোন করে আমন্ত্রণ করেছিলেন তার পুলিশকে বলে দেওয়া উচিত ছিল। মাসির বয়স হয়েছে, সুষ্ঠু সংসার বিক্ষিপ্ত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।
১৫. চক্রবর্তী, পৃ. ১৫। *সোমপ্রকাশ*, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৭০ ব., পৃ. ৫। বলা বাহুল্য, বিধবা মেয়ের মায়ের 'বিলাপ' আমি পড়েছি বহু বছর পর সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর বইয়ে।
১৬. *শরৎ সাহিত্যসমগ্র*, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৬০২।
১৭. ঐ, প্রথম ভাগ, পৃ. ১৩৬। অশান্ত, অনিশ্চিতের কাল ১৯৪০-এর দশক। অনেকটা বাধ্য হয়েই বড়দের কাছাকাছি দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতাম। স্বভাবত কারণে ওঁদের আলোচনা আমাদের প্রভাবিত করত।
১৮. ঐ, প্রথম ভাগ, পৃ. ১৪৪।
১৯. ঐ, প্রথম ভাগ, পৃ. ১৮৪।
২০. শুনেছি 'বিউলি' হল এখন নেই। চল্লিশের দশকের নামকরা হল ঢাকাতে কোথায় ছিল মনে নেই।
২১. আশির দশকে একটি ছোট্ট 'বুটিকে' বড় সুন্দর কারুকার্য করা ছোট টুকরো দেখলাম। যাঁর দোকান তিনি আমার পরিচিত, জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী কাপড় বলতে পারো? না সুতি, না সিল্ক, না নাইলন, কী হতে পারে?' জবাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে অসুবিধে হলো না, 'প্যারাসুট সিল্ক'। প্রাক-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জন্ম হলে সুবিধে আছে। টুকরোটি আমার কাছে – যাক, শেষ পর্যন্ত প্যারাসুট সিল্ক আমার কেনা হলো!

২২. খাঁটি বাঙালি পরিবারে আমার অক্ষর পরিচয় ইংরেজি দিয়ে কেন শুরু হয়েছিল জানি না। বাবার মাতৃভাষা শিক্ষায় গভীর বিশ্বাস ছিল, সেটা তাঁর নানা লেখায় আছে। হতে পারে যে আমি বাবার চারপাশে যতটা সময় থাকতাম, বাবা থাকতেন ইংরেজি ভাষার অর্থনীতির বই নিয়ে। বায়না করেছি ইংরেজি শিখবার বা বই দেখে দেখে এত প্রশ্ন করেছি যে বাবা হরফ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৩-এর প্রশ্নপত্র দেখে বোঝা যায় যে ততদিনে বাংলা ভাষার জ্ঞান ইংরেজি থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

২৩. এ ঘটনা নিয়ে আলোচনা বা লেখা হয়নি। বাবা মনে করতেন এ নিয়ে কথাবার্তা বললে আন্তরিকতা, আপ্যায়নের অবমাননা হবে। আমি বলতাম, 'হ্যাঁ, কে জানে – আমার মতো কজন আবার বেল টিপবে।' চৌষট্টি বছর পর লিপিবদ্ধ করতে বোধহয় ক্ষতি নেই।

২৪. মুসলমান পরিবারের রেওয়াজও ভিন্ন ছিল না, বোনের মৃত্যু হলেও দুই পরিবারের সম্পর্ক অটুট থাকত, লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক, *প্রণীত জীবন*, পৃ. ১২৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরা-ছেড়ে যাওয়া

১৯৪৫-এ যুদ্ধ শেষ হলো, সৈন্যবাহিনী ঢাকা ছেড়ে যেতে লাগল, আর পুরানা পল্টনের সব বাড়ি ধীরে ধীরে অধিগ্রহণ থেকে মুক্ত হতে লাগল। 'পাখিরা ফিরে এলো কুলায়'-এর মতো — আমরা পুরানা পল্টনের পুরনো বাসিন্দারা এক এক করে নিজের এলাকায় ফিরে এলাম, তবে অনেকে ভিন্ন বাড়িতে। আমরা এখন ৩২ নম্বরে, মিষ্টিদিরা ৫ নম্বরের পাশে ৪ নম্বর বাড়িতে। জ্যোতির্ময় সেন মেসো তাঁদের নিজের বাড়ি, লাল ইটের 'নীলজ্যোতি'তে, পরিমলকাকারা 'পরমভবনে', পৈতৃক বাড়িতে। আমার জীবনযাত্রা খানিকটা বদলে গেল, কারণ যুদ্ধে বন্দি ডাক্তার, কৃষ্ণার বাবা, যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরলেন আর কৃষ্ণা তার মা-বাবার সঙ্গে অন্য কোনো শহরে চলে গেল। বাল্যসখী কাছে নেই, মনে দাগ কেটেছিল, তবে ওই বয়সে এসব বেশিদিন মনে থাকে না। নতুন বন্ধু টুমনি এসেছে, আমরা একই স্কুলে, একই ক্লাসে, বিকেলে সে খেলার সাথী, প্রিয় বন্ধু।

হেঁটে স্কুলে যাই, ফার্স্ট ট্রিপ, সেকেন্ড ট্রিপের ঝঞ্ঝাট নেই। ইডেন স্কুল পুরান ঢাকা থেকে বিরাট নতুন দালানে এসেছে, বাড়ি থেকে মাঠ পেরিয়ে যেতে অসুবিধে হয় না। মিষ্টিদি, ডলি (একটু দূরে থাকে বলে আগে তার সঙ্গে রোজ দেখা হতো না), টুমনি আর আমি একসঙ্গে যাই। যতীনদা বা কেউ সঙ্গে থাকেন। পথে কুকুরের ভয় ছিল, একদিন আমার টিফিনের বাক্স ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, মিষ্টিদি আমাকে আগলে রাখলেন।

স্কুলে বিরাট ক্লাসের ঘর, জানালা অনেক, আলোয় ভরা। সবার আলাদা আলাদা টেবিল-চেয়ার। শিক্ষয়িত্রী বসতেন খানিকটা উঁচু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদির ওপর, টেবিল-সংলগ্ন চেয়ারে। ক্ষিরোদদিকে মনে পড়ে — সাদার ওপর কমলা রঙের পাড়ের সাধারণ করে পরা শাড়িতে, কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ, মাথায় ঘোমটা। আর কনকদি, গলার চেনে ছোট ক্রুশ, বোধহয় আমাদের ক্লাস-টিচার ছিলেন। অঙ্ক, সেলাই — দুই-ই শেখাতেন। ক্লাস ফাইভে সেলাই ছিল ব্লাউজ বানানো। কনকদি ছেঁটে দেবেন, আমরা হাতে বখেয়া, হেম এসব করব। নানা রঙের কাপড় এনে দিলাম সবাই মিলে, আমার হালকা সবুজ কাপড়টি কেটে দিতে এত সময় লাগল যে ছুটি এসে গেল, ব্লাউজ সেলাই শেখা আমার হলো না। গানের টিচার ছিলেন এক ভদ্রলোক, তখন মনে হতো বৃদ্ধ, এখন নিজের বার্ধক্য আসাতে বুঝি অতকিছু বয়স ছিল না। হারমোনিয়াম বাজিয়ে মনোযোগ দিয়ে শিখিয়েছিলেন 'আজি মর্মরধ্বনি কেন বাজিল রে।' 'কোন ভিখারি হায় রে'তে এসে আমার সব গণ্ডগোল হয়ে যেত।

স্কুলের লম্বা বারান্দায় টিচাররা, ছাত্রীরা চলাফেরা করতেন। দেখেছি বীণাদি-বেলুদিকে — খুব লম্বা দুজনেই, বলিষ্ঠ গড়ন, পাড়ে নানা কারুকার্য করা সুন্দর সুন্দর সাদা ধনেখালি শাড়ি সাধারণ করে পরে আসতেন। বাঁ কাঁধে থাকত সুদৃশ্য পিন। এঁরা মাকেও পড়িয়েছেন — অনেক অনেক ছাত্রী এঁদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেছেন। সাজ-পোশাক, গঠন, চলাফেরার ধরন একই রকম হওয়াতে এঁদের বীণাদি-বেলুদি বলা হতো — আলাদা করে একজনের নাম নেওয়া হতো না। মায়ের সময় থেকেই এর প্রচলন ছিল। ওঁদের দেখে মনে হতো ওঁরা দুটি মূর্তি যার লয়-ক্ষয় নেই, অর্থাৎ কখনো বৃদ্ধা হবেন না। আজো তাঁদের ওই বারান্দায় দেখতে পাই, ও-রকমই আছেন। তখন ঢাকার বিখ্যাত গায়িকা লায়লা আর্জুমান্দ বানু; নামেই সুর, ঝঙ্কার, ছন্দ। একদিন স্কুলের বারান্দাতে দেখেছিলাম গাঢ় নীল রঙের বুটি দেওয়া শাড়িতে, আঁচল ঘুরিয়ে ডান হাতে আলতো করে রাখা, বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলেন। উনি তখন ইডেন কলেজে পড়তেন। পাতলা গড়ন, শ্যামল মুখশ্রী, মনে হয়েছিল গায়িকার চেহারা তাঁর কণ্ঠস্বরের মতো — সুরেলা, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ।

স্কুলে আমার বান্ধবী ছিল নাজমা। ছোটখাটো, পাতলা, টিকোলো নাক, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী; আমরা একসঙ্গে টিফিন খেতাম, গল্প করতাম, বারান্দায় হেঁটে বেড়াতাম, জানলা দিয়ে বাইরের জগৎ দেখতাম। ও ছিল আমাদের লিডার। পড়াশোনা কী করেছি ভুলে গিয়েছি, গরমের ছুটির আগের এক আনন্দ সকাল মনে পড়ে। লম্বা ছুটি সামনে, নাজমা ঠিক করল শেষ দিন সবাই আমরা কনকদির জন্য একটু কিছু খাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনব, সেই অজুহাতে একটা ভোজ হয়ে যাবে। নাজমা বলল, সবাইকে শাড়ি জাতীয় কিছু পরে আসতে হবে, যাতে মনে হয় আমরা বড় হয়ে গেছি। হৈ-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া হলো — শুধু মুশকিল করল টুমনি। আমাদের সবার গোড়ালি অবধি ঢাকা, ও হাঁটু অবধি ফ্রক পরে এলো আর নাজমার কাছে বকুনি খেলো। নাজমা সত্যি লিডার ছিল। ইডেন স্কুলে এই আমার শেষ দিন। ছুটির পর শহরের পরিস্থিতির জন্য স্কুলে যাইনি, নাজমাকেও দেখিনি।

পুরানা পল্টনে প্রথম কিছুদিন ঠিক আগের মতো চলল। বিকেলে পরিমলকাকা আসেন, ছড়া লেখেন, আলাপ-আলোচনা করেন। মন্মথকাকা, অজিতমেসো সবাই কাছাকাছি, মায়ের দুই প্রিয় বন্ধু মীরামাসি ও জুনোমাসি, তাঁরাও তাই কাছাকাছি। বাবার সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধুদের আগমন আগের মতোই রইল; মা চিরাচরিতভাবে অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত রইলেন। আম বা ডিম ১০০ বা ২০-তে কত সেই হিসাবেই বিক্রি হচ্ছে, দাদা তাঁর অনুগত বন্ধুদের নিয়ে ক্রিকেট খেলছেন, কিঞ্চিৎ মন্থরগতিতে হলেও শান্তি লাইব্রেরি চালাচ্ছেন বা সাহিত্যচর্চা করছেন। কবি হবার প্রয়াস তখন বন্ধু পল্টনের ছিল কিনা জানি না, তবে দাদার ছিল। কবি না হলেও সমালোচক-লেখক হয়েছিলেন।

শহরের অবস্থা শান্ত না থাকার কোনো কারণ নেই, যুদ্ধশেষে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছেন। পুরনো শহর থেকে চলাফেরা করার সমস্যা নেই, আমরা মামাবাড়ি যেতে পারি, দূর থেকে অতিথিদের আসাতেও কোনো বাধা নেই। মনে পড়ে বাবার বন্ধু সদাশিবকাকার ভাইজির উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, পরীক্ষার জায়গা ওঁদের বাড়ি থেকে অনেক দূর, আমাদের বাড়ির কাছে। শহর থেকে রোজ তিনবার যাতায়াত করা সম্ভব নয়। পরীক্ষার পুরো কদিন সকালে পরীক্ষার্থীকে জায়গামতো পৌঁছে, ওঁর বাবা ও দিদি, মঞ্জুদি আমাদের বাড়িতে আসতেন। দুপুরে — দুই পরীক্ষার মাঝে — তাকে দেখে, জল-জলখাবার খাইয়ে ফিরে আসতেন। আবার সন্ধ্যেবেলা ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। এটা নেহাতই দূরত্বের জন্য, শহরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা ছিল না।

মঞ্জুদি খুব সুন্দর সেজে, গলায় গোল বিশাল মটরের মতো পাথর বা মুক্তোর হার পরে আসতেন — শখের মালা, কোনো সোনা থাকত না। সারাদিন বই পড়ে মায়ের সঙ্গে খানিকটা গল্প করে দিন কাটাতেন। জোড়াখাটের ওপর পা তুলে বসা সুন্দরী, সুসজ্জিতা মঞ্জুদি, তাঁর মার্জিত কথাবার্তা, একটি বিশেষ কারণে আমার মনে গেঁথে আছে। এ ধরনের বন্ধুত্ব, সহজ-সরল সম্পর্ক, বিনা দ্বিধায়, কুণ্ঠায় একে অন্যের সাহায্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসা, আপন আত্মীয়-পরিজনের সুবৃহৎ গণ্ডি — বড় ভালো লাগত। আজো যদি কখনো নজরে আসে ভালো লাগে।

দুর্ভাগ্যবশত স্বাভাবিক-শান্ত পরিবেশ হলো ক্ষণস্থায়ী। ধীরে ধীরে শহরের আবহাওয়া এবং আমাদের পারিবারিক জীবনের আবহাওয়া বদলে গেল। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বা নিরাশ হয়ে ১৯৪৬-এ বাবা চলে গেলেন দিল্লি, ওখানে বাড়ি পেলে আমাদের নিয়ে যাবেন; কবে বাড়ি পাবেন নিশ্চয়তা নেই। একই কারণে পরিমলকাকা আগেই দিল্লিতে কাজ নিয়ে গেলেন। যাবার আগে হতাশার ইঙ্গিত দিয়ে আমাকে ছড়া লিখে দিলেন

ওরে মোদের বিবি,
হোস নে বুদ্ধিজীবী।
হোস যদি চাষা
থাকবে কিছু আশা।

পুরানা পল্টনে ভাঙন শুরু হলো। আসলে আমাদের শান্ত, ঘরোয়া পরিবেশে ভাঙন শুরু হয়েছিল অনেক আগে, ১৯৪৪-এ যখন ৫নং, পরম ভবন, নীলজ্যোতি, পল্টন ভিলা সব ছাড়তে হলো। ফিরে এসেছিলাম এ পাড়াতেই কিন্তু ততদিনে তার রং বদলে গিয়েছে। রায়চৌধুরী পরিবারের কাউকে আর দেখিনি, বারান্দা থেকে মেধোদার 'কাকিমা' ডাকটিও আর শুনিনি। পূর্ণদা জেঠাকেও পরে কখনো দেখিনি। তাঁর স্নেহভরা হাসিটি চোখে দেখতে পাই। ৩নং-এর জ্যোৎস্না মাসিমারা কোথায় গেলেন জানি না, আমার জীবন থেকে ১৯৪৪-এই হারিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু রয়ে গেছে মায়ের ঝাঁপিতে ওঁদের পরিবারের একটি ছবি — মাসি, মেসো, অঞ্জুদি — লম্বা দুটি বিনুনি সামনে, আর ছোট্ট তিলক, আমার ভাইয়ের সমান। হয়তো যাবার সময় জ্যোৎস্না মাসি মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের জীবনে একটা শূন্যতা এসে গেল, মনে হতো পাড়াটা কেমন স্তব্ধ, অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে।

পড়াশোনা করি, বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা; মা-মাসিরা, কাকা-কাকিরা চিন্তিত, যদিও ঢাকা ছেড়ে যাবার কথা ভাবনার মধ্যে আনতেন বলে মনে হয় না।[১] বাবা আশা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাস্টারমশাইদের আধিপত্য কম হলে ফিরে আসবেন, তা আর হলো না। পরিমলকাকাও একসময় ঢাকায় ফিরে আসার স্বপ্ন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের অবস্থা দিন দিন অনিশ্চিত হতে লাগল, ১৯৪৬-এর আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকাতে প্রচণ্ড দাঙ্গা শুরু হলো। শহরে কারফিউ, স্কুল বন্ধ, যত দিন যায় খুন-খারাবির হিসেব শুনি। কতটা গুজব, কতটা সত্যি জানা সম্ভব ছিল না, তবে পাড়ার না হলেও পরিচিত কারো কারো আহত বা নিহত হবার খবর পেয়েছি। খুন করা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা কোনো ধর্মের একচেটিয়া ছিল না।

পাড়ার এক কোণে বহুকাল ধরে ছিল আজিম বক্সের মুদির দোকান। মুসলমান বলে কেউ কোনোদিন প্রতিবাদ করেননি, আমাদের সব বাড়িতে জিনিসপত্র আসত ওখান থেকে। আমরা মেয়েরা অত দূর যেতে পারতাম না, দাদারা-বন্ধুরা মিলে যেতেন, আজিম ভাই ওদের বিনি পয়সায় লজেঞ্চুস দিতেন — মানুষ নিশ্চয়ই ভালো ছিলেন। কত দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু আজিম বক্স পুরানা পল্টন ছেড়ে যাননি। এ পাড়ার সঙ্গে যেন তার আত্মিক যোগ ছিল। আত্মিক যোগ বিচার করা বা তাকে সম্মান দেওয়া একসময় দু'পক্ষই ভুলে গেলেন, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিংস্রতার শিকার হলেন বৃদ্ধ আজিম বক্স।

ঢাকা-দিল্লি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতায় আশুতোষ সেনকে বাবা লিখছেন, 'ঢাকা থেকে ডাক চলাচল বন্ধ, বাড়ির খবর বহুদিন পাই না। কলকাতা থেকে সম্ভব হলে কারো হাতে এ চিঠি শান্তিকে পাঠিয়ে দেবেন।' মা একা — আমাদের তিনজনকে নিয়ে (যতীনদার সাহায্য থাকলেও সেও তো ছেলেমানুষই ছিল) কী করে সংসার চালাতেন, দিন কাটাতেন, জানি না। যতীনদা রোজ বাজার থেকে ফিরে দাঙ্গার ভয়াবহ খবর দিতেন, আবার দড়িতে ঝোলানো মাছ দেখিয়ে আনন্দের সঙ্গে বলতেন, 'মা-গো, ইলিশ মাছ কী সস্তা, কী সস্তা।' মা অসন্তোষের ভঙ্গি করে বলতেন, 'থো ফ্যালাইয়া তোর ইলিশ মাছ, কে কোথায় কেমন আছে তার ঠিক নাই, তাইর আবার মাছের শখ।'

ধীরে ধীরে সব বন্ধ হতে লাগল। ফলওয়ালার ফলের ঝুড়ি, ডিমওয়ালার হাঁক, কিছুই দেখা বা শোনা যায় না। স্কুল যেতে পারি না — সারাদিন, বিশেষ করে বিকেলবেলা কী করি? মাঝে মাঝে মন্মথকাকা তাঁর বাড়িতে quiz রাখেন, মীরামাসি মিলের শাড়ির পাড় থেকে সুতোর গুছি বের করে উলবোনা শেখান, নয়তো মিষ্টিদির দিদিমা শেখান ছুঁচের কাজ। উল পাবার প্রশ্ন ওঠে না, আর, ভালো কাপড় কিনতে কে কোথায় যাবে? বাবার আদ্দির পুরনো পাঞ্জাবির টুকরো দিয়ে রুমালে এমব্রয়ডারি করতাম; এমব্রয়ডারির সিল্কের সুতো বোধহয় এই দিদিমার ভাণ্ডার থেকে আসত। তবে এ তো রোজদিন হয় না। মিষ্টিদির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা, অজিতমেসো ঠিক করলেন ওঁদের বাড়িতে মেয়েরা রোজ বিকেলে একত্র হব এবং খেলাধুলা, কিছু একটা করব।

ওঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমাদের প্রিয় সুনীলদা; তাঁর ওপর ভার পড়ল আমাদের ব্যস্ত রাখা নয়, কিছু শেখাবার। সত্যি অনেক কিছু শিখেছিলাম ওঁর কাছে। শুরু হয়েছিল খেলা, গল্প বলা, গল্প লেখা, ব্রতচারী, ব্যায়াম ইত্যাদি দিয়ে। তখন দেশাত্মবোধক গানের দিন, সুনীলদার সঙ্গে আমরা সমবেত কণ্ঠে গাইতাম, 'ধনধান্য পুষ্পভরা'[২], 'বল বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে', 'ভারত আমার, ভারত আমার' ইত্যাদি। যেদিন সুনীলদা না আসতে পারতেন আমাদের গম্ভীর মেসো, যাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেতাম, আমাদের exercise করাতেন, 'মাথা পেছন করো, সামনে করো, হাত কোমরে রাখো...,' এখন বুঝি ওটা ছিল 'যোগ' শিক্ষা।

সুনীলদা ছোটদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতে জানতেন। ঠিক করলেন আমাদের দিয়ে *লক্ষ্মীর পরীক্ষা* নাটক করাবেন। নানা পাঠ বলার পর ঠিক হলো মিষ্টিদি রানী, ডলি লক্ষ্মী। সুনীলদা বললেন, 'কোমরে হাত দিয়ে, চোখ গোল গোল করে রোষে কথা বলতে এক বিবিই পারবে', সুতরাং আমি ক্ষিরো। কৃষ্ণার সঙ্গে এভাবে প্রচুর ঝগড়া করেছি, ক্ষিরো হতে অসুবিধে হলো না!

রোজ বিকেলে মহড়া চলত, পাঠ মুখস্থ করা, অভিনয় করতে শেখা, স্টেজে কী করে ঢুকতে হয় বা বের হতে হয় তা শেখা, বিকেল কীভাবে কেটে যেত জানি না। এছাড়া মায়েদের শাড়ি, রঙিন ঘুড়ির মতো পাতলা কাগজ, রকমারি ফিতে দিয়ে স্টেজ সাজানো, কাজ, চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। এত কাজের মধ্যে শহরের অবস্থা কি আর আমাদের মনে আসে?

এ বাড়ির দিদিমার তত্ত্বাবধানে মিষ্টিদিদের ৪নং বাড়ির বারান্দায় স্টেজ বেঁধে থিয়েটার হলো। মুকুট পরা, ওপর হাতে গয়না, ঝলমলে শাড়ি, সুন্দরী মিষ্টিদিকে সত্যি রাজরানীর মতো দেখাচ্ছিল। ডলির দৃঢ় স্বরে, 'আমি সে লক্ষ্মী' আজো কানে বাজে। বাগানে দর্শকবৃন্দ — মা-বাবারা, পাড়া-প্রতিবেশীরা, তাঁদেরও মন কিছুটা সময় শহরের হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেল, আমরা পেলাম প্রশংসা।

সুনীলদার উৎসাহে ও নির্দেশে শুরু হলো *খিচুড়ি*, একটি হাতে লেখা little magazine। উপদেষ্টা সুনীলদা, সম্পাদকমণ্ডলী ছোটদের মাঝ থেকে, সম্পাদকীয় তাঁরাই লেখেন, কোনো ছাপা পত্রিকা থেকে কম নয়। ডলির হাতের লেখা খুব সুন্দর, লেখা নির্বাচন হয়ে গেলে প্রতিটি সংখ্যা ও হাতে লিখে দিত। ও ছবিও খুব ভালো আঁকত, প্রত্যেক লেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে ওর আঁকা ছোট ছবি গল্প-কবিতা বা প্রবন্ধের সমাপ্তি জানাত। ঢাকা ছাড়বার পর ডলির সঙ্গে দেখা হয়নি, কোনো খবর কখনো পাইনি, সে দুঃখ আমার রয়ে গেছে। শ্যামবর্ণা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, দুবিনুনি আঁট করে 'বেগুন' করে বাঁধা, মুখে সর্বদা মৃদু হাসি, নানা গুণসম্পন্ন ডলিকে ভোলা যায় না।

আজ সুনীলদা নেই, *খিচুড়ি*র একটি সংখ্যাও কারো হাতে নেই। শুধু মনে পড়ে সে সময়কার দুশ্চিন্তা, পাড়ার নিস্তব্ধতা থেকে পরিবারের গুরুজনদের ছাড়া আমাদের যদি কেউ আড়াল করে রেখে থাকেন তিনি ছিলেন সুনীলদা।

খিচুড়ি, *লক্ষ্মীর পরীক্ষা*র পর অনেক দশক পার হয়ে গিয়েছে; কিন্তু আমাদের ছোটবেলা, পুরানা পল্টন, ঢাকা, আমাদের কাছে আজো জীবন্ত। মিষ্টিদির ১৩-০৯-২০০৪-এ লেখা চিঠি থেকে একটু উদ্ধৃত করি :

> 'কি ভালো লাগে যে সেই দিনগুলোর (ঢাকার) কথা ভাবতে! যদিও আমরা যখন বড় হয়েছি দেশের যা পরিস্থিতি ছিল তার মধ্যেই বড়দের চেষ্টায় আমরা আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। ঢাকার কী ভয়াবহ পরিস্থিতি সে সময়। সন্ধ্যে হতেই দু'দলের চেঁচামেচি, মারামারি। এখনো সেসব ছবির মতো মনে পড়ে। কত কাল চলে গেছে মাঝে। জীবনের নানা পরিবর্তন এসেছে — সবই অতীতের স্মৃতি। যদিও সবকিছু আনন্দের নয়, তাও বসে বসে স্মৃতিচারণ করি।'

AMARBOI.COM

দাঙ্গার কিছু আগে ফিরে যাই। অনিশ্চিত পরিস্থিতি। এলো ১৯৪৬-এর মুক্তি দিবস, ৯ আগস্ট। সুনীলদার নির্দেশে মিষ্টিদি, টুমনি, ডলি আর আমি স্বাধীনতার পতাকা (সম্ভবত কংগ্রেসের, INA-রও হতে পারে), চার কোণে ধরে, 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা' গাইতে গাইতে পুরানা পল্টনের নানা রাস্তায় প্রভাতফেরি করলাম। সেদিন বা অল্প পরেই এলো ঈদ।[৩] সবাই মনে করেছিলেন গণ্ডগোল বাড়বে — ঠিক তাই হলো।

বাড়ির সামনের খোলা মাঠ আগস্টের কড়া রোদে চিকচিক করছিল। সকাল থেকে শুনি গুলির আওয়াজ — সবার মনে আতঙ্ক। মহিলারা উঠোনে, রাস্তায়, ছেলেমেয়েদের একত্র করে রাখার চেষ্টায়। মাও বাড়ির পাশে, গেটের ভেতর অন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন, আমাদের সবাইকে কাছে রেখে। হঠাৎ দাদাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ, কোথাও নেই — আশপাশের কোনো বাড়িতে যায়নি। মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন, 'দুরন্ত ছেলে, আমার আঁচল দিয়ে হাত বেঁধে রাখলাম, কত বললাম কোথাও যাবি না — কখন গিঁট খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালিয়ে গেছে। এখন কী করি?' মা তো আমাদেরও সামলাতে ব্যস্ত। কিছু মুরব্বি মহিলা বলতে লাগলেন, 'সত্যি তো, কী অন্যায়! কোথায় গেছে, কে জানে? কারো হাতে না পড়ে, বড়ই অবাধ্য। আবার পরের ছেলে, তাও যদি নিজের হতো।' শুনে মায়ের অবস্থা আরো শোচনীয়।

দাদার তখন ১৪ বছর বয়স — সে কেন ছোটদের বা মহিলাদের সঙ্গে থাকবে? দৌড়ে পালিয়ে গেছে পাড়ার সীমানায়, লাঠি পাকড়ে বড়দের সঙ্গে পাড়া রক্ষা করতে। কাকিমার কাছ থেকে ভাগ্যিস সে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারত না, খানিকক্ষণ পর ফিরে আসতেই হলো। মার মুখে হাসি ফিরে এলো — কী ভালোই না বাসতেন দাদাকে!

শুধু ঈদ কেন, রোজদিনই ভয়ে, উদ্বেগে কাটত। দিনের আলো তবু যদি একটু আশ্বস্ত রাখত, রাত ছিল ভয়াবহ। ঘুমিয়ে পড়তাম তাড়াতাড়ি — রাত ঘন হলেই শুরু হতো সমবেত কণ্ঠে 'আল্লা-হু-আকবর' বা 'বন্দেমাতরম'। নিঃশব্দ রাতে মনে হতো এই পবিত্র ধ্বনির সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসছে। সেই গভীর রাতে মা ভীত স্বরে আমাদের জাগিয়ে তুলতেন; পেছনের বাড়ি ছিল দোতলা, কোনো অবাঙালি থাকতেন। ডাক শুনতে পেলেই পাড়ার সব ছেলেমেয়ে, মহিলারা জড়ো হতেন এ বাড়ির ছাদে। পুরুষেরা পাড়ার নানা বাড়ির ছাদে লাঠি, গরম জল ভরা বোতল, লাঠির ওপর লাগানো ছুরি ইত্যাদি নিয়ে পাড়া রক্ষার জন্য তৈরি থাকতেন।

রোজ রাতে ডাক শুরু হতেই মা একটা পুঁটুলিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, বোধহয় জীবন বীমার, আর কি-ই বা ছিল — আর যদি গয়না থেকে থাকে, নিয়ে — ভাইকে (চার বছরের হয়নি) কোলে করে, আমার হাত ধরে, দাদাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তা পার হয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতেন। আমার কাছে কোনটা বেশি ভয়াবহ ছিল জানি না — ছোট নর্দমা লাফ দিয়ে পার হওয়া না আক্রমণের ভয়! আমাদের বাড়ি ছিল সীমানায়, যতীনদা থাকতেন বাড়িতে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে — বাঁশ, বর্শা, দা, কোদাল সব নিয়ে।

দোতলা বাড়ির ছাদে মা, মাসি, কাকিরা, আমরা ছোটরা — বহুজন; ঘুম এলেও কোলাহলে ঘুমোনো সম্ভব ছিল না। আমার বয়স প্রায় নয় বছর, কী অবস্থায় আছি বুঝতে পারি। ছাদের দেয়াল উঁচু ছিল না, এক ইটে পা রেখে অনেকদূর অবধি দেখতে পেতাম। অন্ধকারে (চাঁদের আলো যেন আকাশ থেকে সরে গিয়েছিল) রাতের পর রাত দেখেছি দূরে আগুন, তার আকাশচুম্বী শিখা — কোনো না কোনো বস্তি জ্বালানো হচ্ছে। যে পক্ষেরই হোক, এই মর্মভেদী দৃশ্য ভুলবার নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ের মাহিম এলাকায়, যেখানকার দরগা হিন্দু-মুসলমান ধর্মনির্বিশেষে দর্শন করতে যায়, যেখানে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় ধর্মনির্বিশেষে গরিবদের খাওয়ানো হয়, সেখানে কাঠের গুদামে আগুন লাগানো হলো, আর আমরা বারান্দা থেকে আকাশচুম্বী আগুনের শিখা দেখলাম, মনটা পাথর হয়ে গিয়েছিল। অর্ধশতাব্দী — কিছুই বদলায়নি, এই সত্য উপলব্ধি করা বড় কঠিন।

১৯৪৬-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর। দিন কোনোমতে কেটে যায়; সকালে একটু পড়াশোনা করে বাগানে ঘুরে, মা-ভাইকে জ্বালাতন করে বিকেলের অপেক্ষায় থাকি — কখন মিষ্টিদিদের বাড়ি যাব। সেখানে সব ভুলে, হৈচৈ করে, বেলা থাকতেই বাড়ি ফিরতাম। তারপর — শেষ বিকেল থেকে ভয় ঢুকে যায় — কী জানি কী হবে রাতের বেলায়?

এত বিপদের মধ্যেও বাবার কয়েকজন ছাত্র অফিস-কলেজ শেষে রোজ আসেন আমাদের কাছে, কুশল-সংবাদ নিতে, প্রয়োজন কী আছে জানতে, বাইরের জগতের সঙ্গে একটু সম্পর্ক করিয়ে দিতে, সর্বোপরি আমাদের যে একটি বৃহত্তর পরিবার আছে ছাত্রদের নিয়ে, সেই আশ্বাস দিতে। মনে হতো ৩২ নম্বর পুরানা পল্টন একটি নিরাপদ দ্বীপ। সত্যব্রতদা লিখেছেন, 'পুরানা পল্টনে কয়েক মাস থাকবেন [একা] গুরুপত্নী (অর্থাৎ, মা) এবং তাঁদের বালিকাকন্যা ও শিশুপুত্র। স্বামীবাগ থেকে প্রায়শ যেতাম আমরা কয়েকজন ছাত্র, তোজাম্মল হক অন্যতম।[৪] প্রায়শ নয়, সত্যব্রতদা আর তোজাম্মলদা আসতেন রোজ। সিঁড়িতে বসে দাদারা কত গল্প করতেন। সন্ধ্যে কাছাকাছি এলেই মা বলতেন, 'বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, কারফিউ শুরু হবে।' দু'জনেই হেসে বলতেন, 'মাসিমা, আমাদের কেউ কিছু বলে না।' তাও ভয় থাকত। অনেক গল্পের, নানা আশ্বাস দেবার পর এঁরা দু'জন সাইকেল করে চলে যেতেন — বাড়ির সামনে লম্বা রাস্তা, খোলা মাঠ। যতদূর পারতাম দেখতাম, ধবধবে সাদা বকের পাখার মতো এঁদের সাদা শার্ট ঝাপটা দিতে দিতে দূরে চলে যাচ্ছে।

দিন যায়, রাত যায়। বাবা দিল্লিতে, শুধু চিন্তা নয়, কষ্টে আছেন। আগ্রা হোটেলের পরিবেশ, পরিস্থিতি, খাওয়া কোনোটাই ভালো নয়। একদিন শুয়ে আছেন, খাট থেকে অল্প দূরে চলন্ত পাখা হঠাৎ দুড়ুম করে ছাদ থেকে পড়ে গেল। অল্পের জন্য বাবা বেঁচে গেলেন। পরে ম্যানেজার বা অধিকারী কাউকে জানালে তিনি আফসোসের সঙ্গে বললেন, 'ইস, আবার একটা পাখার খরচ করতে হবে!' বাবার sense of the absurd প্রখর ছিল।

১৯৪৬-এ দিল্লি শহর আধুনিক ছিল না — পুরনো দিল্লি তো নয়ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যানবাহনের অসুবিধে — এক্কা বা টঙ্গা ছাড়া উপায় নেই, গলির মতো রাস্তা, লাগোয়া সারি সারি বাড়ি, গাছপালা কম; খোলামেলা, ফুল-পাতার ঢাকা শহর ছেড়ে ভালো লাগার কথা নয়। সর্বোপরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রী ছেড়ে থাকতে বাবার কষ্ট হতো। আমাদের জন্য চিন্তা তো সর্বক্ষণ! পরিমলকাকা আমাকে ছড়া পাঠালেন, ছবিসহ। একটি তক্তপোষে শোয়া টিকোলো নাক, ছাদের দিকে তাকানো রোগা এক ভদ্রলোকের ছবি, নিচে পদ্য :

> 'এইভাবে দিনরাত শুয়ে শুয়ে থাকা
> মনে মনে ভাবা আর কবে যাব ঢাকা।'[৫]

হঠাৎ করেই একদিন বাবা ঢাকা এলেন, আমাদের দিল্লি নিয়ে যেতে। ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসের ২ তারিখে ঢাকা ছাড়লাম, ব্যান্ডেল, চুঁচূড়া নানা পথ ঘুরে, অনেক স্টেশনে বহু ঘণ্টা অপেক্ষা করে, পরিচিতদের কাছে কোথাও কোথাও থেকে, ৯ অক্টোবর দিল্লি পৌঁছলাম। মায়ের সংসারের আসবাবপত্র, গোকুল বসাকের তৈরি আলমারি, সোফাসেট, বিয়ের যৌতুকের dressing table, জোড়াখাট, সবই ৩২ নম্বরের একটি ঘরে গুদাম হয়ে রইল। বন্ধু মানুষ কেউ ও বাড়িতে থাকতে লাগলেন। তাঁদের সুনজরে থাকবে বলে চিন্তা রইল না। তখন তো মনে এই ছিল যে আবার ফিরে যাব, আবার ওখানে সংসার পাতব। আমরা আর ফিরে গেলাম না, কিছু ফিরে পেলাম না।

যুদ্ধের পর সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত নানা জিনিস সস্তায় বিক্রি হতো। মা কয়েকটি পোক্ত ঝোলা কিনেছিলেন, নাম দিয়েছিলাম 'মিলিটারি ব্যাগ'। বেশিরভাগ ব্যাগেই বাবার ও আমাদের বই-খাতা, একটিতে মায়ের সংসারের অতি সামান্য জিনিস। মায়ের একটি ক্যানভাসের ছোট ব্যাগ ছিল, মা বলতেন, 'বুলকি'। এতেই প্রতি রাতে পালাবার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখতেন। ঢাকা ছেড়ে আসার সময় এই বুলকিতে মা ভরেছিলেন বিবনের দেওয়া চিনেমাটির পেয়ালা-পিরিচ আর পরিমলকাকার ছড়া। আমাদের কাপড়-চোপড় অল্পই ছিল, কোনো ঝোলাতে তা রাখা হলো, আর সযত্নে পিসিদিদির তৈরি কাঁথা।

বহু বছর পর, মা-বাবার মৃত্যুর অনেক পর, পুরনো বাক্সে আবিষ্কার করলাম মায়ের দশ-বারো বছরের সংসারের হিসেবের খাতা, আমাদের জন্মতারিখ ইত্যাদি দিয়ে ছোট ছোট নোটবুক, পারিবারিক চিঠিপত্র ও আমার *রংমশাল*, যাতে একবার ধাঁধার উত্তর সঠিক দিয়েছিলাম বলে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম বেরিয়েছিল। আমার নামের নিচে পেন্সিলের রেখা, মায়ের হাতে। ঢাকার সংসার, ঢাকার জীবন মা-বাবার কাছে সোনালি স্মৃতি, সোনালি স্বপ্ন হয়ে চিরকাল পাশে ছিল।

দেশবিভাগের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য শুনিনি, কখনো এ নিয়ে প্রশ্ন করিনি। বহু বছর পর ১৯৯৩-তে আমার কন্যা রেহানা তার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঢাকার কথা মনে হয়? কষ্ট হয়? যেতে ইচ্ছা করে?' মায়ের তখন আশির ওপর বয়স, উত্তর দিলেন, 'মনে কেন হবে না; গেণ্ডারিয়া, পুরানা পল্টন, সব মনে পড়ে, তবে দেশভাগ না হয়ে উপায় ছিল না, মুসলমানরা তাদের দেশ তো চাইবেই। তুমি তো জানো না আমরা হিন্দুরা তাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছি? ছোটবেলায় গেণ্ডারিয়াতে আমাদের শাড়ির আঁচলে বা জামাতে যদি কোনো মুসলমানের ছোঁয়াও লাগত, বাড়ি এসে আমাদের জোর করে স্নান করানো হতো — শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা — সকাল-সন্ধ্যা, প্রতিবাদ করে লাভ হতো না। হিন্দুদের চলে আসতে হলো, তাতে অবাক হবার কিছু নেই, এত অবজ্ঞার পর ওরা আমাদের চাইবে কেন?'

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭, আমরা কটকে। ঢাকার ছাত্র সত্যব্রত বসু ও নির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী আমাদের কাছে সেদিন। দুজনেই পূর্ববঙ্গে শিক্ষকতা করেন, ১৬ আগস্ট ঢাকা ফিরে যাবেন। ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে পণ্ডিত নেহরুর 'India wakes to freedom.' বক্তৃতার পরের কথা সত্যব্রতদা লিখেছেন

> স্যারের পাশে বসে Tryst with destiny বক্তৃতা শুনলাম।... ড. দাশগুপ্ত বললেন, 'ভারত এখন দুভাগে বিভক্ত। তোমরা ফিরে যাবে পাকিস্তানে। জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত থেকে পৃথক হবার অনড় মনোভাব দেশবিভাগের জন্য দায়ী নিশ্চয়। কিন্তু বাংলায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের বৈষম্য ও তাচ্ছিল্যে ভরা আচরণের প্রভাব আমরা ভেবেছি কি?'[৬]

এটা ছিল মা-বাবার যুক্তি দিয়ে কথা। ১৯৯১-তে ঢাকার প্রিয় ছাত্র এম এন হুদাকে লেখা একটা চিঠিতে জানতে পারলাম ঢাকা, পূর্ব বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতটা দুঃখ বাবা পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক নেতার এক বক্তৃতা পড়ার পর বাবা লিখছেন, 'যে কোনো ভাগাভাগি, বিভাগের কথা পড়লে বড়ো দুঃখ পাই। তোমাকে আগেও লিখেছি, এখনও জানাচ্ছি, আমি আজও স্বপ্ন দেখি, শেষ নিঃশ্বাস অবধি স্বপ্ন দেখব যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত আবার এক সূত্রে বাঁধা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বাঁধন যতই শিথিল হোক না কেন।'

দেশবিভাগ যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তা তিনি জানতেন, কিন্তু এই ভাগ-বাটোয়ারা, রক্তবন্যা তাঁর পরিচিত সমাজ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও সংস্কারের বাইরে ছিল। চোখের সামনে তাঁর socially committed, idealistic পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেল, ভেসে গেল, তাঁরা রইলেন মূক দর্শক হয়ে — যুক্তি, জ্ঞান, নীতিবোধ কিছুই একে রোধ করতে পারল না। এই ক্ষত তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মৃত্যুর অল্প আগে একটি খাতায় লিখে গিয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া

তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়োখোকা বাংলা ভেঙে ভাগ করো,
তার বেলা?

তথ্যসূত্র

১। এঁরা অনেকেই দেশবিভাগ সত্ত্বেও ঢাকাতে থেকে গিয়েছিলেন। যেমন — অজিত সেন, অরুণ দত্ত, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী। ১৯৫০-এ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা ছাড়া উপায় রইল না।

২। এ গান ছোটবেলা থেকে গেয়েছি। বীরভূম, বাংলাদেশ বা ভিয়েতনাম এমন কখনো হয়নি যে, ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে গিয়েছি আর গুনগুন করিনি, 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।' ধান আর জলের দেশের মেয়ে আমি, ধানের সবুজের থেকে সুন্দর আর কী হতে পারে?

৩। এতদিনের কথা, কবে, কখন, সবসময় মনে থাকে না — কী হয়েছিল তা অনেকটা মনে আছে। ভুলভ্রান্তি আছে জানা সত্ত্বেও যেমনটি মনে আছে লিখছি।

৪। বসু, ২০০৬, পৃ. ১১৮। সত্যব্রতদা, তোজাম্মলদা ছাড়া আসতেন সানাউল হক, তবারক হুসেন ও মনু কবীর। সত্যব্রতদা ছাড়া আর কারো সঙ্গে পরে কোনোদিন আমার দেখা হয়নি। নিজেদের বিপদ উপেক্ষা করে আমাদের, বিশেষ করে মায়ের মনে শান্তি, নিশ্চিন্তি আনার জন্য আমরা এঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

৫। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

৬। বসু, ২০০৬, পৃ. ১৩০। এই 'পীড়াদায়ক সমাজবাস্তবকে' অশোক মিত্র ব্যক্ত করেছেন একটি বহু পুরনো 'প্রাকৃত স্তরভুক্ত সমাজপ্রাসঙ্গিক' গানের মাধ্যমে।

কালো কয়লার মতো ময়লা ছেলে
মজিয়ে দিল প্রাণ,
আগে জানতাম কী লো দিদি
সে যে মুসলমান রে দিদি
সে যে মুসলমান।
(*আরেক রকম*, ১-১৫ মার্চ, ২০১৭, পৃ. ৪৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

ঢাকা যাওয়ার কথা ভাবিনি তা নয়, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অনেকটাই ইচ্ছাকৃত, অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না, বর্তমান মনকে ব্যথা দিতে পারে। বিদেশ যাচ্ছি ভেবে বাংলাদেশে যাওয়া সম্ভব নয়, দ্বিধা আসে নানা দিক থেকে। তার থেকে ছেলেবেলার নির্মল আনন্দ মনে রেখে এগিয়ে চলা ভালো।

২০০২ সালের শেষ দিক। খবর এলো, South Asian Network for Development of Environmental Economics (SANDEE)-এর বার্ষিক অধিবেশন ঢাকাতে, ডিসেম্বরে, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ভাই পার্থ ও সুইডেনের এক অর্থনীতিবিদ এর সঞ্চালক, আরো কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে আমি সভ্য। এবার উৎসাহ দিলো ভাই, বারবার বলল, 'চল্ যাই, ভাই-বোনে মিলে ঢাকা যাই। কাজের পর গৈলাও ঘুরে আসব। চল্ চল্ — সব ব্যবস্থা আমার ছাত্ররা করবে, তুই শুধু আয়।' ছোট ভাইয়ের কথা আমার কাছে 'বেদবাক্য', এক্ষেত্রে না বলার প্রশ্ন আসে না, ঢাকা ভ্রমণের রং বদলে গেল। উৎসাহ সংক্রামক, পরিবারের সবাই জল্পনা করতে লাগলেন। আমি আর ভাই এক সম্মিলিত উৎসাহে ঢাকা-গৈলা ঘুরে আসার চিত্র আঁকলাম।

ভাইয়ের এক ছাত্র ঢাকা থেকে গৈলার পথের মানচিত্র পাঠাল, বারবার দেখতে লাগলাম সেই ছবি। গৈলা নেই তাতে, কাছের আইগলঝাড়া আছে, সেখানে আঙুল স্পর্শ করে মনে হলো গৈলা পৌঁছে গেছি। পরিচিত ঢাকা সামনে এলো; খেলাধুলা, পাড়া বেড়ানো, নিশ্চিন্তির শহর। আমার অবস্থা তখন পরিমলকাকার ছড়ার মতন

'মনে মনে ভাবা আর করে যাব ঢাকা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত আগ্রহ আগে বুঝিনি।

২০০২ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'আখেরি মোনাজাতে'র বিকেলে ঢাকা পৌঁছলাম — দেশবিভাগের পর এই প্রথম ঢাকা যাওয়া। শহর খুব একটা যে পরিচিত ছিল আগে তা নয়, তবু মনে হলো রাস্তাঘাট, নানা এলাকা, জনগণের ভিড়, গাড়ি — সবই কল্পনার বাইরে। এয়ারপোর্ট থেকে বনানী যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল। সময় লাগল ঠিকই, তবে পথের অভিজ্ঞতা রোজকার গাড়ির ঠেলাঠেলি, হর্নের আওয়াজ কোলাহলের নয়, সেদিনকার দৃশ্য ভিন্ন। হাজার হাজার ধার্মিক মানুষ ধর্মকথা শুনে বাড়ি ফিরছেন, পায়ে হেঁটে, গাড়িতে, ধীর পদক্ষেপে একা বা পরিচিতদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে। ক্লান্ত-শান্ত, উজ্জ্বল চেহারা। একটি ছবি বিশেষ করে মনে পড়ে — অল্পবয়সী একজন, বালক বলা যেতে পারে, গাড়ির কোণে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে, চেহারায় শ্রান্তি-শান্তি।

মিটিংয়ের প্রথম কদিন ছুটি নিয়েছি, স্মৃতির ঢাকায় ফিরে যাওয়ার আশায়। প্রথমেই গেলাম পুরানা পল্টন। অনেক ভিড় ঠেলে, নানাজনকে জিজ্ঞাসা করে পুরানা পল্টন নামে যেখানে পৌঁছলাম, স্মৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। দীঘি-মন্দির কোথায় ছিল বলা ভার, চতুর্দিকে উঁচু দালান। পরম ভবন, পল্টন ভিলা, জজ সাহেবের লাল ইটের বাড়ি ধূলিসাৎ করে নতুন মহল উঠেছে। ৩২নং খুঁজে পেলাম, চেনার উপায় নেই, সামনের খোলা মাঠ, আমাদের বাগান, আশপাশের ছোট ছোট বাড়ি সব ভেঙে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে এমন ফ্ল্যাট বাড়ি। রাস্তা সংকীর্ণ, চতুর্দিকে বাজার, দোকান, কোলাহল। ওই তো, একটা রাস্তা ভেঙে ডানদিকে গেলেই ছিল ৫নং — আজ রাস্তা, পথ অজানা। অজানা পথে হেঁটে হেঁটে হঠাৎ খুঁজে পেলাম ৫নং-এর মোড়, রাস্তা। বড় আশা নিয়ে ৫নং-এ গেলাম, বাড়িটি সদ্য ভেঙে ফেলা হয়েছে, ভেতরে গর্ত একমাত্র সাক্ষী যে এখানে বাড়ি ছিল। গাছপালা নেই। পাশে ৩নং, ৪নং একই রকম আছে, ওদিকের নীলজ্যোতি ফলকহীন, জীর্ণ। রাস্তার ওপারের বাড়ি আগের মতো, ছোট, একতলা। মলিনতা ছাড়া খুব বদল আসেনি। রাস্তায়, মোড়ে দু-একটি রিকশা। ভরদুপুরে শান্ত, নিরিবিলি, প্রায় জনহীন — আমার ছোটবেলার নিজস্ব জগৎ। আমি দর্শক বা পর্যটক নই — বেদনাবোধ নিয়ে ফিরে এলাম। ৫নং ধূলিসাৎ হয়ে প্রমাণ করল, সে আমার জীবনের কত গুরুত্বপূর্ণ, ভালোবাসার অঙ্গ ছিল।

শাঁখারীবাজার নতুন আবিষ্কার। ওই সরু ছোট গলিতে পাঁচটি মন্দির, নিচে দোকান, ওপরে বসতি। শীতের ভোরে রাস্তা ফাঁকা, অত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালেও শাঁখারীরা করাত দিয়ে শঙ্খ কাটছেন। একই সুরে, একই গতিতে তার বাজে যেন কর্কশ আওয়াজের এসরাজ। কোথাও পাথরের ঠোকাঠুকি, হয়তো শিলনোড়া তৈরি হচ্ছে। নানাজনে মিলে কাজ করছেন, ছন্দ এক। টুকরো টুকরো কথা হলো, জীবন সংঘর্ষ কোথায় নেই। শাঁখারীবাজারে পাড়া-পাড়া একটা তাজা ভাব, অনন্তকাল থেকে এক সংস্কৃতি চলে আসছে, আমি যাকে ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায় ভেবেছিলাম।[১] গেণ্ডারিয়া-লক্ষ্মীবাজার ছিল প্রাণহীন।

এভাবে দিনে শহরে ঘোরাঘুরি করি, যাতে ভাইয়ের যেদিন সময় হবে সেদিন চট্ করে ওকে ঘুরিয়ে আনতে পারি। দুরাশা — ঢাকায় ২০০২ সালেও চট্ করে ঘোরাঘুরি করা যেত না।

সন্ধ্যায় মিটিংয়ের বক্তৃতা, নৈশভোজে যাই। এরকম এক সন্ধ্যায় বন্ধু রেহমান সোবহান একটি কার্ড দিয়ে বললেন, 'এই ভদ্রলোকের বাবা মোহাম্মদ শরীফ, তোমার বাবার ছাত্র ছিলেন বহু বছর আগে। তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। ফোন করো।' কার্ডে নাম, মোহাম্মদ শামসুর রহমান।

পরদিন যোগাযোগ করতেই উনি আমাকে শরীফ সাহেবের জুঁই কাঞ্চন ভরা ধানমণ্ডির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। শরীফ সাহেবের ৯৬ বছর বয়স, চোখে দেখতে পান না, হুইলচেয়ারে বসা। পুরনো দিনের নানা কথা জানলাম ওঁর কাছে, পুরোটা সময় আমার হাত ধরে রাখলেন, যেন গুরুর মেয়েকে কাছে পেয়ে উনি গুরুর সান্নিধ্য পাচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে যে দু-ঘণ্টা কাটিয়েছি আমার জীবনে অমন শান্তিপূর্ণ সময় বেশি আসেনি। সেই যে ১৯২৯-৩০-এ ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্বন্ধ গড়েছিল, আজো তার কোনো পরিবর্তন হয়নি ওঁর মনে।

একটি কার্ড, একটি ফোন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো, পেলাম অপত্য স্নেহ, ভালোবাসা, পরিবার। ২০০২-এর ডিসেম্বরের আগে গুরুকন্যা একজন আছে বা সে কীরকম, কোনো ধারণা ছিল না এঁদের, সেই আমি আজ এই রহমান পরিবারের এক সদস্য — ছোট বোন, আপা, দিদি, ননদ, খালা, ফুফু, পিসি — আমার বাপের বাড়ি বিশাল।

একটা সময় এলো যখন প্রতিবছর ঢাকা যাই, ছোট ভাইয়ের কাছে থাকি — রোজ রাতে পুরো পরিবার মিলে আড্ডা, ভোজ, মিন্টু মিঞা বা তার ছেলের হাতের কাচ্চি বিরিয়ানি, পুরান ঢাকার মাংসের চপ, খাস্ বিস্কিট, পিঠা নিয়ে হৈচৈ। মাঝরাতে গাড়ি নিয়ে দেখতে যাই ফরাশগঞ্জের ঝুলভরা অট্টালিকা — এককালে কী ঐশ্বর্যই না ছিল —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপলাল হাউস, তারা মসজিদ। বাইরে থেকে দেখি রেস্টুরেন্ট, যেখানে সারাদিন শুধু রকমারিভাবে ডিম তৈরি হয়, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ, তারও বেশি — তিলধারণের স্থান নেই। তাঁতীবাজার, অলিগলি — নাম শুনেছি ছোটবেলায়, চোখের দেখা এই দেখলাম। সবকিছু করা হয় স্নেহশীল, আবেগপূর্ণ, আশ্চর্য ভাইজান, মো. শামসুর রহমানের তত্ত্বাবধানে।[২]

২০১০-এর প্রথম দিক। ষাট বছরের ওপর ইডেন স্কুল ছেড়েছি। আর কিছু মনে না থাকলেও, নাজমা মনে রয়ে গেছে। কোথায় কেমন আছে — কত কিছু। টুমনি ছাড়া স্কুলে ও আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। রোজ একসঙ্গে টিফিন খাওয়া কি সোজা কথা? ও যে আমাদের লিডার ছিল তা-ইবা ভুলি কী করে? খয়েরি, কমলা জাতীয় ডিজাইনের সালওয়ার আর কুর্তা জাতীয় কিছু পরা, স্কার্ফ বাঁধা ওর উজ্জ্বল চেহারা অনেক সময় সামনে এসেছে। একটা ফাঁক, কিছু কৌতূহল, তার সঙ্গে ফেলে আসা দিন ফিরে পাওয়ার আশা মনের মাঝে উঁকি মেরেছে। ফিরে পাব কী করে? ওর তো পুরো নামও জানি না, কোথায় থাকত তাও জানি না। শুধু নাজমা দিয়ে কি হয়?

২০১০-এর এক শীতের সকালে ছোট ভাই শামীম ও ভ্রাতৃবধূ সালমার সঙ্গে পুরনো দিনের কথা হচ্ছিল। হঠাৎ সালমা বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও — নাজমা, কে নাজমা? কোন নাজমা, পুরো নাম কী? কোথায় থাকত?' আমার তো কোনো জবাব নেই। 'নিশ্চয় আমার নাজমা আপা — আর কেউ হতে পারে না। সেও ইডেনে পড়ত — তোমারই সমবয়সী।' আমি অবিশ্বাসের উঁচু ধাপে — এ হতে পারে না, অসম্ভব।

ফোনে ওরা দুজনে জিজ্ঞাসাবাদ করল, '১৯৪৬-এ ক্লাস ফাইভে পড়তে? ম্যাট্রিক কবে পাস করেছ?' প্রশ্নাদির পর আমাকে টেলিফোন দিয়ে সালমা বলল, 'এই নাও দিদি, তোমার নাজমা।' আমি ইতস্তত‌ভাবে ফোনে কথা বলছি, কারণ এ তো সত্যি হতে পারে না। সালমার নাজমা আপার আমাকে মনে নেই, সে যদি আমার বন্ধু নাজমাও হয়, আমাকে মনে রাখার কথা নয়। ওর জীবন তো একই রয়ে গিয়েছিল, আমারটাতেই তোলপাড় এসেছিল।

নাজমা বলল, দেখা করতে আসবে। আমি অবিশ্বাসের বোঝা নিয়ে উৎসুক, উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করলাম। চিনবইবা কী করে? তখন দশ হয়নি আর আজ আমরা সত্তরের কোঠায়। নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় দ্রুত পদে এক মহিলা এলেন, সেই টিকোলো নাক, ছোটখাটো, হাসিমুখ, আত্মপ্রত্যয়, সেই দ্রুত হাঁটা। নাজমা, ক্লাস ফাইভের ইডেন স্কুলের বন্ধু, আমাদের লিডার নাজমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে ভেবে মনে একটা ফাঁক থাকত, ফেলে আসা দিন ফিরে পাওয়া যায় না, অল্পসময়ের সাথী হলেও, ছেলেবেলায় সাথী হারিয়ে গেলে স্মৃতিতে অপূর্ণতা থেকে যায়। এই অপূর্ণতা সেদিন পূর্ণ হলো।

এমন অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন; এ যেন 'গল্প হলেও সত্যি'র একটি কাহিনি।

দেশবিভাগ আমার ব্যক্তিগত জীবনে আপাতদৃষ্টিতে সেরকম শূন্যতা আনেনি। তবু মনের কোণে একটা অভাববোধ থেকে গেছে, মানসিক-উদ্বাস্তুতাও তো হয়। তাছাড়া লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু, বাস্তুহারা জীবনের ছায়া পড়েছিল বৈকি। আজ এত বছরে সময়ের গতিতে, জীবনের গতিতে এ-ছায়া খানিকটা সরে গেছে। হিসাব-নিকাশ না করে দেশবিভাগ অবশ্যম্ভাবী ছিল মেনে নিয়েছি। আর আজকাল সবকিছুই আন্তর্জাতিক, আমাদের সবার নানারকমের সত্তা।

আমি ভারতীয়, আমি বাঙালি, আমি দুই বাংলার বাঙালি, গৈলা আমার দেশ, ঢাকা আমার বাড়ি, এই সত্য উপলব্ধি করে আনন্দ পাই। আমি আজ আর শেকড়হীন নই। তবু মনে হয়, বারবার মনে হয়, এই ভাগ-বাটোয়ারা, এই সীমান্তরেখা না হলেও তো পারত।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র

১. শাঁখারীবাজার দেখে মনে হয়েছিল একে UNESCOর World Heritage Site-এ রাখা উচিত।
২. অশোক মিত্র মহাশয় বহু বছর পর ২০১২ কি ২০১৩ সালে ঢাকা গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমাকে লিখলেন, ঢাকা যাওয়ার বিরাট অভিজ্ঞতা, মো. শামসুর রহমান। এরকম নিঃস্বার্থ পরোপকারীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া সৌভাগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩৪-এর হিসাবের খাতা — বিয়ের পর প্রথম সংসার — ১৪ই আগস্ট মা-বাবার বিয়ে হয়।
২২/৮/৩৪ কাজের লোক মনীন্দ্র — ২ টাকা
(নতুন সংসার) প্লেট ২ টাকা ৫ আনা
সসপেন ৮ আনা,
বেলুন চাকি ১০ পয়সা
খুন্তি ১ আনা
বৈয়ম ৩ আনা ১৩ পয়সা
ডালের কাঁটা ১৫ পয়সা

৯ই সেপ্টেম্বর
বাড়িভাড়া — শশীকুটির, বক্সিবাজার ১৫ টাকা
২৭ সেপ্টেম্বর — সমীরের জুতা ১ টাকা ৪ আনা
১লা অক্টোবর — বাড়িভাড়া ২৩ টাকা
(ভাগ করে এ বাড়িতে থাকতেন, কেউ হয়তো অন্যত্র গিয়েছেন, তাই ভাড়া বেশি)।

হিসাবের খাতার নমুনা
শুরু ১৯৩৭ — ১লা জানুয়ারি
২রা জানুয়ারি — সুবোধদার ধার শোধ ৫ টাকা
৭ই জানুয়ারি — বাড়িভাড়া ১৬ টাকা (মনে হয় সেগুনবাগান)
আকলুর মাইনে ৫ টাকা
মালি ৩ টাকা
৪ মার্চ — সুন্দরদিদির তহবিল থেকে ধার ১৫ টাকা
bedswitch 1th March (দাম লেখা নেই)
৪ মার্চ — তাঁতের শাড়ি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় দাম — ৩ টাকা
এপ্রিল ৩ — সুন্দরদিদির তহবিলে ধার শোধ ১০ টাকা
এপ্রিল ৭ — সুন্দরদিদির হিসাবে জমা ৫ টাকা (অর্থাৎ পুরো শোধ হলো)
বাড়িভাড়া — ১৬ টাকা
১০ই জুলাই — গোকুল বসাক ফার্নিচারের জন্য ১০ টাকা
জুলাইয়ের ইলেকট্রিক বিল — ২ টাকা
১১ই জুলাই — পাখা দুটো — ৫ পয়সা (হাতপাখা নিশ্চয়ই)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪ই জুলাই — লক্ষ্মীর প্রদীপ — ৫ পয়সা
১৫ই জুলাই — সতীশের মাইনে ১২ টাকা
৩১-এ জুলাই — গোকুল বসাক ২০ টাকা
৬ই আগস্ট — বাড়িভাড়া ২৭ টাকা
১৮ আগস্ট — গোকুল বসাক ৫ টাকা
২৩শে আগস্ট — খোকনের (সমীর) চুল কাটা ১ আনা
২৮শে আগস্ট — খোকনের স্লেট বাল্যশিক্ষা কেনা হচ্ছে
৪ঠা সেপ্টেম্বর — জমাদারের মাইনা ১ টাকা
১১ই সেপ্টেম্বর — সেজদির হাওলাত শোধ ৫ টাকা
১৪ই সেপ্টেম্বর — সেজদির লক্ষ্মীর আসন ১১ আনা
১৮ই সেপ্টেম্বর — খোকনের বই ৫ পয়সা
২০শে সেপ্টেম্বর — সেজদির কাপড়ের জন্য extra ১টা ৮ আনা
Tailor ১০ টাকা
২রা অক্টোবর — শান্তির (মায়ের) ধার শোধ — ২ টাকা

স্বল্প আয়ে সুষ্ঠুভাবে সংসার করতে হলে বিভিন্ন তহবিলের প্রয়োজন হয়, গেণ্ডারিয়া থেকে বোনপোরা, ছোট ভাই এলে তাদের হাতে কিছু, অন্তত ফিরে যাবার রেলভাড়া দিতে হয়। জীবন, মিহির, প্রবীরের নামে কয়েক আনা, বড় ভাশুরঝি মাতৃহারা খুকীর জন্য কয়েক টাকা রাখা, প্রত্যেকের নামে আলাদা তহবিল। কোনো অতিথি এলে হয়তো আমার হাতে একটি টাকা দিলেন, সেই দিয়ে 'বিবির তহবিল'। এ থেকে ধার নিলে শোধ দেওয়া হতো রিবন, ক্লিপ কিনে।

মাঝে মধ্যে হিসেবে আছে,
শীতলার থালা — ১ আনা

বিস্মৃতির মাঝে একটি ছবি সামনে এলো: ডুরে শাড়ি পরা অল্পবয়সী বিবাহিত মেয়েরা কয়েকজন, সিঁথিতে চওড়া গাঢ় সিঁদুর, কপালে বড় টিপ, ৫নং এর সামনের বাগানে দাঁড়িয়ে, হাতে সিঁদুরভরা পেতলের থালা। 'বসন্ত' রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবার দেবী মা শীতলা, বৌমারা তাঁর মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদি সিঁদুর নিয়ে বিভিন্ন বাড়ির এয়োদের কপালে ছুঁইয়ে, কৌটোতে ভরে দিতেন। প্রণামি হিসেবে থালাতে পয়সা দিতে হতো।

গুজরাটে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তমীতে উনুন জ্বালানো হয় না। ঠাণ্ডা শীতল খাওয়া, শীতলা মাকে প্রসন্ন রাখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩৯-৪২-এর হিসাবের খাতা থেকে ক্লাস টু লেকচারারদের মাইনে কতটা হাতে আসত আন্দাজ পাওয়া যায়। নানা কারণে মাইনের অনেকটাই কাটা যেত, বাবার ক্ষেত্রে বিলেত যাবার জন্য ৩০০০ টাকার ধার শোধ হচ্ছিল প্রতি মাসে। কাকা-মেসোদের প্রত্যেকেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ধার নিতে হতো; 'লিখিত বেতন হইতে কম টাকা আসিত', লিখছেন মা।

বেতনের হার

১৯৩৯		বেতন
	মার্চ	১০০ টাকা ৯ আনা
	মে	১০০ টাকা ১৫ আনা
	জুন	১১০ টাকা ২ আনা
	আগস্ট	১১০ টাকা ২ আনা
	অক্টোবর	১১৪ টাকা ১৪ আনা
	নভেম্বর	১২৭ টাকা ১৪ আনা
১৯৪০		
	জানুয়ারি	৯১ টাকা ৩ আনা
	ফেব্রুয়ারি	৭৯ টাকা ১১ আনা
	মার্চ	১০০ টাকা ৫ আনা
	এপ্রিল	১২৭ টাকা ৪ আনা
১৯৪১		
	জুন	১৩৭ টাকা ৪ আনা
	জুলাই	১৫৯ টাকা ৮ আনা
	আগস্ট	১৭৩ টাকা
	সেপ্টেম্বর	১৬৮ টাকা ৩ আনা
	অক্টোবর	১৮৬ টাকা ৪ আনা
১৯৪২	(বাবা এখন ক্লাস ওয়ান লেকচারার)	
	জানুয়ারি	২২৯ টাকা ৪ আনা
	মে	২৩৮ টাকা ৪ আনা ৩ পয়সা
	অক্টোবর	২৬৫ টাকা

অধ্যাপকদের সংসার এতে চলে না, পারিবারিক দায়িত্ব পালন হয় না। বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করতে হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে আসে কখনো ২০ টাকা, কখনো ৪০ টাকা বক্তৃতা দেবার জন্য। পরীক্ষার খাতা দেখে কিছু উপার্জন হয়, যেমন বাবার ১১০ টাকা ৫ আনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২৮/৩/৪০), ১১০ টাকা ২ আনা (১৫/৪/৪০)। মাঝে মাঝে বোর্ড অফিস থেকে টাকা আসে (জুন ১৯৪১, বোর্ড অফিস হইতে আসিল ১১৫ টাকা)। কী অফিস জানি না, কোনো পরীক্ষার অফিস নিশ্চয়ই, অধ্যাপকরা আর কোথায় যাবেন?

বছরে কয়েকবারের এই বাড়তি আয়ে সবকিছু সামলানো যায় না; প্রত্যেকেরই থাকে ব্যাংকের ওভারড্রাফট, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার। ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর মাসে বাবা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার নিলেন ৬০০ টাকা; ডিসেম্বর মাস থেকে প্রতিমাসে মাইনে থেকে কাটা যাচ্ছে ৩০ টাকা। বাবারা সহকর্মী ও বন্ধুরা এত কাছের ছিলেন যে একে অপরের কাছ থেকে ধার নিতেন, মা-মাসিরাও; ৫ টাকা, ১০ টাকা। ধার শোধ হতো, হয়তো সময় নিয়ে।

জিনিসপত্রের দাম

১৯৪০ ১. মুরগি ২টা — ৪ আনা ১০ পয়সা
২. ওজনে বড় হলে — ৮ আনা ৯ পয়সা।
৩. লাউ ও ডোগা — ৫ পয়সা
৪. মোচা — ৫ পয়সা
৫. বাখরখানি — ১০ পয়সা
৬. চাউল (১ মণ) — ৮ টাকা
৭. মতির ঘি — ৫ টাকা
৮. রোজকার বাজার — আট আনা
৯. খুচরো সওদা — ১ আনা

(মতি ঘিওয়ালাকে মনে পড়ে, বেশ লম্বা, গোলগাল, শক্তপোক্ত, ধুতি উঁচু করে পরা, আঁটসাঁট বাঁধা, গায়ে হাতওয়ালা সাদা গেঞ্জি, কাঁধে লম্বা বাঁশ থেকে ঝোলানো হাঁড়ি ভরা ঘি, পুরানা পল্টনের বাড়ির উঠোনের দরজায়।)

কিছু শব্দ নতুন করে মনে পড়ল

১. ফাঁস (এক গাড়ি) — ১ টাকা ৩ আনা
২. জলভাড়ী — ২ আনা বা ৪ আনা
৩. কুয়ো থেকে ঘটি তোলা — ৪ আনা
৪. মুটে — ৩ আনা
৫. পাটখড়ি — ✓৹ (এক আনা)
৬. কয়লা (১০ মণ) — ১০ টাকা আট আনা
৭. ঘুঁটে — ১০ পয়সা
৮. পাটা ধার করান — ১০ পয়সা
৯. জুতার চক — ১ আনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. চুল ছাঁটা, সমীরের গাড়ি ভাড়া, গেণ্ডারিয়া যাবার রেল ভাড়া — সবই এক আনার মধ্যে।

বিবিধ খরচ, সংসারের ও সামাজিক

১. সমীরের স্কুল মাইনা	৩ টাকা ৮ আনা
২. সমীরের হাত খরচ (রোজদিন নয়)	৫ থেকে ১০ পয়সা
৩. বই (বিজ্ঞান পরিচয়)	৪ টাকা ৮ আনা
৪. আনন্দবাজার পত্রিকা	২ টাকা ৪ আনা
৫. লংক্লথ (১৫ গজ)	৮ টাকা ৪ আনা ১০ পয়সা
৬. Lactogen (এক টিন)	২ টাকা ৮ আনা
৭. রানীর বিবাহের খরচ (রানী কে জানি না)	১০০ টাকা
৮. বাবুর জন্মদিনের উপহার (মন্মথকাকার পুত্র বাবু)	৩ টাকা ৫ আনা
৯. জ্যোতির্ময় বাবুর মেয়ের জন্য জামা	১ টাকা
১০. বরিশালে উপহার দেবার জন্য	
২ খানা শাড়ি	৯ টাকা
৫ খানা তাঁতের শাড়ি	১৯ টাকা
১১. শান্তির (মায়ের) শাড়ি	৩ টাকা
১২. ফেকনের বকশিশ (ধুতি ২ টাকা, হাতে ১ টাকা)	৩ টাকা
১৩. সেতার সারানো	১১ টাকা
১৪. সেতারের মেজরাফ	৫ আনা

শখের খরচ ছিল না তা নয়

১. বিবির শাড়ি	৮ আনা
২. বিবির শান্তিপুরি শাড়ি	১ টাকা
৩. জামার জন্য লেস	৮ আনা
৪. কাচের চুড়ি	৪ আনা
৫. চীনে কুশন কাভার	৪ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৩; বেতন বৃদ্ধি হয়নি, মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।
মে মাস

চাল (বাদাম) — ২ মণ — ৪০ টাকা
মতি ঘি — ৬ টাকা
রোজকার বাজার আট আনা থেকে বেড়ে ১ টাকা

মাসের শেষে হিসাব মেলানো মা-মাসি-কাকিদের পক্ষে সহজ ছিল না। বাবা-কাকারা গবেষণা, অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিত থাকতেন বাড়তি টাকার বন্দোবস্ত কোথা থেকে হবে। তবু বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র যাবার কথা ভাবেননি। মা-মাসিরা টানাটানির সংসার সত্ত্বেও এ-বেলার মাছ ও-বেলা রান্না করেননি, থেকেছেন হাসিমুখে, আনন্দে, শান্তিতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. অজিত দত্ত *কুসুমের মাস*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৬।

২. অলকনন্দা দাশগুপ্ত প্যাটেল 'পরিমল রায়ের ছড়া', *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ৩, ১৪১৫।

৩. অলকনন্দা দাশগুপ্ত প্যাটেল 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় প'ড়ে মনে এল', *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ৩-৪, ১৪১৬।

৪. অশোক মিত্র *আপিলা-চাপিলা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২।

৫. অশোক মিত্র, প্রকাশক শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, লেজার ইম্প্রেশনস, কলকাতা, ২০০৩।

৬. আবদুর রাউফ *বহুমাত্রিক নজরুল*, বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০।

৭. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : *আমার বোকা শৈশব*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০।

৮. *আরেক রকম* : সম্পাদক অশোক মিত্র, সমাজচর্চা ট্রাস্ট, কলকাতা।

৯. আশালতা সেন *সেকালের কথা*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০।

১০. কবি বিজয় গুপ্ত *পদ্মপুরাণ* বা *মনসামঙ্গল*: সম্পাদক, পণ্ডিত কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরি, কলিকাতা, ২০১৩।

১১. কমল চৌধুরী সংগ্রহ ও সম্পাদনা, *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২।

১২. *কালি ও কলম* সম্পাদক আবুল হাসনাত, প্রকাশক আবুল খায়ের, ঢাকা।

১৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম : *চল্লিশ দশকের ঢাকা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১।

১৪. গিরীন্দ্রনাথ দাস *বাংলার পীর সাহিত্যের কথা*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৮।

১৫. 'গৈলা সম্মিলনী' সংকলিত *গৈলার কথা*, কলকাতা, ১৯৬৬।

১৬. *চতুরঙ্গ* সম্পাদক আবদুর রাউফ, ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা।

১৭. *চারুকলা* সম্পাদক অশোক ভট্টাচার্য্য, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৯।

১৮. চিত্ররেখা গুপ্ত *প্রথম আলোর পদধ্বনি*, উর্বি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯।

১৯. চিত্ররেখা গুপ্ত *উনিশ শতকের বিস্মৃত লেখিকারা, সঞ্চয় ও সংশয়*, উর্বি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪।

২০. জীবনানন্দ দাশ *রূপসী বাংলা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৪০৮।

২১. তপন পিপলাই *স্মৃতির মণিকোঠায় একটি পিপলাই বাড়ির কাহিনী*, পিপলাই বাড়ি, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, ১৯৯৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২. নলিনী মিত্র *আমাদের মামাবাড়ি*, জুন ১৯৮১, পরিবারের জন্য লেখা, প্রকাশকের নাম নেই।

২৩. নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী *বাংলা সাহিত্যের কথা*, *লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৩।

২৪. নীলকান্ত বেপারী *কবি বিজয় গুপ্ত, জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১।

২৫. পরিমল রায় 'ঢাকার কথা', *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, ১৪১৪।

২৬. প্রণব বর্দ্ধন *স্মৃতি কুন্তয়ন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩।

২৭. প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৩৬৮।

২৮. *প্রবাসী* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা।

২৯. মিহির সেনগুপ্ত *বিষাদবৃক্ষ*, 'উজানি খালের সোঁতা', পৃ. ৯৩-৩৭১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬।

৩০. মিহির সেনগুপ্ত *একুশ বিঘার বসত*, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৯।

৩১. মুনতাসীর মামুন সম্পাদক, *ঢাকার স্মৃতি*, ১২ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২।

৩২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *শরৎ সাহিত্যসমগ্র*, সম্পাদক সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০০।

৩৩. শৈলজারঞ্জন মজুমদার *যাত্রাপথের আনন্দগান*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২।

৩৪. সনৎকুমার সাহা 'অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত', *কালি ও কলম*, ঢাকা (সম্ভবত ২০০৩)।

৩৫. 'সনৎকুমার সাহা অর্থনীতির তত্ত্বজ্ঞানী' অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, *কালি ও কলম*, ষষ্ঠ বর্ষ, নবম সংখ্যা, কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ৭-১৯।

৩৬. সত্যব্রত বসু *বুড়িগঙ্গা থেকে যমুনা*, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬।

৩৭. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী *অন্দরে অন্দরে, উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*, স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৮।

৩৮. সরদার ফজলুল করিম *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব বঙ্গীয় সমাজ*, *অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

৩৯. সুকুমার রায় *ঢাকার সঙ্গীত সমাজ*, *চল্লিশ দশকের ঢাকা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬১-৮১।

৪০. সৈয়দ শামসুল হক *প্রণীত জীবন*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮।

৪১. হায়াৎ মামুদ *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

৪২. হাসান আজিজুল হক *আগুন পাখি*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩. ক্ষিতিমোহন সেন *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৬।

৪৪. *A. K. Dasgupta Collected Works*, ed. Alaknanda Patel, Oxford University Press, Delhi, 2009.

৪৫. Amartya Sen Poverty and Famines; An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford Clarendon Press, 1981.

৪৬. Aneesh Pradhan *Hindustani Music in Colonial Bombay*, Three Essays Collective, New Delhi, 2014

৪৭. Ashok Mitra (ed) : *Economic Theory and Planning*, Essays in Honour of A. K. Dasgupta, OUP, 1974.

৪৮. Geraldine Forbes and Tapan Raychaudhuri The Memoirs of Dr. Haimabati Sen, Roli Books, New delhi, 2000

৪৯. Joan Robinson 'Review of Economic Planning and Growth' by A. K. Dasgupta, *Economic Journal*, 1966.

৫০. Michael P. West New Method Readers, London, Longmans Green and Co. 1926.

৫১. Willem Van Schendel *A History of Bangladesh*, Cambridge University Press, New Delhi, 2009.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~